HINDUSTAN PAPER CORPORATION LTD.
Cachar Paper Mill
PLANT
TOWNSHIP
Paper For People
From Bamboo To Book

ISNN 2249-5207

বরাক উপত্যকার অর্থনৈতিক দৃশ্যপট

আকাদেমি পত্রিকা

১৪৩০ বঙ্গাব্দ ।। ২০২৪ খ্রিস্টাব্দ

ভাষা আকাদেমি
বরাক উপত্যকা বঙ্গ সাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্মেলন

বরাক উপত্যকার অর্থনৈতিক দৃশ্যপট

আকাদেমি পত্রিকা

১৪৩০ বঙ্গাব্দ : ২০২৪ খ্রিস্টাব্দ

সম্পাদক

পরিতোষচন্দ্র দত্ত

ভাষা আকাদেমি
বরাক উপত্যকা বঙ্গ সাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্মেলন
কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহক সমিতি, শিলচর, আসাম

আকাদেমি পত্রিকা

AKADEMI PATRIKA

A Research Journal of the Bhasha Akademi (in Bengali)
under the aegis of Barak Upatyaka Banga Sahitya-O-Sanskriti Sammelan, Silchar, Assam
published by ***Gautam Prasad Dutta****, General Secretary, edited by Paritoshchandra Dutta, Convenor,*
Bhasa Akademi, Vol. VI, No. 7

© *Barak Upatyaka Banga Sahitya-O-Sanskriti Sammelan, Silchar, Assam*

Price : ₹ 300/-

ISSN 2249-5207

সম্পাদনা সমিতি

বিভাসরঞ্জন চৌধুরী, সঞ্জীব দেবলস্কর, সব্যসাচী রায়, নিজাম উদ্দিন লস্কর, পরিতোষচন্দ্র দত্ত (আহ্বায়ক)

প্রকাশ : ২০২৪ **#** ১৪৩০

© **বরাক উপত্যকা বঙ্গ সাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্মেলন, কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহক সমিতি।**

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা : পুণ্যপ্রিয় চৌধুরী

মুদ্রণ : শিলচর সানগ্রাফিক্স, উল্লাসকর দত্ত সরণি, শিলচর - ৭৮৮০০১

প্রকাশক : বরাক উপত্যকা বঙ্গ সাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্মেলন পরিচালিত 'ভাষা আকাদেমি'র পক্ষে কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহক সমিতির সাধারণ সম্পাদক **গৌতমপ্রসাদ দত্ত** কর্তৃক প্রকাশিত, ভাষা আকাদেমির আহ্বায়ক **পরিতোষচন্দ্র দত্ত** কর্তৃক সম্পাদিত এবং শিলচর সানগ্রাফিক্স, প্রেমতলা, শিলচর-৭৮৮০০১ এর পক্ষে **পুণ্যপ্রিয় চৌধুরী** কর্তৃক মুদ্রিত।

মূল্য : ৩০০ টাকা

এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিভিন্ন মতামত সম্পূর্ণভাবে লেখকদের। প্রকাশক, সম্পাদক কিংবা সম্পাদকমণ্ডলী এর জন্য দায়ী নন।
অনুমতি ছাড়া এই পত্রিকার কোনও লেখা বা রচনার কোনও অংশবিশেষ প্রকাশ নিষিদ্ধ।

বিষয়সূচি

মুখবন্ধ ৫
প্রাক্-কথন ৭
সম্পাদকীয় ৯

- বরাক উপত্যকার অর্থনৈতিক অনগ্রসরতা — *বিভাসরঞ্জন চৌধুরী* ১৫
- বরাক উপত্যকার উন্নয়ন : প্রত্যাশা ও আশঙ্কা — *অলক সেন* ২৪
- বরাকের বিকাশ কোন্ পথে — *গুরুদাস দাস* ৩০
- বরাক উপত্যকা ও ‘পূর্বে তাকাও’ নীতি — *বীরেশ্বর মুখোপাধ্যায়* ৪২
- বরাকের বিকল্প যোগাযোগ — *গৌতমপ্রসাদ দত্ত* ৫১
- বরাকের আর্থিক বিকাশে ব্যাঙ্কিং ক্ষেত্র — *আশিস চৌধুরী* ৬২
- বরাক উপত্যকায় কৃষির সেকাল — *আবিদ রাজা মজুমদার* ৬৮
- বরাকের কৃষির একাল — *সুদীপ্ত দেবরায়* ৭৪
- বরাকের কৃষি : সময়ের অনুভব — *সঞ্জীব দেবলস্কর* ৮১
- বরাকে কৃষিভিত্তিক ব্যবসায়ের সম্ভাবনা — *সুভাষ ভট্টাচার্য* ৮৮
- বরাকের অর্থনীতিতে চা-শিল্প — *তমাল সেন* ৯৪
- বরাকের অর্থনীতিতে বাঁশ শিল্প — *পার্থপ্রতিম দাস* ৯৮
- পর্যটন শিল্পে বরাকের সম্ভাবনা — *সঞ্জীব ভট্টাচার্য* ১০৬
- উপত্যকার বিকাশে শনবিল — *মানবেন্দ্র দত্তচৌধুরী* ১১৬
- কালীগঞ্জের শীতলপাটি : ঐতিহ্য, সম্ভাবনা — *সব্যসাচী রায়* ১২০
- কাছাড় চিনিকল : একটি পর্যালোচনা — *অরিজিৎ চৌধুরী* ১২৭
- কাগজকলের রুদ্ধ দুয়ার— সম্ভাবনার অপমৃত্যু — *পরিতোষচন্দ্র দত্ত* ১৩৬
- অর্থনৈতিক উন্নয়ন পর্ষদ : মুক্তির ইস্তাহার — *দীপক সেনগুপ্ত* ১৫০
- বিভাজন-পূর্ব সিলেট : বিস্মৃত বিদ্যা ও শিল্পের আখ্যান — *জয়িতা দাস* ১৫৮
- মানব বিকাশ : হাইলাকান্দি জেলার চিত্র — *গোলাবচন্দ্র নন্দী* ১৮২
- করিমগঞ্জ কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক : পর্যবেক্ষণ — *বিবেকানন্দ মোহন্ত* ১৮৮
- গ্রাম পদ্মারপার : ১৯৫০ থেকে ২০২২ — *বিনোদলাল চক্রবর্তী* ১৯৯

বিষয়সূচি

লেখক পরিচিতি ২০৪

ক্রোড়পত্র :

১ এক নজরে বরাক উপত্যকা ২০৭
২ **The Memorandum on Economic Development Council** ২০৮
৩ **Synopsis on Revival of Cachar Paper Mill & Struggle of JACRU** ২৩০
৪ **Chief Minister's Statement on Barak (1)** ২৩৫
৫ **Chief Minister's Statement on Barak (2)** ২৩৭
৬ **Beginning of the Tea Industry in Cachar** ২৩৯
৭ **The Statistics: A Government of Assam Publication** ২৪৩
৮ **Natural Wetlands in Barak Valley** ২৪৬
৯ বরাক উপত্যকার তিন জেলায় ব্যাঙ্কগুলোতে জমা এবং অগ্রিম প্রদানে খতিয়ান ২৪৭

বিশেষ প্রতিবেদন :

ক. আকাদেমি পত্রিকা — গত ছয়টি সংখ্যার সূচি ২৫০

বরাক উপত্যকা বঙ্গ সাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্মেলন
কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহক সমিতি
দূরভাষ : +৯১-৯৪৩৫০৭৫৭৫৫/ ৯৭৪২৫৩০৯৮৪

মুখবন্ধ

রাক উপত্যকার সাহিত্য-সংস্কৃতি-ভাষা-শিক্ষা-অর্থনীতি-ইতিহাস প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়ে গবেষণা ও গবেষণামূলক গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি প্রস্তুতির জন্য কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহক সমিতি ভাষা আকাদেমি গঠন করে। ভাষা আকাদেমি দ্বারা প্রকাশিত 'আকাদেমি পত্রিকা'র সপ্তম সংখ্যা বের হতে চলেছে এবার। এই 'আকাদেমি পত্রিকা' পূর্বতন 'গবেষণা পর্যদ পত্রিকা'রই নতুন রূপ। ইতিপূর্বে গবেষণা পর্যদ/ ভাষা আকাদেমির উদ্যোগে পরপর ছয়টি সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছে, যা সংশ্লিষ্ট মহলে যথেষ্ট সমাদৃত হয়েছে। এবারের সংখ্যাটি প্রকাশিত হচ্ছে বরাক উপত্যকার অর্থনীতিকে কেন্দ্র করে। বিভিন্ন গবেষক তাঁদের সুচিন্তিত ভাবধারা উপস্থাপন করেছেন তাঁদের নিবন্ধে। বিগত দিনে 'জনগণের কাছে চলো' এমন স্লোগান তুলে স্বশাসিত অর্থনৈতিক উন্নয়ন পরিষদের দাবিতে অভিযান শুরু করেছিল বরাক উপত্যকা বঙ্গ সাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্মেলন;আমাদের প্রধানমন্ত্রীর কাছে এ ব্যাপারে স্মারকলিপিও দেওয়া হয়েছিল। এবারকার আকাদেমি পত্রিকার সংখ্যাটি তাই খুবই প্রাসঙ্গিক। উপত্যকার জনসাধারণ ও সংশ্লিষ্ট মহলের কাছেও সংখ্যাটি অবশ্যই অর্থবহ ও সমাদৃত হবে বলে আমার বিশ্বাস।

বরাক উপত্যকা বঙ্গ সাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্মেলন এই উপত্যকার সর্বাঙ্গীণ ঐতিহ্যের ধারাবাহিকতা রক্ষায় দায়বদ্ধ। বাংলাভাষী সহ অপরাপর সংখ্যালঘু গোষ্ঠীর ভাষা-সংস্কৃতি-শিক্ষা-অর্থনীতি-ইতিহাস প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়ের মর্যাদা রক্ষায়ও সমান যত্নশীল। ভাষা আকাদেমি পত্রিকার বিভিন্ন সংখ্যায় তা প্রতিফলিত হয়।

বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব যারা আমাদের আহ্বানে সাড়া দিয়ে বরাক উপত্যকার অর্থনৈতিক অবস্থা মূল্যায়নের প্রয়াস করেছেন, তাঁদের সবাইকে জানাই আমার কৃতজ্ঞতা।

বিনীত

১ ডিসেম্বর ২০২৩

(রাধিকারঞ্জন চক্রবর্ত্তী)
সভাপতি

বরাক উপত্যকা বঙ্গ সাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্মেলন
কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহক সমিতি
দূরভাষ : ০৩৮৪২ ২৬৭১২৭
৯১-৯৪০১৫৯৪৯২৪/৬০০৩০০৭৪১৯
সাধারণ সম্পাদক
Email : gautampdutta@Gmail.com

প্রাক্‌-কথন

১৯৪৭ সালে অখন্ড ভারতের বুক চিরে শুধু দু'টি দেশেরই সৃষ্টি করা হয়নি, গণভোটের রাজনৈতিক কূট চক্রান্তে অবিভক্ত সুরমা উপত্যকাকে দু'টি দেশে বিভাজিত করা হয়েছিল। অর্থনৈতিকভাবে সমৃদ্ধ সিলেট জেলার বৃহৎ অংশকে তৎকালীন পাকিস্তানে ঠেলে দেওয়ার পরই বরাক, ধলেশ্বরী, সুরমা, কুশিয়ারার জনপদে আর্থ-সামাজিক বিপর্যয় যাত্রা শুরু হয়। স্বাধীনতার গত সাড়ে সাত দশকে রাজনীতি-লালিত উগ্র জাতীয়তাবাদী মনোভাবের ফলশ্রুতিতে ক্রমাগত বঞ্চনা ও উপেক্ষা বরাক উপত্যকার আর্থিক মেরুদণ্ডটাকে ভেঙে দিয়েছে।

আর্থিক বিকাশের ক্ষেত্রে দু'টি সূচক হচ্ছে স্থানীয় সম্পদকে যথাযথভাবে কাজে লাগিয়ে শিল্পায়ন এবং তাকে লাভদায়ক করে তুলতে উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা। মিশ্র অর্থনীতির কাল থেকে উদার অর্থনীতির রূপান্তরের পর্বগুলোতে এই উপত্যকায় সরকারি ও বেসরকারি ক্ষেত্রে শিল্পায়নের জন্য বিনিয়োগের মাত্রা বাড়াতে তেমন আগ্রহ দেখা যায়নি। আঞ্চলিক সম্পদকে কাজে লাগিয়ে সরকারি স্তরে যে-সব বড়, মাঝারি ও ক্ষুদ্র মাপের শিল্প এই উপত্যকায় গড়ে উঠেছিল, একে-একে তার দুয়ারে তালা লাগিয়ে বাতি নিভিয়ে দেওয়া হয়েছে। বেসরকারি ক্ষেত্রে সংগঠিত শিল্প চা-র বিরাট সম্ভাবনা থাকলেও উপযুক্ত বিনিয়োগ ও আধুনিকীকরণের অভাবে তা ধুঁকছে। অন্যান্য ক্ষেত্রে তেমন উল্লেখযোগ্য শিল্প গড়ে উঠেনি। ফলে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির যে সম্ভাবনা দেখা গিয়েছিল, তা রুদ্ধ হয়ে পড়েছে। সরকারি স্তরে নিয়োগের ক্ষেত্রেও এই উপত্যকার সন্তানদের প্রতি যে বিমাতৃসুলভ মনোভাব দেখানো হচ্ছে, তা নজিরবিহীন।

আজকে প্রায় শিল্পহীন পরিবেশ এবং অগুনতি বেকারের দীর্ঘশ্বাসের যুগলবন্দি আর্থিক স্থিতিকে বিপর্যয়ের দিকে ঠেলে দেওয়ায় দেয়ালে পিঠ লেগে গেছে। এই অবস্থায়ও রাজনৈতিক ও সামাজিক স্তরে ঘুরে দাঁড়ানোর কোনও উদ্যোগ নেই। দিল্লি, দিসপুরে ক্ষমতার অলিন্দে বরাকের কান্নাকে আন্তরিকভাবে পৌঁছে দেওয়ার মানসিক দৃঢ়তা এবং সদিচ্ছা প্রায় শূন্যের কোঠায়। রাজনীতি এখানে মানুষের প্রত্যাশা পূরণে ব্যর্থ হয়ে কার্যত দেউলিয়া হয়ে গেছে। সামাজিক ক্ষেত্রে ধর্মীয় মেরুকরণে সৃষ্ট ভাবাবেগ আত্মপরিচয় ও অধিকার রক্ষার চেতনাকে ম্লান করে এক আত্মঘাতী

অসহনশীল পরিবেশ তৈরি করেছে। ফলে আগামী প্রজন্মের ভবিষ্যৎ চরম অনিশ্চয়তার পথে ধাবমান।

এই প্রেক্ষাপটকে সামনে রেখে বরাক উপত্যকা বঙ্গ সাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্মেলন এবারের আকাদেমি পত্রিকাকে ‘বরাক উপত্যকার অর্থনৈতিক দৃশ্যপট’ সংখ্যা হিসেবে প্রকাশ করেছে। দলীয় রাজনীতি এবং সব ধরনের সংকীর্ণ ভাবাবেগের ঊর্ধ্বে দাঁড়িয়ে এই উপত্যকার ভবিষ্যৎ সুরক্ষায় চিন্তনের ক্ষেত্রকে এই অর্থনৈতিক সংখ্যা সাহায্য করতে পারে বলে আমরা আশা করছি।

বিনীত

গৌতমপ্রসাদদত্ত

(গৌতমপ্রসাদ দত্ত)
সাধারণ সম্পাদক

৮ পৌষ, ১৪৩০ বঙ্গাব্দ
২৫ ডিসেম্বর, ২০২৩ খ্রিস্টাব্দ

সম্পাদকীয় প্রতিবেদন

অর্থনৈতিক উন্নয়নে কৃষি ও শিল্পের ভূমিকা সম্পর্কে অর্থনীতিবিদদের মধ্যে মতভেদ আছে। তাই দেখা যায় অনুন্নত দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে কৃষি প্রাধান্য পাবে, না শিল্প প্রাধান্য পাবে—এই নিয়ে দু'টো চরম মত রয়েছে। বাস্তবে কিন্তু কৃষি ও শিল্প উন্নয়ন সম্পর্কহীন পরস্পর-বিরোধী নয় উপরন্তু এই দু'টি একে-অপরের পরিপূরক। অর্থাৎ, কৃষি উন্নয়ন যেমন শিল্প উন্নয়নকে সাহায্য করে, তেমনই আবার শিল্প উন্নয়ন কৃষি উন্নয়নকে সাহায্য করে। এই মতের প্রবক্তা হলেন নার্কস (Nurkse), স্কিটভস্কি (Sckitovsky), লিউইস (Lewis) প্রমুখ অর্থনীতিবিদ। এসব অর্থনীতিবিদ কৃষি ও শিল্প উভয় ক্ষেত্রকেই সমান গুরুত্ব দিয়ে সুষম উন্নয়নের পক্ষে মত দেন। তাঁদের মতে, কৃষি উন্নয়ন ও শিল্প উন্নয়ন পরস্পর-পরস্পরকে সাহায্য করে এবং কৃষিক্ষেত্র ও শিল্পক্ষেত্র যৌথভাবে অর্থনৈতিক উন্নয়নের গতি দ্রুততর করে। বলা যেতে পারে, কৃষি উন্নয়ন নানাভাবে শিল্প উন্নয়নে সাহায্য করে।

কৃষি এবং কৃষকরাই উপত্যকা, রাজ্য তথা দেশের অর্থনীতির মেরুদণ্ড। জনগণের পুষ্টির স্তর উন্নয়ন ও জনস্বাস্থ্যের উন্নয়নকে দেশের অন্যতম কর্তব্য হিসেবে চিহ্নিত করা প্রয়োজন। দেশের মানুষের জীবন ও জীবিকার সঙ্গে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠভাবে মিশে রয়েছে কৃষি। তাই কৃষিক্ষেত্রকে বাদ দিয়ে উপত্যকা তথা দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন অসম্ভব। দেশের ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার সঙ্গে তাল মিলিয়ে কৃষিখাতের সার্বিক উন্নয়নের জন্য সুষ্ঠু পরিকল্পনা একান্ত অপরিহার্য। কৃষিখাতের সম্প্রসারণের ফলে শিল্পখাতেরও প্রসার ঘটে। যখন কৃষিবিদদের সঞ্চয় থাকে, তারা ভোগ্যপণ্য কিনতে পারে, শিল্পেও বিনিয়োগ করতে পারে। এর ফলে শিল্পখাতের পরোক্ষ প্রসার ঘটে। উৎপাদনশীলতা ও আয় বৃদ্ধি এবং গ্রামীণ এলাকায় কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে বিশাল জনগোষ্ঠীর সমৃদ্ধির জন্য কৃষির গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। দেশের জিডিপিতে কৃষিখাত অর্থাৎ ফসল, মৎস্য, প্রাণিসম্পদ এবং বন গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে, শ্রমশক্তির প্রায় অর্ধেক কর্মসংস্থান জোগান এবং কৃষিভিত্তিক শিল্প প্রতিষ্ঠানের প্রধান কাঁচামাল সরবরাহ করে। কৃষি সামাজিক কর্মকাণ্ডের এক বিশেষ ক্ষেত্র, যাজনদের খাদ্য ও পুষ্টির নিশ্চয়তা, আয়ের সুযোগ সৃষ্টি এবং দারিদ্র্য হ্রাসকরণের মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলোর সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। এছাড়া, কৃষি বিভিন্ন ধরনের ভোগ্যপণ্যের বিশেষ করে গ্রামীণ এলাকায় ভোক্তাদের বাজারের চাহিদাভিত্তিক মালামালের উৎস।

বরাক উপত্যকার গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর দারিদ্র্য হ্রাস এবং জীবনমান উন্নয়নের জন্য বর্তমান কৃষি উৎপাদন ব্যবস্থাকে অধিকতর গতিশীল করা এবং টেকসই বাণিজ্যিক কৃষি উৎপাদন ব্যবস্থার প্রচলন অপরিহার্য। বরাক উপত্যকার কৃষিতে ফসলখাত অধিক

গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে এবং সরকারের কৃষিবিষয়ক বিভিন্ন কর্মসূচিতে ফসলখাত সর্বাধিক গুরুত্ব পাওয়ার চেষ্টা করা হয়ে থাকে। এটাও বাস্তব ঘটনা, প্রতি বছর উপত্যকায় কৃষিজমির পরিমাণ একটু-একটু করে কমছে। পাশাপাশি মাটির অবক্ষয় এবং উর্বরতা হ্রাস পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মাটিতে লবণাক্ততা বৃদ্ধির ফলে মাটির গুণাগুণ হ্রাস পাচ্ছে। এছাড়া জলসম্পদও সংকুচিত হচ্ছে। এটাও ঘটনা যে, স্বাধীনতার সময় থেকেই রাজ্যের শাসকগোষ্ঠী এই উপত্যকার উন্নয়নে এক বৈষম্যমূলক আচরণের ফলেই আজও এই উপত্যকা নানাভাবে পিছিয়ে রয়েছে। স্বাধীনতার পর থেকেই অবহেলিত ও শোষিত এ উপত্যকার গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর ও সাধারণ মানুষের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে কৃষির কোনও বিকল্প নেই বলেই দৃঢ় বিশ্বাস। কৃষির উন্নতিই হচ্ছে কৃষকের অর্থনৈতিক মুক্তি, কৃষকের অর্থনৈতিক মুক্তি মানেই উপত্যকার অর্থনৈতিক স্বাধীনতার সূর্য হবে আরও প্রজ্বলিত ও প্রস্ফুটিত। বর্তমান সময়ে এই উপত্যকার প্রতি সরকারের বিদ্বেষ আরও প্রকটভাবে কার্যকর হতে দেখা যাচ্ছে। এক্ষেত্রে এ উপত্যকার নেতা-মন্ত্রীরাও নিজেদের স্বার্থের কথা চিন্তা করেই শিরদাঁড়া সোজা করে উপত্যকার প্রকৃত উন্নয়নের পক্ষে আওয়াজ তুলতে পারছেন না। অবশ্য দু’-একজন ব্যতিক্রমী চরিত্রের ব্যক্তিত্ব থাকার ফলে এই উপত্যকায় সামান্যভাবে অর্থনৈতিক উন্নয়ন সরকার অনিচ্ছা সত্ত্বেও করতে বাধ্য হয়েছে।

অর্থনৈতিক উন্নয়নের সংজ্ঞা নিয়ে অর্থনীতিবিদদের মধ্যে যথেষ্ট মতপার্থক্য থাকলেও উন্নয়নের পূর্বশর্তই হচ্ছে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা। রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা না থাকলে অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্ভব নয়। ভাষা আকাদেমির এই সপ্তম সংখ্যায় প্রকাশিত নিবন্ধগুলোতে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড, ভবিষ্যতে আমাদের সম্ভাবনা ও চ্যালেঞ্জগুলোর ওপর দৃষ্টিপাত করার চেষ্টা করা হয়েছে। হিসেব মিলিয়ে দেখতে হবে, আমরা কতটুকু অর্জন করেছি, কতটুকু ব্যর্থ হয়েছি, কেন ব্যর্থ হয়েছি এবং ভবিষ্যতের চ্যালেঞ্জগুলো কীভাবে মোকাবিলা করে এগিয়ে যেতে হবে। সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলো নিয়ে আত্মপর্যালোচনার মাধ্যমে নিশ্চয়ই সঠিক পথনির্দেশনা পাওয়া যাবে। আশা করা যায়, যে সরকার আসবে, তাদের জন্য একটি দিকনির্দেশনা তৈরি হবে এতে, যাতে তারা ঠিকমতো রাজ্য তথা দেশ পরিচালনা করতে পারে। পথ ভিন্ন হতে পারে, কিন্তু উপত্যকার অর্থনৈতিক উন্নতির ব্যাপারে সবার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য এক হওয়া উচিত।

ভারতে বিভিন্ন উৎপাদনের মধ্যে অন্যতম অর্থকরী উৎপাদন হচ্ছে চা। উনবিংশ শতকের তৃতীয় দশকে চা-শিল্পের পক্ষে অত্যন্ত অনুকূল হিসেবে এ উপত্যকাসহ রাজ্যের প্রকৃতি, পরিবেশ, মাটির উর্বরতা ও জলবায়ু ব্রিটিশ বণিকদের নজরে পড়ায় চা-বাগানের পত্তন হয়েছিল। বর্তমান সময়ে দেশে প্রায় ১৬০০টি চা-বাগান রয়েছে, যার মধ্যে আসামে ৭৯৯টি। গত দুই দশকে রাজ্যে প্রায় ৫০টি বাগান ধ্বংস হয়ে গেছে। একইভাবে এই উপত্যকায়ও চা-বাগানের সংখ্যা ১০০টির বেশি থাকলেও আজ আর সেই সংখ্যা নেই। বরাক উপত্যকার অর্থনীতিতে একসময় চা-শিল্পের এক বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা থাকলেও বর্তমান সময়ে উপত্যকার চা-শিল্পে কিছুটা মন্দাভাব চলছে। বিশেষভাবে ছোট ছোট চা-বাগান, যেখানে মালিকের একটা বা দুটো বাগান রয়েছে, সেখানে সঙ্কট বিরাজ করছে। তবে এটাও সত্য, ১৯৮৫ থেকে ১৯৯৯ সাল পর্যন্ত মালিকপক্ষ সীমাহীন লাভ করেছে। স্বাধীনতার পর অনেক ছোট ছোট চা-বাগান গড়ে উঠেছে। যে বাগানগুলো শুধুমাত্র কাঁচা চা-পাতা বিক্রি করে থাকে, সেই ছোট ছোট চা-বাগানগুলো সঙ্কটজনক অবস্থায় রয়েছে। আবার এটাও সত্য, মানুষের ক্রয়ক্ষমতা নীচে নেমে যাওয়ার ফলে চা বিক্রিও অনেকটা কমে গিয়েছে। মালিকগোষ্ঠী অধিক লাভের জন্য সুপরিকল্পিতভাবে স্থায়ী শ্রমিকের

সংখ্যা ক্রমান্বয়ে কমিয়ে এনেছে। তাছাড়া শ্রমিকের অর্জিত সবরকম সুযোগ-সুবিধা কেড়ে নেওয়ার প্রচেষ্টা মালিকপক্ষ অব্যাহত রেখেছে। পুঁজিবাদী বিশ্ব অর্থনৈতিক সঙ্কটে সৃষ্টি হয়েছে ভারতেরও চরম অর্থনৈতিক সঙ্কট এবং এই সঙ্কটে আমাদের চা-শিল্পও রয়েছে।

উল্লেখ্য, উপত্যকার অধিকাংশ চা-বাগান সবুজ পাহাড়ে ঘেরা থাকায় এক অপরূপ প্রাকৃতিক শোভার সৃষ্টি হয়, যা পর্যটকদের আকর্ষিত করে মনকে আন্দোলিত করে। উপত্যকায় প্রচুর চা-বাগান রয়েছে, যেখানের কারখানাগুলোতে নানা মানের চা উৎপাদন হয়ে থাকে। বিশ্বের বাজারে এই উৎপাদিত চায়ের বিশেষ সমাদর রয়েছে। কিন্তু বরাকের এই চা-শিল্পকে ধ্বংস করার সুপরিকল্পিত পরিকল্পনা সরকারের রয়েছে এবং স্থানীয় কিছু সুযোগসন্ধানী নেতার সহযোগে বাস্তবায়িত করার প্রক্রিয়া শুরু হয়ে গেছে। যেভাবেই হোক বরাক উপত্যকাকে অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল করার এক সংকীর্ণ রাজনীতি কাজ করছে বলেই জনগণের ধারণা। রাজনীতিতে অবাঞ্ছিত ব্যক্তিদের প্রবেশ পুরো রাজনৈতিক পরিবেশকে বিষাক্ত করে তুলেছে। উল্লেখ্য, গ্রামীণ কৃষক এবং কারিগরদের নিঃস্ব করার জন্য ব্রিটিশ সরকার তাদের ওপর কর-এর বোঝা বিপুল পরিমাণে বৃদ্ধি করার অসৎ পদক্ষেপ গ্রহণ করলো, যাতে গ্রামীণ শ্রমজীবী জনসাধারণ চা-বাগানে শ্রমিক হিসেবে কাজ করতে বাধ্য থাকে। ১৮৩৭ সালে এখানে প্রথম প্রচেষ্টা শুরু হলেও ১৮৪০ সালের পর চিন দেশ থেকে চিনা শ্রমিকদের এনে উৎপাদনের কাজ শুরু হয়। তবে কৃষক জনসাধারণ ব্রিটিশের এই জঘন্য ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়ে উপনিবেশবাদীদের চক্রান্ত ব্যর্থ করে দেওয়ার ফলে শ্রমিক সংগ্রহ করতে মধ্যভারতে ছুটতে হয়। উপত্যকায় এই শিল্পের গোড়াপত্তনসহ বর্তমান বাস্তব সমস্যা সম্পর্কিত একটি নিবন্ধ এই সংখ্যায় প্রকাশের চেষ্টা করা হয়েছে।

আসামের আর্থিক আয়ের ক্ষেত্রে বরাকের কৃষিক্ষেত্র এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। চা, রাবার উৎপাদনের পাশাপাশি কৃষিজাত দ্রব্য, যেমন ধান, সুপারি, হলুদ, আদা, রসুন, মিষ্টি আলু, আনারস, কাঁঠাল, কলা, পেঁপে, কমলা সহ বিভিন্ন সাইট্রাস ফল এবং শাকসব্জির ফলনের মাধ্যমে মোট দেশীয় উৎপাদন (গ্রোস ডমেস্টিক প্রোডাক্ট) তথা অর্থনৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে এক বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে। ইতিমধ্যে বরাক উপত্যকার আনারস বিদেশের বাজারে স্থান পেয়েছে। উপত্যকার সুপারিও বহির্রাজ্যের বাজারে এক বিশেষ স্থান দখল করে রাখতে সক্ষম রয়েছে। বিভিন্ন লেখকের গবেষণালব্ধ নিবন্ধে উপরিউক্ত বিষয়গুলোর ব্যাপারে মূল্যবান তথ্যসহ মতামত প্রকাশ পেয়েছে। এছাড়াও উপত্যকার অর্থনীতির উন্নয়নে মাছ চাষের এক বিশাল ভূমিকা রয়ে গেছে। গুণগত মানের মাছের চারা উৎপাদন এবং স্থানীয় মাছের সংরক্ষণের ব্যাপারে রাজ্য সরকারের আসাম মীন নীতি ১৯৫৩ এবং আসাম মীন চারা আইন ২০০৫-এর সফল রূপায়ণে গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। মীন চারা আইন, ২০০৫-এর ভিত্তিতে আসাম মীন চারা নীতি ২০১০ গৃহীত হয়েছে। গুণগত মাছের চারা উৎপাদনের ব্যাপারে এধরনের প্রচেষ্টা ভারতে প্রথম বলে মনে করা হচ্ছে। এই মাছ চাষের সঙ্গে জড়িত সাধারণ জনগণের সচেতনতা ও সহযোগিতা ছাড়া এই আইনসমূহের সফল রূপায়ণ কোনওভাবেই সম্ভব নয়।

সভ্যতার ক্রমবিকাশের পাশাপাশি যুগের ধারাবাহিকতায় ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায় এবং সভ্যতার বিবর্তনে ব্যাঙ্ক ব্যবস্থার উন্নতি পরিলক্ষিত হয়। অর্থনীতিতে বিভিন্ন কার্য সম্পাদনের জন্য নানাধরনের ব্যাঙ্ক রয়েছে। বিভিন্ন ধরনের কাজের ভিত্তিতে ব্যাঙ্কের বিভিন্ন শ্রেণিবিভাগ থাকলেও বর্তমান সংখ্যায় উপত্যকার কিছু বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক এবং সমবায় আইনের আওতায় গঠিত ও

পরিচালিত সমবায় ব্যাঙ্ক নিয়ে সামান্য আলোকপাত করার চেষ্টা করা হয়েছে।

অর্থনৈতিক উন্নয়নের একটি বিশেষ দিক হচ্ছে মানবসম্পদের উন্নয়ন। জীবনধারণের জন্য একান্ত প্রয়োজনীয় দ্রব্যের বণ্টন আরও ব্যাপক করা, যেমন খাদ্য, আশ্রয়, স্বাস্থ্য সহ সব ধরনের সামাজিক নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা উন্নয়নের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক। তাই এখানে মানবিক বঞ্চনা নিয়েও তথ্যসমৃদ্ধ আলোচনার চেষ্টা করা হয়েছে। জীবন 'মানব উন্নয়ন' মাপকাঠি সম্পর্কিত বিভিন্ন পরিসংখ্যান বিশ্লেষণ করে রাজ্যের জেলাগুলোকে সাজানো হয়।

বিশ্ব অর্থনীতিতে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে এই শিল্পের অবদান ৮.৯ ট্রিলিয়ন ডলার। ২০১৯ সালে পর্যটন শিল্প বৈশ্বিক অর্থনীতিতে ২.৯ ট্রিলিয়ন ডলার অবদান রাখে, যা বিশ্ব জিডিপি-র ১০.৩ শতাংশ। এক সময়ের শান্তির দ্বীপ হিসেবে খ্যাত বরাক উপত্যকার বৈচিত্র্যপূর্ণ প্রাকৃতিক সৌন্দর্যসমৃদ্ধ সংস্কৃতিকে দেশ-বিদেশের পর্যটকদের কাছে তুলে ধরার প্রয়োজন রয়েছে। পর্যটন শিল্পকে কেন্দ্র করে উপত্যকায় বেকার সমস্যা দূরীকরণে নতুন নতুন কাজের সৃষ্টি করা যেতে পারে। পর্যটন সম্ভাবনাময় স্থানসমূহের পরিকাঠামোগত উন্নয়নের মাধ্যমে পর্যটন শিল্পে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করে উপত্যকার দারিদ্র্য বিমোচনে সহায়তা করা, পর্যটকদের সেবা প্রদানের কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ এবং বহির্বরাকে ইতিবাচক ভাবমূর্তি তুলে ধরার চেষ্টায় উপত্যকার পর্যটন শিল্প নিয়ে কিছু আলোচনা করা হয়েছে। উপত্যকার কুটিরশিল্পের নিয়েও কিছু সম্ভাবনার কথা বলা হয়েছে। দেশ বিভাজনের পূর্ববর্তী সময়ের উপত্যকার অর্থনৈতিক অবস্থা নিয়ে তথ্যপূর্ণ আলোচনার উপস্থিতি রয়েছে। এছাড়াও উপত্যকা বিভিন্নভাবে আর্থিক বৈষম্যের শিকার হওয়ায় উপত্যকার অর্থনৈতিক বিকাশ বাধাপ্রাপ্ত হয়েছে, যা প্রকাশিত পরিসংখ্যানে ফুটে উঠেছে।

অর্থনৈতিক উন্নয়নে উপত্যকার একমাত্র বৃহৎ শিল্প পাঁচগ্রাম কাছাড় কাগজকলের জন্মের ইতিহাসসহ উৎপাদন ক্ষমতা ইত্যাদি নিয়ে আলোচনার পাশাপাশি পরিশিষ্টে বন্ধ করে দেওয়া কাগজকলের কর্মচারী ইউনিয়নের আন্দোলনের বিভিন্ন দিক নিয়ে সারসংক্ষেপ লিপিবদ্ধ করার চেষ্টা করা হয়েছে। এখানে কাগজকল কর্মী তথা ইউনিয়নের নেতা মানবেন্দ্র চক্রবর্তীর লেখা একটি সারসংক্ষেপও অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এসব নথিপত্র পেতে বেশ কয়েকজন কাগজকল কর্মী নানাভাবে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন, যাদের সাহায্য ছাড়া আমার নিবন্ধসহ বিভিন্ন নথিপত্র জোগাড় করা ছিল অসম্ভব, তাদের সবার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

ভাষা আকাদেমি বর্তমান সংখ্যা প্রকাশ করতে গিয়ে অতিমারির এক বিরাট অধ্যায়কে সহ্য করতে হয়েছে। সম্মেলনের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী 'বরাক উপত্যকার অর্থনৈতিক পুনর্জাগরণ' বিষয়ে ভাষা আকাদেমির এই বিশেষ সংখ্যা প্রকাশের চিন্তাভাবনাকে ফলপ্রসূ করতে গিয়ে পরিকল্পনা তৈরি করেও অতিমারি সহ নানা সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়েছে। যা-ই হোক, বরাক উপত্যকার অর্থনৈতিক অনগ্রসরতার পাশাপাশি উন্নয়নের পরিকাঠামো ব্যবস্থার আধুনিকীকরণ, বিভিন্ন শিল্পোদ্যোগের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থবরাদ্দ এবং যথাস্থানে বিনিয়োগ ইত্যাদির প্রয়োজন রয়েছে। এই উপত্যকার গুরুত্বপূর্ণ ভৌগোলিক অবস্থানের পাশাপাশি রয়েছে নানারকম প্রাকৃতিক সম্পদ, যেগুলোর সঠিক অন্বেষণ আজ পর্যন্ত করা হয়নি। স্বাধীনতার থেকেই উপত্যকার প্রতি সরকারের চরম উপেক্ষা, বৈষম্যতাই প্রকৃত অর্থে উন্নয়নে উপযুক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়নি। স্বাধীনতার ৭৬ বছরেও দেশের অন্যান্য অঞ্চলের তুলনায়

এই উপত্যকার অর্থনৈতিক বিকাশ সঠিক অর্থে ঘটেনি, যদিও দেশের বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদরা তাঁদের মূল্যবান পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে বেশ কিছু সম্ভাবনার কথা উল্লেখ করেছেন। অন্ন-বস্ত্র-বাসস্থানের নিশ্চয়তা, শিক্ষা-স্বাস্থ্য সুবিধা ও কর্মসংস্থানের সুযোগ, উন্নত পরিকাঠামো এবং শিল্পোদ্যোগসহ সামাজিক নিরাপত্তা বিধানের বিষয়গুলোকে সরকারের কাছে বারবার দাবি জানানো সত্ত্বেও কোনও কাজ হচ্ছে না। তবে একথা বহুল আলোচিত যে, একুশ শতকে অর্থনৈতিক উন্নয়নই হবে দেশ ও জাতির শ্রেষ্ঠত্ব ও প্রতিযোগিতায় টিকে থাকার অন্যতম নিয়ামক। একথা অস্বীকার করা অসম্ভব যে, জীবনযাত্রার মানদণ্ড, মূল্যবোধ নিয়ন্ত্রণে অর্থনৈতিক স্বয়ম্ভরতার এক বিশেষ সহায়ক ভূমিকা রয়েছে। ব্যক্তি বা পরিবারের মতো একই কথা দেশ বা জাতির ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। ভাষা আকাদেমির অনুরোধে সাড়া দিয়ে যাঁরা তাঁদের একনিষ্ঠ অধ্যয়ন, চিন্তন, সুচিন্তিত উপদেশ সহ মতামত এবং গবেষণালব্ধ মূল্যবান লেখার মাধ্যমে এই বিশেষ সংখ্যাটিকে ঋদ্ধ করার ঐকান্তিক চেষ্টা করেছেন, তাঁদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। ভুল স্বীকার করা নিশ্চয়ই দুর্বলতা নয়, বরং বলা ভালো তা নৈতিক শক্তিরই প্রমাণ। যে কোনও কাজ করতে গিয়ে কিছু ভুল-ভ্রান্তি হওয়া অস্বাভাবিক কিছু নয়। ভাষা আকাদেমির এই সপ্তম সংখ্যা প্রকাশ করতে গিয়েও অনিচ্ছাকৃত যে-সব মুদ্রণজনিত ভুলত্রুটি রয়ে গেছে, তার সব দায়ভার আমি নতমস্তকে বহন করে নিচ্ছি। তবে লেখাগুলোর মতামত প্রকাশে সম্পাদক সমিতি কোনওভাবেই দায়বদ্ধ নয়। এখানে অবশ্যই উল্লেখ করা প্রয়োজন, শিলচর সানগ্রাফিক্স প্রিন্টার্স অ্যান্ড পাবলিকেশনসের কর্ণধার পুণ্যপ্রিয় চৌধুরীসহ অক্ষর বিন্যাসে সলাম হেমন্ত সিংহ, সর্বাণী ভট্টাচার্য, অরুণাভ দাস, মিঠু দাস এবং প্রুফে আবুল বরকত বরলস্কর ও মুদ্রণের সব কর্মীর অকুণ্ঠ সহযোগিতার জন্য থাকলো আন্তরিক ধন্যবাদ। আমাদের সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে সচেতন থাকায়, ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্পর্কিত অনেক কিছুকেই স্থান করে দেওয়া সম্ভব হয়নি। তবে আমাদের অনুসন্ধান, আমাদের গবেষণা চলতেই থাকবে। এ প্রসঙ্গে কবি রবার্ট ফ্রস্ট-র কবিতার চারটি লাইন মনে পড়ছে —

The woods are lovely, dark and deep.
But I have promises to keep,
And miles to go before I sleep.
And miles to go before I sleep.

(পরিতোষচন্দ্র দত্ত)
সম্পাদক, আকাদেমি পত্রিকা

বরাক উপত্যকার অর্থনৈতিক অনগ্রসরতা

বিভাসরঞ্জন চৌধুরী

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ‘আফ্রিকা’ কবিতাটি সবাই না হলেও অনেক জনেরই পড়ে নেওয়া আছে। আজকাল ওই কবিতাটি খুব মনে পড়ে। বরাক উপত্যকাবাসী হিসেবে কোথায় যেন নিজেদের মিল দেখতে পাই ওই কবিতাটির কথার সঙ্গে। বরাক উপত্যকায়ও আছে এক অবিরাম ‘ভাষাহীন ক্রন্দন’ এবং এখানেও শহিদের রক্তে পঙ্কিল হয়েছে ধূলি, অপমানিত হয়েছে ইতিহাস।

বরাক উপত্যকাবাসী মনে করেন, আসামের ভৌগোলিক কাঠামোয় তাঁরা এবং তাঁদের উপত্যকা উপেক্ষিত, অবহেলিত এবং বঞ্চিত। এই ক্ষোভ নতুন কিছু নয়। দীর্ঘদিন ধরে ধীরে ধীরে তা পুঞ্জীভূত হয়েছে মাত্র। এই ক্ষোভের যথার্থতা বিচার খুব সহজ এবং স্বল্প পরিসরে সম্ভবও নয়। তবু সমস্ত বিষয়টির এক নমুনাচিত্র তুলে ধরার এক চেষ্টা মাত্রই এই আলোচনায় করা হয়েছে। এখানে বিচার্য বিষয়ের এবং বিচারের সম্পূর্ণতায় তাই কিছুটা খামতি থেকেই যাবে। এই ত্রুটি মার্জনীয়।

আমাদের মূল বিশ্লেষণে প্রবেশের আগে আমরা বরাক উপত্যকার পশ্চাৎপটটা একটু দেখে নিতে পারি। ১৮৩২-এ কাছাড় নামক এক স্বাধীন রাজ্যকে ব্রিটিশরা অধিকার করে ব্রিটিশ শাসনাধীন অঞ্চলের সঙ্গে যুক্ত করে। ১৮৭৪-এ যখন Chief Commissioner শাসিত রাজ্য হিসেবে আসাম রাজ্য গঠন করা হল, তখন শ্রীহট্ট বা সিলেট এবং কাছাড় জেলা বা এই দুই জেলার সম্মিলিত পরিচয়ে সুরমা উপত্যকাকে নবগঠিত আসামের সঙ্গে জুড়ে দিলেও এই সংযুক্তি ছিল নিতান্তই রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক বিষয় বা বলা যেতে পারে রাজস্ব সংক্রান্ত বিষয়। অন্যান্য সবরকম বাস্তব প্রয়োজন ও দৈনন্দিন জীবনযাপনে কার্যত এই ভূ-খণ্ড ছিল অবিভক্ত বঙ্গেরই অঙ্গ। শ্রীহট্টের করিমগঞ্জ মহকুমা নিয়ে কাছাড় জেলায় ‘বরাক উপত্যকা’ অভিধাটি এসেছে দেশ বিভাগের পর। ভাষিক, সাংস্কৃতিক এবং ব্যবসা-বাণিজ্য ইত্যাদি অর্থনৈতিক বিষয়ে বরাক উপত্যকা ব্রহ্মপুত্র উপত্যকা থেকে এতটাই ভিন্ন ছিল যে, স্বাধীনতা লাভের আগে পর্যন্ত ব্রিটিশ শাসক শ্রীহট্ট ও কাছাড়ের শিক্ষা, বিচার ব্যবস্থা ইত্যাদির স্বতন্ত্র পূর্বতন ব্যবস্থায় হস্তক্ষেপ করত না। প্রথমদিকে সুরমা উপত্যকার আসামভুক্তির প্রভাব এই দুই জেলার দৈনন্দিন জীবনে তাই কোনও প্রভাব ফেলতে পারেনি। এখানে উল্লেখ্য, ১৯৪৯ সাল পর্যন্ত তখনকার প্রধান রাজনৈতিক দল ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের কাছাড়ের জেলা কমিটি আসাম প্রদেশ কংগ্রেসের অধীন না হয়ে বঙ্গীয় প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির অধীন ছিল। আসামের বাকি অংশেও বৈচিত্র্য কম ছিল না। ছিল বিভিন্ন জাতি-গোষ্ঠীর বাস, ছিল বিভিন্ন ভাষা, বিভিন্ন সংস্কৃতি। তৎকালীন আসামের প্রকৃত ছবিটি সম্পর্কে শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক তথা খ্যাতনামা প্রাক্তন সাংসদ প্রয়াত হেম বরুয়া ‘The Red River and the Blue Hills-এ সুস্পষ্টভাবে লিখেছেন, "Without any strong Linguistic, cultural, economic or any other kind of affinity, Assam stands out in all India as a miniature League of Nations." তিনি এ-ও বলেছেন, "Assam, originally meant the land which the Shans conqured and consolidated in 1228. When the Britis, after occupation, constituted the new province in 1874, they extended the name to the whole territory that came within its purview."

দেশে ভাষার ভিত্তিতে যখন রাজ্যগুলোর পুনর্গঠন হল, তখন রাজ্য পনুর্গঠন কমিশন আসামকে এক ভাষাভাষী রাজ্য হিসেবে স্বীকৃতি না দিয়ে বহু ভাষাভাষী রাজ্য হিসেবেই গণ্য করেছে। ভারত তার অঙ্গরাজ্যগুলোর ভাষিক ও সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যকে স্বীকৃতি দিয়েছে। ভাষিক ও সাংস্কৃতিক প্রয়োজনে পরবর্তীকালে নতুন করে কোথাও কোথাও কিছু কিছু রাজ্যের পুনর্গঠন করতে হয়েছে বঞ্চনা ও বৈষম্যের অবসান ঘটাতে। এমনি করেই সৃষ্টি হয়েছে মেঘালয়, মিজোরাম, ঝাড়খণ্ড ও তেলেঙ্গানা ইত্যাদি। আসামের মধ্যে থেকেও স্বায়ত্তশাসনের অধিকার আদায় করে নিয়েছে বড়োল্যান্ড। এই গঠন-পুনর্গঠনের প্রক্রিয়া শেষ হয়ে গেছে কিনা, তা এখনও নিশ্চিতভাবে বলা যাচ্ছে না। বঞ্চনা ও বৈষম্যের অভিযোগ এখনও আছে। আছে বরাক উপত্যকায়ও। এই বঞ্চনা ও বৈষ্যম্যে বরাক উপত্যকা ক্রমশই পিছিয়ে পড়ছে। এ অঞ্চলের অর্থনৈতিক উন্নয়ন নিয়ে যতই আশ্বাস ও প্রতিশ্রুতি দেওয়া হোক না কেন, কার্যত তা অপূর্ণই থেকে যায়। এই প্রেক্ষিতেই বরাক উপত্যকার অর্থনৈতিক অবস্থার অবস্থান ঠিক কোথায়, তা আমরা একবার খোঁজ নিয়ে দেখি।

একটি অঞ্চলের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য প্রাথমিক স্তরেই যা অবশ্য প্রয়োজন, তা হল ওই অঞ্চলের আর্থ-সামাজিক পরিকাঠামোর উন্নয়ন। অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য যে প্রাথমিক অবশ্য পূরণীয় শর্ত রয়েছে, আর্থ-সামাজিক পরিকাঠামোর উন্নয়ন তার অন্যতম। আবার, এই পরিকাঠামোর অন্যতম অঙ্গগুলো হচ্ছে শিক্ষা, বিদ্যুৎ, পরিবহন, ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থা ও স্বাস্থ্য পরিষেবা। বরাক উপত্যকার অর্থনৈতিক অবস্থা কী এবং উন্নয়নই বা এখানে কতটুকু গতি পেয়েছে, তার মূল্যায়ন আমরা এই নিরিখেই করার প্রয়াস পেতে পারি। শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রথম বিচার্য হচ্ছে প্রাথমিক ও বুনিয়াদি শিক্ষার আশানুরূপ অগ্রগতির খতিয়ান তুলে ধরলেও বাস্তব সমীক্ষায় প্রাপ্ত বিদ্যালয়-ছুটদের স্ফীতকায় সংখ্যা, সরকারি বিদ্যালয়ে দীর্ঘদিন ধরে শূন্যপদে নিযুক্তি না হওয়ায় প্রয়োজনীয় সংখ্যক শিক্ষক-শিক্ষিকার অভাব, বিদ্যালয়ে শিক্ষক-শিক্ষার্থীর অনুপস্থিতির আধিক্য, অনিয়মিত পাঠদান ইত্যাদি সমস্যা শিক্ষাক্ষেত্রের এক বিবর্ণ চিত্রই তুলে ধরে। স্বাস্থ্যক্ষেত্রের অবস্থাও ভিন্ন নয়। অধিকাংশ স্বাস্থ্যকেন্দ্রই ন্যূনতম পরিষেবা বিধানে অক্ষম। ডাক্তার নেই, নেই ওষুধ কিংবা অন্যান্য সুবিধা। জেলাস্তরের হাসপাতালগুলোর পরিস্থিতিও হতাশাজনক। উপত্যকার ভরসাস্থল শিলচর মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতাল এখন অবধি পূর্ণাঙ্গ হয়ে উঠতে পারল না। অনেক আবশ্যিক বিভাগই এখন অবধি কলেজে অনুপস্থিত। চরম সঙ্কটজনক অবস্থায় অনেক রোগীকেই তাই সুচিকিৎসার আশায় অত্যন্ত ঝুঁকি নিয়েই গুয়াহাটির পথে পাড়ি দিতে হয়। যথেষ্ট কষ্টজনক এই যাত্রায় অনেক রোগীকেই গন্তব্যস্থলে পৌঁছানোর আগেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করতে হয়। Neurology, Urology ইত্যাদি অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিভাগ যে সঠিকভাবে এখন পর্যন্ত কেন খোলা সম্ভব হয়নি, তার জবাব দেবে কে? সম্প্রতি সরকারি উদ্যোগে Neurology বিভাগে একজন ডাক্তারকে চুক্তিভিত্তিক নিযুক্তি দেওয়া হলেও প্রয়োজনের তুলনায় তা নিতান্তই নগণ্য, সান্ত্বনা বই কিছু নয়। উপত্যকার পুরো স্বাস্থ্যসেবা কাঠামোই এরকম দুর্বল। রাজ্যে যত প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র আছে, তার মাত্র ৭.৫ শতাংশ রয়েছে এই উপত্যকায়। সরকারি ডিস্পেনসারির অবস্থা আরও খারাপ, রাজ্যের মোট ডিস্পেনসারির মাত্র ৫.৫ শতাংশ নিজেদের ভগ্নস্বাস্থ্য নিয়ে উপস্থিত রয়েছে এখানে।

বরাক উপত্যকায় বহু রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কের লক্ষণীয় উপস্থিতি রয়েছে ঠিকই, কিন্তু এই উপস্থিতি এখানকার

অর্থনৈতিক অবস্থার দ্যোতক নয়। মোট অমানতের মোটামুটি ৩০ শতাংশ মাত্র এখানে ঋণদান বা বিনিয়োগ হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। এর মধ্যে প্রায় ৫০ শতাংশই যাচ্ছে সেইসব খাতে, যেগুলোকে আমরা অগ্রাধিকারের ক্ষেত্র (Priority Sector) বলে গণ্য করি না। উন্নয়নমূলক বিনিয়োগ হয় সামান্যই। বিনিয়োগের বাতাবরণ নেই, তৈরিই হয়নি। আমানতের এক বিরাট অংশ তাই বাইরে চলে যাচ্ছে। এই সমস্যার প্রতিকার করতে প্রয়োজন স্থানীয়ভাবে বিনিয়োগের জন্য উপযুক্ত বাতাবরণ তৈরি করা। কিন্তু রাজ্য সরকার কিংবা কেন্দ্র সরকার — উভয়ই এ নিয়ে উদাসীন।

উদাসীনতা রয়েছে এই উপত্যকার বাইরের যোগাযোগ ব্যবস্থার সার্বিক উন্নয়নে। তবে এই উপত্যকার রেল যোগাযোগ ব্যবস্থার পুনঃপ্রতিষ্ঠায় কেন্দ্র সরকার কিন্তু যথেষ্ট উৎসাহ ও উদ্যম দেখিয়েছে। রেল যোগাযোগ পুনঃস্থাপনের কাজ এক সময় বিস্ময়করভাবে শম্বুকের গতিকেও হার মানাচ্ছিল। কেন্দ্রে ক্ষমতায় এসে নতুন সরকার রেলের কাজে হঠাৎই জোয়ার এনে প্রায় যুদ্ধকালীন তৎপরতায় রেল যোগাযোগ পুনঃস্থাপন করে ২০১৫ সালের নভেম্বরে নতুন ব্রডগেজ লাইনটি যাত্রী চলাচল ও পরিবহনের জন্য খুলে দেয়। বাইরে থেকে বরাক উপত্যকায় প্রবেশ করার অসুবিধা এই রেলপথ অনেকটাই লাঘব করে দিয়েছে। তবে এই উপত্যকা কিংবা উত্তর-পূর্বাঞ্চলের এই দক্ষিণাংশ এখন অবধি কিন্তু খুব সুগম হয়নি। রেলপথ চালু হওয়ার পর ইতিমধ্যেই বেশ কয়েকবার এই পথ নাগাড়ে অনেকদিন বন্ধ করে রাখতে হয়েছে ভূমি স্খলনে ক্ষতিগ্রস্ত রেললাইনকে সারিয়ে তোলার জন্য। লামডিং-বদরপুর অংশে রেলের লাইন একটি মাত্র হওয়ায় — এখানে রেল চলাচল সবসময়ই সমস্যাপ্রবণ। রয়েছে গতি-বাধকতা, রয়েছে অনিশ্চয়তা, রয়েছে ক্রমবর্ধমান রেল চলাচলের চাপ। এখানে দুর্গম পাহাড় এড়িয়ে চন্দ্রনাথপুর থেকে লঙ্কা পর্যন্ত বিকল্প এক রেলপথ তৈরির সম্ভাবনা খতিয়ে দেখা হয়েছিল তৎকালীন রেলমন্ত্রী প্রয়াত চেল্লকেরে করিম জাফর শরিফের কার্যকালে। যতদূর জানা যায়, সুড়ঙ্গবিহীন ও অত্যন্ত কম সংখ্যক সেতুর প্রয়োজন থাকা প্রস্তাবিত এই রেলপথের সম্ভাব্যতা স্বীকৃতিও হয়েছিল। কিন্তু কোনও অজানা কারণে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এই প্রস্তাব হিমঘরেই পড়ে আছে। সে যা-ই হোক, এ সম্পর্কে এটুকুই সংক্ষেপে বলা যেতে পারে, উত্তর-পূর্বাঞ্চলের দক্ষিণাংশ বর্তমান রেল-যোগাযোগ ব্যবস্থা প্রয়োজনের তুলনায় নিতান্তই অপ্রতুল।

সাম্প্রতিক অতীতে Look East Policy এবং সম্প্রতি Act East Policy সম্পর্কে অনেক কথা হয়েছে। এ নিয়ে এমনভাবে বলা হয়েছে এবং বলা হচ্ছে, যেন পূর্বমুখী বাণিজ্য এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলোর সড়ক যোগাযোগ যে অনেক সম্ভাবনার দ্বার খুলে দিতে পারে, তা হঠাৎ করেই আবিষ্কার করা হয়েছে। এটা যেন হঠাৎ করেই উপলব্ধি করা গেছে দক্ষিণ এশিয়ার মানচিত্র ডিঙ্গিয়ে মায়ান্মার-সিঙ্গাপুরের সম্ভাব্যে ত্রিমুখী বাণিজ্য শুধু ভারত নয়, দক্ষিণ এশিয়ার অর্থনৈতিক মানচিত্রেও বিস্তর পরিবর্তন নিয়ে আসবে। Act East নীতিতে গুয়াহাটিকে Development Hub করার কথা ভাবা হচ্ছে। উত্তর-পূর্বাঞ্চলের দক্ষিণাংশে শিলচর শহরও গুরুত্ব পেতে চলেছে। Act East নীতির পেছনে একাধিক কারণ রয়েছে। এদের অন্যতম দু'টির আমরা উল্লেখ করছি। একটি অর্থনৈতিক, অপরটি রাজনৈতিক। অর্থনৈতিক লক্ষ্য হল, উত্তর-পূর্বাঞ্চলের অর্থনৈতিক উন্নয়নের দীর্ঘমেয়াদি লক্ষ্যে পৌঁছনোর জন্য বিনিয়োগ ও শিল্পোন্নয়নের পরিবেশ তৈরি করা এবং পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলোর সঙ্গে সহযোগিতার সম্পর্ক স্থাপন করে দেশের প্রতিরক্ষামূলক অবস্থানকে সুদৃঢ় করে ওই অঞ্চলে চিনের প্রভাব বিস্তারের আগ্রাসী উদ্যোগকে প্রতিহত করা। অভীষ্ট এই লক্ষ্যে পৌঁছতে প্রথমেই দরকার এই অঞ্চলে ভারতের অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক সড়ক যোগাযোগ স্থাপন করা। উত্তর-পূর্বাঞ্চলের দক্ষিণাংশে সড়ক যোগাযোগের বর্তমান অবস্থা

সন্তোষজনক নয় বললেও খুবই কম বলা হবে। বরাক উপত্যকা ত্রিপুরা রাজ্যের প্রবেশদ্বার। অথচ বরাকের সঙ্গে ত্রিপুরার ভূতলীয় যোগাযোগ খুব মসৃণ নয়। বস্তুত, ত্রিপুরার সঙ্গে মিজোরামের সীমা দীর্ঘতর হওয়ায় এই দুই রাজ্যের মধ্যে যোগাযোগ আরও উন্নত হওয়া স্বাভাবিক ছিল। কিন্ত তা হয়নি। পার্শ্ববর্তী বাংলাদেশের মধ্য দিয়ে পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপনের জন্য উদ্যোগ নিতে অনেকদিন থেকেই কেন্দ্র সরকারের কাছে দাবি রাখা হচ্ছিল। কিন্তু এ নিয়ে সরকারের উৎসাহ সৃষ্টি করা যায়নি। উৎসাহের অভাব না থাকলে মহাসড়কের কাজ এতদিনে শেষ হয়ে যেত এবং মণিপুর, মিজোরাম ও ত্রিপুরা রাজ্য উপকৃত হত। আর, বরাক উপত্যকার আবদ্ধতাও কিছুটা হলেও হ্রাস পেত। এত কিছু বলার উদ্দেশ্য হল এই যে, আজ যখন Act East Policy অনুযায়ী এগিয়ে যেতে গিয়ে প্রথমেই যে Road Connectivity-র প্রয়োজন আমরা অনুভব করছি, আমরা হয়তো তা অনুভবই করতাম না, যদি মহাসড়কের কাজটা এবং বহুকাঙ্ক্ষিত মিজোরাম-মণিপুর-ত্রিপুরা-বরাক উপত্যকা অভ্যন্তরীণ সড়ক যোগাযোগটা যথাসময়ে বাস্তব রূপ পেত। তা যদি হত তাহলে গুয়াহাটি তার সুবিধেজনক ভৌগোলিক অবস্থানের কারণেই এই উন্নত যোগাযোগের মুনাফা তুলে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের এই ঈপ্সিত অর্থনৈতিক উন্নয়ন যজ্ঞে অনেকটাই এগিয়ে থাকত। অর্থনৈতিক উন্নয়নে পুরো অঞ্চলটির পক্ষেও আরও এগিয়ে থাকা সম্ভব হত। উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থার উপস্থিতিতে মিজোরাম, মণিপুর, ত্রিপুরা এবং আসামের বরাক উপত্যকার উন্নয়ন হলে যে ওইসব অঞ্চলে ব্যবসা-বাণিজ্য ও চাহিদার প্রসার ঘটত, তার সুফল পেত গুয়াহাটি এবং ব্রহ্মপুত্র উপত্যকাও।

আসামের জেলাগুলোর মধ্যে অর্থনৈতিক উন্নয়নের বিচারে বরাক উপত্যকার জেলাগুলোর আপেক্ষিক অবস্থান নির্ণয় করতে গেলে উপরিউক্ত কথাগুলো খুব প্রাসঙ্গিক। কারণ, 'যোগাযোগ' অর্থনৈতিক উন্নয়নের এক অন্যতম নির্ণায়ক। এটা অস্বীকার করার উপায় নেই যে, পরিকাঠামোগত দুর্বলতাই বরাক উপত্যকা তথা প্রতিবেশী রাজ্যগুলোর অর্থনৈতিক অনগ্রসরতার অন্যতম কারণ।

সম্প্রতি উত্তর-পূর্বাঞ্চলকে জলপথে দক্ষিণ এশিয়ার বন্দরগুলোর সঙ্গে যুক্ত করার বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করা হচ্ছে। কিন্তু বরাক উপত্যকা থেকে নদীপথে বাংলাদেশের ভেতর দিয়ে ভারতের বন্দরের সঙ্গে যাতায়াত ও পরিবহনের জলপথটি ১৯৬৫-তে ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধের সময় সেই যে বন্ধ হয়েছিল, তা আর খুলে দেওয়া হল না। বলা ভাল, সরকারিস্তরে বা রাজনৈতিক মহলে এ বিষয়ে কোনও আন্তরিক উৎসাহও লক্ষ্য করা গেল না। ওই সময় ব্রহ্মপুত্র দিয়ে আন্তর্দেশীয় নৌপথও বন্ধ হয়েছিল, কিন্তু পরবর্তীকালে সেই পথ পুনরায় খুলে গিয়েছিল।

এ সবের ফল কী হয়েছে? ফল অবশ্যই খুব সুখকর হয়নি। শুধুমাত্র দূরদৃষ্টির অভাবে প্রচুর সম্ভাবনা সত্ত্বেও আসাম সামগ্রিকভাবে যেমন পিছিয়ে পড়েছে, তেমনই স্থলবন্দি বরাক উপত্যকা অবহেলায়, উপেক্ষায় আর অদূরদর্শিতায় আরও বেশি পিছিয়ে পড়েছে। এই পিছিয়ে পড়ার প্রক্রিয়াটি নতুন কোনও ঘটনা নয়। এটি চলছে দীর্ঘদিন ধরেই। এ অভিজ্ঞতা যে শুধু বরাক উপত্যকারই হয়েছে তা নয়। অতীতে আরও অনেক জেলা পিছিয়ে পড়ার অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হয়েছিল। তবে এদের অনেকের পক্ষেই আত্মোন্নতির স্বার্থে আসাম থেকে বেরিয়ে যাওয়া সম্ভব হয়েছে এবং নতুন রাজ্য হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে পরবর্তীকালে নিজেদের আলাদা চলার সিদ্ধান্তের যথার্থতাও প্রমাণ করতে পেরেছে। তবে বরাকের ক্ষেত্রে এমনটি হবার জো নেই।

এতক্ষণ যা বলা হল, তা নিছকই বর্ণনা। এই বর্ণনার সারবত্তা সম্পর্কে কারও সন্দেহ বা সংশয় থাকতেই পারে। সংশয় নিরসনের জন্য তাই দু'-একটি নির্দেশক বা Indicators-র উল্লেখ প্রয়োজন।

আজকাল মানব উন্নয়নের পরিমাপই অর্থনৈতিক উন্নয়নের মাপকাঠি। মানব উন্নয়ন কতটা হল, তা দিয়েই বিচার হয় উন্নয়ন কতটা হল। দেশভাগ প্রকৃত অর্থেই বরাক উপত্যকার ভাগ্য আসামের সঙ্গে একসূত্রে গেঁথে দিল। সেই থেকে সাত দশকেরও বেশি সময় পেরিয়ে এসে বরাক উপত্যকার অর্থনৈতিক হালচাল কোথায় দাঁড়িয়ে, আমরা তা আজকালকার মানব উন্নয়নের মানদণ্ডেই পরিমাপ করার প্রয়াস পেতে পারি।

মানব উন্নয়নের সূচকই হচ্ছে এই মানদণ্ড। এই সূচকটি হচ্ছে তিনটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সাফল্যের মিশ্র সূচক। বিষয় তিনটি হল — স্বাস্থ্য, শিক্ষা আর উপার্জন অর্থাৎ আয়। আমাদের কাছে বিশদ তথ্য সংবলিত মানব উন্নয়নের যে প্রতিবেদনটি আছে, তা প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী কর্তৃক প্রকাশিত ২০১৪ সালের মানব উন্নয়ন প্রতিবেদন। এই প্রতিবেদন অনুযায়ী স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও আয়ের ক্ষেত্রে আসামের অনেকটাই অগ্রগতি ঘটেছে — যদিও সর্বভারতীয় প্রেক্ষিতে আসামের এই অগ্রগতির হার যথেষ্টই মন্থর। ১৯৯১-তে এই সূচক ছিল ০.৩৪৮ আর ১০ বছর পরে ২০০১ সালে আসামে তা বৃদ্ধি পেয়ে হয়েছে ০.৪০৭। সর্বভারতীয় স্তরের হিসেব থেকে দেখা যাচ্ছে আসাম কিন্তু ক্রমশই উন্নতি করে যাচ্ছে। তাই এই সূচক ২০১৫-তে দাঁড়িয়েছে ০.৫৯৮ এবং ২০১৮-তে ০.৬২৪। সারা ভারতের ক্ষেত্রে ২০১৯-এ এই সূচক ছিল ০.৬৪৫। এখানে উল্লেখ্য, মানব উন্নয়নের এই সূচক (Human Development Indexবা HDI)-র মান '০' থেকে '১'-র মধ্যেই ওঠানামা করে।

মানব উন্নয়নের যথার্থ অগ্রগতি স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও আয় এই ত্রি-মাত্রিক সুষম উন্নয়নের ওপর নির্ভরশীল। এদের যে কোনও একটিতে প্রভূত অগ্রগতি বাকি দু'টি বিষয়ের অগ্রগতিকে উল্লেখযোগ্যভাবে ছাপিয়ে গিয়ে মোট অগ্রগতিকে স্ফীতকায় করে দিলেও তিনটি ভিন্ন বিষয়ের মধ্যে অগ্রগতির ভারসাম্য না থাকলে তা সুষম মানব উন্নয়ন হিসেবে গণ্য হয় না। এজন্য মানব উন্নয়নে অগ্রগতি মূল্যায়ন করতে হলে তা সুষম কিনা বিচার করে দেখতে হয় এবং তাই স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও আয় — এই তিনটি বিষয়ের প্রত্যেকটির অগ্রগতি আলাদাভাবে দেখে নিয়ে তাদের মধ্যে ভারসাম্য সুনিশ্চিত করতে হয়।

আমরা এখানে আসামের স্বাস্থ্যক্ষেত্রের অগ্রগতির বিষয়টি নিয়ে এ রাজ্যের মানব উন্নয়নের মূল্যায়ন শুরু করতে পারি। আসামের মানব উন্নয়ন প্রতিবেদন ২০১৪ জানিয়েছে যে, এ রাজ্যে মানুষের গড় আয়ু বৃদ্ধির জন্য যে লক্ষ্যমাত্রা স্থির করেছিল তার ৫০ শতাংশ মাত্র অর্জন করা সম্ভব হয়েছে। সামগ্রিকভাবে এক্ষেত্রে আসামের সাফল্যের হার ৫০ শতাংশ হলেও, জেলা হিসেবে কামরূপ (নগর) ৮০ শতাংশ সাফল্য নিয়ে তালিকার শীর্ষে অবস্থান করছে। জেলাগুলোর এই তালিকায় ৩০ শতাংশ সাফল্য নিয়ে কাছাড় দখল করেছে নিম্নতম স্থানটি। অর্থাৎ, রাজ্যের ২৭টি জেলার মধ্যে স্বাস্থ্য পরিষেবায় কাছাড়ের স্থান ২৭তম। হাইলাকান্দি জেলা ২৪তম এবং করিমগঞ্জ ১৫তম। কাছাড় জেলার অবস্থা এতটা খারাপ ছিল না। ২০০১ সালের মানব উন্নয়ন প্রতিবেদনেও স্বাস্থ্যসেবায় রাজ্যের ২৩টি জেলার মধ্যে কাছাড়ের স্থান ছিল ১২ নম্বরে আর হাইলাকান্দি ও করিমগঞ্জ ছিল ১৪ ও ১৮ নম্বরে। ২০০১ থেকে ২০১৪ পর্যন্ত সময়কালে করিমগঞ্জের সামান্য অবস্থানিক উন্নতি হলেও কাছাড় ও হাইলাকান্দি এগিয়ে যেতে তো পারেইনি, এমনকী নিজেদের অবস্থানও ধরে রাখতে পারেনি। পিছিয়েই পড়েছে।

শিক্ষা ক্ষেত্রের ওপর দৃষ্টি ফিরিয়ে আনলে দেখি, জেলা হিসেবে কামরূপ (নগর) লক্ষ্যমাত্রায় পৌঁছতে না পারলেও ৭৮ শতাংশ সাফল্য নিয়ে তালিকার প্রথম স্থানটিই দখল করে নিয়েছে। শিক্ষাক্ষেত্রের পরিষেবায় সবচেয়ে পেছনে দরং জেলা, যেখানে সাফল্যের হার লক্ষ্যমাত্রার ৫০ শতাংশ মাত্র। বরাক উপত্যকার তিনটি জেলা সহ রাজ্যের প্রায় অর্ধেক সংখ্যক জেলার সাফল্যের হার রাজ্যের গড় সাফল্যমাত্রার

নীচে।

মানব উন্নয়ন সূচক নির্ণয়ে ব্যবহৃত আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হল 'মাথাপিছু বার্ষিক আয়' বা PCAI (Per Capita Annual Income)। এটি মানব উন্নয়নের একটি পরোক্ষ নির্দেশক। মোটামুটি ভালভাবে বেঁচে থাকতে যতটুকু আয়ের প্রয়োজন তা মানব উন্নয়ন সূচক নির্ণয়ে একটি অন্যতম বিচার্য বিষয়। UNDP (United Nations Development Programme) প্রথম মানব উন্নয়ন প্রতিবেদনে (১৯৯০) এই নির্দেশকের ওপর তাই গুরুত্ব আরোপ করেছিল।

আসামের জেলাগুলোর মাথাপিছু বার্ষিক আয় লক্ষ্য করলে আমাদের সামনে জেলাগুলোর এক অসম উন্নয়নের চিত্র ফুটে ওঠে। এখানেও আমরা দেখতে পাই কামরূপ (নগর) যখন মোট ৬৩,৪৪৪ টাকা মাথাপিছু বার্ষিক আয় (PCAI) নিয়ে তালিকায় সবচেয়ে ওপরে রয়েছে, কাছাড় জেলায় মাথাপিছু বার্ষিক আয় (PCAI) তখন ২৩,০৫২ টাকা মাত্র, যা কিনা কামরূপ (নগর) জেলার মাথাপিছু আয়ের (PCAI) দুই-তৃতীয়াংশের চেয়ে সামান্য বেশি। ওই মাথাপিছু বার্ষিক আয়ের নিরিখে আসামের জেলাগুলোর মধ্যে কাছাড়ের স্থান ১৩তম। করিমগঞ্জ ও হাইলাকান্দির অবস্থা আরও হতাশাজনক— এদের অবস্থান যথাক্রমে ২০তম এবং ২৭তম স্থানে। জেলার সংখ্যা ২৭। উল্লেখ্য, আসামের মাথাপিছু বার্ষিক আয় ওই সময় ছিল ২৪, ৬৬০ টাকা।

মানব উন্নয়ন প্রতিবেদন ২০১৪ থেকে আরও একটি অস্বস্তিকর তথ্য উঠে আসছে। দেখা যাচ্ছে এই প্রতিবেদনের পূর্ববর্তী এক দশক কালেরও অধিক সময়ে বরাক উপত্যকার তিনটি জেলায় মাথাপিছু বার্ষিক আয় জন্য জেলাগুলোর তুলনায় বৃদ্ধি পায়নি। তাই এই মাপকাঠিতে বরাক উপত্যকার তিনটি জেলা ক্রমশই পিছিয়ে পড়েছে। আসামের জেলাগুলোর মধ্যে বরাকের তিনটি জেলার স্থান ২০০১ সালের মানব উন্নয়ন প্রতিবেদন অনুযায়ী কোথায় ছিল এবং ২০১৪ সালের প্রতিবেদন অনুযায়ী তাদের স্থান কোথায় তা আমরা নীচে তুলে ধরছি —

মাথাপিছু বার্ষিক আয়ের হিসেবে মানব উন্নয়ন প্রতিবেদন (HDR) অনুযায়ী আসামের জেলাগুলোর মধ্যে বরাক উপত্যকার জেলাগুলোর আপেক্ষিক অবস্থান

			২০০১	২০১৪
১।	কাছাড়	—	৭ নং	১৩ নং
২।	করিমগঞ্জ	—	১৯ নং	২০ নং
৩।	হাইলাকান্দি	—	৯ নং	২৭ নং

অঙ্কের হিসেবে বরাক উপত্যকায় মাথাপিছু মোট আয় যে কমেছে তা নয়, কিন্তু অন্যত্র আয় বৃদ্ধি এতটাই দ্রুত হয়েছে যে, বরাক উপত্যকার জেলাগুলো অন্য জেলা থেকে পিছিয়ে পড়েছে অর্থাৎ তুলনায় দরিদ্রতর হচ্ছে।

পানীয়জলের প্রাপ্যতা জীবনধারণের মানের এক অন্যতম নির্ণায়ক। আসামের শহরাঞ্চলের ৯৪ শতাংশ মানুষ পানীয়জলের সুবিধাভোগী। গ্রামাঞ্চলে এই সুবিধা ভোগ করেন ৮৫ শতাংশ মানুষ। এগুলো হচ্ছে ২০১৪ সালের মানব উন্নয়ন প্রতিবেদনে প্রাপ্ত তথ্য। এই পরিসংখ্যান আপাত দৃষ্টিতে সন্তোষজনক মনে হলেও গড় হিসেবের বাইরে গিয়ে জেলাভিত্তিক পরিস্থিতি বিচার করে দেখলে এই সন্তোষবোধ অনেকটাই উবে যায়, ওপরের পরিসংখ্যানের আড়ালে নীচের ছবিটা ঢাকা পড়ে যায় :—

মানব উন্নয়ন প্রতিবেদন, ২০১৪ অনুযায়ী নিম্নোক্ত জেলাগুলোতে পানীয়জলের প্রাপ্যতা —

১। ডিমা হাসাওয়ে —৬৩.৮ শতাংশ মানুষের কাছে (সামগ্রিকভাবে)
২। হাইলাকান্দিতে — ৫৫.৬
৩। করিমগঞ্জে — ৩৯.৮
৪। কার্বি আংলঙে — ৩৩.৬
৫। শোণিতপুরে — ৩০.৬

ওপরের পরিসংখ্যান থেকে পরিষ্কার, পানীয়জলের সুবিধে সর্বত্র সুষমভাবে বণ্টন করা সম্ভব হয়নি। এই প্রতিবেদনের আরও তথ্য বিশ্লেষণ করলে এটা বুঝতে অসুবিধে হয় না যে, আসামে উন্নয়নের ছোঁয়া সর্বত্রই সমানভাবে লাগেনি বা উন্নয়নের সুফলও সুসমভাবে সর্বত্র ছড়িয়ে দেওয়া হয়নি। এতে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে, বাক্সা, ধেমাজি, কার্বি আংলং, ডিমা হাসাও, দরং, শোণিতপুর প্রভৃতি জেলা। আর উন্নয়নের বৈষম্যে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে বরাক উপত্যকার তিনটি জেলা।

আমরা গরিবি হঠাতে চাইলেও, সকলের সঙ্গে, সকলের বিকাশ চাইলেও বাস্তবে যা ঘটছে, তা সম্পূর্ণ অন্যরকম। এ রাজ্যেও তার ব্যতিক্রম নেই। মানুষের মধ্যে যেমন উন্নয়নের বৈষম্য প্রকট হচ্ছে, তেমনই জেলায় জেলায় বৈষম্য তৈরি হচ্ছে বা কোথাও তা আগের চেয়ে প্রকটতর হচ্ছে। কামরূপ (নগর) জেলা মানব উন্নয়নে ০.৭০৩ সূচক নিয়ে রাজ্যে জেলাগুলোর মধ্যে শীর্ষে অবস্থান করছে। বরাক উপত্যকার অবস্থান কিন্তু উদ্বেগজনক। এই উপত্যকার কাছাড় জেলার মানব উন্নয়ন সূচক ০.৪৬৩, জেলাগুলোর মধ্যে ২৪তম স্থান, হাইলাকান্দির মানব উন্নয়ন সূচক ০.৪৩৭ অবস্থান সবচেয়ে নীচে অর্থাৎ ২৭তম স্থানে এবং করিমগঞ্জ রয়েছে ০.৪৫৬ সূচক নিয়ে ২৫তম স্থানে। বাক্‌সা জেলা ০.৪৩৭ সূচক নিয়ে ২৬তম স্থানটি দখল করে না নিলে, বরাক উপত্যকা উন্নয়নের সাম্প্রতিককালের মাপকাঠি মানব উন্নয়নের ক্ষেত্রে রাজ্যের সব জেলার মধ্যে ‘সর্বনিম্ন’ তিনটি স্থান অধিকার করে নেওয়ার নজির (!) সৃষ্টি করত।

উপরিউক্ত তিনটি ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করে পাওয়া পরিসংখ্যান বরাক উপত্যকার এক বিবর্ণ অর্থনৈতিক চিত্রই শুধু তুলে ধরছে না, একইসঙ্গে আসামের অর্থনৈতিক উন্নয়নকে আঞ্চলিকভাবে অনভিপ্রেত ও অ-সম বলেই ইঙ্গিত করছে।

মানব উন্নয়ন অধ্যয়নে ‘দারিদ্র্য’ও এক গুরুত্বপূর্ণ বিচার্য বিষয়। দারিদ্র্যকে এখানে এক বহুমাত্রিক বঞ্চনা বা Multi-dimensional Deprivation হিসেবেই দেখা হয়। এই বহুমাত্রিক বঞ্চনার গভীরতা ও পরিসর বোঝা যায় বহুমাত্রিক দারিদ্র্য সূচক বা Multi-dimensional Poverty Index (MPI) থেকে।

বহুমাত্রিক দারিদ্র্য সূচক (MPI) নিরূপণের ভিত্তিও সেই শিক্ষা, স্বাস্থ্য এবং জীবনযাপনের মান। এই ত্রিমাত্রিক বিচারের সঙ্গে আরও ১০টি নির্দেশককে যুক্ত করে সেই আধারে স্থির করতে হয় দারিদ্র্যসূচক। এই ১০টি নির্দেশক মূলত শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও জীবনযাপনের মান অর্থাৎ আয় সংক্রান্ত, আমরা সেগুলোর নাম দেখে নিতে পারি। এখানে শিক্ষা সংক্রান্ত নির্দেশক দু'টি। (১) শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পাঠ দেওয়া বছরের সংখ্যা, (২) বিদ্যালয়ে উপস্থিতি, স্বাস্থ্য সম্পর্কিত নির্দেশক, (৩) পুষ্টি, (৪) শিশুমৃত্যুর হার এবং জীবনযাপনের ক্ষেত্রে বিচার্য নির্দেশক, (৫) রান্নার জন্য ব্যবহৃত ইন্ধনের রূপ, (৬) পানীয়জলের উৎস, (৭) বিদ্যুতের ব্যবহার, (৮) বাসগৃহের মান, (৯) সম্পদ ও (১০) বাসস্থানের স্বাস্থ্যকরতা। এই পদ্ধতি মতে এইসব সুবিধা-র এক তৃতীয়াংশ থেকেও কেউ বঞ্চিত হলে তাকে দরিদ্র বলে গণ্য করা হয়।

২০১৪ সালের মানব উন্নয়ন প্রতিবেদনে ওপরে উল্লিখিত পদ্ধতি অনুযায়ী দারিদ্র্য বিচার করে কাছাড় জেলাকেই (৪৫.৮৭) আসামের জেলাগুলোর মধ্যে দরিদ্রতম হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। ওই প্রতিবেদন

অনুযায়ী আসামের গ্রামাঞ্চলের ৪৮.৫ শতাংশ মানুষের কৃষিজমি নেই এবং ভূমিহীনতার আধিক্য রয়েছে আসামের ৫টি জেলায় এবং এদের মধ্যে দু'টিই বরাক উপত্যকার, যথা কাছাড় ও করিমগঞ্জ। আসামের ৬টি জেলায় কাঁচা বাসগৃহের উপস্থিতি এখনও চোখে পড়ার মত। এই জেলাগুলোর মধ্যে হাইলাকান্দি জেলাও আছে।

বরাক উপত্যকায় উন্নয়নের হিসেব করতে গিয়ে এতক্ষণ শুধু ক্রমাগত পিছিয়ে পড়ার এক চিত্রই দেখছিলাম। সৌজন্যে, UNDP-র Assam Human Development Report, 2014। বস্তুত, এ এক খণ্ডচিত্র মাত্র। প্রকৃত অবস্থা অনেক বেশি হতাশাজনক।

এটা বললে মনে হয় না অতিরঞ্জন হবে যে, বরাকে কোনও উন্নয়নমূলক প্রকল্পই স্বাভাবিকভাবে তার বাস্তব রূপ পায় না। স্বাভাবিকভাবে কোনও বড় প্রকল্পও সাধারণত বরাক উপত্যকার জন্য বরাদ্দ হয় না। অন্তত এ যাবৎ যা কিছু হয়েছে তার প্রত্যেকটির জন্য অনেক কাঠখড় পোড়াতে হয়েছে বা আন্দোলন করতে হয়েছে।

শিল্পোন্নয়নের অনেক সম্ভাবনা থাকলেও বরাক উপত্যকায় শিল্পক্ষেত্রের বিকাশ ঘটেনি। অনেক আশা জাগিয়ে চিনিকলের প্রতিষ্ঠা হলেও সেটি ছিল স্বল্পায়ু। বহু প্রচেষ্টায় কাগজকল স্থাপনের মাধ্যমে উপত্যকার অর্থব্যবস্থায় নতুন জোয়ার এলেও আমরা তা ধরে রাখতে ব্যর্থ হয়েছি। কাগজকলটির শ্রীবৃদ্ধির সব উপকরণ থাকা সত্ত্বেও এর অবক্ষয়ের কারণগুলো দূর করতে না পারায় এটিরও পঞ্চত্বপ্রাপ্তি ঘটেছে। এই বারবার ব্যর্থ হওয়ার কারণগুলো চিহ্নিত করে প্রতিকার না করা পর্যন্ত শিল্পক্ষেত্রে কোনও বড়মাপের বিনিয়োগে খুব উৎসাহ না থাকাটাই স্বাভাবিক।

বরাক উপত্যকার এই অর্থনৈতিক অনগ্রসরতাকে দূর করতে রাজনীতিবিদরা অনেক কথাই বলে থাকেন। আশ্বাসেরও ফুলঝুরি দেখা যায়। সরকারের পক্ষ থেকে মন্ত্রীরাও এই ব্যাপারে পিছিয়ে থাকেন না। সরকারি ক্ষেত্রে এরূপ অনেক নতুন নতুন প্রকল্পের কথা ঘোষণা হয়, এমনকী শিলান্যাসও হয়। প্রকল্পগুলো কিন্তু সম্পূর্ণতা লাভ করে না। কিছু কিছু ক্ষেত্রে অর্থ বরাদ্দ হয়, কিন্তু কাজই শুরু হয় না। এরকম কিছু সরকারি প্রকল্পের কথা আমরা এখানে উল্লেখ করব, যেগুলোর বাস্তব অবস্থা সরকারের আন্তরিকতাকেই প্রশ্নের সামনে দাঁড় করিয়ে দেয়। সম্প্রতি স্থানীয় একটি সংবাদপত্রে এধরনের কয়েকটি প্রকল্পের ভবিষ্যৎ ও বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে উদ্বেগ এবং আশঙ্কা প্রকাশ করা হয়েছে। এরকম একটি প্রকল্প হল হাইলাকান্দি কুচিলা অঞ্চলে একটি ITI স্থাপন, যার ব্যাপারে ২০১২-১৩ সালে সিদ্ধান্ত নিয়ে Multi-sectoral Development -র অধীনে ৪.২৭ কোটি টাকা বরাদ্দ করে ২০১৪ সালের ৩০ মে শিলান্যাস করা হয়। নির্মাণ প্রক্রিয়া অসম্পূর্ণ রেখেই ২০১৮ থেকে এর কাজ বন্ধ রয়েছে। প্রায় প্রতিটি সরকারি প্রকল্পের একই অবস্থা। উদাহরণস্বরূপ, জেলা গ্রন্থাগার (শিলচর), আইরংমারায় বিবেকানন্দ সাংস্কৃতিক কেন্দ্র, শিলচরে ইয়ুথ হস্টেল, করিমগঞ্জ মেডিক্যাল কলেজ, শিলচর ইটখলাঘাটে বরাক নদীর ওপর সেতু, শিলচরে মিউজিয়াম, শিলচরে বাইপাস ইত্যাদি কত প্রকল্পই রয়েছে, যার মধ্যে কিছু রয়েছে অর্ধসমাপ্ত অবস্থায়, কোথাও বা অর্থ বরাদ্দ হয়েও কোনও দুর্বোধ্য কারণে প্রকল্পগুলোর কাজ শুরুই হচ্ছে না বা শুরু হলেও থমকে আছে। করিমগঞ্জ মেডিক্যাল কলেজের প্রস্তাব বাস্তবায়িত হচ্ছে না জমি না পাওয়ায়, আবার মহাসড়কের কাজ ১৭ বছরেও শেষ হয় না অদ্ভুত সব কারণে। প্রস্তাবিত প্রকল্পগুলো আমাদের চোখের সামনে ললিপপের মত আন্দোলিত হলেই বোধহয় আমরা খুশি। তাই সরকারও এর চেয়ে বেশি কিছু করা নিষ্প্রয়োজন বলে মনে করে।

বরাক উপত্যকাকে উন্নয়নের পথে নিয়ে আসতে হলে চাই বিশেষ পরিকল্পনা আর সে পরিকল্পনার

বাস্তবায়নে চাই আন্তরিক প্রচেষ্টা। এক্ষেত্রে রাজনৈতিক দল এবং জনপ্রতিনিধিদের এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা থাকে। কিন্তু এখানকার রাজনৈতিক দল ও জনপ্রতিনিধিদের ভূমিকা কার্যত একেবারেই গুরুত্বহীন। সরকারের কোনও সিদ্ধান্তের ওপর এদের কোনও প্রভাবই লক্ষ্য করা যায় না। তাই পরস্পরকে দোষারোপ করেই এরা নিজেদের অক্ষমতা ঢাকতে সচেষ্ট থাকেন। অবশ্য এমনটিই হওয়া স্বাভাবিক কারণ, রাজ্য পুনর্গঠনের সুপারিশ ব্যক্ত করতে গিয়ে আসামের মত একটি Multilingual State সম্পর্কে ঠিক এই আশঙ্কা প্রকাশ করে কমিশন (SRC) মন্তব্য করেছিল : "In multiligual States, political leadership and administrative authority remain the monopoly of the dominant language groups, and linguistic minorities are denied an effective voice in the governance of their States. Even where there are substantial minorities having adequate representation in the cabinet, the representatives of linguistic minority groups find it impossible, owing to party discipline and other factors, to do anything effective to safeguard the interest of minorities." (Report of the State Reorganisation Commission, 1955, P.36).

কিম্ আশ্চর্য্যম্ অতঃপরম্। হ্যাঁ, States Reorganisation Commission এজন্য safeguards-র জন্য সুপারিশ করেছিল। কিন্তু প্রশাসনের ওপরতলায় যদি আগ্রহ, সদিচ্ছা ও সাহসের অভাব থাকে, তাহলে সবকিছু, সব আইনগত সংস্থানই অর্থহীন হয়ে যায়। রাজধর্মকে অন্তরালে চলে যেতে হয়, দল-ধর্মই মুখ্য হয়ে ওঠে।

বরাক উপত্যকার এই জটিল পরিস্থিতিতে জনসাধারণ যখন এক নেতৃত্বহীনতায় ভুগছেন, তাদের পুঞ্জীভূত ক্ষোভ, আশা ও আকাঙ্ক্ষাকে 'ভাষা' দিতে কেউ এগিয়ে আসছে না, তখন একটি মাত্র সংগঠন, বরাক উপত্যকার অগ্রগামী বৌদ্ধিক সংগঠন, বরাক উপত্যকা বঙ্গ সাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্মেলন এই উপত্যকার ভাষিক ও সাংস্কৃতিক পরিচিতি রক্ষায় নিরবচ্ছিন্ন ও নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। এখানকার যথার্থ দাবি ও অধিকার নিয়ে সতত সরব এই সংগঠন সব ভাষিক সংখ্যালঘুর অধিকার সম্পর্কেও সচেতন। বরাকের উন্নয়নের জন্য বরাকবাসীর দীর্ঘদিনের দাবি বরাক উপত্যকা স্বশাসিত অর্থনৈতিক উন্নয়ন পর্ষদ। সংবিধানের সংস্থানের মধ্যে থেকেই বরাকবাসীর এই দাবির রূপায়ণ সম্ভব। বরাক উপত্যকার উন্নয়নে, উন্নয়নমূলক কাজে সিদ্ধান্ত গ্রহণে বরাকবাসীকেই অংশীদার করতে প্রস্তাবিত এই পর্ষদ খুবই গুরুত্বপূর্ণ এক ভূমিকা পালন করতে পারে। বরাক উপত্যকা বঙ্গ সাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্মেলন এই পর্ষদের জন্য এক নীল নক্সা তৈরি করে সরকারের কাছে দাবি জানিয়েছিল, কিন্তু এখন অবধি কোনও সাড়া পাওয়া যায়নি। এ অঞ্চলের অগ্রগতির জন্য উপযুক্ত স্থানে উপযুক্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণে দীর্ঘসূত্রিতা, উদাসীনতা আর অনীহাই যে এ অঞ্চলের অনগ্রসরতার মুখ্য কারণ, সে সম্পর্কে দ্বিমত থাকার অবকাশ কোথায়! সব রাত্রির পরই ভোর হয়। আকাশ লাল হয়ে ওঠে। তারপর দিনের আলোও ফোটে। বরাক উপত্যকা সেই আশা অটুট রাখুক।

বরাক উপত্যকার উন্নয়ন : প্রত্যাশা ও আশঙ্কা

অলক সেন

প্রায় ৪১ লক্ষ জনসংখ্যা নিয়ে দক্ষিণ আসামে চারদিক পাহাড় ঘেরা এক সমতল ভূমি হচ্ছে আমাদের এই বরাক উপত্যকা বা আদি কাছাড় জেলা। বর্তমান এই উপত্যকার মধ্যে রয়েছে কাছাড়, করিমগঞ্জ ও হাইলাকান্দি এই তিনটি জেলা। প্রাক্-স্বাধীনতাকালে এই উপত্যকা একটি উন্নত অঞ্চল হিসেবে পরিচিত ছিল। এই অঞ্চলের জমি ও আবহাওয়া কৃষি ও চা উৎপাদনের জন্য ছিল অত্যন্ত সহায়ক। স্বাধীনতার সময়ে দেশভাগের ফলে এই উপত্যকা ভৌগোলিকভাবে অত্যন্ত প্রান্তিক অঞ্চলে পরিণত হয়। স্বাধীনতা-উত্তর ভারতে শিল্পোন্নয়নের বিশেষ কোনও প্রভাব এই অঞ্চলে পড়েনি, তবুও অর্থনৈতিকভাবে এই উপত্যকা আসামের মধ্যে প্রথম সারিতেই ছিল। কিন্তু বর্তমানে আমরা দেখতে পাচ্ছি, তুলনামূলকভাবে বরাক উপত্যকা ক্রমশ অর্থনৈতিক উন্নতির নিরিখে পিছিয়ে যাচ্ছে। অর্থনৈতিক উন্নতির যে কোনও সূচকেই তা পরিলক্ষিত হয়, সেটা মাথাপিছু আয়ই (per capita income) হোক আর মানবকল্যাণ সূচকেই (Human Development Index) হোক। অনেক পেছনে না গিয়ে গত ২০ বছরের চিত্রই বলে দিচ্ছে যে, আমরা ক্রমাগত আসামের অন্যান্য জেলা থেকে পিছিয়ে যাচ্ছি। যে আসাম রাজ্যই আবার সর্বভারতের তুলনায় একেবারে তলানিতে আছে, সব মৌলিক সূচকেই আসাম রাজ্যের স্থান হচ্ছে সর্বনিম্ন থেকে ৩ নং কিংবা ৪ নং স্থানে। কাজেই আত্মতুষ্টিতে না ভুগে এখনই যদি আমরা সঠিক কারণ নির্দিষ্ট না করে, মৌলিক পরিবর্তন না এনে এভাবেই চলতে থাকি তবে বোধহয় শীঘ্রই একটি সম্পূর্ণ অচলাবস্থায় আমরা গিয়ে পৌঁছব। কথাগুলো খুব নেতিবাচক শোনাতে পারে কিন্তু যে অর্থনীতি বাস্তবে কোনও পরিবর্তন আনতে পারবে না, সেটার পৃষ্ঠপোষকতা করা অর্থহীন। বর্তমানের কোনও সমস্যা দেখলে তার রোগ নির্ণয় করে ভবিষ্যতের জীবনযাত্রাকে অনেক মসৃণ, সবল, সফল ও চলমান (Sustainable) করাটাই তো প্রকৃত অর্থে ইতিবাচক মানসিকতা। আজ এই উপত্যকায় যখন একটির পর একটি শিল্প প্রথমে চা-শিল্প তারপর চিনিকল এবং কাগজকল ধ্বংস হওয়ার প্রক্রিয়ার মধ্যে ছিল, তখনই যদি আমরা সে-সব প্রক্রিয়ার বিরোধ করতাম এবং রোধ করতাম, তবে হয়তো এইসব শিল্প আমাদের হারাতে হতো না। এই তিনটি শিল্পের পতনের পিছনে নিশ্চয়ই দায়ী ছিল না কোনও নীতিগত ব্যর্থতা বা পরিকাঠামোগত অপর্যাপ্ততা বা ভৌগোলিক অবস্থান। মূল কারণ ছিলো আমাদের এক বিচিত্র অ-অর্থনৈতিক মানসিকতা — যা হল তাৎক্ষণিক ও অতি সহজভাবে অর্থ উপর্জনের (quick and easy earning) মানসিকতা। যে মানসিকতা শুধু আমাদের বরাক উপত্যকার নয়, সমগ্র আসাম তথা উত্তর-পূর্বাঞ্চলের অর্থনৈতিক অগ্রগতির প্রধান অন্তরায়। এই মানসিকতাই আমাদের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের উগ্রপন্থা বিস্তারের জন্য অনেকটাই দায়ী। বরাকে যদিও এখনও উগ্রপন্থা মাথাচাড়া দেয়নি কিন্তু সঠিকভাবে এই অঞ্চলের উন্নয়নের মাধ্যমে লোকের হাতে স্বীকৃত পন্থায় স্থায়ী উপার্জনের বন্দোবস্ত না করলে আগামী দিনে বিভিন্ন ধরনের সংকট দেখা দেবে।

বরাক উপত্যকার অনগ্রসরতা

চলে আসি বর্তমানে আত্মবিশ্লেষণ ও বিকল্পের খোঁজে, যুক্তিতর্ক দিয়ে বলা যেতে পারে, আজ আমাদের অনেক উন্নতি হচ্ছে। কারণ, আজ আমাদের এই আছে বা সেই আছে, যা আগে ছিল না। সেটা অস্বীকার না করলেও উন্নয়ন আমরা কীভাবে মাপবো? আমার বাবা মাধ্যমিকে ৬০ শতাংশ নম্বর পেয়েছিলেন এবং আমি ৭০ শতাংশ নম্বর পেয়েছি। তাই আমি তার চেয়ে সফল, এটা কি হয়? কারণ, তিনি ৬০ শতাংশ পেয়ে ক্লাসে প্রথম হতেন এবং আমি ৭০ শতাংশ পেয়ে ক্লাসে পনেরোতম স্থানে আছি। কাজেই অগ্রগতি তুলনামূলক অবস্থান দিয়েই পরীক্ষা করা হয়, পরম অবস্থান দিয়ে নয়। তুলনামূলক অবস্থান বুঝিয়ে দেয়, অন্যরা যখন এগিয়ে যাচ্ছে, আমি তখন এগোতে পারছি কিনা? বিশেষত অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য সরকারস্বীকৃত কিছু মাপদণ্ড রয়েছে, যার মধ্যে একটি হলো মানব উন্নয়ন সূচক (HDI)। এছাড়া আছে মাথাপিছু আয় (PCI), অনগ্রসরতা সূচক (Backwardness Index), দরিদ্রতা অনুপাত (Poverty Ration) ইত্যাদি। বিগত ২০ বছরের মধ্যে আসামে আমরা পেয়েছি দু'টি মানব কল্যাণ সমীক্ষা (Human Development Index Report) ২০০৩ সালে এবং ২০১৪ সালে (যা প্রকাশিত হয়েছে ২০১৬ সালে)। ২০০৩ সালে রাজ্যের জেলাগুলোর মধ্যে কাছাড় জেলার অবস্থান ছিল ৮ নং স্থানে, যা ২০১৪ সালে নেমে এসেছে ২৪-এ, একইভাবে করিমগঞ্জ নেমে এসেছে ১৯ থেকে ২৫-এ, এবং হাইলাকান্দি ১১ থেকে ২৭-এ। এরপরও কি আমাদের সতর্ক হয়ে যাওয়া উচিত নয়? ২০২৪ সাল নাগাদ ২০২১-র জনগণনার পর হয়তো আরেকটি মানব কল্যাণ সমীক্ষা প্রকাশিত হবে, কিন্তু মনে হয় না খুব একটা মৌলিক পরিবর্তন আসবে বলে। কারণ, আমাদের অর্থনৈতিক প্রক্রিয়ায় আমরা কোনও বিশেষ পরিবর্তন এখনও আনতে পারিনি। অন্যান্য সূচক আমাদের অবস্থা আরও করুণ, যেমন মাসিক মাথাপিছু আয়ে ২০১৪ সালে (শেষ পাওয়া পরিসংখ্যানে) কাছাড়ে ১৯২১ টাকা, করিমগঞ্জে ১৫৯৬ টাকা, হাইলাকান্দিতে ১৩৮৬ টাকা, যেখানে সমগ্র আসামের ক্ষেত্রে এই সংখ্যা হলো ২০৫৫ টাকা এবং যোরহাট জেলায় এই সংখ্যা ৩২২২ টাকা। অনুন্নতার সূচকে বরাকের তিন জেলার অবস্থানও একইভাবে নিরাশাময় — কাছাড় আছে ১৪ নং স্থানে, করিমগঞ্জ ১২ নং ও হাইলাকান্দি ১৩ নং স্থানে। ভাবুন, একসময় অবিভক্ত কাছাড় জেলার অবস্থান থাকত উন্নত পাঁচটি জেলার মধ্যে।

বৃহৎ শিল্প, প্রত্যাশা ও বাস্তব

উপরিউক্ত আলোচনায় এটা পরিষ্কার, বরাক উপত্যকা ক্রমশ পিছিয়ে যাচ্ছে এবং শীঘ্র যদি এর সঠিক বিধান না নেওয়া হয় তবে কিন্তু আমরা এক অপরিবর্তনীয় অবস্থায় পৌঁছে যাব। এই উপত্যকার আশু উন্নয়নের প্রয়োজন তা নিয়ে অবশ্য কোনও দ্বিমত নেই। এবং এই উন্নয়নের সমাধানসূত্র হিসেবে আমরা বলি যে, শীঘ্র রাজনৈতিক তৎপরতায় এখানে সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় বৃহৎ শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা প্রয়োজন। আমাদের ধারণা, বৃহৎ শিল্প প্রতিষ্ঠা হলে অনেক সরকারি তহবিল আসবে এবং সেই তহবিল ব্যয় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের সবার আয়ও বৃদ্ধি পাবে। অর্থাৎ, সত্বর ও সহজ অর্থ উপার্জন হয়ে যাবে। কিন্তু বাস্তব কী বলে, যে কোনও ধরনের ইন্ডাস্ট্রি — এখানে এলেই কি স্বীকৃত উপায়ে আমজনতার আয় বৃদ্ধি পাবে? দ্বিতীয়ত, বর্তমান ভৌগোলিক ও পরিবহনগত সীমাবদ্ধতায় বরাক উপত্যকায় কোনও বৃহৎ শিল্প কি লাভজনক হবে? হ্যাঁ, ভবিষ্যতে বাংলাদেশ হয়ে আমাদের পরিবহন ব্যবস্থা উন্নত হলে তখন ভাবা যেতে পারে। কিন্তু আমাদের তো শীঘ্র সমাধানের প্রয়োজন। প্রথম প্রশ্নের পরিপ্রেক্ষিতে বলি, আমাদের উন্নয়ন — সে-সব ক্ষেত্রের মাধ্যমেই

হওয়া উচিত, যেগুলোর সঙ্গে আধিক সংখ্যক লোকের অর্থনৈতিক ক্রিয়াকর্মের সংযোগ (Linkage) রয়েছে। অন্যথায় যদি অতি অত্যাধুনিক কোনও শিল্প প্রতিষ্ঠা হয়, এখন যেহেতু আমাদের আমজনতার দক্ষতা উচ্চ প্রযুক্তির স্তরের নয়, কাজেই সেই শিল্প লাভজনক হলেও লভ্যাংশ মুষ্টিমেয় কিছু লোকের হাতে যাবে আর আমজনতার কোনও লাভ হবে না। আর যদি ভাবি, গাছ লাগিয়ে দীর্ঘস্থায়ীভাবে গাছের ফল লোককে খাওয়ানোর প্রকল্পের টাকা গাছ না লাগিয়ে নিজেদের মধ্যে বণ্টন করে নেব, কিছু দরিদ্র লোককে সাহায্য করব, তবে অন্য কথা, যার কোনও যুক্তি অর্থশাস্ত্রে নেই। হয়তো বা ভৌগোলিক অবস্থান, সামাজিক ও অর্থনৈতিক বৈষম্যের পাশাপাশি এই মানসিকতাই আমাদের উপত্যকার ক্রমাগত অনুন্নয়নের এক প্রধান কারণ। সঠিক গবেষণা করলে সেটা বেরিয়ে আসতে পারে। এই প্রক্রিয়ায় আমরা নিজেরাই নিজের পায়ে কুড়োল মারব এবং এই প্রক্রিয়া কোনও দিনই স্থায়ী (Sustainable) উন্নয়ন দিতে পারে না। আমাদের ভুললে চলবে না, শুধু কেন্দ্র সরকারের দানের ওপর নির্ভর করে কোনও উন্নয়ন সম্ভব হয় না এবং হলেও স্থায়ী হতে পারে না। আমাদের ভুললে চলবে না, স্বাধীনতার সাত দশক পেরিয়ে এলেও আসাম সহ উত্তর-পূর্বাঞ্চলের সব রাজ্য আর্থিকভাবে কেন্দ্র সরকারের ওপর ৫০ শতাংশেরও বেশি অংশে নির্ভরশীল। কোনও রাজ্যে সেই সংখ্যা ৭০ শতাংশেরও বেশি, যেখানে অন্ধ্রপ্রদেশ — যা ৩০ বছর আগে আসামের সমতুল্য ছিল, বর্তমানে সেই কেন্দ্রীয়-নির্ভরতা হচ্ছে মোট ১৬ শতাংশ, গুজরাট, হিমাচল প্রদেশ, কেরল ও গোয়া এইসব রাজ্যে এই সংখ্যা ১৫ শতাংশেরও নীচে। উল্লেখ্য, কেরল, গোয়া, হিমাচল প্রদেশ বৃহৎ শিল্পায়নের বিকল্প খুঁজে ও যথার্থ ব্যবহার করে আজ উন্নতির শিখরে পৌঁছেছে, তাই আমাদেরও উচিত হতাশ না হয়ে, এই বরাক উপত্যকায় — যেখানে এখনও শান্তি বিরাজমান, যা অর্থনৈতিক উন্নয়নের পূর্ব শর্ত, সঠিক বিকল্প চিহ্নিত করে সম্মিলিতভাবে এগিয়ে যাওয়া। খুব দেরি করা যাবে না, লোকের হাতে ন্যূনতম আয় না পৌঁছলে সে অসাধু উপায় অবলম্বন করে ফেলে, যার কিছু ইঙ্গিত সকালবেলা খবরের কাগজ হাতে নিলেই বিভিন্ন জায়গায় নিষিদ্ধ সামগ্রী বাজেয়াপ্ত হওয়ার ঘটনা থেকেই পাওয়া যায়।

মূল সমস্যা : গ্রাম ছাড়ার প্রবণতা

বিকল্প আমরা দুই দৃষ্টিকোণ থেকে আলোচনা করব, একটি হচ্ছে শীঘ্র সমাধান ও আরেকটি হচ্ছে দীর্ঘমেয়াদি। সমস্যার নিরিখে আমরা বরাক উপত্যকার অর্থনৈতিক অবস্থা ও গ্রাম ও শহরগুলোর ক্রমশ অবক্ষয় রোধের সমাধান বের করার চেষ্টা করব। আসলে এই তিনটি সমস্যাই ঘনিষ্ঠভাবে একে-অন্যের সঙ্গে জড়িত। সঠিক রোগ নির্ণয় করলে দেখা যায়, এক প্রতিকারেই সবগুলোর সমাধান হয়ে যাবে। যেহেতু বরাকের অর্থনৈতিক পরিস্থিতির কথা আগেই আলোচনা হয়েছে, তাই আসি এখন গ্রাম ও শহরের কথায়। উপত্যকার শহরগুলোর অবস্থা ভয়াবহ, বিশেষত শিলচর শহর ক্রমশ থাকার অযোগ্য হয়ে দাঁড়াচ্ছে। যার যথেষ্ট ইঙ্গিত এবারের (২০২২ সালের) বন্যাকালে পাওয়া গেছে। প্রশাসন ও নেতা-মন্ত্রীদের চেষ্টায়ও শিলচর শহরের বিভ্রাট মেটানো যাবে না। প্রতিদিন সকাল ১০টার পর বা কোনও বিশেষ অনুষ্ঠানে বা কোনও প্রাকৃতিক দুর্যোগে এই শহর মূলত অচল হয়ে দাঁড়ায় এবং সেটাই স্বাভাবিক। কেননা, প্রত্যেকটি শহরেরই একটি সর্বাধিক বহন ক্ষমতা (carrying capacity) থাকে এবং শিলচর শহরের জনবসতি নিরিখে সেই সীমা অনেক আগেই অতিক্রম করে ফেলেছে। অন্যভাবে উপত্যকার গ্রামগুলোর সমস্যা হচ্ছে, বেশ কয়েক দশক ধরে গ্রাম পরিত্যাগ করে বড় শহরে (মূলত শিলচরে) চলে আসার একটি হিড়িক পড়েছে। গ্রাম ছাড়ার পাশাপাশি গ্রামের কৃষিকার্য ও অন্যান্য প্রাথমিক পেশা ছাড়ার প্রবণতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। আমাদের উপত্যকা মূলত গ্রামভিত্তিক (৭৫

শতাংশ লোক গ্রামবাসী), কৃষি ছাড়া খুব নির্ভরশীল বিকল্প উপার্জনের উৎস এখনও এখানে গড়ে ওঠেনি। যেগুলো সীমিত সংখ্যক উৎস আছে, তাদের সংযোগ অধিক সংখ্যক সাধারণ লোকের সঙ্গে নেই। কাজেই সে-সব প্রতিষ্ঠান অধিক মুনাফা উপার্জন করলেও তার লভ্যাংশ অধিক সংখ্যক লোকের মধ্যে বিস্তৃত হয় না বা উপত্যকার বাইরে চলে যায়। যেমন, চা-শিল্পের লাভ বরাক উপত্যকার অর্থব্যবস্থাকে খুব একটা প্রভাবিত করে না। কারণ, অন্যান্য সেক্টরের সঙ্গে চা-শিল্পের খুব একটা সংযোগ নেই।

অর্থনৈতিক প্রক্রিয়া

একটি অর্থব্যবস্থা সবল ও চলমান হতে হলে দু'টি প্রক্রিয়া একসঙ্গে চলতে হবে।প্রথমত, সক্ষম লোকদের কোনও না কোনও স্বীকৃত উৎপাদন ব্যবস্থার সঙ্গে জড়িয়ে থাকতে হবে (চাকরিরতরাও উৎপাদনে জড়িত) এবং দ্বিতীয়ত, উৎপাদিত বস্তুসমূহ বিক্রি হয়ে যেতে হবে ও উৎপাদনের ফলে উপার্জিত লভ্যাংশ যদি অধিক সংখ্যক সাধারণ লোকের মধ্যে বিস্তৃত না হয়, তাহলে ক্রয় ক্ষমতা বাড়বে না, উৎপাদিত সামগ্রী বিক্রি হবে না, ক্রমশ ব্যবসা সঙ্কুচিত হবে, বেকারত্ব বাড়বে, অর্থনৈতিক অনগ্রসরতা চলতে থাকবে। কাজেই, এই উপত্যকার মূল জীবিকার মাধ্যম নির্বাচনের সময় আমাদের বেছে নিতে হবে সে-সব ক্ষেত্রকেই, যার চাহিদা আছে অনেক বেশি এবং আমজনতার সঙ্গে সংযোগও আছে অনেক বেশি। সেই ক্ষেত্রগুলো মূলত বরাক উপত্যকার জন্য বর্তমান পরিস্থিতিতে কী কী হতে পারে? যেহেতু এই অঞ্চলের লোকের কারিগরি দক্ষতা খুব একটা উচ্চ পর্যায়ের নয়, কাজেই আমরা প্রাথমিকভাবে নির্ভর করতে পারি মূলত কৃষি, পরিষেবা (রেস্টুরেন্ট, হোটেল, যাতায়াত, বিনোদন, ইন্টারনেট পরিষেবা ইত্যাদি), ও ক্ষুদ্রশিল্পে (হস্ততাঁত ও কুটিরশিল্প ও manufacturing)-র ওপর। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন, আমরা সমান্তরালভাবে বৃহৎ ও অত্যাধুনিক শিল্প প্রতিষ্ঠানের চেষ্টা চালিয়ে যাব কিন্তু মৌলিকভাবে আমাদের এখন উপরিউক্ত ক্ষেত্রগুলোর ওপর নির্ভর করে এগিয়ে যেতে হবে।

কৃষি : কৃষিকে নির্বাচনের মূল কারণ হচ্ছে, কৃষিজাত পণ্য আমাদের মৌলিক চাহিদা এবং প্রতিদিনই আমরা অন্তত কিছু পরিমাণ কৃষিজাত সামগ্রী ক্রয় করি। কিন্তু বাস্তব হচ্ছে, বরাক উপত্যকা কৃষি উৎপাদনে অতি সুবিধাজনক অবস্থায় থাকা সত্ত্বেও আমাদের মোট প্রয়োজনের অধিকাংশ বাইরের অঞ্চল থেকে আসে। কাজেই আমরা তো কৃষি থেকে আয় করছি না বরং আমাদের অন্য উৎস থেকে অর্জিত আয়ের অনেক অংশই প্রতিদিন অঞ্চলের বাইরে চলে যাচ্ছে। কৃষিক্ষেত্রে আমাদের অনেক অগ্রগতি করা সম্ভব, আমাদের গড় কৃষি উৎপাদন আরও অনেক বাড়ানো সম্ভব এবং অনেক জমিতে এক ফসলের স্থানে দুই বা তিন ফসল ফলানোর চেষ্টা করা। এই ক্ষেত্রে উৎপাদন হলে বিক্রি ও আয় উপার্জন নিশ্চিত। কৃষির পাশাপাশি অন্যান্য গ্রামীণ উৎপাদন, যেমন দুধ, মৎস উৎপাদন, গ্রামভিত্তিক ও বাগানভিত্তিক বিনোদন, ভ্রমণ ইত্যাদিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারি। মোট কথা, গ্রামীণ অর্থব্যবস্থাকে আধুনিকতার মোড়কে পুনরুজ্জীবিত করে নিতে পারি। আমাদের এই সত্যটা বুঝে নিতে হবে যে, প্রকৃতপক্ষে গ্রামের ওপর ভিত্তি করেই শহর চলে। একদিন গ্রামের সঙ্গে শহরের যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলে শহরের অবস্থা মৃতপ্রায় হয়ে যায়।

গ্রাম ও শহরের (শিলচর) পুনরুজ্জীবন

গ্রাম ত্যাগের মূল কারণ হচ্ছে, মানুষ জীবনের সাধারণ সুযোগ-সুবিধার ওপর ভিত্তি করেই তার বসতির স্থান নির্ধারণ করে। জীবনযাপনের মৌলিক প্রয়োজনীয়তা হচ্ছে শিশুদের শিক্ষা-দীক্ষা, চিকিৎসার সুবিধা

ইত্যাদি। বরাক উপত্যকায় এই সুবিধাগুলি মূলত শিলচর শহরেই গড়ে উঠেছে। এর ফলে মানুষের শিলচরমুখী অগ্রসর হওয়ার এক বিশাল প্রবণতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে এবং এর ফলস্বরূপ শিলচর শহরই আজ সম্পূর্ণভাবে বিকল হয়ে যাওয়ার মুখে। শিলচর শহর তার ৬০ বছরের পুরনো পরিকাঠামো নিয়ে এই ভার আর বহন করতে পারছে না। এই প্রবণতা অজানা কিছু নয়, অর্থনীতিতে একটি কথা প্রচলিত আছে — লোকের মৌলিক চাহিদার সামগ্রী যদি লোকের স্থানে পৌঁছানো না যায় তবে লোক সেই সামগ্রীর উৎসস্থলে চলে আসবে। উন্নয়নের সঙ্গে সঙ্গে স্থান পরিবর্তনের এই প্রবণতা সর্বত্রই দেখা যায়। কিন্তু সর্বত্রই সুপরিকল্পিতভাবে এর সমাধান করা হয়। সমাধানসূত্রও কারও অজানা নয়। মূল আদি শহরকে আর ভারাক্রান্ত না করে শহরকে চারদিকে প্রসারিত (expand) করা এবং প্রসারিত সব অংশকে রিং রোড বা বাইপাস দিয়ে সংযুক্ত করা, যাতে শহরের মধ্যে প্রবেশ না করে লোক এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্তে চলে যেতে পারে। এধরনের সমাধান ভারতের সব বড় শহরেই করা হয়েছে। যার জন্য আমরা কলকাতায় দেখি পুরনো কলকাতা ও সল্ট লেক বা নিউ টাউন এবং আরও অনেক, নয়া দিল্লি ও পুরনো দিল্লি ইত্যাদি। এছাড়াও বিরত থাকতে হবে শহরের পুরনো অংশে নতুন করে কোনও বহুতল আবাসন নির্মাণ করা, নতুন কোনও বৃহৎ Shoping Complex, Nursing Home কিংবা কোনও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, স্কুল-কলেজ ইত্যাদি থেকে। শহরের থেকে অনেক দূরে এই প্রতিষ্ঠানগুলো তৈরি হলে যাতায়াতের সুবিধা হবে, পার্কিংয়ের বা ট্রাফিক সমস্যা হবে না, গ্রামের লোকেরাও সহজে এই সুবিধাগুলো পাবে এবং শহরেও প্রাকৃতিক-সামাজিক ও পরিকাঠামোগত সঙ্কট তৈরি হবে না। প্রত্যেক গ্রামে মৌলিক পরিষেবাগুলো যেমন চিকিৎসা (Health Centre) শিক্ষা, বিদ্যুৎ, পরিবহন ও পানীয়জলের সুবন্দোবস্ত করে দেওয়া হলে গ্রামীণ লোকেরা নিজের ভিটেমাটি থেকে বিচ্যুত না হয়ে, নিজেদের সামাজিক মর্যাদা অক্ষুণ্ণ রেখে গ্রামে বসেই উপার্জন করতে পারবে এবং উন্নতমানের জীবন কাটাতে পারবে। সেসঙ্গে শহরের ওপর চাপ কমে যাওয়ায় শহরবাসীরও জীবনযাপনের মাপেরও (quality of life) উন্নতি হবে। এভাবেই শহর ও গ্রামের মধ্যে সামঞ্জস্য রেখে একটি স্বাবলম্বী ও চলমান (sustainable) অর্থব্যবস্থার উত্থান হবে, যা ক্রমশ এই অঞ্চলকে এগিয়ে নিয়ে যাবে।

ভারত একটি বৈচিত্রময় দেশ। প্রত্যেকটি অঞ্চলেরই একটি নিজস্ব বৈশিষ্ট্য আছে, সেজন্য প্রতি অঞ্চলে যে একই উন্নতির প্রক্রিয়া (development model) কার্যকর হবে, তা ঠিক নয়। পরম্পরাগত সমাজ থেকে অতি আধুনিক সমাজে রূপান্তরিত হতে হলে যে সব অঞ্চলকেই বৃহৎ শিল্প নির্ভর হতে হবে, তেমন কোনও কথা নয়। কোনও অঞ্চলের উন্নতির চালক (engine of growth) কী হবে, সেটা নির্ভর করবে সেই অঞ্চলের ভৌগোলিক অবস্থান, প্রাকৃতিক ও সামাজিক বৈশিষ্ট্যের ওপর। ভারতের রাজ্যগুলোর মধ্যে বিভিন্ন সূচকে অধিক উন্নত কয়েকটি রাজ্য হচ্ছে হিমাচল প্রদেশ, কেরল ও গোয়া— এরা প্রত্যেকেই কিন্তু উপরিউক্ত অর্থনৈতিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমেই নিজেদের উন্নত করেছে। মোদ্দা কথা, আয় বৃদ্ধিই তো হচ্ছে মূল অর্থনৈতিক উন্নয়ন, সেটা বৃহৎ শিল্প দিয়েই হোক বা কৃষি ও গ্রামীণ ক্ষুদ্র শিল্প দিয়েই হোক। যে অঞ্চলে যা সুবিধাজনক, তার মাধ্যমেই হবে। শেষ পাওয়া তথ্য অনুযায়ী (২০১৩) বরাক উপত্যকার তিন জেলার দরিদ্রতার অনুপাত হচ্ছে কাছাড়— ৩১ শতাংশ, করিমগঞ্জ— ৩৭ শতাংশ, হাইলাকান্দি— ৩৩ শতাংশ। যেখানে হিমাচল প্রদেশে এই সংখ্যা হচ্ছে ৮.০৬ শতাংশ, কেরলে ৭.০৫ শতাংশ ও গোয়ায় ৫.০১ শতাংশ। তবে কথা হচ্ছে, সেই রাজ্যগুলোতে কৃষি ও গ্রামীণ শিল্পের পাশাপাশি পর্যটন শিল্পও এক বিরাট ভূমিকা নিয়েছে। যা আসবে আমাদের দ্বিতীয় পন্থায়।

দীর্ঘমেয়াদি সমাধান (শিল্প ও পর্যটন)

গ্রাম ও শহরের মধ্যে সামঞ্জস্য রেখে প্রাথমিক ক্ষেত্রের বিকাশ ঘটিয়ে বরাক উপত্যকার অর্থব্যবস্থা যখন একটা শক্ত ভিত স্থাপন করে ফেলবে, তখন আমরা ধীরে ধীরে দ্বিতীয় স্তরের অর্থনৈতিক উন্নয়নের দিকে অগ্রসর হবো। এই প্রক্রিয়ার মূল অঙ্গ হবে মাঝারি ও বৃহৎ শিল্প (যদি সম্ভব হয়) এবং পর্যটন। পর্যটন ক্ষেত্রে এই উপত্যকার বিশাল সম্ভাবনা আছে, যার সঠিক ব্যবহার করে এই অঞ্চলের অর্থব্যবস্থায় এক আমূল পরিবর্তন আনা সম্ভব। পর্যটনের ক্ষেত্রে আমাদের মূলধন হচ্ছে, চারদিকে অবস্থিত বিশাল পর্বতমালা, প্রাকৃতিক ও সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্যে ভরপুর আমাদের বিশাল সংখ্যক চা-বাগান এবং উত্তর-পূর্বাঞ্চলে শান্তির দ্বীপ হিসেবে পরিচিত আমাদের অঞ্চলের বিরাজিত শান্তি ও নিরাপত্তা — যা কোনও পর্যটনের পূর্বশর্ত। আমাদের এখানে পর্যটনের প্রধান আকর্ষণগুলো হতে পারে ব্রিটিশ আমলের তৈরি চা-বাগানগুলোর বাংলোতে বা তৈরি করা কটেজ-এ প্রকৃতির সঙ্গে থাকা এবং সন্ধ্যার পর বাগানের গানবাজনা উপভোগ করা, দিনের বেলায় চা প্রস্তুতির প্রক্রিয়া পরিদর্শন করা, পাহাড় ও বন্য নদীগুলোকে rock climbing, trekking, water-sports, river-raffing, angling ইত্যাদি ও আমাদের ঘন জঙ্গলের বিচিত্রতা, বন্যপ্রাণী ও গাছপালা পরিদর্শন করা, পর্যটনের সম্মুখ ও পশ্চাৎ সংযোগও (forward and backward linkage) অনেক বেশি। পর্যটন এখন সম্পূর্ণ বিশ্বে ও ভারতে সর্বাধিক সম্ভাবনাময় ক্ষেত্র ও কর্মসংস্থান বৃদ্ধির উৎস। আসামে এই ক্ষেত্রের অবদান জাতীয় আয়ের ৫.৫ শতাংশ এবং নতুন কর্মসংস্থানের ১০ শতাংশ। ২০১৫-১৬ সালে আসামে পর্যটকদের বৃদ্ধির হার ছিল ১৬ শতাংশ। বিদেশি পর্যটকদেরও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার প্রতি আকর্ষণ দিনে দিনে বাড়ছে। বরাক উপত্যকা ইচ্ছে করলে এই পরিস্থিতির পুরো লাভ নিতে পারে, পর্যটকেরা শিলং, হাফলং ও বাংলাদেশ পর্যন্ত এসে থেমে যান। আমরা মেঘালয়, মিজোরাম, ডিমা হাসাও, ত্রিপুরা, বাংলাদেশ ও বরাক উপত্যকা নিয়ে একটি বৃহৎ Tourist Circuit বানাতে পারি।

প্রথম পন্থায় যেভাবে আমরা বরাক উপত্যকার মধ্যে নিজেরাই সমাধান করে নিতে পারি, দ্বিতীয় পন্থায় কিন্তু আমাদের রাজ্য সরকারের সম্পূর্ণ সদিচ্ছা ও সহযোগিতা ছাড়া এগোনো সম্ভব নয়। বৃহৎ শিল্প কিংবা পর্যটন শিল্প উভয়ের সফলতার জন্য আমাদের স্থায়ী ও নির্ভরযোগ্য বিশাল যোগাযোগ ব্যবস্থা (যা অনেকাংশে বাংলাদেশের মধ্য দিয়ে) করতে হবে এবং মূল ভূখণ্ডের সঙ্গে all-seasoned নির্ভরযোগ্য সংযোগ গড়ে তুলতে হবে। বাস্তব বলে যে, এখন আপাতত আমরা প্রথম পন্থার ওপর নির্ভর করে আমাদের বর্তমান অবক্ষয়ের শীঘ্র সমাধান করি এবং একটি শক্ত অর্থনৈতিক ভিত গড়ে তুলি, যাতে আমরা নিজেদের কিছুটা হলেও আত্মনির্ভরশীল করে তুলতে পারি। আর যদি পরিকাঠামো ও নীতিগতভাবে ভবিষ্যৎ আমাদের সহায়ক হয়, তবে আমরা দ্বিতীয় পন্থা অবলম্বন করে বিরাট উন্নয়নের দিকে এগিয়ে যাব। এখন তাই প্রথম পন্থা ব্যবহার করি এবং দ্বিতীয় পন্থার তৎপরতা চালিয়ে যাই। শেষ কথা হলো যে কোনও পন্থার সফলতার জন্য যা সবচাইতে প্রয়োজন সেটা হচ্ছে আমাদের দক্ষতা। বড় রেস্টুরেন্ট শুরু করলেও তার সফলতা নির্ভর করবে রাঁধুনির দক্ষতার ওপর। দক্ষ চিকিৎসক দেখাতে, দক্ষ শিক্ষকের কাছে শিক্ষা গ্রহণ করতে কিন্তু দূরত্বটা কখনও বিচার্য হয় না। আমাদের উচিত, সর্বস্তরের দক্ষতা বাড়ানোর জন্য যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়া এবং প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা।

দক্ষতা, পরিশ্রম ও শিল্পসুলভ মানসিকতা নিয়ে এবং quick এবং easy earning-র মানসিকতা পরিত্যাগ করলে আমাদের সফলতা আসবেই।

বরাকের বিকাশ কোন্ পথে

গুরুদাস দাস

সংক্ষিপ্তসার

বর্তমান নিবন্ধটিতে বরাক উপত্যকার অর্থনৈতিক উন্নয়নের সীমাবদ্ধতা ও সম্ভাবনার দিকগুলো নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। যথেষ্ট পরিমাণে কৃষিযোগ্য ভূমি থাকা সত্ত্বেও কেন কৃষিভিত্তিক উন্নয়ন এখানে সম্ভব হয়ে উঠছে না, সেটা ব্যাখ্যা করা হয়েছে। খনিজ সম্পদের প্রতুলতা সত্ত্বেও কীভাবে কৃষি ও বনজ সম্পদভিত্তিক শিল্পায়ন এখানে হতে পারে, সে বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। কীভাবে বরাক উপত্যকার প্রাচীন চা-শিল্পকে পুনরুজ্জীবিত করা যায়, সে বিষয়েও আলোচনা করা হয়েছে। শিক্ষা ও স্বাস্থ্যকে কেন্দ্র করে কীভাবে পরিষেবা শিল্পকে গড়ে তোলা যায় সে বিষয়েও আলোকপাত করা হয়েছে। যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি ঘটিয়ে কীভাবে এখানকার উৎপাদকদের জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বাজারে প্রতিযোগী করে তোলা যায় সে বিষয়েও আলোচনা করা হয়েছে। পরিশেষে পরিচিতির সংকট থেকে কীভাবে উত্তরণ ঘটানো যায় এবং অর্থনৈতিক উন্নয়ন করা যায়, সেদিকেও আলোকপাত করা হয়েছে।

ভূমিকা

কোনও একটি অঞ্চলের অর্থনৈতিক উন্নয়নের কাঠামো নির্ভর করে সেখানকার বস্তুসম্পদ, মানবসম্পদ, প্রাতিষ্ঠানিক পরিকাঠামো এবং যোগাযোগ ব্যবস্থার পরিমাণগত ও গুণগত মানের ওপর। বস্তুসম্পদ বলতে মূলত প্রাকৃতিক সম্পদকেই বোঝায়। ভূগর্ভস্থ খনিজ পদার্থ, মাটির উর্বরতা, বনজ সম্পদ, প্রাকৃতিক জলাধার যেমন নদী, খাল, বিল ইত্যাদি যা কিনা উৎপাদনের উপকরণ হিসেবে ব্যবহৃত হয়। যে অঞ্চলে প্রাকৃতিক সম্পদ যত বেশি থাকে, সে অঞ্চলের অর্থনৈতিক উন্নয়নের পথ ততই সুগম হয়। বস্তুত, প্রাকৃতিক সম্পদের পরিমাণই কোনও একটি অঞ্চলের অর্থনৈতিক উন্নয়নের ভিত্তি রচনা করে। প্রাকৃতিক সম্পদ না থাকলেও উন্নয়ন হতে পারে তবে, তার ভিত্তি তত শক্তিশালী হয় না।

মানবসম্পদ বলতে সাধারণত বোঝায় ওই অঞ্চলের বসবাসকারী মানুষজনের স্বাস্থ্য, শিক্ষা, কারিগরি দক্ষতা, ব্যবসায়িক বৃত্তি, অর্থ উপার্জনের স্পৃহা ও সর্বোপরি পরিশ্রম করার ক্ষমতা। যে অঞ্চলের মানবসম্পদ যত বেশি শক্তিশালী সে অঞ্চলের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ততই ত্বরান্বিত হয়! বস্তুত, প্রাকৃতিক সম্পদ থাকলেও তাকে ব্যবহারের কৃৎকৌশল জানা না থাকলে সেগুলো অব্যবহৃতই থেকে যায় এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নও ধীরলয়ে এগোয়।

প্রাতিষ্ঠানিক পরিকাঠামো বলতে মূলত বস্তু ও সেবা উৎপাদনের সঙ্গে জড়িত সামাজিক, প্রশাসনিক ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানসমূহের উপস্থিতি, পরিচালন ব্যবস্থা, তাদের কার্যকারিতা এবং আন্তঃপ্রাতিষ্ঠানিক সমন্বয় সাধনকেই বোঝায়। যে অঞ্চলের প্রতিষ্ঠানসমূহ যত প্রাণবন্ত, গতিশীল ও আন্তঃপ্রাতিষ্ঠানিক সমন্বয় যত

শক্তিশালী ও গভীর, সে অঞ্চলের অর্থনৈতিক উন্নয়নের হারও ততই বেগবান। অন্যথায় শৈবাল আচ্ছাদিত জলাশয়ের মতই অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও গতিহীন হয়ে পড়ে।

যোগাযোগ ব্যবস্থা বলতে মূলত বোঝায় উৎপাদন স্থলের সঙ্গে উৎপাদিত দ্রব্যসমূহের বিক্রয় স্থলের মধ্যে যাতায়াত সংক্রান্ত ব্যবস্থাপনা। সে সড়ক, রেল, জলপথ যা-ই হোক না কেন। উৎপাদিত দ্রব্যসামগ্রীর বাজারজাত করার সুব্যবস্থা না থাকলে উৎপাদনের প্রণোদনা থাকে না। যোগাযোগ ব্যবস্থা যদি ব্যয়বহুল হয়, তাহলে উচ্চ পরিবহন খরচের ফলে দ্রব্যমূল্য বেড়ে যায় এবং উৎপাদকরা বাজারের প্রতিযোগিতায় পিছিয়ে পড়ে। এর ফলে উৎপাদন করেও মুনাফা অর্জন করা কষ্টসাধ্য হয়। কোনও অঞ্চলের যোগাযোগ ব্যবস্থা যত উন্নত, পরিবহন খরচ যত কম, সে অঞ্চলের উৎপাদকেরা তত বেশি লাভবান হয় এবং উৎপাদনের মাত্রার ওপর তার প্রভাব পড়ে। অধিক মাত্রায় উৎপাদন করে কম খরচে বাজারজাত করার মধ্যে দিয়ে উৎপাদকরা বেশি বেশি মূলধন সঞ্চয় করতে সমর্থ হয়। আর এই সঞ্চিত মূলধনই অর্থনৈতিক উন্নয়নের দরজা খুলে দেয়।

উপরিউক্ত এই চারটি বিষয়ের (বস্তুসম্পদ, মানবসম্পদ, প্রাতিষ্ঠানিক পরিকাঠামো ও যোগাযোগ ব্যবস্থা) নিরিখে আমরা বরাক উপত্যকার অর্থনৈতিক উন্নয়নের ছবিটি বিশ্লেষণ করার প্রয়াস করেছি। প্রথমে বস্তু সম্পদ /প্রাকৃতিক সম্পদের বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করা যাক। কী বস্তুসম্পদ আছে বরাক উপত্যকায়? তার গুণগত মানই বা কী? তার ব্যবহারের স্বরূপটি কী? এই বস্তুসম্পদকে ভিত্তি করে কী শিল্প এখানে গড়ে উঠেছে? এই দুইয়ের সম্পর্ক কতটা শক্তিশালী? যদি দুর্বল হয় তবে কীভাবে বস্তুসম্পদ ও শিল্পের মধ্যে নিবিড় সম্পর্ক স্থাপন করা যায়?

কৃষিভিত্তিক উন্নয়ন ও তার সীমাবদ্ধতা

বরাক উপত্যকায় কোনও খনিজ পদার্থের সঞ্চয়ের সন্ধান পাওয়া যায়নি। ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার মতো খনিজ তেল, প্রাকৃতিক গ্যাস বা কয়লা—এর কোনওটাই এখানে নেই। ভুমিই হলো এখানকার মূল সম্পদ। ভুমিকে কেন্দ্র করে কৃষিভিত্তিক কাজকর্মই এখানকার মানুষের প্রধান জীবিকা। এই উপত্যকার মোট আয়তন ৬৯২২ বর্গকিলোমিটার। যা কিনা আসামের ৮.৮২ শতাংশ। মোট ভৌগোলিক এলাকার ৪৭.২৩ শতাংশ চাষযোগ্য। আর এই চাষযোগ্য ভূমির ৭৩.০৪ শতাংশে কৃষি কাজ করা হয়ে থাকে।

ধান চাষই বরাক উপত্যকার প্রধান কৃষিকাজ। কৃষির জন্য চাই পর্যাপ্ত জল। জলসম্পদেও বরাক উপত্যকা যথেষ্ট সমৃদ্ধ। বরাক ও তার শাখানদী ছাড়াও অসংখ্য খাল, বিল ও অন্যান্য জলাশয়ে এই অঞ্চল সমৃদ্ধ। কিন্ত তা সত্ত্বেও কৃষিভিত্তিক উন্নয়ন সম্ভব হচ্ছে না মূলত দু'টি কারণে। প্রথমত, জলসম্পদ ও ভূমিসম্পদের মধ্যে সমন্বয়ের অভাব। জলসম্পদের রক্ষণাবেক্ষণ ও ব্যবহার ভূমিসম্পদের উপযোগী করে তোলার প্রয়াসের অভাব। বর্ষাকালে প্লাবনজনিত কারণে কৃষি ক্ষতিগ্রস্ত হয় আর শীতে জলের অভাবে কৃষিকাজ সম্ভব হয়ে ওঠে না। এটা হচ্ছে মূলত পরিকল্পনা ও তাকে বাস্তবায়িত করবার অভাবের কারণে। যদি জলসম্পদের রক্ষণাবেক্ষণকে ভূমিসম্পদের ব্যবহারের উপযোগী করে তোলা যায় তবে কৃষি উৎপাদনের পরিমাণ অনেক গুণ বৃদ্ধি পাবে এবং কৃষিভিত্তিক উন্নয়নের পথও সুগম হবে। এ তো গেল জোগানের দিক। এবার চাহিদার দিকটিও দেখা যাক।

দ্বিতীয়ত, উৎপাদিত কৃষিপণ্যের (মূলত ধানের) বাজারের অভাব। এমনিতেই ক্ষুদ্র ও মাঝারি কৃষকদের উৎপাদন খরচ বেশি। খোলাবাজারে বহির্রাজ্যের চালের দাম কম। পঞ্জাব, হরিয়ানা, উত্তরপ্রদেশ প্রভৃতি রাজ্যের বৃহৎ চাষীদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় এখানকার ক্ষুদ্র ও মাঝারি চাষীরা এটে উঠতে পারে না। ফুড

কর্পোরেশন অব ইন্ডিয়াও এতদঞ্চলের চাষীদের উৎপাদিত ধান ক্রয় করে না ফলে ফসল উৎপাদন করেও তা বাজারজাত করার সমস্যার কারণে কৃষকদের ক্ষতি ছাড়া লাভ খুব একটা হয় না। বেশিরভাগ কৃষকই চাষ করে তার পরিবারের বছরের খাবারের জোগানের জন্য। ফলে কৃষির বাণিজ্যিকীকরণ এখানে হয় না বললেই চলে। এই দুঃসহ পরিস্থিতি মোকাবিলার জন্য সরকারের কোনও পদক্ষেপও পরিলক্ষিত হয় না। ধানের কুইন্টাল প্রতি নিম্নতম দাম নির্ধারণ ও তার প্রয়োগ যথাযথভাবে করা না গেলে কৃষিভিত্তিক উন্নয়ন দুরূহ হয়ে পড়বে। বাজারের বিস্তার ঘটিয়ে, চাল প্রক্রিয়াকরণ শিল্প স্থাপন করে কিছুটা হলেও এই সমস্যার সমাধান করা যায়।

জলসম্পদ ও মৎস্য চাষ: সীমাবদ্ধতা

কৃষি ছাড়া মাছ চাষের জন্য জলসম্পদের ব্যবহার হয়ে থাকে। বরাক উপত্যকা বাঙালি-প্রধান অঞ্চল। আর মাছ হলো বাঙালির প্রিয় খাবার। স্থানীয় চাহিদা থাকা সত্ত্বেও, জলসম্পদকে ব্যবহার করে পর্যাপ্ত পরিমাণে মাছ চাষ করা সম্ভব হয়ে উঠছে না। ফলে বহির্রাজ্য থেকে মাছের আমদানি করতে হচ্ছে। এমনকী বাংলাদেশ ও মায়ান্মার থেকেও এখানে মাছ আমদানি হচ্ছে। বিশেষত ইলিশ মাছ। প্রচুর জলাশয় থাকা সত্ত্বেও পর্যাপ্ত পরিমাণে মাছ চাষ করা এখানে হয়ে উঠছে না। কারণ, পরিকল্পিত উদ্যোগের অভাব। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মাছচাষীদের পক্ষে কোনও বৃহৎ পরিকল্পিত উদ্যোগ গ্রহণ করা সম্ভব নয়। তাদের নুন আনতে পান্তা ফুরোয়। বৃহৎ বা ব্যক্তিগত পুঁজিও এ কাজে উৎসাহ বোধ করবে না। কারণ বাজারের আয়তন খুব ছোট। মাছভিত্তিক প্রকরণ শিল্প তৈরি করে এর আকার কতকটা বাড়ানো যায়। এজন্য সারাবছর মাছের জোগান যাতে অব্যাহত থাকে, সেটা সুনিশ্চিত করতে হবে বিজ্ঞানভিত্তিক মাছ চাষের উদ্যোগ গ্রহণের মধ্য দিয়ে। যেখানে বাজার সাড়া দেয় না, সেখানে সরকারের দায়িত্ব এ কাজ সম্পন্ন করা। ক্ষুদ্র মাছচাষিদের সংগঠিত করে মাছ উৎপাদন, মাছভিত্তিক শিল্প স্থাপন এবং সেই উৎপাদিত দ্রব্যগুলোর বাজারজাত করার জন্য সমবায়ভিত্তিক উদ্যোগ গ্রহণ করা যেতে পারে।

শিল্পায়ন : সীমাবদ্ধতা ও সম্ভাবনা

শিল্পায়ন ছাড়া কোনও অঞ্চলের অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্ভব নয়। যেহেতু বরাক উপত্যকায় কোনও খনিজ সম্পদ নেই, তাই খনিজ সম্পদভিত্তিক শিল্পায়ন এখানে সম্ভব নয়। ফলে কৃষি ও বনজ সম্পদভিত্তিক শিল্পায়নই এখানকার উন্নয়নের পথকে সুগম করতে পারে। বরাক উপত্যকায় ভূ-অর্থনৈতিক অবস্থান অবশ্য এখানকার শিল্প বিকাশের উপযোগী। উপত্যকাটি পার্শ্ববর্তী পাহাড়ি অঞ্চল দ্বারা পরিবেষ্টিত। এই পাহাড়ি অঞ্চলগুলো বনজ সম্পদে যেমন সমৃদ্ধ, তেমনই নানারকম উদ্যানজাত দ্রব্য উৎপাদনের উপযোগী। বস্তুত, মিজোরাম, মেঘালয় এবং নর্থ কাছাড় হিল্‌স বহুবিধ উদ্যানজাত দ্রব্য উৎপাদনের জন্য সবিশেষ উল্লেখের দাবি রাখে। মিজোরামের পাহাড়ি অঞ্চলে যেমন প্রচুর পরিমাণে উৎকৃষ্ট বাঁশ পাওয়া যায়, তেমনই প্রচুর পরিমাণে হলুদ, আদা ও স্কোয়াশ উৎপন্ন হয়। পাহাড়ি এলাকার বাঁশ ব্যবহার করে কাছাড় কাগজকল পরিচালিত হতো। ডিজিটাইজেশনের বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে কাগজ ব্যবহারের চাহিদা কমে যাওয়ায়, পাঁচগ্রামে অবস্থিত এই কাগজশিল্পটি ধীরে ধীরে বন্ধ হয়ে যায়। এর ফলে এই উপত্যকায় বহু মানুষের রুজি-রোজগারের পথও বন্ধ হয়ে যায়। কিন্তু কাগজ ছাড়াও আরও বহুবিধ শিল্পজাত দ্রব্য তৈরি করা সম্ভব। বাঁশ ব্যবহার করে জৈব জ্বালানি তেল তৈরি করা যায়। বাঁশ বস্ত্রশিল্পেরও একটি উপাদান। বাঁশের কড়ই একটি জনপ্রিয় খাদ্য উপাদান।

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলোতে এটা খুবই জনপ্রিয় খাবার। এটা আমাদের স্বাস্থ্যের জন্য খুবই উপকারী। বিশেষত, যারা মধুমেহ ও উচ্চ রক্তচাপজনিত রোগের শিকার। বাঁশের কড়ুই প্রক্রিয়াকরণ করে বিদেশের বাজারে জোগান দেওয়া যেতে পারে। আর এজন্য কোনও অতি উচ্চ প্রযুক্তির ব্যবহারেরও প্রয়োজন নেই। বাঁশের আঁশ দিয়ে তৈরি বস্ত্র সিন্থেটিক বস্ত্রের চাইতে বহুগুণে স্বাস্থ্যবর্ধক। গবেষণায় দেখা গেছে, বাঁশের আঁশ দিয়ে তৈরি জামাকাপড় ক্ষতিকারক আল্ট্রাভায়োলেট রশ্মিকে বহুল পরিমাণে প্রতিরোধ করতে সক্ষম। সেজন্য স্বাস্থ্য সচেতনতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে উন্নত দেশগুলোতে এধরনের জামাকাপড়ের চাহিদাও দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। বরাক উপত্যকা এধরনের জৈব জ্বালানি ও জৈব বস্ত্রশিল্প গড়ে উঠবার একটি আদর্শ স্থান হিসেবে পরিগণিত হতে পারে। বরাক উপত্যকার পার্শ্ববর্তী পাহাড়ি অঞ্চলগুলোতে প্রচুর পরিমাণে হলুদ উৎপন্ন হয়। বিশেষত মিজোরামে। বস্তুত, হলুদ উৎপাদনে ভারতে মিজোরামের স্থান নবম। উৎপাদিত এই হলুদের একটা বড় অংশ কাঁচামাল হিসেবে বাংলাদেশে রফতানি করা হয়। ২০১৭-১৮ সালের পরিসংখ্যান অনুযায়ী যখন আন্তর্জাতিক বাজারে প্রতি টন হলুদের দাম ছিল ৯৭ হাজার টাকা, বাংলাদেশে প্রতি টনের দাম ছিল ৭৪ হাজার টাকা। ফলে উত্তর-পূর্বের রাজ্যগুলোর হলুদ উৎপাদকরা অনেক কম দাম পেত কাঁচা হলুদ বাংলাদেশে রফতানি করে। রান্না খাবার তৈরি ছাড়াও হলুদের নানা রকম ব্যবহার হয় শিল্পদ্রব্য উৎপাদনের ক্ষেত্রে। হলুদের গুঁড়ো প্রস্তুত ছাড়াও, এটা দিয়ে তেল তৈরি করা হয়। আয়ুর্বেদিক ওষুধ তৈরির কাজেও হলুদের বহুল ব্যবহার হয়। বিভিন্ন রকম প্রসাধনী ক্রিম তৈরি করতেও হলুদের ব্যবহার হয়। ওষুধ প্রস্তুতকারী বাণিজ্যিক সংস্থাগুলো হলুদ ব্যবহার করে অ্যান্টিসেপটিক ক্রিম তৈরির জন্য। নানারকম বেকারি দ্রব্য এবং ফাস্টফুড তৈরিতেও হলুদের ব্যবহার হয়। নানারকম রং তৈরির কাজেও হলুদের প্রয়োজন হয়। তাই হলুদকেন্দ্রিক একাধিক প্রক্রিয়াকরণ শিল্প বরাক উপত্যকায় স্থাপন করা যেতে পারে। কাঁচা হলুদ রফতানির পরিবর্তে বিভিন্ন শিল্পের উপাদান হিসেবে প্রক্রিয়াকৃত হলুদ রফতানি করা গেলে কৃষকদেরও আয় বাড়বে, ব্যবসায়ীদেরও মুনাফা বাড়বে এবং কর্মসংস্থানের সুযোগও বাড়বে। হলুদের মতোই বরাক উপত্যকা সংলগ্ন পাহাড়ি অঞ্চলগুলোতে প্রচুর পরিমাণে উৎকৃষ্ট ধরনের আদা উৎপন্ন হয়। স্পাইস বোর্ডের ২০১৭-১৮ সালের পরিসংখ্যান অনুযায়ী ওই বছরে শুধুমাত্র মিজোরামেই ৬২,৭৪০ টন আদার ফলন হয়েছিল। বস্তুত, আদা উৎপাদনে ভারতে মিজোরামের স্থান পঞ্চম। এই আদার প্রায় ৪০ শতাংশ রফতানি হয় বাংলাদেশে। করিমগঞ্জের সুতারকান্দি এবং ফেরিঘাট হয়ে এই আদা বাংলাদেশে যায় কাঁচামাল হিসেবে। কিন্তু হলুদের মতোই, বাংলাদেশের বাজারে প্রতি টন আদার মূল্য আন্তর্জাতিক বাজারের তুলনায় অনেক কম। যখন জার্মানির বাজারে ভারতীয় আদা রফতানি করে সর্বোচ্চ প্রতি টন ৩ লক্ষ টাকা পাওয়া যায়, সে জায়গায় বাংলাদেশের সর্বনিম্ন দাম প্রতিটন মাত্র ২১ হাজার টাকা। অবশ্যই আদা চাষীদের ভাগ্যে জোটে আরও কম। কাঁচা আদা রফতানি না করে যদি একে প্রক্রিয়াকরণ করে আদা ব্যবহারকারী বিভিন্ন শিল্পের উপযোগী উপাদান হিসেবে রফতানি করা যায় তবে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের অর্থনৈতিক উন্নয়নের পথ সুগম হবে।

এ প্রসঙ্গে যে প্রশ্নটি উত্থাপিত হওয়া স্বাভাবিক, সেটা হলো যদি আন্তর্জাতিক বাজারে বিশেষত উন্নত দেশগুলোতে আদার মূল্য এতটাই বেশি, তবে কেন উত্তর-পূর্বের ব্যবসায়ীরা এই আদা অনেক কম দামে বাংলাদেশে রফতানি করছে? এর একটি অন্যতম মূল কারণ হলো, ভারতীয় আদা বিদেশে রফতানির বাণিজ্যটি কেরল ও তামিলনাড়ুতে কেন্দ্রীভূত। মিজোরামের আদা কেরলে পাঠাতে হলে যে পরিমাণ পরিবহন খরচ হবে তাতে কেরলের ব্যবসায়ীদের কাছে সেটা লাভজনক হবে না। সেজন্য দাম কম হওয়া সত্ত্বেও করিমগঞ্জ বাংলাদেশ সীমান্ত বাণিজ্যের পথ দিয়ে এই আদা বাংলাদেশে রফতানি করা হয়।

বাংলাদেশে কম দামে কাঁচামাল হিসেবে আদা রফতানির বিকল্প হলো আদার প্রক্রিয়াকরণ করা। কাঁচা আদা থেকে শুকনো আদা, আদার চকোলেট, লজেন্স, বিস্কুট ইত্যাদি বানানো। আদার গুঁড়ো বানানো যা কিনা সর্বত্রই রান্নার কাজে ব্যবহৃত হয়। আদার তেল এবং আদার পানীয় তৈরি করা। আদার সস, আদার আচার তৈরি করা। এছাড়াও ওষুধ তৈরিতে, খাদ্য প্রক্রিয়াকরণে, মাংস প্রক্রিয়াকরণে এবং তামাক প্রক্রিয়াকরণে আদার বহুল ব্যবহার রয়েছে। পার্শ্ববর্তী পাহাড়ি অঞ্চলের আদা ব্যবহার করে এমন অনেক আদাভিত্তিক প্রক্রিয়াকরণ শিল্প বরাক উপত্যকায় গড়ে উঠবার সম্ভাবনা রয়েছে। বরাক উপত্যকা এবং উপত্যকা সংলগ্ন পাহাড়ি অঞ্চল ও রাজ্যগুলোতে প্রচুর পরিমাণে আনারস উৎপন্ন হয়। বস্তুত, ভারতে উৎপাদিত মোট আনারসের প্রায় ৫০ শতাংশই উৎপন্ন হয় উত্তর-পূর্বের রাজ্যগুলোতে। কোনওরকম প্রক্রিয়াকরণ ব্যবস্থা না থাকায়, এই উৎপাদনের সবটাই বাজারে আসে সতেজ ফল হিসেবে। মরসুমের সময় চাহিদার তুলনায় জোগান বেশি হয়ে যাওয়াতে, আনারসের বাজারদর নীচের দিকে চলে যায়। যার ফলে চাষিরা ন্যায্যমূল্য পায় না। ফলে উৎপাদন বাড়াবার কোনও উৎসাহ ও চাষীদের মধ্যে দেখা যায় না। যদি ফল প্রক্রিয়াকরণের ব্যবস্থা থাকতো, তবে বর্তমান বাগানগুলোতে ভালো ব্যবস্থাপনার দ্বারা আরও অধিক ফলন করা যেত। পাশাপাশি নতুন নতুন আনারস বাগানের বিস্তার করে এর উৎপাদন অনেক গুণ বাড়ানো যায়। স্মরণ করা যেতে পারে যে, বিশ্বের ৬ শতাংশ আনারস ভারতে উৎপন্ন হয়। কিন্তু ভারত রফতানি করে এক শতাংশেরও কম। অন্যদিকে, থাইল্যান্ড উৎপন্ন করে বিশ্বের প্রায় ৯ শতাংশ আনারস, কিন্তু রফতানি করে প্রায় ১৩ শতাংশ আনারস জাত দ্রব্য। করিমগঞ্জের এক গবেষক, উজ্জ্বলকুমার পাল, যিনি কিনা বর্তমানে দুর্গাপুর জাতীয় কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অধ্যাপনা করছেন, তার গবেষণায় দেখিয়েছেন, যদি বরাক উপত্যকা ও তার আশেপাশের আনারস থাইল্যান্ডে বাজারজাত করা যায় তবে এখানকার ব্যবসায়ীরা ১০০ শতাংশের বেশি মুনাফা অর্জন করতে পারে। চাহিদা বৃদ্ধি পেলে আনারস উৎপাদকেরাও লাভবান হতে পারে।

সতেজ আনারস রফতানির পরিবর্তে এ থেকে নানারকম প্রক্রিয়াকৃত দ্রব্য, যেমন জ্যাম, জেলি, লজেন্স, পানীয় তৈরি করে সেগুলো বাজারজাত করতে পারলে বরাক উপত্যকার অর্থনৈতিক উন্নয়ন আরও বেশি গতি লাভ করতে পারে। নিদেনপক্ষে যদি আনারসের মন্ডও তৈরি করা যায়, যা কিনা বিভিন্ন ধরনের প্রক্রিয়াকৃত খাদ্যবস্তু। উৎপাদনের উপকরণ হিসেবে কাজ করে, সেটাও এই উপত্যকাকে অর্থনৈতিকভাবে একধাপ এগোতে সাহায্য করবে। বিশ্ববাজারে সতেজ আনারসের চাইতেও টিনজাত আনারসের চাহিদা অনেক বেশি। আনারস একটি মরসুমি ফলন, যা খুবই পচনশীল এবং এটাকে সতেজ অবস্থায় শীতল ঘরেও রাখা যায় না। তাই টিনজাত অবস্থায় এটাকে সব ঋতুতেই বাজারে জোগান দেওয়া যায়। তাই, আনারসকেন্দ্রিক খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্পের একটা ভালরকম সম্ভাবনা রয়েছে আমাদের বরাক উপত্যকায়।

এ পর্যন্ত আমরা বাঁশ, হলুদ, আদা ও আনারস—এই চারটি বস্তুকে ভিত্তি করে যে শিল্প সম্ভাবনা গড়ে উঠতে পারে সে কথা আলোচনা করেছি। এই আলোচনাকে আর বিস্তারিত না করে শুধু এটুকু বললেই যথেষ্ট হবে যে একইভাবে বরাক উপত্যকায় উৎপন্ন একাধিক ফসলেরও প্রক্রিয়াকরণ সম্ভব। স্থানীয় ধান উৎপাদকরা লাভবান হতে পারে যদি চালকেন্দ্রিক প্রক্রিয়াকরণ শিল্প এখানে গড়ে ওঠে।

কিন্তু প্রশ্ন হল, এই কৃষি ও উদ্যানজাত ফসলের প্রক্রিয়াকরণ শিল্প তৈরি করবে কে? কৃষকদের কাছে না আছে অর্থ, না আছে প্রযুক্তি, না আছে বাজার সংক্রান্ত যোগাযোগ। কৃষির বাইরে রয়েছে ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীরা। তারা শিল্প তৈরির সহায়ক হতে পারে কিন্তু শিল্পের উদ্যোক্তা হতে পারে না। বস্তুত, উদ্যোক্তা হলেন সেইসব মানুষ, যারা ঝুঁকি নিয়ে মূলধন সংগ্রহ করে এবং সেই মূলধনকে কাজে লাগিয়ে দ্রব্য উৎপাদন করে

বাজারজাত করে। বাজারে বিক্রি করে খরচের তুলনায় আয় বেশি হলে তারা মুনাফা অর্জন করে আর লোকসান হলে সে দায় বহন করে। সেজন্য প্রতিষ্ঠিত বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান, যেমন ডাবর, নেসলে, আইটিসি, হলদিরাম, পারলে, পেপসি, হিন্দুস্তান ইউনিলিভার—এদের সাহায্য নিতে হবে। যদি প্রতিষ্ঠিত বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানগুলো তাদের শাখা এই বরাক উপত্যকায় স্থাপন করে এবং এখানকার কাঁচামাল ব্যবহার করে প্রক্রিয়াকরণ শিল্প গড়ে তোলে তবেই, এই স্বপ্নকে সার্থক রূপ দেওয়া যেতে পারে।

এই বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানগুলো মূলত বাজারের কার্যকর্তা যাদের কাছে মূলধন আছে, প্রযুক্তি আছে এবং সর্বোপরি বাজারের নেটওয়ার্ক আছে। কিন্তু তারা বরাক উপত্যকায় আসবে কেন? তারা আসবে যদি এখানে উৎপাদন করে জাতীয় বা আন্তর্জাতিক বাজারে বিক্রি করে লাভবান হতে পারে। বর্তমান যোগাযোগ ব্যবস্থার নিরিখে যখন উৎপাদিত দ্রব্য এখান থেকে বাইরে নিয়ে যেতে অত্যধিক পরিবহন খরচ লাগে, এখানে শাখা স্থাপন করা তাদের জন্য লাভদায়ী হবে না।

এ সমস্যা সমাধানের দুটো রাস্তা আছে। এর যে কোনওটি বা দুটোই অবলম্বন করলে এ সমস্যা থেকে বেরিয়ে আসা সম্ভব। প্রথমত, যদি বরাক উপত্যকা থেকে কলকাতা পর্যন্ত পরিবহন ভর্তুকি দেওয়া যায়। দ্বিতীয়ত, যদি বরাক উপত্যকাকে বাংলাদেশ করিডর দিয়ে কলকাতার সঙ্গে যাতায়াতের ব্যবস্থা করা যায় অথবা বরাক-সুরমা দিয়ে জলপথে বাংলাদেশের মধ্য দিয়ে মূল ভারতীয় ভূখণ্ডের সঙ্গে যাতায়াত সুগম করা যায়। যা-ই হোক যোগাযোগ সংক্রান্ত আলোচনা প্রসঙ্গে পরে আমরা এই বিষয়ের ওপর আলোকপাত করব।

চা-শিল্প : সীমাবদ্ধতা ও সম্ভাবনা

শিল্প সংক্রান্ত আলোচনা শেষ করবো বরাক উপত্যকায় চা-শিল্পের ওপর আলোকপাত করে। বস্তুত, চা-শিল্পই এখানকার প্রাচীনতম শিল্প। এর শুরু হয়েছিল ঔপনিবেশিক পরিমণ্ডলে উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে। বর্তমানে বরাক উপত্যকায় ১০০টিরও বেশি চা-বাগান রয়েছে। ২০২০-২১ সালের পরিসংখ্যান অনুযায়ী এই উপত্যকায় চা-চাষের অধীনে রয়েছে মোট ৩৬৫৮৬ হেক্টর এলাকা, যা কিনা আসামের চা-চাষের মোট এলাকার প্রায় ১০.৫ শতাংশ। এই ১০.৫ শতাংশ এলাকায় ২০২০ সালে মাত্র আসামের সাড়ে ছয় শতাংশ চা উৎপাদন হয়েছে। অর্থাৎ, জমির তুলনায় উৎপাদন কম হয়েছে।

বরাক উপত্যকায় হেক্টর প্রতি চায়ের উৎপাদন কম হওয়ার অনেক কারণ রয়েছে। প্রাকৃতিক কারণগুলো যেমন অধিক উষ্ণ জলবায়ু, বাতাসে বেশি আর্দ্রতা, বর্ষাকালে অত্যধিক বৃষ্টিপাত এবং এর ফলে কৃত্রিম বন্যার পরিবেশ বাদ দিলেও কম উৎপাদনের একটি অন্যতম মূল কারণ হলো চা-গাছগুলোর অত্যধিক বয়স। বেশিরভাগ চা-বাগানের গাছগুলোর বয়স প্রায় ৫০ বছরের বেশি। গাছের বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে তার উৎপাদন ক্ষমতাও কমে যায়। ফলে ২০-২৫ বছর পরই বাগানগুলোর উৎপাদন কমতে শুরু করে। এর হাত থেকে বাঁচার জন্য প্রতিবছরই কিছু কিছু পুরনো গাছ সরিয়ে দিয়ে সেখানে নতুন গাছ লাগাতে হয়। চা রোপণ বিশেষজ্ঞদের মতে, বরাক উপত্যকার চা-বাগানগুলোতে উৎপাদন ধরে রাখতে প্রতিবছর প্রায় আড়াই লক্ষ চা গাছের পুনরায় রোপণ করা প্রয়োজন। কিছু বড় এবং পেশাদার বাগান যেমন রোজকান্দি, দেওয়ান, ধোয়ারবন্দ, কুম্ভীরগ্রাম ও লক্ষীপুর ছাড়া বেশিরভাগ ছোট বাগানে এই ফের রোপণের কাজটি অবহেলিত হয়ে আসছে। যার ফলে হেক্টরপিছু চাযের উৎপাদন বরাক উপত্যকায় কমতে শুরু করেছে। যেহেতু এখানে বেশিরভাগ বাগানই ছোট আকারের এবং যাদের বেশিরভাগই কাঁচা পাতা উৎপাদন করে বড় বাগানগুলোতে বিক্রি করে। কারণ, বড় বাগানগুলোর মত পাতা থেকে চা তৈরির ফ্যাক্টরি তাদের নেই। কাঁচা পাতা বিক্রি

করে ছোট বাগানগুলোর এমন কিছু মুনাফা হয় না, যাতে তারা চা-গাছগুলোর নিয়মিত যত্ন নিতে পারে ও প্রয়োজনে পুনর্রোপণ করতে পারে। ছোট বাগানগুলোতে ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত দক্ষতারও অভাব রয়েছে। ফলে এখানে শ্রমিকদের মজুরি অন্যান্য চা শিল্পাঞ্চলের তুলনায় কম হওয়া সত্ত্বেও বাগানগুলোর মুনাফার পরিমাণ ক্রমেই কমে আসছে। বিশ-ত্রিশ বছর আগে এখানকার চা-শিল্পের মুনাফার পরিমাণ যেখানে ৪০-৫০ শতাংশ ছিল, বর্তমানে এই গড় হ্রাস পেয়ে ২০-২৫ শতাংশে এসে দাঁড়িয়েছে।।

জোগানের সীমাবদ্ধতা ছাড়াও উৎপাদিত চায়ের বাজারজাত করার সীমাবদ্ধতাও এই শিল্পের অগ্রগতির পক্ষে প্রতিবন্ধকতা তৈরি করছে। প্রথমত, সিংহভাগ চা-ই এখানে তৈরি হয় সিটিসি শ্রেণির, যার কেজি প্রতি দাম অন্যান্য উচ্চশ্রেণির— যেমন অর্থোডক্স বা সবুজ চায়ের (green tea) তুলনায় অনেক কম। কেজি প্রতি চায়ের দাম বেশি হলে ক্রমবর্ধমান উৎপাদনের উপকরণের, যেমন সার, বিদ্যুৎ, ইত্যাদি—সঙ্গে পাল্লা দিয়ে এই শিল্প বিকশিত হতে পারে। এটা সম্ভব হবে যদি উচ্চশ্রেণির চা এখানকার বাগানগুলো তৈরি করতে পারে। আর এজন্য বৈচিত্র্য আনতে হলে ফ্যাক্টরিগুলোর আধুনিকীকরণ প্রযোজন— যা কিনা এই অঞ্চলে ভীষণভাবে অবহেলিত হচ্ছে। আর ফ্যাক্টরিগুলোর আধুনিকীকরণ সম্ভব নয় যদি না চা-শিল্পে বেশি বেশি করে বিনিয়োগ করা যায়। যেহেতু বেশিরভাগ বাগান পরিচালিত হয় ব্যক্তিমালিকানায় আর অধিকাংশ বাগানমালিকই বহির্বরাকের, সেজন্য মুনাফার বিনিয়োগ এখানে খুব একটা পরিলক্ষিত হয় না।

বর্তমানে বরাক উপত্যকায় মোট চা উৎপাদনের সিংহভাগই সরাসরি বাগানগুলো থেকে ক্রেতাদের কাছে বিক্রি করা হয়ে থাকে। বড় বাগানগুলোর বাজারের নেটওয়ার্ক রয়েছে। তাই তাদের ক্রেতার অভাব হয় না। কিন্তু ছোট বাগানগুলোর সে সুবিধা নেই। ফলে যদি বরাক উপত্যকায় একটি চা নিলাম কেন্দ্র গড়ে তোলা যায় তবে ছোট-বড় সকলেই বাজারের সুবিধা ভোগ করতে পারে। এখানে চা নিলাম কেন্দ্র না থাকায় এখানকার উৎপাদকদের গুয়াহাটি নিলাম কেন্দ্র বা শিলিগুড়ি নিলাম কেন্দ্র বা কলকাতা নিলাম কেন্দ্রের সাহায্য নিতে হয়। এতে পরিবহন খরচ, গোডাউন খরচ, ব্রোকারেজ ফি ইত্যাদি দিয়ে বাজারে বিক্রির ফলে মুনাফা অনেক কমে যায়। এই অতিরিক্ত খরচ কমে যাবে যদি এখানে একটি চা-নিলাম কেন্দ্র গড়ে তোলা যায়। সরাসরি ক্রেতার কাছে বিক্রি করার সুযোগ থাকলে ছোট বাগানগুলো উৎসাহিত হবে এবং কাঁচা চা-পাতা বিক্রির পরিবর্তে তারাও ফ্যাক্টরি বানিয়ে চা প্রক্রিয়াকরণ করে সেটা বিক্রি করতে পারবে। এতে চা-শিল্পে বিনিয়োগ ও বাড়বে, সঙ্গে আনুষঙ্গিক ব্যবসারও বিকাশ হবে।

পরিষেবা ক্ষেত্র : সীমাবদ্ধতা ও সম্ভাবনা

কৃষি ও শিল্পের পর এবার আমরা বরাক উপত্যকার পরিষেবা ক্ষেত্রের সম্ভাবনার দিকটি নিয়ে আলোকপাত করবো। শিক্ষা ও স্বাস্থ্য—এই দুই পরিষেবা প্রদানকারী ক্ষেত্রের যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে এই অঞ্চলের অর্থনৈতিক উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করার। এই উপত্যকায় উচ্চশিক্ষা ও গবেষণার পরিকাঠামোটি গড়ে উঠেছে মূলত বিশ্ববিদ্যালয়, জাতীয় কারিগরি প্রতিষ্ঠান, শিলচর মেডিক্যাল কলেজ, একাধিক শিক্ষক প্রশিক্ষণ কলেজ—এসবকে কেন্দ্র করে। কম করেও আনুমানিক আট-দশ হাজার বহির্বরাকের ছাত্রছাত্রী এখানে বিভিন্ন বিষয়ে পড়াশুনো ও গবেষণাকর্মে নিয়োজিত। এইসব পড়ুয়া ও গবেষকরা এখানে বসবাস করার জন্য স্থান ও ভোগ্যপণ্যের একটা চাহিদা তৈরি হয়েছে। শিলচর শহরে এবং আইরংমারাতে ভালো সংখ্যক ব্যক্তি বাড়ি ভাড়া দিয়ে একটা নিয়মিত আয় করেন। স্থানীয় কৃষি, মাছ, তরিতরকারি ও ফলমূলের চাহিদা ও ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের আয় বৃদ্ধির সহায়ক হয়েছে। এছাড়াও স্থানীয় বাণিজ্যিক যান চালকদেরও আয়ের

পথ সুগম হয়েছে। এককথায়, ট্রান্সফার পেমেন্টের পথ বেয়ে এখানকার স্থানীয় অর্থব্যবস্থার অর্থের প্রবেশ ঘটছে।

এ তো গেল প্রত্যক্ষ প্রভাবের কথা। এছাড়াও পরোক্ষ লাভও হচ্ছে নানাভাবে। যেমন, যারা এই উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে পড়ছে, তাদের অনেকেই এখানকার ছাত্রছাত্রীদের কোচিং করাচ্ছে বিভিন্ন প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার জন্য। অনেকেই শিলচরের কোচিং সেন্টারগুলোতে এখানকার ছাত্রছাত্রীদের প্রশিক্ষণ দিচ্ছে। অনেক স্থানীয় অভিভাবকরা তাদের পরামর্শ পাচ্ছেন নিজেদের ছেলেমেয়েদের ক্যারিয়ার প্ল্যানিংয়ের জন্য।

বাণিজ্যিক দৃষ্টিভঙ্গির নিরিখে শিক্ষার চাইতেও বেশি সম্ভাবনা নিয়ে গড়ে উঠছে বরাক উপত্যকার স্বাস্থ্য পরিষেবা ক্ষেত্রটি। ২০২১ সালের পরিসংখ্যান অনুযায়ী এই অঞ্চলে শিলচর মেডিক্যাল কলেজ, তিনটি সিভিল হাসপাতাল, একটি ক্যান্সার হাসপাতাল ছাড়াও রয়েছে ৩৫টি প্রাইভেট নার্সিং হোম, ৭৪টি ডায়াগনোস্টিক সেন্টার। এমনকী অ্যাপোলো হাসপাতালের দু'টি ক্লিনিকও এখানে গড়ে উঠেছে। বরাক উপত্যকার পার্শ্ববর্তী রাজ্যগুলো থেকে বহুসংখ্যক রোগী এখানে আসছেন চিকিৎসাসেবা পাওয়ার জন্য। এতে একটা ভালো সংখ্যক বেকার ছেলেমেয়ে এই প্রতিষ্ঠানগুলোতে নিয়োজিত হয়েছে। এছাড়াও চিকিৎসা পরিষেবা বাণিজ্যের অনুষঙ্গ হিসেবে হোটেল ব্যবসার সুযোগ বেড়েছে। অ্যাম্বুলেন্স ব্যবসাও প্রসারিত হয়েছে। ফলে শুধুমাত্র যে স্থানীয় মানুষজন চিকিৎসার সুযোগ পাচ্ছেন তা-ই নয়, চিকিৎসা পরিষেবার জন্য যারা বাইরে থেকে আসছেন তারাও স্থানীয় অর্থব্যবস্থাকে সমৃদ্ধ করতে সাহায্য করছেন।

এ পর্যন্ত আমরা শিক্ষা ও স্বাস্থ্য পরিষেবা থেকে প্রত্যক্ষ এবং স্বল্প মেয়াদি লাভের দিকটাই আলোচনা করেছি। এই দুটোর ক্ষেত্রেই একটা দীর্ঘমেয়াদি লাভের দিক রয়েছে। যে গবেষণা সংক্রান্ত কাজগুলো বিশ্ববিদ্যালয়, এনআইটি বা মেডিক্যাল কলেজে হচ্ছে সেগুলোকে যদি স্থানীয় সমস্যা সমাধানের নিরিখে পরিচালিত করা যায়, তবেই বরাক উপত্যকার দীর্ঘমেয়াদি লাভ হবে। বর্তমানে এরকম কোনও পরিকল্পিত উদ্যোগ পরিলক্ষিত হচ্ছে না। যদিও ব্যক্তিগত স্তরে কেউ কেউ স্থানীয় সমস্যা নিয়েও কাজ করছেন। যদি বিভিন্ন উন্নয়নকারী সরকারি, আধা-সরকারি এবং বেসরকারি সংস্থাগুলোর সঙ্গে স্থানীয় প্রশাসন এবং উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর কর্ণধারেরা একযোগে স্থানীয় সমস্যা সমাধানের জন্য অর্জিত জ্ঞানের প্রয়োগ করবার জন্য নিয়োজিত এমন একটি প্রক্রিয়া বা সংগঠনের জন্ম দিতে পারেন, তাহলেই জ্ঞানের বিশেষীকৃত প্রয়োগ স্থানীয় স্তরে সম্ভব হয়ে উঠবে। আর এটা না করা গেলে জ্ঞানচর্চার সঙ্গে স্থানীয় সমস্যার মেলবন্ধন করা যাবে না এবং দীর্ঘমেয়াদি লাভ থেকে বরাক উপত্যকা বঞ্চিতই থেকে যাবে। একটা ছোট্ট উদাহরণ দিলেই বিষয়টি পরিষ্কার হবে। বরাক উপত্যকায় ভূগর্ভস্থ জলের অত্যধিক আয়রন থাকায় ডিপ টিউবয়েল দিয়ে এই জল তুলে গার্হস্থ্য কাজে ব্যবহার করা যায় না। আয়রনমুক্ত পানীয়জল পাওয়ার প্রযুক্তি খুব বেশি জটিল নয়। যদি এনআইটি ও মেডিক্যাল কলেজ একযোগে এ সমস্যা সমাধানের উদ্যোগ নেয় এবং স্বল্প খরচে কীভাবে এটা করা যায় তার একটি মডেল তৈরি করে, তবে বরাক উপত্যকায় একটি দীর্ঘমেয়াদি লাভ হবে। তাই আন্তঃপ্রাতিষ্ঠানিক সহযোগিতার মাধ্যমে এভাবে যদি সমস্যাভিত্তিক গবেষণা করা যায় তবে এর ফলস্বরূপ যে বিশেষ জ্ঞান ও প্রযুক্তির জন্ম হবে, সেটা বরাক উপত্যকায় দীর্ঘমেয়াদি অর্থনৈতিক উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করবে।

যোগাযোগ ব্যবস্থা : সীমাবদ্ধতা ও সম্ভাবনা

আমরা বরাক উপত্যকায় কৃষি, শিল্প ও পরিষেবার ক্ষেত্রে সম্ভাবনার দিকগুলো নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছি। কী সম্পদ আমাদের আছে এবং তার নিরিখে কী ধরনের শিল্পায়ন এখানে হতে পারে, সেটাও পর্যালোচনা করেছি। কিন্তু শিল্পায়ন শুধুমাত্র সহজলভ্য প্রাকৃতিক সম্পদের ওপর নির্ভর করে না। উৎপাদিত সামগ্রী বিক্রি করার বাজারের আয়তন এবং স্বল্প খরচে সেগুলো বাজারে পৌঁছে দেওয়ার সুবিধাও একটা বড় ভূমিকা পালন করে। স্থলবেষ্টিত বরাক উপত্যকায় যোগাযোগের অসুবিধা এবং অত্যধিক বেশি পরিবহন খরচের জন্য এখানকার উৎপাদিত দ্রব্যসামগ্রীর বাজারদর অনেক বেশি হওয়াতে এগুলো প্রতিযোগিতামূলক বাজারে বিক্রি করা যায় না। ফলে বাণিজ্যিক উৎপাদন এখানে লাভজনক নয় আর এর ফলে বাণিজ্যিক বিনিয়োগও এখানে আকৃষ্ট হয় না।

প্রশ্ন হলো, কীভাবে পরিবহন খরচ কমানো যায়? বর্তমানে ভারতীয় বাজারে পৌঁছনোর জন্য বরাক উপত্যকা থেকে গুয়াহাটি এবং শিলিগুড়ি হয়ে পণ্যবাহী ট্রাকগুলোকে কলকাতায় যেতে হয়। শিলচর থেকে এই পথে কলকাতা পৌঁছতে মোট ১৪০৭ কিলোমিটার পথ অতিক্রম করতে হয়। এক টন দ্রব্য শিলচর থেকে কলকাতায় বহন করতে খরচ পড়ে ৫০৬৫ টাকা। এই হিসেব করা হয়েছে ২০২১ সালের পরিসংখ্যান অনুযায়ী, যেখানে ভারতে গড় স্থলপথে পরিবহনের খরচ প্রতি টন প্রতি কিলোমিটার ৩.৬ টাকা ধরা হয়েছে। যদি সমপরিমাণ অর্থাৎ এক টন দ্রব্য শিলচর থেকে সুতারকান্দি এবং ঢাকা হয়ে কলকাতা পৌঁছানো যায় তবে ট্রাকগুলোকে মাত্র ৬০০ কিলোমিটার দূরত্ব অতিক্রম করতে হবে। ঢাকা হয়ে যেতে প্রতি টন প্রতি কিলোমিটার ৩.৬ টাকা হিসেবে এক টন দ্রব্য পরিবহনের খরচ পড়বে মাত্র ২১৬০ টাকা। ফলে বাংলাদেশ করিডর ব্যবহার করলে প্রতি টন পরিবহন খরচ প্রায় সুনির্দিষ্টভাবে বলতে গেলে ২৯০৫ টাকা কমে যাবে। শুধু কি তা-ই? পরিবহনের সময়ও বাঁচবে অনেক। শিলচর থেকে গুয়াহাটি ও শিলিগুড়ি হয়ে কলকাতা যেতে একটি পণ্যবাহী গাড়ির গড়ে সময় লাগে ১৭০ ঘণ্টা। যদি ধরেও নেওয়া যায় যে গাড়িটিতে দুইজন চালক রয়েছেন এবং প্রত্যেক চালক পালা করে ১২ ঘণ্টা ধরে চালান এবং কোনওরকম বিরতি ছাড়াই গাড়িটি চলছে তথাপি কলকাতা পৌঁছতে সাত দিন সময় লাগবে। আর যদি পণ্যবাহী যানটি সুতারকান্দি ও ঢাকা হয়ে কলকাতায় যায় তবে সময় লাগবে মাত্র ৩৫ ঘণ্টা অর্থাৎ দেড়দিনের মাথায় পৌঁছবে।

কৃষি ও উদ্যানজাত পচনশীল কাঁচামাল দ্রুত বাজারে না পৌঁছতে পারলে তার গুণাগুণ খারাপ হয়ে যায়। সেজন্য পরিবহনের সময়টাও বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। তাই যদি বাংলাদেশ করিডর ব্যবহার করে স্থলপথে বরাক উপত্যকায় উৎপাদিত দ্রব্য ভারতের বাজারে পৌঁছাবার ব্যবস্থা করা যায় তবে এখানকার পণ্যের প্রতিযোগিতামূলক অবস্থান অনেকটাই সুদৃঢ় হবে।

এ তো গেল স্থলপথে পণ্য পরিবহনের কথা। জাতীয় বাজারে বরাক উপত্যকার উৎপন্ন দ্রব্যের প্রতিযোগিতামূলক অবস্থান আরও বেশি সুদৃঢ় হবে যদি শিলচর-মহিশাসন-ঢাকা-কলকাতা রেলপথকে পুনর্নবীকরণ করা যায়। এই রেলপথটি এখনও বিদ্যমান। ১৯৬৫ সালের আগে এই পথে পণ্য ও যাত্রী পরিবহন করা হতো। কিন্তু তারপর থেকে রাজনৈতিক ও বিদেশনৈতিক কারণে এটি বন্ধ হয়ে যায়। মহিশাসন থেকে ঢাকা হয়ে কলকাতার দূরত্ব প্রায় ৬৮২ কিলোমিটার। আর প্রতি টন প্রতি কিলোমিটার রেলে পরিবহনের খরচ গড়ে ১.৬১ টাকার হিসেবে এক টন দ্রব্য শিলচর থেকে কলকাতায় নিয়ে যেতে খরচ হবে ১০৯৭ টাকা। যা কিনা বাংলাদেশ করিডর দিয়ে রোড পরিবহন খরচের অর্ধেক। এছাড়া শিলচর থেকে গুয়াহাটি ও জলপাইগুড়ি হয়ে রেলপথে কলকাতায় পণ্য পরিবহন খরচের অর্ধেক। সুতরাং, রেলপথে

বাংলাদেশ করিডরের মধ্য দিয়ে শিলচর-কলকাতা যোগাযোগ ব্যবস্থাকে পুনর্নবীকরণ করলে বরাক উপত্যকায় অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রতিবন্ধকতা অনেকাংশেই দূরীভূত হবে।

বাংলাদেশের মধ্য দিয়ে সড়ক ও রেল পরিবহনের মাধ্যমে বরাক উপত্যকার সঙ্গে ভারতীয় মূল ভূখণ্ডের যোগাযোগ ঘটিয়ে কীভাবে পরিবহন খরচ কমানো যায়— এই আলোচনা আমরা করেছি। সড়ক ও রেল ছাড়াও আরও কম খরচে ভারতীয় বাজারে এখানকার পণ্যদ্রব্য পৌঁছে দেওয়া যায় যদি আমরা বাংলাদেশের জলপথ ব্যবহার করতে পারি। বস্তুত, ঔপনিবেশিক শাসনের সময় এই জলপথ ব্যবহার করেই কলকাতা থেকে বরাক উপত্যকায় পণ্য-সামগ্রীর আদান-প্রদান হতো।

বরাক নদী করিমগঞ্জের টুকেরগ্রামের কাছে দু'টি শাখায় বিভক্ত হয়— কুশিয়ারা এবং সুরমা। এই দু'টি নদী বাংলাদেশের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়ে মেঘনা নদীতে মিলিত হয়। বাংলাদেশের চাঁদপুরের কাছে মেঘনা ও পদ্মার মিলন হয়। তাই সুরমা বা কুশিয়ারা-মেঘনা-পদ্মা-গঙ্গা বেয়ে যেমন জলযানগুলো উত্তর ভারতের শহরগুলো যেতে পারে, তেমনই সুরমা বা কুশিয়ারা-মেঘনা-বঙ্গোপসাগর-হুগলি নদী হয়ে কলকাতায় পৌঁছতে পারে। প্রাচীন ও মধ্যযুগের যখন সড়ক ও রেল যোগাযোগ গড়ে ওঠেনি, এই নদীপথই ছিল যাত্রী ও পণ্য বহনের প্রধান উপায়।

এই জলপথে কলকাতার সঙ্গে বরাক উপত্যকার যোগাযোগ স্বাধীনতার পরেও কার্যকরী ছিল। ১৯৫০-র দশকের শেষদিকে ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে চুক্তি সম্পন্ন হয় এই পথকে ব্যবহার করার জন্য। কিন্তু ১৯৬৫ সালের ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধের পর এই পথ বন্ধ হয়ে যায়। যদিও বাংলাদেশ গঠনের পর ১৯৭২ সালে পুনরায় ভারত-বাংলাদেশ চুক্তি হয় এই জলপথ ব্যবহারের জন্য। কিন্তু ততদিনে রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে নদীগুলোর বহু অংশে নাব্যতা ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং এর ফলে এই নদীপথের পুনর্ব্যবহার আর হয়ে ওঠেনি। কিন্তু নদীগুলোর যেখানে যেমন প্রয়োজন সংস্কার সাধন করে এই জলপথকে পুনরায় সচল করা কোনওভাবেই অসম্ভব কাজ নয়।

জলপথে করিমগঞ্জ থেকে কলকাতার দূরত্ব প্রায় ১৩১৮ কিলোমিটার। আর প্রতি টন প্রতি কিলোমিটার জলপথে পরিবহন খরচ মাত্র ২৫ পয়সা। সুতরাং, এক টন দ্রব্যসামগ্রী জলপথে বরাক উপত্যকা থেকে কলকাতায় পাঠাতে খরচ হবে ৩৩০ টাকা (নির্দিষ্টভাবে বলতে গেলে ৩২৯ টাকা ৫০ পয়সা) যা কিনা সড়কপথের ছয় ভাগের এক ভাগের সমান। আর রেলপথে পণ্য পরিবহনে প্রায় তিন ভাগের এক ভাগ। অনুরূপভাবে জলপথে বরাক উপত্যকা থেকে বারাণসীর দূরত্ব ২৭০১ কিলোমিটার। এক টন দ্রব্যসামগ্রী এখান থেকে উত্তর ভারতের বাজারে পাঠাতে জল পরিবহন খরচ পড়বে মাত্র ৬৭৫ টাকা (নির্দিষ্টভাবে ৬৭৫ টাকা ২৫ পয়সা)। ফলে জলপথ যদি পুনরায় চালু করা যায় তবে একদিকে যেমন বরাক উপত্যকায় তৈরি পণ্যের প্রতিযোগিতামূলক অবস্থান যথেষ্ট সুদৃঢ় হবে, তেমনই বহির্বরাক থেকে দ্রব্যসামগ্রী এখানকার বাজারে আনার পরিবহন খরচও বহুলাংশে কমে যাবে। এতে স্থানীয় বাজারে জিনিসপত্রের দামও কম হবে। ফলে সাধারণ মানুষও স্বল্প খরচে দিনাতিপাত করতে পারবে।

যোগাযোগ সংক্রান্ত আলোচনায় আমরা এটাই দেখাতে চেয়েছি যে, বরাক উপত্যকার অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য এখানকার উৎপাদিত দ্রব্য সামগ্রীকে বৃহত্তর ভারতীয় বাজারে স্বল্পমূল্যে জোগান দিতে হবে। আর এটা সম্ভব হবে যদি পরিবহন খরচ কমানো যায়। পরিবহন খরচ কমানোর একটি উপায় আছে যদি বাংলাদেশ করিডর ব্যবহার করে (সড়ক, রেল, ও জলপথ) আমরা ভারতীয় জাতীয় বাজারে আমাদের পণ্যসামগ্রী জোগান দিতে পারি এবং আমাদের প্রয়োজনীয় সামগ্রী আনতে পারি। যদি বাংলাদেশের মধ্য দিয়ে

আনা-নেওয়ার এই ব্যবস্থা করা যায় তো ভালো, নতুবা বরাক উপত্যকার অর্থব্যবস্থা ও বাংলাদেশের অর্থব্যবস্থার মধ্যে সমন্বয়ের মাধ্যমেও খানিকটা অগ্রসর হওয়া যায়। যদি বাংলাদেশের বাজার বরাক উপত্যকার ব্যবসায়ীদের জন্য উন্মুক্ত রাখা যায়, তবে কম পরিবহন খরচে আমরা সেখানকার বাজারে আমাদের উৎপাদিত সামগ্রী বিক্রি করতে পারবো এবং কম খরচে আমাদের প্রয়োজনীয় সামগ্রী সংগ্রহ করতে পারবো।

মানবসম্পদ : পরিচিতির সংকট ও উত্তরণ

এ পর্যন্ত আমরা বরাক উপত্যকার বস্তুসম্পদকে কেন্দ্র করে কী ধরনের শিল্পায়ন করা যায়, কীভাবে কৃষির এবং বাগিচা শিল্পের সমস্যাগুলো মোকাবিলা করা যায়— এই সম্পর্কে আলোচনা করেছি। কীভাবে প্রাতিষ্ঠানিক পরিকাঠামোকে উন্নয়নের কাজে লাগানো যায় সে কথাও বলেছি। কিন্তু এই কাজগুলো করবে কে? মানুষই হলো উন্নয়নের পদাতিক সেনা যারা অর্থনৈতিক প্রতিনিধির (economic agent) কাজ করে। তাই মানুষের সঙ্গে তার বাসস্থানের সম্পর্ক নিবিড় না হলে তার মধ্যে ভূমিপুত্রের অধিকারবোধের শেকড় গভীরতর না হলে তার ব্যক্তিগত, সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অধিকারবোধ সুরক্ষিত না হলে সে তার বাসভূমির উন্নয়নের কাজে সর্বস্ব পণ করতে আগ্রহী হয় না। নিঃসন্দেহে মানুষ মুনাফা লাভের আশাতেই অর্থনৈতিক কার্যকলাপে জড়িত হয়। কিন্তু মুনাফা লাভের জন্য সম্পদ সৃষ্টির প্রযোজন। আর এই সম্পদ-সে জমিই হোক, ব্যবসা হোক বা শিল্পই হোক—ভোগদখলের নিরঙ্কুশ অধিকার যদি সন্দেহের ঘেরাটোপে আচ্ছাদিত থাকে তবে স্বভাবতই এই সম্পদ সৃষ্টির জন্য যথাযথ বিনিয়োগের উৎসাহে দেখা দেয় ভাটার টান। দীর্ঘদিন ধরে চলে আসা 'পরিচয় এর রাজনীতি'র (politics of Identity) ফলে আসামসহ বরাক উপত্যকায়ও ব্যক্তিগত উদ্যোগ ও বিনিয়োগ বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। বস্তুত, বিংশ শতাব্দীর ষাটের দশক থেকে আসামকে অসমিয়া জাতির রাজ্যে (Assam for Assamese) পরিণত করবার এক লাগাতার প্রয়াস চলছে এবং এর বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে অন-অসমিয়া জাতিগোষ্ঠীগুলোকে কখনও বহিরাগত কখনও বিদেশি আখ্যা দিয়ে বিতাড়ন করবার চেষ্টার মাধ্যমে। বর্তমানে এনআরসি (NRC) রূপায়ণে এই প্রচেষ্টারই আর এক ভিন্ন রূপ। এর ফলে সমগ্র আসামেই অন-অসমিয়া জনগোষ্ঠীগুলো এক গভীর পরিচিতির সংকটে ভুগছে। এই সংকট থেকে পরিত্রাণ পেতে—যাদেরই সামর্থ রয়েছে তারা অন্য রাজ্যে বিনিয়োগ করে বিকল্প বাসস্থান এবং বিকল্প আয়ের ব্যবস্থা করছে। বস্তুত, আসাম সরকার এখানে যুগ যুগ ধরে বসবাসকারী অন-অসমিয়া জনগোষ্ঠীগুলোকে ন্যূনতম নিরাপত্তা প্রদানে শুধুমাত্র ব্যর্থ হয়েছে তা-ই নয়, বরং রাষ্ট্রীয় পরিকাঠামোকে উগ্র অসমিয়া প্রাদেশিকতার স্বার্থে ব্যবহৃত হতে দিচ্ছে। ফলে পরিচিতির সংকট (identity crisis) অর্থনৈতিক উন্নয়নের পরিপন্থী ভূমিকা পালন করছে। জাতিগত বৈচিত্র্যের (ethnic diversity) অর্থনৈতিক সুফলের (economic | dividend) পরিবর্তে, জাতিদাঙ্গার কুফলে ভুগছে আসামসহ বরাক উপত্যকার অর্থব্যবস্থা। ভাষাভিত্তিক পরিচিতির ঊর্ধ্বে উঠে নাগরিকভিত্তিক পরিচিতির (citizenship based identity) বলয়ে এই সমস্যার সমাধান করতে না পারলে উগ্র অসমিয়া জাতীয়তাবাদের যূপকাষ্ঠে বরাক উপত্যকার অর্থনৈতিক উন্নয়নও বলি প্রদত্ত হবে একথা নিঃসংকোচেই বলা চলে। এই পরিচিতির সংকট থেকে পরিত্রাণের একটি সহজ উপায় হল জাতি-ধর্ম-ভাষা নির্বিশেষে বর্তমানে আসামে বসবাসকারী সব মানুষকেই আসামের নাগরিক হিসেবে মেনে নেওয়া এবং সেই অনুযায়ী পরিচয়পত্র প্রদান করা। এটা করা হলে ভবিষ্যতে বেআইনি অনুপ্রবেশকারীদের সনাক্ত করা সম্ভব হবে এবং তাদের বহিষ্কার করার কাজটাও সহজ হবে। আর

এটা না করে যদি অতীতের নথির ভিত্তিতে বেআইনি অনুপ্রবেশকারীদের সনাক্তকরণ করার চেষ্টা হয়, যা কিনা এনআরসির মাধ্যমে করবার চেষ্টা হচ্ছে, তবে যে আইনি জটিলতার সৃষ্টি হবে। তাতে একদিকে যেমন পুরো প্রক্রিয়াটাই পণ্ডশ্রমে পর্যবসিত হবে, অন্যদিকে ভবিষ্যৎ অনুপ্রবেশের দরজাটাও বন্ধ করা সহজ হবে না। এভাবেই পরিচিতির অচলায়তনও চলতেই থাকবে। আর এই অচলাবস্থা নির্বাচনী রাজনীতির সওদাগরদের জন্য সহায়ক হলেও অর্থনৈতিক উন্নয়নের পরিপূরক হবে না।

উপসংহার

বরাক উপত্যকার অর্থনৈতিক উন্নয়নের যে রূপরেখাটি এই আলোচনায় আমরা তুলে ধরেছি, সেটা শুধুমাত্র সাংকেতিক। এটা বিস্তারিত অবয়বটি পরিস্ফুটনের কাজে শুধুমাত্র সাহায্যকারীর ভূমিকাই পালন করবে। কিন্তু বিষয় হল, বরাক উপত্যকার সার্বিক অর্থনৈতিক উন্নয়নের বিস্তারিত নকশাটি প্রস্তুত করবে কে? কে এই উন্নয়নের নীল নকশাকে (blueprint) বাস্তবায়িত করবে? নিঃসন্দেহে এ কাজ সামাজিক ও রাজনৈতিক কর্মকর্তাদের। দলমত নির্বিশেষে, ধর্মীয় ভেদাভেদের ঊর্ধ্বে উঠে বরাক উপত্যকার অর্থনৈতিক উন্নয়নের একটি সর্বজনগ্রাহ্য দলিল তৈরি করা এবং তাকে রূপায়ণ করার সংগ্রামে লিপ্ত হওয়ার মধ্যেই নিহিত রয়েছে এখানকার ভবিষ্যৎ। ব্যক্তির রাজনৈতিক উচ্চাকাঙ্ক্ষা যদি সমষ্টির উন্নয়নের পরিপন্থী হয়, যা এতদিন নির্বাচনী রাজনীতির খেলোয়াড়রা করে এসেছে, তবে বরাকের অর্থব্যবস্থা যে তিমিরে রয়েছে সেখানেই থাকবে। তাই প্রয়োজন বিকল্প ভাবনার বিকল্প রাজনীতির—যার মূল গ্রথিত থাকবে বরাকের মাটিতে যে কণ্ঠ হয়ে উঠবে বরাক কণ্ঠ। বরাক উপত্যকার আঞ্চলিক উন্নয়নের ঘোষণাপত্র (manifesto) হয়ে উঠুক সর্বজনের মিলনক্ষেত্র। সব ধারা মিলিত হোক এই মিলন ক্ষেত্রে। ভূ-আর্থিক তত্ত্বই হোক ভূ-রাজনীতির দিশারি। প্রত্যেক বরাকবাসী হয়ে উঠুক বরাক উন্নয়নের কাণ্ডারি। বরাক-উন্নয়ন মন্ত্রই হোক একবিংশ শতাব্দীর সংগ্রামের হাতিয়ার। রাজ্য ও রাষ্ট্র পরিচালনার নীতিনির্ধারণের সব দিগন্তকেই বিচার করা হোক এই মন্ত্রের কষ্টিপাথরে। উন্নয়ন আপনা-আপনি ঘটে না। উন্নয়ন ঘটাতে হয়। আর তা ঘটায় মানুষই। বরাক উপত্যকার উন্নয়নও ঘটাতে হবে বরাকবাসীকেই।

বরাক উপত্যকা ও ‘পূর্বে তাকাও’ নীতি

বীরেশ্বর মুখোপাধ্যায়

উত্তর-পূর্ব কি পৃথিবীর শেষ সীমায় অবস্থিত? এখনও বিশাল ভারতের অনেক লোকের মনে উত্তর-পূর্ব সম্বন্ধে সম্যক ধারণা নেই। হয়তো বা তাদের মধ্যে অনেকেরই ধারণা যে, ঘন জঙ্গলে ভরা এবং দুর্ভেদ্য পর্বতশৈলীর দ্বারা তিনদিকে বেষ্টিত অঞ্চল উত্তর-পূর্বের পর পূর্ব দিকে আর কোনও কিছুর অস্তিত্ব নেই, বোধ হয় পৃথিবীর এখানেই শেষ। অনেকেই হয়তো ভাবে না, উত্তর-পূর্বের দুর্ভেদ্য পাহাড় ডিঙ্গিয়ে ওপারে কী আছে তা জানতে চাওয়া প্রায় একরকম অসম্ভব কাজ। এই সেদিন পর্যন্ত ভারতের মূল ভূখণ্ডের জনসাধারণ উত্তর-পূর্বের ওপারে কোনওরকম সম্ভাবনার কথা যে থাকতে পারে, সে সম্পর্কে একরকম উদাসীন ছিলেনই বলা চলে। ৯০-র দশকে ভারত সরকারের লুক ইস্ট পলিসি এবং এশিয়ান ‘Car Rally’ ভারতের মূল ভূখণ্ডের বাণিজ্য শিল্প এবং অর্থনীতির তথাকথিত কর্ণধারদের ক্ষেত্র হয়ে উঠতে পারে একথা তাদের কাছে এতদিন পর্যন্ত শুধুই যেন এক অলীক কল্পনামাত্র হয়ে ছিল। উত্তর-পূর্বের দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলোর সঙ্গে ভারতের বাণিজ্যিক সম্পর্ক এবং অর্থনৈতিক সম্ভাবনার এক উন্মুক্ত দ্বার (Launching Pad) হয়ে ওঠার সম্ভাবনা খুবই উজ্জ্বল। তাছাড়া দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া এবং সুদূর প্রাচ্যের দেশগুলোর সঙ্গে ট্যুরিজমের সম্ভাবনা প্রসারের ক্ষেত্রে উত্তর-পূর্ব যে এক উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করতে পারে, সে সম্পর্কে কোনও দ্বিমত নেই। উত্তর-পূর্বের দক্ষিণ আসাম তথা বরাক উপত্যকা এবং সংলগ্ন অঞ্চলের (যেমন আসামের ডিমা হাসাও জেলা, মণিপুর এবং মিজোরাম রাজ্য) কেন্দ্রবিন্দু যে শিলচর তাতে কোনও দ্বিমত নেই। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, শিলচর কি কোনওদিন আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে উঠতে পারবে? হয়তো নৈরাশ্যবাদীরা বলবেন যে, তা কী করে সম্ভব? কিন্তু একথা মনে রাখতে হবে, শিলচরের বিশেষ ভৌগোলিক অবস্থান এবং দক্ষিণ পূর্ব এশিয়াতে বর্তমানে ক্রমবর্ধমান পরিবর্তনশীল রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে ভবিষ্যতে শিলচরের এক উল্লেখযোগ্য আন্তর্জাতিক বাণিজ্য কেন্দ্র হিসেবে আত্মপ্রকাশ করার যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে। অবশ্যই এজন্যে সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন কেন্দ্র এবং রাজ্য সরকারের বিশেষ সদিচ্ছা, উদ্যোগ, সহযোগিতা এবং তার পরেও যেটা সবচাইতে প্রয়োজন সেটা হচ্ছে জনসাধারণের সচেতনতা।

বরাক উপত্যকা বঙ্গ সাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্মেলনের ২৯তম দ্বি-বার্ষিক সম্মেলনে অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে বরাক উপত্যকা যাতে স্বয়ংশাসিত এক অর্থনৈতিক অটোনমাস অঞ্চল হিসেবে পরিচিতি অর্জন করতে পারে, সে সম্পর্কেও আলোচনা করা হয়েছিল। ২০১৪ সালে ভারত সরকার লুক ইস্ট পলিসিকে উন্নত পর্যায়ে নিয়ে যাবার উদ্দেশ্যে অ্যাক্ট ইস্ট পলিসির প্রচলন করেছেন। বরাক উপত্যকা অঞ্চলকে দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার কয়েকটি দেশের প্রবেশদ্বার হিসেবে গণ্য করা যায়। কিন্তু সরকার এখন পর্যন্ত এই নীতির অধীনে এই অঞ্চলের ভৌগোলিক অবস্থান এবং সংযোগ ব্যবস্থার সম্ভাবনার কীভাবে যথার্থভাবে উপযোগ

করা যায়, সে সম্পর্কে এখন পর্যন্ত কিছুই স্পষ্ট করে জানায়নি। বরাক উপত্যকার সঙ্গে আন্তর্জাতিক যোগাযোগ ব্যবস্থার সম্ভাবনার কথা সম্পর্কে দু'-একটা কথা বলছি।

প্রথমেই শিলচরের সঙ্গে অবশিষ্ট ভারতের বর্তমান যোগাযোগ ব্যবস্থার ওপর আলোচনা করাটা বোধহয় খুব একটা অপ্রাসঙ্গিক হবে না। কিছুদিন আগে পর্যন্তও বোধহয় আসামের সবচাইতে অবহেলিত অথচ গুরুত্বপূর্ণ শহর ছিল শিলচর। সমগ্র আসামে অর্থনৈতিকভাবে গুয়াহাটি এবং তিনসুকিয়ার পরেই শিলচরের স্থান। দক্ষিণ আসামে রাজনৈতিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ তো বটেই, অর্থনৈতিকভাবে এবং ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে সমগ্র দক্ষিণ আসাম, মণিপুর, ত্রিপুরা এবং মিজোরামের প্রাণকেন্দ্রও হচ্ছে শিলচর তাতে সন্দেহের কোনও অবকাশ নেই। অথচ বোধহয় আসামের সবচাইতে উপেক্ষিত শহর ছিল শিলচর। এর মুখ্য কারণ ছিল, ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার সঙ্গে যোগাযোগ ব্যবস্থার অপ্রতুলতা, উপযুক্ত পরিকাঠামোর অভাব এবং তার উন্নয়নের ব্যাপারে রাজ্য সরকারের অনীহা। আমাদের জনপ্রতিনিধিরাও এই ব্যাপারে ছিলেন হয় নিরাসক্ত, নয় উদাসীন। অবশিষ্ট ভারতের সঙ্গে যোগাযোগের জন্য শিলচর তথা সমগ্র বরাক উপত্যকা আসামের মধ্যে দিয়ে রেল এবং সড়ক ব্যবস্থার ওপর নির্ভরশীল। কিন্তু এই দুই উপত্যকার মধ্যে সংযোগকারী রেল ও সড়ক ব্যবস্থা এই সেদিন পর্যন্ত ছিল নেহাৎই অপ্রতুল এবং ভঙ্গুর। আজ রেল ব্যবস্থার বেশ কিছু উন্নতি হয়েছে, কিন্তু সড়ক ব্যবস্থা যে তিমিরে ছিল, সেই তিমিরেই রয়ে গেছে।

এবার একটু পেছন ফিরে তাকানো যাক। এই তো সেদিনের কথা, শত বছরের অধিক পুরনো জরাজীর্ণ মিটারগেজ রেলপথের সীমিত বহন ক্ষমতার কথা (এছাড়া গোদের উপর বিষফোঁড়ার মতো কিছু দিন আগে পর্যন্ত ডিমা হাসাও জেলায় বিদ্রোহীদের উৎপাত তো ছিলই) তো সর্বজনবিদিত। সড়কপথে শিলচরের সংযোগকারী ৪০ এবং ৪৪ নং রাষ্ট্রীয় পথের (গুয়াহাটি-শিলং-জোয়াই-বদরপুর) অবস্থাও তো তথৈবচ। এজন্য অবশ্যই দায়ী ভারত সরকারের (এবং সেই আসাম সরকারও বটে) বিমাতৃসুলভ আচরণ।

১৯৯৬ সালে গেজ পরিবর্তনের কাজ শুরু করা হয়েছিল, এবং এই কাজ দশ বছরের মধ্যে সম্পূর্ণ হওয়ার কথা ছিল। জাতীয় প্রকল্প হিসেবে ঘোষণা করা সত্ত্বেও এর কাজ হয়েছিল অত্যন্ত ঢিমেতালে। এর কারণ হচ্ছে, প্রতি বছর এই প্রকল্পের জন্য কেন্দ্র সরকার পর্যাপ্ত পরিমাণে অর্থ বিনিয়োগ করেনি (তাছাড়া বিদ্রোহীদের উৎপাত তো আছেই)। সুতরাং, যা অবশ্যম্ভাবী তা-ই হয়েছে। এই প্রকল্পের কাজ শেষ হতে লেগেছে প্রায় কুড়ি বছরেরও অধিক সময়।

এদিকে, শিলং-জোয়াই-বদরপুর সড়ক সংযোগকারী ৪৪ নং জাতীয় সড়কের কথাও কহতব্য নয়। ফোর লেন শিলচর-সৌরাষ্ট্র রাষ্ট্রীয় মহাসড়কের অংশবিশেষ শিলচর-নগাঁও পথের কাজ আজও শেষ হয়নি। কাজেই সময়ে সময়ে গালভরা আশ্বাসবচন সত্ত্বেও শিলচর তথা বরাক উপত্যকা যে তিমিরে সে তিমিরেই রয়ে গেছে। এদিকে, বর্তমানে শিলচর-করিমগঞ্জ-সুতারকান্দি হয়ে বাংলাদেশের সঙ্গে সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থা রয়েছে, কিন্তু এই পথে পণ্য বাণিজ্যের পরিমাণ যথেষ্ট নয় কারণ, সীমান্তের ওপারে বাংলাদেশের সড়ক ব্যবস্থা ভালো নয়, তাই অপ্রতুল পরিকাঠামোর অভাবে বাণিজ্য বিঘ্নিত হচ্ছে। ভারতীয় অংশে সীমান্তে একটি ICP (Integrated Check Post) স্থাপন করা হয়েছে, যেখানে ভিসা-পাসপোর্ট সহ সব আধুনিক সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা রয়েছে। কিন্তু বাংলাদেশের অংশে এখন পর্যন্ত যে পরিকাঠামো রয়েছে, সেটা নেহাৎই অপ্রতুল।

এবারে আসছি আসল কথায়। শিলচর তথা বরাক উপত্যকার জন্য আসাম ও মেঘালয় ছাড়াও আরও তিনটি রাজ্যের গুরুত্ব প্রচুর। এগুলো হচ্ছে ত্রিপুরা, মণিপুর এবং মিজোরাম। এই রাজ্যগুলোর সঙ্গে সুদীর্ঘ

আন্তর্জাতিক সীমান্ত রয়েছে (বাংলাদেশ ও মায়ান্মার), এছাড়া করিমগঞ্জ জেলা এবং বাংলাদেশের মধ্যে কুশিয়ারা নদীর মধ্য স্রোত বরাবর রয়েছে ভারত-বাংলা আন্তর্জাতিক সীমান্ত।

আজ অবশ্য একথা অস্বীকার করার অবকাশ নেই যে, বিগত কয়েক বছরে অবস্থার কিছু পরিবর্তন অবশ্যই ঘটেছে, বিশেষ করে রেল যোগাযোগ ব্যবস্থার ক্ষেত্রে। আগে শিলচরের সঙ্গে ভারতের কোনও বড় শহরের সরাসরি যোগাযোগ ছিল না। মিটারগেজ আমলে অবশ্য দুটো ট্রেন বরাক ভ্যালি এক্সপ্রেস এবং কাছাড় এক্সপ্রেস সরাসরি শিলচরকে গুয়াহাটির সঙ্গে সংযুক্ত করতো। কিন্তু এই পর্যন্তই। তারপর গুয়াহাটি অথবা বঙ্গাইগাঁও থেকে ব্রডগেজে কলকাতা অথবা দিল্লির ট্রেন ধরতে হতো। ব্রডগেজ আমলের প্রথম পর্যায়ে শিলচর তথা বরাকবাসীর অবস্থা আরও শোচনীয় হয়ে পড়ে (গুয়াহাটি থেকে লামডিং ব্রডগেজ ও তারপর মিটারগেজ, তবেই গুয়াহাটি থেকে শিলচর পৌঁছানো সম্ভব হতো)। তাছাড়া গোদের উপর বিষফোঁড়ার মতো ট্রাক এবং নাইট সুপার লবির প্রভাবে লামডিং-বদরপুর ব্রডগেজ লাইনের কাজ অনেকাংশে স্তিমিত হয়ে পড়েছিল। অবশ্য শেষ পর্যন্ত ধর্মনগর হয়ে আগরতলা পর্যন্ত শিলচরের সঙ্গে এবং আগরতলাসহ দেশের অন্যান্য অংশের সঙ্গে সরাসরি ব্রডগেজ সংযোগ স্থাপন করা সম্ভব হয়েছে সত্যি কিন্তু এজন্যে শিলচর তথা বরাকবাসীকে বহু দিন অপেক্ষা করতে হয়েছে।

এখন আমাদের শিলচর, বদরপুর, করিমগঞ্জ এবং আগরতলায় ব্রডগেজ লাইনের কাজ সম্পূর্ণ হয়ে যাবার পরিপ্রেক্ষিতে শিলচর তথা বরাক উপত্যকার দেশের মধ্যে এবং বিদেশের বিশেষ করে বাংলাদেশ এবং কিয়দংশে মায়ান্মারের সঙ্গে রেল যোগাযোগের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা সম্পর্কে কিছু আলোচনা করার অবকাশ আছে বই কি!

প্রথমেই বাংলাদেশের কথা বলছি। আগরতলার অদূরেই ভারত-বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক সীমানার ওপারে আখাউড়া জংশন, আগরতলা থেকে দূরত্ব মাত্র ১৫ কিঃমিঃ। দেশভাগের আগের সিলেট-চট্টগ্রাম মিটারগেজ রেলপথে কুলাউড়া এবং আখাউড়া জংশন দুটোর গুরুত্ব ভারত-বাংলাদেশ রেল যোগাযোগের ক্ষেত্রে অপরিসীম।

প্রথমেই আখাউড়া জংশনের কথায় আসছি। আগরতলা থেকে সড়কপথে ঢাকার দূরত্ব ১৪০ কিঃমিঃ। এই পথে অনেক দিন ধরেই সপ্তাহে দুই দেশের বাস পর্যায়ক্রমে দু'দিন করে আগরতলা-ঢাকা রুটে চলাচল করছে। আগরতলা-আখাউড়া সংযোগকারী রেলপথ ভারত সরকারের অনুদানে নির্মিত হচ্ছে এবং এর নির্মাণ ও তদারকির কাজ অর্পণ করা হয়েছে ভারত সরকারেরই একটি সংস্থা IRCON-কে। প্রথম প্রথম ভারতীয় অংশে জমি অধিগ্রহণের ব্যাপারে কিছু কিছু সমস্যা দেখা দিলেও, পরে সব কাজই সুচারুরূপে সম্পন্ন হয়ে গেছে। বাংলাদেশের অংশে আরও কিছু সমস্যা ছিল, একটি ৩.১ কিঃমিঃ দৈর্ঘের একটি Viaduct নির্মাণ করে সেই সমস্যারও সমাধান করে ফেলেছেন ভারতীয় ইঞ্জিনিয়াররা। ভারতীয় অংশে নিশ্চিন্তপুরে একটি Transhipment yard তৈরি করার কাজও প্রায় সম্পূর্ণ। ৫৮০ কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মিত হয়েছে ভারতীয় অংশের ৫.৪৬ কিঃমিঃ এবং বাংলাদেশের অংশের ১৫.৬ কিঃমিঃ দৈর্ঘের অংশ দুটো অর্থাৎ ভারতের আর্থিক অনুদানের দ্বারা নির্মিত হচ্ছে। কিন্তু আলাদা করে এই ইয়ার্ডের প্রয়োজন কেন? তার একটা কারণ আছে, তা-ই বলছি। বর্তমানে ভারতীয় অংশে রেলপথের পুরোটাই ব্রডগেজ। কিন্তু এখনও বাংলাদেশ অংশে রেলপথ পুরনো মিটারগেজই রয়ে গেছে। সেই কারণেই ব্রজগেজ এবং মিটারগেজের মধ্যে পণ্য এবং যাত্রীদের transhipment-র জন্যই নিশ্চিন্তপুরে এই ইয়ার্ডের প্রয়োজন। এই প্রকল্পের কাজ বেশ ভালভাবেই এগোচ্ছে এবং আশা করা যায়, এ বছরের মধ্যেই আগরতলা-ঢাকার মধ্যে সরাসরি রেল যোগাযোগ স্থাপিত

হবে। অবশ্যই এর আগে দুই সরকারের মধ্যে কিছু নিয়ম-কানুন প্রবর্তনের প্রয়োজন হবে (বিশেষ করে ভিসা এবং ইমিগ্রেশনের ক্ষেত্রে অনেকটা শিয়ালদহ-ঢাকা (গেদে-দর্শনা) অথবা শিয়ালদহ-খুলনা (বেনাপোল-পেট্রোপোল) সেক্টর যে-সব বিধি-নিয়ম প্রযোজ্য হয় সেই রকম আর কী!)। তেমন হলে তো আগরতলা-ঢাকা সরাসরি রেল যোগাযোগ খুব তাড়াতাড়িই স্থাপিত হবে বলে আশা করা যায়।

এর পরের স্টেজ হচ্ছে শিলচর-ঢাকা সরাসরি ট্রেন চালাবার প্রশ্ন। সে ব্যাপারেও আগের নজির তো রয়েছে। (ভারত-পাকিস্তানের মধ্যে সমঝোতা এক্সপ্রেস প্রথমে চালু হয়েছিল অমৃতসর এবং লাহোরের মধ্যে (ওয়াঘা সীমান্তে অবস্থিত 'আটারি' স্টেশনের মধ্য দিয়ে)। কিন্তু পরে এই ট্রেনটিকে দিল্লি পর্যন্ত সম্প্রসারিত করা হয় (তখন ভিসা এবং ইমিগ্রেশনের নিয়মাবলি দিল্লিতেই সম্পন্ন করার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। এজন্য ওল্ড দিল্লি রেলস্টেশনে এক নম্বর প্ল্যাটফর্মের একটা অংশকে বিশেষভাবে মজবুত জালের বেড়া দিয়ে ঘিরে দেওয়া হয়)। কাজেই শিলচর-ঢাকার মধ্যে সরাসরি রেল সংযোগ ব্যবস্থার কথা ভাবাটা মোটেই অপ্রাসঙ্গিক নয়।

এই প্রসঙ্গে এখানে আরেকটা ট্রেনের উল্লেখ করবো, সেটা হচ্ছে ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে যে আর একটি ট্রেন চলাচল করে তার কথা। এই ট্রেনটি হচ্ছে 'থর এক্সপ্রেস'। পাকিস্তানের সিন্ধু প্রদেশ (করাচি ক্যান্টনমেন্ট) এবং ভারতের রাজস্থান (যোধপুর) প্রদেশের মধ্যে যাতায়াত করে। এখানেও ভারতের ব্রডগেজ এবং পাকিস্তানের মিটারগেজের মধ্যে Transhipment-র সমস্যা আছে। খোকরাপার (পাকিস্তান) এবং মুনাবাও (ভারত) সীমান্তে এই ব্যবস্থাই প্রচলিত হয়েছে। এই অসুবিধা অতিক্রম করার জন্য 'পাকিস্তান রেলওয়ে' পাকিস্তানের মিটারগেজ লাইনের (১০ কিঃমিঃ) অংশবিশেষকে ব্রডগেজে রূপান্তরিত করে পাকিস্তান রেলওয়ে ভারত সীমান্ত থেকে খোকরাপার পর্যন্ত ভেতরে নিয়ে এসেছে, যাতে ব্রডগেজ এবং মিটারগেজের মধ্যে Transhipment করার সুবিধা হয়।

আশা করা যায়, ইতিমধ্যে আগরতলা-আখাউড়া প্রকল্পের কাজ পুরো হয়ে গিয়েছে। এতে সূচনা হল ভারত-বাংলাদেশ রেল যোগাযোগের এক নতুন অধ্যায়।

এবারে আসছি আগরতলা-চট্টগ্রাম সংযোগের কথায়। প্রথমেই বলি, আগরতলা-সাব্রুম রেল সংযোগের কথা। আগরতলা-সাব্রুম (১১৪ কিঃমিঃ) রুটে ইতিমধ্যেই রেল যোগাযোগ ব্যবস্থা চালু হয়ে গেছে। দিনে তিনটি করে ডিএমইউ ট্রেন এই রুটে চলাচল করছে। সীমান্ত শহর সাব্রুমের ওপারে বাংলাদেশের সীমান্ত। দুই দেশের মধ্যে দিয়ে ফেনী নদী বয়ে চলেছে। সাব্রুম এবং বন্দর শহর চট্টগ্রামের দূরত্ব মাত্র ৭৫ কিঃমিঃ। ত্রিপুরার সঙ্গে চট্টগ্রাম বন্দরের সঙ্গে সংযোগের জন্য ফেনী নদীর ওপর একটা ব্রিজ নির্মাণের প্রয়োজনীয়তা অনেক দিন ধরেই অনুভুত হচ্ছিল।

সব চাইতে আশার কথা, সাম্প্রতিককালে (৯ মার্চ, ২০২১) ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ফেনী নদীর ওপর ভারত এবং বাংলাদেশের সংযোগকারী মৈত্রী সেতুটির উদ্বোধন করেন। ভারতীয় অর্থসাহায্যে নির্মিত ১.৯ কিঃমিঃ দৈর্ঘ্যবিশিষ্ট এই সেতুটি তৈরি করতে ব্যয় হয়েছে ১২৯ কোটি টাকা এবং এর নির্মাণের দায়িত্ব ছিল ভারতীয় সংস্থা NHIDCL (National Infrastructure Development Corporation Limited)-র ওপর। এই ডবল লেনযুক্ত Cable stayed সেতুটি ভারতের সাব্রুম এবং বাংলাদেশের রামগড়ের মধ্য দিয়ে চট্টগ্রাম বন্দরকে সরাসরি সংযুক্ত করবে। সাব্রুমে একটি Integrated Check Post (ICP) নির্মাণের কাজ ইতিমধ্যেই শুরু হয়েছে। আপাতত শিলচরের জন্য আগরতলা-সাব্রুম-চট্টগ্রাম সংযোগী রেল-সড়ক পরিবহন ব্যবস্থা যে এক নতুন দিগন্ত এবং সম্ভাবনার সূচনা করবে, তাতে কোনও

সন্দেহ নেই। এর ফলে প্রায় ১৬০০ কিঃমিঃ দূরত্বে অবস্থিত সমগ্র দক্ষিণ আসাম ও সংলগ্ন অঞ্চলের সবচেয়ে কাছাকাছি বন্দর হলদিয়ার পরিবর্তে মাত্র ৫০০ কিঃমিঃ দূরত্বে অবস্থিত চট্টগ্রাম সমুদ্র বন্দরের সুযোগ সুবিধা উপলব্ধ হওয়ার ফলে ব্যবসা-বাণিজ্য, পণ্য পরিবহন এবং আমদানি রফতানির ক্ষেত্রে যে এক আমূল পরিবর্তন ঘটবে, তাতে সন্দেহ নেই। হয়তো বা অদূর ভবিষ্যতে সাব্রুম-চট্টগ্রাম রেল সংযোগ স্থাপন হলে রেল থেকে সড়ক পরিবহনের জন্য Transhipment-র প্রয়োজন হবে না, সেক্ষেত্রে সরাসরি রেল পরিবহনের ব্যবস্থা আরও ত্বরান্বিত হবে। সুতরাং, অদূর ভবিষ্যতে স্বভাবতই শিলচর যে এই সমগ্র কর্মকাণ্ডের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে উঠবে তাতে আমার বিন্দুমাত্র দ্বিধাবোধ নেই।

এবার একটা অন্য প্রসঙ্গে আসছি। আর সেটা হচ্ছে, শিলচর এবং সিলেটের মধ্যে রেল যোগাযোগের সম্ভাবনার কথায়। করিমগঞ্জ থেকে ১১ কিঃমিঃ দূরে ভারত-বাংলাদেশে সীমান্তের শেষ রেলস্টেশন মহিশাসন। ওপারে বাংলাদেশের স্টেশন সাহাবাজপুর। ১৯৬৫ সালে ভারত-পাক যুদ্ধের পরে এই রুটে ট্রেন চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। পাক কর্তৃপক্ষ ভারতীয় সীমান্ত থেকে সাহাবাজপুর পর্যন্ত রেললাইন (৬ কিঃমিঃ) উপড়ে ফেলে দিয়েছিল। প্রাক্ স্বাধীনতা যুগে করিমগঞ্জ জংশন থেকে কুলাউড়া জংশন হয়ে সিলেট পর্যন্ত ট্রেন চলতো। সাহাবাজপুর এবং কুলাউড়া জংশনের মধ্যে বড়লেখা, কাঁঠালতলি এবং দক্ষিণবাগ এই তিনটি স্টেশন আছে (এককালে করিমগঞ্জ মহকুমা তো সিলেট জেলারই অন্তর্ভুক্ত ছিল)।

এখন ভারত-বাংলাদেশ এই দুই দেশের যৌথ উদ্যোগে এই ট্রেন লাইন আবার চালু করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। ভারতীয় রেল এই ব্যাপারে ইতিমধ্যেই অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছে। আশা করা যায়, কিছুকালের মধ্যেই শিলচরের সঙ্গে সিলেটের রেল যোগাযোগের সম্ভাবনা উজ্জ্বল হয়ে উঠবে। তাছাড়া ভবিষ্যতে করিমগঞ্জ-কুলাউড়া অংশের আরও কিছু গুরুত্বপূর্ণ সম্ভাবনা রয়েছে। প্রথমত, শিলচরের সঙ্গে আখাউড়ার একটা বিকল্প রেল যোগাযোগ ব্যবস্থার সম্ভাবনা আছে কুলাউড়া জংশনের মাধ্যমে। সুতরাং, করিমগঞ্জ-কুলাউড়া-আখাউড়া হয়ে শিলচর-ঢাকা বিকল্প রেল যোগাযোগ ব্যবস্থা স্থাপন করার সম্ভাবনা তো আছেই। তাছাড়াও শিলচর-করিমগঞ্জ-কুলাউড়া অংশটি প্রস্তাবিত Trans Asian Railway নেটওয়ার্কের দক্ষিণাংশের একটি উল্লেখযোগ্য লিঙ্ক, এই রুট দিয়েই প্রস্তাবিত Trans Asian Railway ভারত থেকে বাংলাদেশে প্রবেশ করবে। এই প্রসঙ্গে একটু পরেই আসছি।

বর্তমানে এশিয়া থেকে ইউরোপ পণ্যসম্ভার রফতানির জন্য মূলত সমুদ্রপথই ব্যবহৃত হয়ে থাকে। কারণ, এর কোনও বিকল্প নেই। তার একটাই কারণ এবং বিমানে cargo freight মোটেই সুলভ নয়। সুতরাং, এর একমাত্র বিকল্প হতে পারে এশিয়া মহাদেশের সঙ্গে ইউরোপের রেল যোগাযোগ ব্যবস্থা। Trans Asian Railway-র সম্ভাবনার কথা নিয়ে এশিয়ার বিভিন্ন দেশে অনেক দিন ধরেই চিন্তা চর্চা চলছে। এর দ্বারা চিন, সিঙ্গাপুর, ভিয়েতনাম, কম্বোডিয়া, ভারত, বাংলাদেশ, মায়ান্মার, থাইল্যান্ড, কোরিয়া, মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া এসব দেশ থেকে অতি সহজেই এবং সুলভে ইউরোপে পণ্যসামগ্রীর container service প্রবর্তন করা সম্ভব হবে। ভারতের কাছে এই রেল নেটওয়ার্কের southern corridor-র গুরুত্ব অসীম। এর দ্বারা ভারত এবং তুরস্কের মধ্য দিয়ে চিনের ইউনান এবং থাইল্যান্ডের সঙ্গে ইউরোপের সরাসরি রেল যোগাযোগ সম্ভব হবে।

বেশ কিছুদিন আগে থেকেই দুই দেশ ভারতের এবং মায়ান্মারের মধ্যে রেল ব্যবস্থার সংযোগ নিয়ে একটা বোঝাপড়া রয়েছে। ৩৪৬ কিঃমিঃ দৈর্ঘ্যের এই রেললাইনে মায়ান্মারের সেক্টরে প্রায় ৩১৫ কিঃমিঃ গ্যাপ (missing link) রয়েছে। এর মধ্যে ভারতের জিরিবাম এবং মোরের মধ্যেকার রেলের প্রস্তাবিত

alignment অনুযায়ী ২৩৬ কিঃমিঃ ভারতের অংশে পড়েছে। এই প্রস্তাবিত রুট মায়ান্মারের টামু থেকে মণিপুরের মোরে হয়ে ভারতে প্রবেশ করবে। জিরিবাম-টুপুল-ইম্ফল রেলপথের (১২৫ কিঃমিঃ) কাজ মোটামুটি সন্তোষজনকভাবেই এগোচ্ছে। তবে এখন পর্যন্ত ইম্ফল-মোরে (১১১ কিঃমিঃ) এবং টামু-ক্যালে (১২৮ কিঃমিঃ) রেলপথের কাজের অনুমোদন হয়নি।

বর্তমানে দেখা যাচ্ছে, অদূর ভবিষ্যতে ইম্ফল-জিরিবাম-শিলচর-করিমগঞ্জ-মহিশাসন-কুলাউড়া রুটটি আন্তর্জাতিক রেলপথের (Trans Asian Railway) একটি উল্লেখযোগ্য অংশবিশেষ হিসেবে পরিগণিত হয়ে ওঠার সম্ভাবনা যে অসীম, তাতে কোনও সন্দেহের অবকাশ নেই। ২০০৫ সালে ভারতীয় সংস্থা RITES-র এক সার্ভেতে ভারতের ইম্ফল থেকে মায়ান্মারের প্রাচীন রাজধানী মান্দালয় পর্যন্ত রেল যোগাযোগের সম্ভাবনার কথাও বলা হয়েছিল। অবশ্য এটা শুধুই সম্ভাবনা মাত্র, তবে ভবিষ্যতে অসম্ভবও কিছু নয়। তবে মোরে এবং ক্যালেকে রেলপথে সংযুক্তকরণ করা হলে ভারতীয় রেল ব্যবস্থা সরাসরি মায়ান্মারের রেলওয়ে নেটওয়ার্কের সঙ্গে সংযুক্ত হবে। এর ফলে বঙ্গোপসাগরের এক উল্লেখযোগ্য বন্দর শহর রেঙ্গুন শিলচরের কাছে উন্মুক্ত হয়ে উঠবে। চট্টগ্রাম বন্দরের বিকল্প হিসেবে ভবিষ্যতে রেঙ্গুন বন্দরের সম্ভাবনাকে একেবারে উড়িয়ে দেবার মতো নয়।

এতক্ষণ ধরে যোগাযোগ ব্যবস্থার বোধহয় সবচেয়ে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম রেল সংযোগের সম্ভাবনার কথা বিশদভাবে বলেছি। এখন বিশেষ করে স্থলপথ, জলপথ এবং বিমানপথে সংযোগের সম্ভাবনার দিকে একটু আলোচনা করে যাক।

প্রথমেই কালাদান প্রকল্পের কথায় আসছি। এই প্রকল্প ২০২৩ সালে সম্পূর্ণ হয়ে ওঠার সম্ভাবনা আছে। এই পথে কলকাতার হলদিয়া বন্দরের সঙ্গে ৫৪০ কিঃমিঃ দৈর্ঘ্যের একটি সমুদ্রপথে মায়ান্মারে বঙ্গোপসাগরের উপকূলে অবস্থিত 'সিটুয়েই' বন্দরের সঙ্গে যুক্ত হবে। সিটুয়েই থেকে চিন প্রদেশের পালটেওয়া (Paletwa) পর্যন্ত ১৫৮ কিঃমিঃ দীর্ঘ কালাদান নদীপথে 'পালেটেওয়া' নদীবন্দরের সঙ্গে যুক্ত করা হবে। এখান থেকে ১৪০ কিঃমিঃ দূরে জরিনপুই (Zorinpui)-জোচাচাহা (Zochachhuah) ভারত-মায়ান্মার সীমান্ত হয়ে একটি রাস্তা (NH 502A) মিজোরামের অভ্যন্তরে আরও ৮৭ কিঃমিঃ দূরে অবস্থিত দক্ষিণ মিজোরামের লউংটলাই (Lawngtlai) শহরকে যুক্ত করবে। লউংটলাই থেকে ৮৫০ কিঃমিঃ দীর্ঘ পথ (NH 54) আইজল এবং বরাক উপত্যকার মধ্য দিয়ে মধ্য আসামের ডবকার কাছে ভারতের অবশিষ্ট অংশের সঙ্গে সংযুক্তকারী ইস্ট-ওয়েস্ট হাইওয়ের সঙ্গে যুক্ত হবে। বর্তমানে শিলিগুড়ির কাছে অবস্থিত চিকেন নেক 'করিডর' দিয়ে কলকাতা থেকে লউংটলাই পর্যন্ত এর দূরত্ব ১৮৮০ কিঃমিঃ, কিন্তু কালাদান প্রকল্পের অন্তর্গত সমুদ্রপথ, জলপথ এবং স্থলপথে দূরত্ব কমে গিয়ে দাঁড়াবে মাত্র ৯৩০ কিঃমিঃ। ফলে বর্তমানের ঘুরপথের পরিবর্তে এই পথে তিন থেকে চার দিন কম সময় লাগবে।

এবার আসছি দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সঙ্গে পথ সংযোগের কথায়। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় নির্মিত আসামের উত্তর-পূর্ব প্রান্তে অবস্থিত লিডোর সঙ্গে উত্তর বার্মা (মায়ান্মার) হয়ে চিনের ইউনান প্রদেশের কুনমিং পর্যন্ত বিস্তৃত ১৭২৬ কিঃমিঃ দীর্ঘ স্টিলওয়েল রোড ভারত তথা উত্তর-পূর্বের সঙ্গে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া তথা চিনের সঙ্গে আন্তর্জাতিক স্তরে যোগাযোগ স্থাপনের ক্ষেত্রে প্রচুর সম্ভাবনাময় হয়ে উঠতে পারত, কিন্তু প্রতিরক্ষা মন্ত্রক ভারত-চিন সম্পর্কের অবনতি, উত্তর-পূর্বের বিদ্রোহীদের কূটাঘাতমূলক কাজকর্মের সম্ভাবনা এবং বেআইনি ড্রাগস এবং চোরাচালানের সম্ভাবনার পরিপ্রেক্ষিতে এই পথটি উন্মুক্ত করে দিতে এখনও সম্মত হয়নি।

মণিপুরের ইম্ফল থেকে মায়ান্মারের পথ সংযোগী রাস্তা বর্তমানে মোরে-টামু-ক্যালে-ক্যালেমিও-মান্দালয়-নেপিডো-ইয়াঙ্গোন হয়ে থাইল্যান্ডের সীমান্তের 'মাই সোট' (থাইল্যান্ডের প্রাচীন রাজধানী)-ব্যাঙ্কক পর্যন্ত চলে গেছে। এই পথ দিয়েই ভারত থেকে ব্যাঙ্কক পর্যন্ত Asian Car Rally অনুষ্ঠিত হয়েছিল। মাই সোটের কাছ থেকে এই পথের আরেকটি শাখা লাওস, কম্বোডিয়া এবং ভিয়েতনামকে সংযুক্ত করেছে।

এখানে এখন কথা হচ্ছে যে, প্রস্তাবিত Trans Asian Highway-র অংশবিশেষ (উত্তর শাখা) মণিপুরের ইম্ফল-মাওগেট-ডিমাপুর হয়ে আসামের ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার NH-37-র সঙ্গে সংযুক্ত হবার কথা। তবে এটা ঘটনা যে, ইম্ফল এবং শিলচরের মধ্যে পথ সংযোগ ব্যবস্থা তেমন উপযুক্ত মানের না হবার দরুন আন্তর্জাতিক যোগাযোগের পক্ষে কিছু অসুবিধে রয়েছে। শিলচর তথা বরাক উপত্যকার বুদ্ধিজীবীদের এই ব্যাপারে সচেতন হবার প্রয়োজন আছে। এর ফলে Trans Asian Highway-র উত্তর-পূর্বের অংশের দক্ষিণ শাখাটির Alignment (যেটা মায়ান্মারের টিড্ডিম থেকে আরাকান হয়ে বাংলাদেশের মধ্য দিয়ে পশ্চিমবঙ্গ দিয়ে আবার ভারতে প্রবেশ করার কথা) কিছু পরিমাণে রদবদল করে বরাক উপত্যকার মধ্য দিয়ে ত্রিপুরা রাজ্য থেকে আখাউড়া সীমান্ত দিয়ে বাংলাদেশে প্রবেশ করানোর একটা সম্ভাবনা রয়েছে। অবশ্য আপাতত এটা শুধুই একটা প্রস্তাবনা মাত্র, বাকিটা ভবিষ্যতের গর্ভে।

এবার বরাক উপত্যকার নৌ পরিবহন ব্যবস্থা নিয়ে কিছু কথা বলা প্রয়োজন। ভারত বাংলাদেশ রুটে নৌ পরিবহনের প্রটোকল রুটে বরাক নদীর অন্তর্গত দু'টি জলপথ রয়েছে— (১) কলকাতা-করিমগঞ্জ-কলকাতা এবং (২) পাণ্ডু-করিমগঞ্জ-পাণ্ডু। বরাক নদীকে ভারতের রাষ্ট্রীয় জলপথ নং ১৬ হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। ১২১ কিঃমিঃ দৈর্ঘ্যের এই জলপথটি ভাঙ্গা বাজার থেকে লক্ষীপুর পর্যন্ত বিস্তৃত। এই জলপথে অবস্থিত বদরপুরকে EPC (Extended Port of Call)-র মর্যাদা দেওয়া হয়েছে। ভারত-বাংলাদেশ এই দুই দেশের যৌথ আলোচনার সময় ভারত সরকার বাংলাদেশ সরকারকে এই প্রস্তাব দিয়েছিল যেন কলকাতা-করিমগঞ্জ প্রটোকল রুটটিকে শিলচর পর্যন্ত সম্প্রসারিত করা হয়। তবে এই সম্পর্কে এখন পর্যন্ত কোনওরকম স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়নি।

সবশেষে শিলচর থেকে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলো (এবং চিনের ইউনান প্রদেশের রাজধানী কুনমিং পর্যন্ত)-র সঙ্গে আন্তর্জাতিক পর্যায়ের বিমান সার্ভিস প্রবর্তন করার সম্ভাবনা সম্পর্কে কিছু কথা আলোচনা করা যেতে পারে।

বর্তমানে উত্তর-পূর্বে তিনটি আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর রয়েছে— (১) গুয়াহাটি, (২) ইম্ফল এবং (৩) আগরতলা। এখন পর্যন্ত গুয়াহাটি আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে শুধুমাত্র একটি আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বিমান যাতায়াত করে (ভুটানের Druk Airlines-র Paro-Guwahati-Singapore রুটের বিমান সেবা সপ্তাহে দুই দিন করে যাতায়াত করে)। গত বছর মে মাসে Spice Jet গুয়াহাটি-ঢাকা রুটে বিমান সার্ভিস চালু করেছিল। কিন্তু পর্যাপ্ত যাত্রীর অভাবে চার মাস পরেই এই সার্ভিস বন্ধ করে দিতে হয়।

সম্প্রতি ভারত সরকার UDAN পরিকল্পনার আওতায় গুয়াহাটি, আগরতলা এবং ইম্ফল থেকে বেশ কয়েকটি আন্তর্জাতিক ফ্লাইট (ঢাকা, চট্টগ্রাম, রেঙ্গুন, কাঠমাণ্ডু, ব্যাঙ্কক, কুয়ালালামপুর, হ্যানয়, কুনমিং) শুরু করার কথা ঘোষণা করেছে। এর মধ্যে ইম্ফল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে এখন কেবলমাত্র ইম্ফল-মান্দালয় সেক্টরে সপ্তাহে দুই দিন করে মায়ান্মারের একটি প্রাইভেট বিমান সংস্থা AVZ Airlines-র দু'টি মাত্র চার্টার্ড ফ্লাইট যাতায়াত করে। ভারত এবং মায়ান্মার দুই দেশের জাতীয় এয়ারলাইন্সগুলো এখন

পর্যন্ত নিয়মিত ফ্লাইট চালাতে সক্ষম হচ্ছে না। কারণ, তার জন্য প্রয়োজন হবে দুই দেশের মধ্যে বিমান চলাচল সংক্রান্ত চুক্তির সংশোধন, বর্তমান চুক্তিতে ইম্ফলকে Port of Call হিসেবে এখন পর্যন্ত অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি।

আগরতলাকে কিছুদিন আগে আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। এখন পর্যন্ত আগরতলা থেকে কোনও আন্তর্জাতিক ফ্লাইট শুরু করা হয়নি, তবে খুব শীঘ্রই আগরতলা থেকে ঢাকা ও চট্টগ্রামের মধ্যে আন্তর্জাতিক ফ্লাইট শুরু করার কথা ভারত সরকার ঘোষণা করেছে।

অনেকেই হয়তো বা ভাবছেন, বরাক উপত্যকা এবং অ্যাক্ট ইস্টের পরিপ্রেক্ষিতে আমি ইম্ফল এবং আগরতলা আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরের প্রসঙ্গ টেনে আনছি কেন। এটা এই কারণে যে, বর্তমানে শিলচরে কোনও আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর না থাকলেও এই দুই প্রতিবেশী রাজ্যের আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের সুযোগ-সুবিধা বরাক উপত্যকার জনগণের কাছে উপলব্ধ হবে। তাছাড়া এই প্রসঙ্গে আরও একটা কথা বলার আছে। সেকথা একটু পরেই বলছি।

বেশ কিছুদিন ধরেই শোনা যাচ্ছে, শিলচরে একটি আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর নির্মাণ করার সম্ভাবনা আছে। এই ব্যাপারে বিশদ কিছু বলার আগে বর্তমানে যে আন্তর্দেশীয় (Domestic) বিমানবন্দর আছে, সে সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করে নেওয়া বোধহয় সঙ্গত হবে। কুম্ভীরগ্রাম বিমানবন্দর, শিলচর শহর থেকে ২৪ কিঃমিঃ দূরে অবস্থিত। অবিভক্ত কাছাড় জেলা এবং মিজোরাম, মণিপুর, মেঘালয় এবং ত্রিপুরার অংশবিশেষের জনসাধারণ এই বিমানবন্দরটি ব্যবহার করে থাকেন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় ১৯৪৪ সালে ব্রিটিশরা কুম্ভীরগ্রামে 'রয়্যাল এয়ার ফোর্স' (RAF)-র একটি স্টেশন হিসেবে এই বিমানবন্দরটি স্থাপন করেছিল। এর একটা ইতিহাস আছে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় ইন্ডো-বার্মা ফ্রন্টে যুদ্ধরত ব্রিটিশ সৈন্যবাহিনীকে রসদ জোগানের জন্য এবং ক্রমশ অগ্রসরমান জাপানি এবং নেতাজির নেতৃত্বাধীন INA-র যৌথ সেনাবাহিনীর অগ্রসর এবং আক্রমণ রোধ করা এবং তাদের ওপর বোমা ফেলার জন্য ব্রিটিশরা আসামের দিনজান (ডিব্রুগড়), ররৈয়া (যোরহাট), সালনিবাড়ি (তেজপুর), লীলাবাড়ি (লক্ষিমপুর) এসব স্থানে বেশ কয়েকটি বিমানবন্দর তৈরি করেছিল। এছাড়া সীমান্তের ফরোয়ার্ড এলাকায় এই উদ্দেশ্যে আরও কয়েকটি বিমানবন্দর (RAF) ব্রিটিশরা স্থাপন করেছিল, কুম্ভীরগ্রাম ছিল তার মধ্যে অন্যতম। পরে এটিকে রয়্যাল ইন্ডিয়ান এয়ার ফোর্স (RIAF)-কে হস্তান্তর করা হয়। স্বাধীনতার পর কুম্ভীরগ্রাম ভারতীয় বায়ুসেনার (IAF) অধীনে চলে আসে। বর্তমানে এই বিমানবন্দরটি IAF-র নিয়ন্ত্রণে একটি অসামরিক বিমানঘাটি (Civil enclave) হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। উত্তর-পূর্বের সবচেয়ে ব্যস্ত বিমানবন্দরগুলোর মধ্যে গুয়াহাটি, আগরতলা এবং ইম্ফলের পরেই চতুর্থ স্থানে রয়েছে শিলচর বিমানবন্দর। এর রানওয়ের দৈর্ঘ্য হচ্ছে ৭,৫০০ ফুট। শিলচর বিমানবন্দরে বর্তমানে ATR-72 বিমান ছাড়াও Boeing 737-800 এবং Airbus A300 বিমান চলাচল করছে। বিঘ্নবিহীন ও নিরাপদভাবে বিমানের সুষ্ঠু ওঠানামা করার জন্য শিলচর বিমানবন্দর আধুনিক লাইটিং সিস্টেম PAPI (Precision Approach Path Indicator) এবং ILS (Instrument Lighting System)-র ব্যবস্থার দ্বারা সজ্জিত। কিন্তু পরিতাপের বিষয়, শিলচর বিমানবন্দরে Night Landing-র সব ব্যবস্থা এবং সুবিধা থাকা সত্ত্বেও কোনও অজ্ঞাত কারণে আজ পর্যন্ত রাতে বিমান চলাচলের ব্যবস্থা করা হয়নি। যেহেতু শিলচর বিমানবন্দরটি AAI (Airport Authority of India)-র নিয়ন্ত্রণাধীন নয়, সেজন্য একমাত্র IAF কর্তৃপক্ষই একথার উত্তর দিতে সক্ষম।

আমি একটু আগেই বলেছি, বেশ কিছুদিন ধরেই শোনা যাচ্ছে যে, শিলচরে একটি আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর নির্মাণ করার সম্ভাবনা আছে। কিন্তু এ ব্যাপারে কোনওরকম আনুষ্ঠানিক ঘোষণা এখন পর্যন্ত হয়নি। তবে একথা ঠিক, কেন্দ্র সরকার ডলু চা-বাগান অঞ্চলে ৮৭০ একর এলাকা নিয়ে একটি গ্রিনফিল্ড বিমানবন্দর স্থাপন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। অবশ্য এই বিমানবন্দরটি আন্তর্জাতিক পর্যায়ে উন্নীত হবার কতটুকু সম্ভাবনা আছে, সেটা একমাত্র অভিজ্ঞ মহলই বলতে পারবে। তবে একথাও ঠিক, শিলচরের ভৌগোলিক এবং স্ট্র্যাটেজিক অবস্থিতি শিলচরকে এক বিশেষ মাত্রা প্রদান করেছে। ফলে আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর স্থাপনের জন্য শিলচরের উপযুক্ততা ইম্ফল অথবা আগরতলার চেয়ে কোনও অংশে কম তো নয়, বরং একটু বেশিই বলা যেতে পারে। শিলচরের বিশেষ ভৌগোলিক অবস্থানের জন্য শিলচর থেকে ঢাকা চট্টগ্রাম, সিলেট, রেঙ্গুন, কুয়ালালামপুর, হ্যানয় এবং কুনমিং পর্যন্ত অনায়াসেই আন্তর্জাতিক ফ্লাইট চালানো সম্ভব। অবশ্য এ ব্যাপারে প্রথমে সবচেয়ে প্রয়োজন প্রস্তাবিত আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের জন্য বিভিন্ন গন্তব্যস্থলের Passenger Load Factor নিরূপণ করা।

পরিশেষে শুধু একটা কথাই বলবো, শিলচরের ভৌগোলিক স্থিতি, বর্তমানে দক্ষিণ এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার পরিবর্তনশীল রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে শিলচরকে এক বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ আন্তর্জাতিক মাত্রা প্রদান করেছে। এরই পরিপ্রেক্ষিতে শিলচরকে এক গুরুত্বপূর্ণ আন্তর্জাতিক বাণিজ্যকেন্দ্র এবং স্থলবন্দর (land port) হিসেবে আত্মপ্রকাশ করার যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে। তবে এজন্য সবচাইতে বড় প্রয়োজন জনসাধারণের সচেতনতা এবং আবারও বলছি রাজনৈতিক সদিচ্ছা।

বরাকের বিকল্প যোগাযোগ

গৌতমপ্রসাদ দত্ত

যোগাযোগ ব্যবস্থা হচ্ছে অর্থনৈতিক উন্নয়নের এক মৌলিক নির্ণায়ক বিষয়। ভৌগোলিক অবস্থান এবং প্রাপ্ত সম্পদের দিকটি বিবেচনা করেই সম্ভাবনাময় ক্ষেত্রগুলো চিহ্নিত করা হয়। এই চিহ্নিত এলাকার বিকাশে যোগাযোগ পরিকাঠামোর আধুনিকীকরণ ও সম্প্রসারণ অনুন্নয়নের রুদ্ধ দুয়ার খুলে দেয়। আর্থিক দুনিয়ার নীতিনির্ধারকদের আগ্রহ এবং সংলাপের পরিসর এতেই তৈরি হয়। এলাকার মানবসম্পদ উন্নয়নের পথও হয় প্রশস্ত।

উত্তর-পূর্বাঞ্চলের মানচিত্রে আসামের বরাক উপত্যকা এক অনন্য ভৌগোলিক অবস্থানে দাঁড়িয়ে রয়েছে। প্রাকৃতিক ও খনিজ সম্পদের প্রাচুর্য ছড়িয়ে রয়েছে এই ভূমিতে। কৃষিজাত সামগ্রীর উৎপাদনেও এই অঞ্চল অনেকটা এগিয়ে। অথচ এসবের পরিকল্পিত ব্যবহারের অত্যাধুনিক প্রয়াসের পথটি একবিংশ শতাব্দীতেও সাবলীল নয়। এই উপত্যকার প্রতি উপেক্ষা ও বঞ্চনার ইতিহাস এতটাই দীর্ঘ যে, বিভিন্ন সময়ে বিকাশের উদ্যম আশার ঝিলিক দেখালেও তা কখনও দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। স্থানীয় অনুভব হচ্ছে, রাষ্ট্র পূর্ব ভারতের এই পশ্চাৎপদ ভৌগোলিক খণ্ডে নাগরিক কল্যাণে কাঙ্ক্ষিত আন্তরিকতা প্রদর্শন করছে না। মনমোহন সিংহ সরকারের ‘পূর্বে তাকাও’ নীতি থেকে নরেন্দ্র মোদিজির ‘কর্মতৎপর পূর্বাঞ্চল’ নীতির সুফলের ছায়া এখানে প্রত্যাশিতভাবে পড়েনি।

১৮৩২ সালে তৎকালীন দেশীয় রাজ্য কাছাড় ব্রিটিশ সাম্রাজ্যে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার পর বাংলার রাষ্ট্রসীমায় থেকেও যেমন উন্নয়নের স্বচ্ছ মুখ দেখেনি, তেমনই ১৮৭৪ সালে ওই মানচিত্র থেকে নির্বাসিত হয়ে আসামের সঙ্গে জুড়ে যাওয়ার পরও সামগ্রিক অবস্থার কোনও গুণগত পরিবর্তন হয়নি। ১৯৪৭ সালে দেশভাগ এই অঞ্চলে যে সার্বিক বিপর্যয় নিয়ে এসেছিল, স্বাধীনতার সাড়ে সাত দশকের পর বহুচর্চিত ‘অমৃতকাল’-র আবহেও সামগ্রিক অবস্থার ছবি বদলায়নি। দেশের অন্যান্য বিকশিত ভূমির সমলয়ে দাঁড়ানোর স্বপ্ন এখনও অধরাই রয়ে গেছে। জনমতের চাপে ভোটের অঙ্কে গেল শতাব্দীর সাত ও আটের সরকারি ক্ষেত্রে রাতাবাড়িতে কাছাড় চিনিকল, পাঁচগ্রামে কাছাড় কাগজকল, বদরপুরঘাটে ইন্ডাস্ট্রিয়াল এস্টেট, বাঁশকান্দি ও আদমটিলার প্রাকৃতিক গ্যাসভিত্তিক দু’টি তাপ বিদ্যুৎ প্রকল্প স্থাপন করা হলেও উপযুক্ত পরিচালনা, সরকার ও রাজনৈতিক নেতৃত্বের আগ্রহের অভাবে একে একে সবই মুখ থুবড়ে পড়েছে। বেসরকারি ক্ষেত্রে চা এবং কৃষি উদ্যান শিল্পের বিরাট সম্ভাবনা থাকলেও এসবের বিকাশও তেমনভাবে হয়নি। কৃষি এ অঞ্চলের প্রধান জীবিকা হলেও তার আধুনিকীকরণ, চাষের জমিকে বছরভর ভালোভাবে ব্যবহার এবং উৎপাদিত সামগ্রীর বিপণন কাঠামোও গড়ে ওঠেনি। সংগঠিত এবং অসংগঠিত ক্ষেত্রে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পগুলোর চালচিত্র তেমন উজ্জ্বল নয়। নয়াদিল্লি ও দিসপুরে সময়ে সময়ে শাসককুলের মুখ বদল হলেও গত কুড়ি বছরে বরাক উপত্যকায় শিল্পায়নের জন্য বড় কোনও লগ্নি করা হয়নি। এসবের ফলে কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধির পরিবর্তে ক্রমশ সংকুচিত হচ্ছে। সামান্য পরিমাণে সরকারি নিযুক্তির যে ব্যবস্থা ছিল, উপেক্ষার পরিকল্পিত রাজনীতিতে তার

দুয়ারও ধীরে ধীরে বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। শিলচর কিংবা করিমগঞ্জে অত্যাধুনিক মল কোনওভাবেই এই উপত্যকার বিকাশের ছবি তুলে ধরে না।

এই আর্থিক দৈনদশা থেকে বেরিয়ে আসতে হলে সরকারি ও বেসরকারি ক্ষেত্রে স্থানীয় সম্পদভিত্তিক শিল্প স্থাপন জরুরি। কিন্তু অনির্ভরশীল যোগাযোগ ব্যবস্থা, অর্থ বিনিয়োগও শিল্প স্থাপনে গুরুত্বপূর্ণ অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে। স্বাধীনতার এত বছরেও এ অঞ্চলের জন্য সব ঋতুর উপযোগী সড়ক ও রেল যোগাযোগ তৈরি হয়নি। বিকল্প সড়ক ও রেলপথের দাবি উঠলেও সবই লালফিতার বাঁধনে বন্দি হয়ে রয়েছে। জাতীয় জলপথের মানচিত্রে বরাক নদী অন্তর্ভুক্ত হলেও এক দশক অতিক্রান্ত, প্রাথমিক পরিকাঠামোই গড়ে ওঠেনি।

রেল যোগাযোগের সূচনা পর্ব

মণিপুর বেয়ে আসা বরাক নদী বিধৌত এই উপত্যকা রেল মানচিত্রে স্থান পেয়েছে এক শতাব্দীর কিছুকাল আগে। মূলত আসামের চা, পাট ও কয়লা চট্টগ্রাম ও কলকাতা বন্দরে পৌঁছে দেওয়া এবং এ অঞ্চলে ব্রিটিশ নিয়ন্ত্রিত ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসারে আসাম-বেঙ্গল রেলওয়ে কোম্পানি চট্টগ্রাম থেকে বদরপুর হয়ে লামডিং ছুঁয়ে উত্তরমুখী রেলপথ নির্মাণের পরিকল্পনা নিয়েছিল। ১৮৮৩ থেকে ৮৭ সাল পর্যন্ত বড়াইল পাহাড়ের বুক চিরে দুর্গম পাহাড়ি পথে সমীক্ষা শেষে সদর্থক সুপারিশ করা হয়। তবে ব্রিটিশ প্রশাসন ও তার নীতিনির্ধারকরা প্রস্তাবিত এই রেলপথ নির্মাণে ঝুঁকি নিয়ে বিপুল পরিমাণ অর্থ লগ্নি বাস্তবোচিত হবে কিনা তা নিয়ে সংশয় ব্যক্ত করেন। অবশ্য ব্রিটেনের সেক্রেটারি অব স্টেটস্ এক্ষেত্রে ভারতের ব্রিটিশ সরকারকে সবুজ সংকেত দেন। ১৮৯৮ সালে চট্টগ্রাম থেকে বদরপুর হয়ে শিলচর অবধি রেলপথ নির্মাণের পরই বদরপুর থেকে লামডিং পথের কাজে হাত দেওয়া হয়। বহুমাত্রিক প্রতিকূলতা কাটিয়ে ১৯০৩ সালে এই নির্মাণপর্ব সাফল্যের মুখ দেখে। রেলের ইঞ্জিনিয়ার ও কর্মীরা তাদের উদ্ভাবনী শক্তি ও নৈপুণ্যকে কাজে লাগিয়ে অসম্ভবকে সম্ভব করে তুলেছিলেন। ১৯০৪ সালে এই নবনির্মিত রেলপথে আনুষ্ঠানিক যাত্রা শুরু হয়। ওই বছরের ১৩ ফেব্রুয়ারি চট্টগ্রামে রেলযাত্রার সূচনা অনুষ্ঠানে যোগ দিয়েছিলেন তৎকালীন ব্রিটিশ ভাইসরয় লর্ড কার্জন। সেদিন তিনি প্রত্যয় ব্যক্ত করে বলেছিলেন, এই রেলপথ পূর্ববঙ্গ থেকে আসাম— এই বিরাট ভূখণ্ডে সম্ভাবনার নতুন দিক উন্মোচিত করবে।

কিন্তু কার্জন সাহেব এই আশাবাদ ব্যক্ত করলেও যাত্রা শুরুর কিছুদিনের মধ্যেই কারিগরি সমস্যার দরুন দফায় দফায় রেল চলাচলে বিঘ্ন ঘটে। অত্যধিক বৃষ্টিপাত জটিলতার মাত্রা এমনভাবে বাড়িয়েছিল যে, ১৯১৬ সাল থেকে প্রায় এক বছর এই পাহাড়ি পথে পুরোপুরি বন্ধ ছিল রেলযাত্রা। সে-সময় রেলপথকে সচল করতে আসাম-বেঙ্গল রেলওয়ে কোম্পানিকে ৩৪ লক্ষ টাকা ব্যয় করতে হয়েছিল। সেই শুরু। ব্রিটিশ ভারতে এবং স্বাধীন ভারতে সমস্যার স্থায়ী সমাধান চেষ্টা করা হলেও মাত্রাতিরিক্ত বৃষ্টিপাতের জেরে ভূমিস্খলনের সমস্যা থেকেই গেছে। কখনও কখনও তা ভয়ঙ্কর রূপ নেয়। মিটারগেজ থেকে ব্রডগেজে রূপান্তরের পরও পরিস্থিতি বদলায়নি।

ভূমিস্খলনের এই সমস্যা ছাড়াও মিটারগেজ রেলপথ বরাক উপত্যকা, ত্রিপুরা, মিজোরাম ও মণিপুরের বড় অংশের চাহিদা মেটাতে পারছে না এবং ভবিষ্যতে সেটা জটিল সমস্যা হবে, এই বিবেচনায় গেল শতাব্দীর সাতের দশকের শেষভাগ থেকে ব্রডগেজ লাইন নির্মাণের দাবি উঠেছিল। এই দাবিতে চাপ বাড়ায় রেলমন্ত্রক রেলের সহযোগী প্রতিষ্ঠান রেল ইন্ডিয়া টেকনিক্যাল ইকোনমিক সার্ভিসেসকে (রাইট্স) বিকল্প রেলপথের জন্য সমীক্ষার নির্দেশ দেয়। এ অঞ্চলের বৃষ্টিপাত, ভূমির অবস্থা, বাড়তি চাপ নেওয়ার ক্ষমতা, রক্ষণাবেক্ষণের সমস্যা ইত্যাদি বিবেচনা করে রাইট্স ১৯৮৪ সালে লঙ্কা থেকে শিলচর অবধি ব্রডগেজ রেলপথ নির্মাণ

সবচেয়ে উপযোগী বলে প্রতিবেদন পেশ করে। কিন্তু এ অঞ্চলে রেল পরিষেবার আধুনিকীকরণে রেলের বড় কর্তাদের যেমন আগ্রহ ছিল না, তেমনই রাজনৈতিক স্তরে সদর্থক মনেরও যথেষ্ট অভাব ছিল। সড়ক পরিবহন লবি তাদের অত্যন্ত লাভদায়ক ব্যবসা স্থায়ী রাখতে তৎকালীন রাজনৈতিক নেতাদের নির্বাচনী তহবিল গঠনে সহায়তা শুরু করে বেশিমাত্রায়। ব্রডগেজের দাবি নিয়ে টালবাহানার মধ্যেই সিকে জাফর শরিফ যখন রেলমন্ত্রী ছিলেন, তখন শিলচর থেকে মেঘালয়ের বাংলাদেশ সীমান্ত ঘেঁষে তৎকালীন গোয়ালপাড়া জেলার যোগীগোপা পর্যন্ত নতুন ব্রডগেজ রেললাইন স্থাপনের উদ্ভট প্রস্তাব আনেন রেল বাজেটে। তবে প্রবল বিরোধিতায় ওই প্রস্তাব শেষ পর্যন্ত হিমঘরে চলে যায়।

ব্রডগেজের জন্য সংগ্রাম

ফলে আবার লঙ্কা-চন্দ্রনাথপুর-শিলচর ব্রডগেজ রেলপথের দাবি জোরদার হয়ে ওঠে। ভূতাত্ত্বিক ও কারিগরি প্রজ্ঞায় অভিজ্ঞতাসম্পন্ন বিশেষজ্ঞরা এই পথ অপেক্ষাকৃত কম ঝুঁকিবহুল বলে মত পোষণ করেন। কিন্তু রেল সংশ্লিষ্ট লবি রাজনৈতিক কর্তৃত্বশালী নেতাদের প্রভাবিত করে নানা যুক্তি দেখিয়ে শতবর্ষপ্রাচীন লামডিং-বদরপুর মিটারগেজ পথ ব্রডগেজে রূপান্তরের প্রস্তাবে সরকারি সিলমোহর আদায়ে সফল হয়। ১৯৯৬-৯৭ অর্থবছরে ২১০ কিলোমিটার দীর্ঘ লামডিং-বদরপুর-শিলচর ব্রডগেজ প্রকল্প প্রস্তাব রেল বাজেটে অন্তর্ভুক্ত করে, তার প্রাথমিক ব্যয় ধরা হয় ৬৪৮ কোটি টাকা। ৯৭-র ২২ জানুয়ারি স্বয়ং তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী এইচডি দেবেগৌড়া রেলমন্ত্রী রামবিলাস পাসোয়ান ও সে-সময়ের কংগ্রেস সংসদীয় দলের চিফ হুইপ সন্তোষমোহন দেবকে সঙ্গে নিয়ে শিলচরে প্রকল্পের আনুষ্ঠানিক শিলান্যাস করেন। ২০০৪ সালে মনমোহন সিংহ যখন প্রধানমন্ত্রী, তখন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সন্তোষমোহন দেবের চেষ্টায় এই ব্রডগেজ প্রকল্প জাতীয় প্রকল্পের মর্যাদা পায়। কিন্তু আর্থিক ব্যয়-বরাদ্দের সমস্যা অনেকটা মিটে যাওয়ায় কাজে গতি আসবে বলে যখন ধরে নেওয়া হয়েছিল, তখনই ২০০৬ সাল থেকে ডিমা হাসাও জেলায় হঠাৎ জঙ্গি তৎপরতা আশ্চর্যজনকভাবে বেড়ে যায়। জঙ্গি হামলায় নির্মাণের দায়িত্বে থাকা রেলকর্মী, কাজের বরাত পাওয়া ঠিকাদার সংস্থার বহু কর্মীকে বেঘোরে প্রাণ হারাতে হয়। এরসঙ্গে যুগলবন্দি হয়ে দেখা দেয় কারিগরি সমস্যা। দুর্বল ভূস্তর ও ভূমিস্খলনের সমস্যা লাঘব করতে হারাঙ্গাজাও থেকে ফাইডিং পুরনো পথ এড়িয়ে মাইগ্রেনডিসা থেকে ডিটেকছড়া নতুন পথে নির্মাণের কাজে হাত দেওয়া হয়। কিন্তু নিরাপত্তা সমস্যা এমন জটিল রূপ নেয় যে, কাজ কার্যত বন্ধ হয়ে পড়ে। ২০০৮ সালের ২১ মে ওই সময়ের রেলমন্ত্রী লালুপ্রসাদ যাদব এক্ষেত্রে আসাম সরকারের সহযোগিতার অভাবের কথা খোলাখুলি ব্যক্ত করেন। এই পরিস্থিতিতে নির্মাণ ব্যয় বেড়ে যাওয়ায় প্রকল্পের রূপায়ণ অনিশ্চিত হয়ে পড়লেও এ নিয়ে প্রবল কোনও রাজনৈতিক আন্দোলন গড়ে তুলতে শাসক ও বিরোধী নেতৃত্ব তেমন আগ্রহ দেখাননি। বাঁধাধরা কিছু কথা এবং মাঝে মধ্যে কর্মসূচির মধ্যেই সব তৎপরতা সীমিত ছিল। এই অবস্থায় সমাজের বিভিন্ন স্তরের নাগরিকরা এগিয়ে এসে গড়ে তোলেন নাগরিক আন্দোলন। এক্ষেত্রে ‘নাগরিক স্বার্থরক্ষা সংগ্রাম পরিষদ’ ও ‘ব্রডগেজ রূপায়ণ সংগ্রাম কমিটি’ ধারাবাহিকভাবে বিভিন্ন মাত্রায় সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ে। অন্যদিকে, ‘সিটিজেন ফোরাম’ দাবি আদায়ে জনস্বার্থ মামলা দায়ের করে গৌহাটি হাইকোর্টে। এসব নাগরিক তৎপরতা রেলমন্ত্রক, দিল্লি-দিসপুর, স্থানীয় জনপ্রতিনিধি এবং দলীয় নেতাদের যথেষ্ট চাপে ফেলে দেয়। মুখরক্ষায় তখন তারা কিছুটা নড়ে বসেন। ২০১৪ সালের ২৮ জানুয়ারি গৌহাটি হাইকোর্টের দুই বিচারপতি কে শ্রীধর রাও এবং পিকে শইকিয়া ‘সিটিজেন ফোরাম’-র জনস্বার্থ মামলার রায় দিয়ে ২০১৫ সালের ১৫ মার্চের মধ্যে ব্রডগেজ নির্মাণপর্ব শেষ করার জন্য ভারত ও আসাম সরকার এবং উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়েকে কড়া নির্দেশ দেন। এই নির্দেশের পরই কাজে গতি বাড়ে। কেন্দ্রে

সরকার বদলের পর নয়া সরকার ইতিবাচক ভূমিকা নেয়। হাইকোর্টের নির্দেশ মেনে ২০১৪ সালের ১ অক্টোবর থেকে মেগা ব্লক শুরু হয় বরাক সহ গোটা পাহাড় লাইনে। ছ'মাসে কাজ অবিশ্বাস্য গতিতে শেষ হয়ে ২০১৫ সালের ১৩ মার্চ যখন ব্রডগেজ ইঞ্জিন লামডিং থেকে পাহাড়ি পথ বেয়ে বদরপুর হয়ে শিলচর পৌঁছয়, তখন উপত্যকাজুড়ে ছিল উৎসবের মেজাজ। এই উচ্ছ্বাস দেখে অভিভূত প্রথম আসা ব্রডগেজ রেল ইঞ্জিনের চালক একে রাম সেদিন অকপটে বলেন, 'ব্রডগেজ রেলের জন্য একটা অঞ্চলের সর্বস্তরের মানুষের এই আর্তি যে কতটা গভীর থেকে উঠে এসেছে, বাইরের দুনিয়ার কেউ না দেখলে তা বিশ্বাস করবেন না।'

এই ব্রডগেজ প্রকল্পের নির্মাণ ব্যয় ১৯৯৬-৯৭ অর্থবছরে যেখানে ধরা হয়েছিল ৬৪৮ কোটি টাকা সেখানে চূড়ান্ত পর্যায়ে ২০১৪-১৫ অর্থবছরে তা বেড়ে দাঁড়ায় ৩,৫০০ কোটি টাকা। ২০১৫ সালের ২১ মার্চ নয়াদিল্লির রেলমন্ত্রকের কনফারেন্স হল থেকে শিলচর-গুয়াহাটি যাত্রীবাহী রেলের যাত্রার সূচনা করেন ওই সময়ের রেলমন্ত্রী সুরেশ প্রভু। শিলচর রেলস্টেশনে বাঁধভাঙা উচ্ছাসের মধ্যে সবুজ পতাকা নেড়ে যাত্রা সংকেত দেন রেল প্রতিমন্ত্রী মনোজ সিন্‌হা। সেদিন গোটা রেলপথের দু'পাশে জনসমাবেশ ছিল নজিরবিহীন। পশ্চাৎপদ এ অঞ্চলের উন্নয়নের জন্য সংগ্রামের ইতিহাসে এভাবেই তৈরি হয় নয়া অধ্যায়।

বড়াইলে বিপর্যয়

তবে ব্রডগেজে রেল চললেও লাইনের ভবিষ্যৎ নিয়ে একটা চাপা সংশয় ছিল একেবারে গোড়া থেকেই। এই শঙ্কার ভিত্তি ছিল তৎকালীন কমিশনার অব রেলওয়ে সেফটি (সিআরএস) সুদর্শন নায়েকের পর্যবেক্ষণ। নির্মিত লাইন পরিদর্শন করে ২০১৫ সালে পেশ করা তাঁর প্রতিবেদনে তিনি বলেন, জিও টেকনোলজির প্রাথমিক শর্ত এতটাই নির্মাণপর্বে লঙ্ঘিত হয়েছে যে, অদূর ভবিষ্যতে পাহাড় লাইনে ভয়াবহ বিপর্যয় ঘটে যেতে পারে। তিনি এক শব্দবন্ধে বিষয়টিকে বলেছিলেন 'ক্যাটাস্ট্রফিক ডিজাস্টার'। বড়াইলের মাটির স্তর, পাহাড়ের অবস্থান, স্ট্রাকচারাল ইঞ্জিনিয়ারিং, জিও টেকনোলজির ব্যবহার দেখে এসবের ত্রুটি সারানোর জন্য বহুমাত্রিক সুপারিশ করেন তিনি। নিয়মিত নজরদারি না রাখলে ধসপ্রবণ এলাকায় হুমকির সম্ভাবনা বেড়ে যাবে, এমন সতর্কবার্তাও দেন। তিনি ইনক্লোমিটার, জিজোমিটারের মত যন্ত্র বসিয়ে দেখভালের ব্যবস্থা করতে বলেছিলেন। তাঁর এই সতর্কীকরণের সাত বছরের মাথায় ২০২২ সালের মে মাসে অত্যধিক বর্ষণে পাহাড় লাইনে বাস্তবিকই বড় বিপর্যয় নেমে আসে। ওই বছরের ১৪ থেকে ১৮ মে এই পাঁচদিন অবিশ্বাস্যভাবে ৫৮টি স্থানে ধস নামায় রেলপথ একেবারেই অচল হয়ে পড়ে। এরমধ্যে ২৪টি জায়গা ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়। সবচেয়ে ভয়ঙ্কর হয়ে ওঠে নিউ হাফলং রেলস্টেশন। পাহাড় বেয়ে নেমে আসা জল-কাদা আর পাথরে শিলচর অভিমুখে আসা রেলের দুটো ইঞ্জিন প্রায় মাটির নীচে চলে যায়। গোটা স্টেশন চত্বর তিন থেকে দশ ফুট উচ্চতায় নুড়িপাথর, মাটি-কাদায় ভরাট হয়ে যায়। পাহাড় লাইনে ধস নেমে রেল চলাচল বন্ধ হয়ে যাওয়ায় রেলযাত্রীরা আগেই নিরাপদে সরে যান। ফলে সে-সময় বড় ধরনের মানব বিপর্যয় ঘটেনি। রেলের হিসেব অনুযায়ী, ২০২২ সালে পাহাড় লাইনে এই ধ্বংসকাণ্ডে আর্থিক ক্ষতির পরিমাণ দাড়ায় সাড়ে তিনশো কোটি টাকার মতো। ধস সরিয়ে নিউ হাফলং রেলস্টেশন সহ গোটা

পথকে সচল করতে রেলমন্ত্রক দিয়েছে ১৮০ কোটি টাকা। আধুনিক প্রযুক্তিকে কাজে লাগিয়ে বিপর্যস্ত রেলপথকে ফের সচল করা হলেও ভবিষ্যতে তার পুনরাবৃত্তি হবে না, এমন গ্যারান্টি রেল সহ কারও পক্ষেই দেওয়া সম্ভব হয়নি। এর ফলেই শুরু হয়েছে বিকল্পের খোঁজ।

ভয়ঙ্কর সোনাপুর

তবে বিপর্যয় যে শুধু পাহাড় লাইনের রেলপথেই ঘটে তা নয়, বড়াইল ও জয়ন্তিয়ার বুক চিরে যাওয়া সড়কপথও প্রতি বর্ষায় মুখ থুবড়ে পড়ে। শিলচর থেকে হাফলং ঘেঁষে লামডিং-নগাঁও যাওয়ার যে সড়কপথ রয়েছে, সেটা কোনওভাবেই সব ঋতুতে চলার উপযোগী নয়। মহাসড়কের যে স্বপ্ন দেখানো হয়েছিল, তা প্রশাসনিক দীর্ঘসূত্রিতা, অনির্ভরযোগ্য ভূমিস্তর এবং অতিরিক্ত বৃষ্টিপাত ও তার জেরে স্থানে স্থানে ধস পতন বড় সমস্যা হলেও কাজের বরাত পাওয়া নির্মাণ সংস্থার মন্থর কাজকর্ম এবং রাজনৈতিক অনাগ্রহে বহুমাত্রিক অন্তরায় তৈরি হয়েছে। ফলে মহাসড়কের বাস্তবায়ন নিয়ে লক্ষ্যমাত্রা বারবারই পরিবর্তন হচ্ছে। আসামের মধ্য দিয়ে বরাক ও ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার নির্ভরযোগ্য সড়ক যোগাযোগের দাবি স্বাধীনতার সাড়ে সাত দশকেও পূরণ না হওয়ায় জোয়াই-বদরপুর জাতীয় সড়কই বরাক উপত্যকা, ত্রিপুরা, মিজোরাম ও মণিপুরের একাংশের একমাত্র ভরসার সড়কপথ। কিন্তু প্রতি বর্ষায় লোভা নদীর গা-ঘেঁষে যাওয়া ৬ নং জাতীয় সড়কের বিপদসঙ্কুল সোনাপুরে ধস নামায় ঘন ঘন স্তব্ধ হয়ে পড়ে যান চলাচল। ধসের এই সমস্যা ২০০১ সালে ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করে, শিলচর থেকে গুয়াহাটি যাওয়া একটি যাত্রীবাহী বাস ধসে তলিয়ে যায় লোভা নদীতে। শিলচরের ১০ জনের প্রাণহানি ঘটে ওই ভয়ঙ্কর দুর্ঘটনায়। ওই বছর প্রায় এক মাস জোয়াই-বদরপুর সড়কপথ বিচ্ছিন্ন ছিল। পরবর্তী সময়ে সোনাপুরে আরও দুর্ঘটনা ঘটেছে, ঘটেছে প্রাণহানিও। এই সমস্যা সমাধানের জন্য প্রবল দাবি উঠলে সীমান্ত সড়ক সংস্থার (বিআরও) তরফে ধসরোধী একটি প্রকল্প প্রস্তাব অবশেষে তৈরি হলেও দিল্লির অনুমোদন ও আর্থিক বরাদ্দ পেতে আরও কয়েক বছর গড়িয়ে যায়। ২০০৭ সালের ডিসেম্বর মাসে কেন্দ্রীয় সড়ক পরিবহন, জাতীয় সড়ক ও জাহাজমন্ত্রক সোনাপুরের ধসপ্রবণ এলাকায় একটি সুড়ঙ্গ তৈরির প্রকল্প প্রস্তাব অনুমোদন করে। স্থির হয় ১১৭ কোটি টাকা ব্যয়ে ১২৩ মিটার দীর্ঘ ও ৪ মিটার প্রস্ত দু'লেনের সড়কের সুড়ঙ্গ পথটি দ্রুত তৈরি হবে। সীমান্ত সড়ক সংস্থার প্রজেক্ট সেতুক ২০০৮ সালের জানুয়ারি মাসে সুড়ঙ্গ ও পথ নির্মাণের কাজ শুরু করে আট মাসে তা শেষ করে। ওই বছরের ২৯ সেপ্টেম্বর কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষা প্রতিমন্ত্রী পাল্লাম রাজু আনুষ্ঠানিকভাবে এই সুড়ঙ্গ পথটি উদ্বোধন করেন। ওই সময় সীমান্ত সড়ক সংস্থার তরফে প্রত্যয় ব্যক্ত করে বলা হয়েছিল, এই নবনির্মিত সুড়ঙ্গ পথ ধস এবং পাহাড়ি কাদামাটি থেকে জাতীয় সড়কের রক্ষা করবে। এমন ব্যবস্থা থাকবে যে, উপরের পাহাড় বেয়ে মাটি-পাথর নেমে এলেও পথে কোনও ব্যাঘাত তৈরি না করে সেগুলো লোভা নদীতে চলে যাবে। কিন্তু এই প্রত্যাশা পূরণ হয়নি। কয়েক বছর ধরে পরিস্থিতির এতটাই

অবনতি ঘটেছে যে, বিষয়টি এখন মেঘালয় হাইকোর্ট পর্যন্ত গড়িয়েছে। ওই রাজ্যের উচ্চ আদালত জোয়াই-বদরপুর সড়ক দেখভালের দায়িত্বে থাকা জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষকে (নাহাই) সোনাপুরে ধসরোধী ব্যবস্থার সমাধানের জন্য পদক্ষেপ নিতে নির্দেশ দিয়েছে। তবে জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষের তরফে এটা স্বীকার করা হয়েছে, সোনাপুরের পরিস্থিতি ক্রমশই জটিল রূপ ধরেছে। আগে যেখানে ২০-২৫ মিটার অংশে ধস নামতো, এখন তার পরিসর অনেক বেড়ে গেছে। ফলে সোনাপুরের সুড়ঙ্গ আর জাতীয় সড়ককে রক্ষা করতে পারছে না। ওখানকার পাহাড়ের পাথরের দুর্বল গুণমান, পাথরে পাথরে সংযোগস্থলগুলোর অস্থিতিশীল অভিযোজন এবং ভূমিস্তরের বিভিন্ন প্রতিকূল পর্যায় ভারি বৃষ্টিপাতের সময় ধসপ্রবণতাকে বাড়িয়ে দিচ্ছে। এ বছর (২০২৩) যে মাত্রায় পাথর, মাটি, কাদা নেমে এসে দফায় দফায় পথটিকে অচল করে সোনাপুরকে ভয়ঙ্কর করে তুলেছে, তাতে বিকল্পের সন্ধান অপরিহার্য মনে করছে খোদ নাহাই।

অনাদৃত বরাকের জাতীয় জলপথ

অর্থনৈতিক বিকাশে জলপথের গুরুত্ব আর্থিক ক্ষেত্রের সঙ্গে যুক্ত সব মহলই মেনে নিয়েছে। এই ভাবনার আলোকে দেশের গুরুত্বপূর্ণ নদীগুলোকে জাতীয় জলপথ হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। এই তালিকায় বরাক নদীকে ১৬ নং জাতীয় জলপথের মর্যাদা দিয়ে অন্তর্ভুক্ত করা হলেও গত এক দশকে কাজের কাজ কিছুই হয়নি। স্থির হয়, পূর্বে লক্ষীপুর থেকে পশ্চিমে ভাঙ্গা অবধি জলপথ গড়ে তোলা হবে, যা করিমগঞ্জকে যুক্ত করে বাংলাদেশের মধ্য দিয়ে কলকাতা বা হলদিয়া পর্যন্ত সংযোজিত হবে। এই পথের নাব্যতার সম্ভাবনা কতটুকু এ নিয়ে অভ্যন্তরীণ জলপথ কর্তৃপক্ষ (আইডব্লুএআই) ১৯৯১ সালে হাইড্রোগ্রাফিক সমীক্ষা চালায়। এরপর কেন্দ্র সরকারের এই প্রতিষ্ঠান মেসার্স রাইট্স দিয়ে ১৯৯৮ সালে আর্থ-কারিগরি সম্ভাব্যতা পর্যবেক্ষণও করিয়ে নেয়, যার প্রতিবেদনে এই অভিমত ব্যক্ত করা হয়, লক্ষীপুর থেকে করিমগঞ্জ পর্যন্ত বরাক নদী দিয়ে জলযান চালানোর যথেষ্ট কারিগরি ও বাণিজ্যিক সম্ভাবনা রয়েছে। বিষয়টি আরও পাকাপোক্ত হয় ২০১৩ সালের ২২ মার্চ। ওইদিন রাজ্যসভায় বরাক নদীকে জাতীয় জলপথ ঘোষণা করতে চেয়ে বিল উত্থাপন করেন তৎকালীন জাহাজ মন্ত্রী জি কে ভাসান। ওই বিলেই লক্ষীপুর থেকে ভাঙ্গা অবধি পরিকাঠামোযুক্ত ১২১ কিলোমিটার দীর্ঘ জলপথ চালু করার প্রস্তাব উত্থাপিত হয়। একই বছরের ১৪ আগস্ট বিলটি রাজ্যসভায় অনুমোদিত হওয়ার পর যথেষ্ট আশার সঞ্চারিত হয় সব মহলে। প্রস্তাবিত প্রকল্পের নির্মাণে ব্যয় ধরা হয়েছিল ১২৩.৩ কোটি টাকা এবং বলা হয় দু'টি পর্যায়ে (২০১৬-১৭ এবং ২০১৮-১৯) প্রকল্পটি সম্পূর্ণ হলে বছরে ১২.৫ লক্ষ টন পণ্য ও মানব পরিবহন করা যাবে। ইতিমধ্যে মিজোরাম সরকার এই প্রকল্পকে স্বাগত জানিয়ে লক্ষীপুর থেকে পূর্বদিকে টিপাইমুখ পর্যন্ত সম্প্রসারণের জন্য কেন্দ্রকে প্রস্তাব পাঠায়। ওই প্রস্তাব নিয়ে কোনও সিদ্ধান্ত না হলেও মূল প্রকল্প প্রস্তাবে একদিকে লক্ষীপুর থেকে ভাঙ্গা অবধি পথের নাব্যতা বৃদ্ধি ও জাহাজ চলাচলের পরিকাঠামো তৈরি, টার্মিনাল স্থাপন, ট্রানজিট শেড নির্মাণ এবং আনুষঙ্গিক ব্যবস্থার কথা বলা হয়েছে, অন্যদিকে ইন্দো-বাংলাদেশ প্রটোকল রুটের অধীন করিমগঞ্জ থেকে কলকাতা বা হলদিয়া পর্যন্ত জল পরিবহন ব্যবস্থা চালু করার কথাও উল্লেখ করা হয়। বাংলাদেশের আশুগঞ্জ থেকে জকিগঞ্জ পর্যন্ত অংশে নাব্যতা বৃদ্ধিতে ভারত আর্থিক সহায়তা দেবে বলেও জানায় দিল্লি। এর বাস্তবায়ন হলে এখানে উৎপাদিত সামগ্রী যেমন কলকাতা ও চট্টগ্রামে পাঠানোর দুয়ার খুলে যাবে, তেমনই কম পরিবহন ব্যয়ে ওখান থেকে পণ্য আমদানি সহজ হবে। ২০২২ সালের ২৯ মার্চ উত্তর-পূর্বাঞ্চল উন্নয়ন দফতর (ডোনার) মন্ত্রী জি কিষান রেড্ডি লোকসভায় একই কথার অনুরণন করে বলেন, কেন্দ্র ইন্দো-বাংলাদেশ প্রটোকল রুট ব্যবহার করে কলকাতা থেকে সহজে পণ্যসামগ্রী করিমগঞ্জ, শিলচর পর্যন্ত পৌঁছে দেওয়া এবং ফেরার পথে ওখানকার

সামগ্রী নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করতে চাইছে। এজন্য জলপথ উন্নয়ন ও পরিকাঠামো নির্মাণ খাতে ১৪৮ কোটি ব্যয়ের লক্ষ্য ধার্য করা হয়েছে। কিন্তু অর্থ মঞ্জুরি না আসায় প্রাথমিক কাজকর্ম এখনও শুরুই হয়নি। অভ্যন্তরীণ জলপথ কর্তৃপক্ষ বরাক নদীকে জাতীয় জলপথ হিসেবে গড়ে তোলার দায়িত্ব দিয়েছে কেন্দ্রীয় অভ্যন্তরীণ জল পরিবহন নিগমকে। কিন্তু ওদের ভাষ্য — আর্থিক মঞ্জুরি পেলেই কাজ শুরু হবে। কেন্দ্রীয় জল পরিবহন ও জাহাজ মন্ত্রী সর্বানন্দ সোনোয়াল রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী থাকাকালে 'বরাক নমামি' উৎসব করে উপত্যকার মানুষকে জলপথ নিয়ে স্বপ্ন দেখালেও এখন কেন্দ্রে জল পরিবহন মন্ত্রকের দায়িত্ব পাওয়ার পর তাঁর সব উৎসাহ ব্রহ্মপুত্রকেন্দ্রিক সীমায়িত দেখা যাচ্ছে। বরাকের কথা শুধুই কাগজে।

অনিশ্চিত মহাসড়ক

গোটা দেশের যোগাযোগ পরিকাঠামো বহুমাত্রিক পর্যায়ে উন্নত হওয়ায় যেখানে জাতীয় ছবিটাই পাল্টে গেছে, সেখানে পূর্ব ভারতের পশ্চাৎপদ বরাক উপত্যকা ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে সারা বছরের জন্য নির্ভরযোগ্য যোগাযোগ ব্যবস্থার স্বপ্ন এখনও অধরা। আঞ্চলিক অর্থনীতিকে সচল রাখতে এবং বর্তমান ও আগামী দিনের চাহিদার কথা মাথায় রেখে বিকল্প যোগাযোগ কাঠামোর দাবি দীর্ঘদিনের হলেও তা অনাদৃতই রয়ে গেছে। রাজনৈতিক অনাগ্রহ ও সরকারি দীর্ঘসূত্রিতার যুগলবন্দিতে উপেক্ষা ও বঞ্চনা কোন্ পর্যায়ে পৌঁছতে পারে, বরাক বিধৌত ভূমি তার উদাহরণ হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে।

সর্বাগ্রেই আসে স্বপ্নের মহাসড়কের কথা। ১৯৯৮ সালের ১০ অক্টোবর প্রয়াত প্রধানমন্ত্রী অটলবিহারী বাজপেয়ী শিলচর-সৌরাষ্ট্র মহাসড়ক প্রকল্পের কথা ঘোষণা করেন। ছ'বছর পর তৎকালীন কেন্দ্রীয় স্থল পরিবহন মন্ত্রী বি সি খাণ্ডুরি ও কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী যশোবন্ত সিং শিলচর এসে প্রকল্পের শিলান্যাস করেন। তিন বছরের মধ্যে ওই প্রকল্পের প্রাথমিক কাজকর্ম শেষ হবে বলে ঘোষণা করা হয়েছিল। কিন্তু আন্তঃপ্রশাসনিক টানাপোড়েন, লালফিতার বাঁধন, বরাত পাওয়া নির্মাণ সংস্থাগুলোর দীর্ঘসূত্রিতা, বড়াইলের অস্থিতিশীল ভূমি ব্যবস্থা, ধসপতন ও আইন-শৃঙ্খলাজনিত সমস্যার দরুন শিলান্যাসের কুড়ি বছর অতিক্রান্ত হওয়ার পরও বলা যাচ্ছে না মহাসড়ক নির্মাণ কবে নাগাদ শেষ হবে। বন ও পরিবেশ দফতরের ছাড়পত্রের দোহাই দিয়ে এই পথের বালাছড়া-হারাঙ্গাজাও অংশের কাজ দীর্ঘদিন আটকে রাখার পর সবুজ সংকেত পেয়ে নির্মাণে অগ্রগতি ঘটলেও হারাঙ্গাজাও-জাটিঙ্গা এবং জাটিঙ্গা-নৃরিমবাংলো অংশের কাজ চলছে অত্যন্ত মন্থর গতিতে, এক্ষেত্রেও উঠে আসছে নানা প্রতিবন্ধকতার কথা। অথচ ডিমা হাসাও জেলার ওপাশ থেকে আসামের মধ্য দিয়ে যাওয়া মহাসড়কের কাজ অনেকদিন আগেই শেষ হয়ে গেছে। ওই অনিশ্চয়তা কাটাতে গৌহাটি হাইকোর্ট স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে মামলা হাতে নিয়ে কেন্দ্র, রাজ্য সরকার ও জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষকে হলফনামা পেশ করতে নোটিশ দিয়েছে।

বিকল্প সড়ক নির্মাণে টালবাহানা

মহাসড়ক নিয়ে এই দোলাচলের মধ্যেই বেসরকারি বিশেষজ্ঞদের প্রস্তাবক্রমে শিলচর-গুয়াহাটি বিকল্প সড়কের দাবি উঠেছিল ২০০৬ সালের ১ নভেম্বর। আসামের ভেতর দিয়ে একটি নির্ভরযোগ্য কম ঝুঁকিবহুল পথের কথা বিবেচনা করে ৬২৭ ও ২৯ নং জাতীয় সড়ক দু'টিকে পুরাতন সড়কপথের উন্নয়ন ঘটিয়ে সংযোজিত করার প্রস্তাব কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের কাছে উত্থাপিত হয়। ওই প্রস্তাব অনুসারে শিলচর থেকে উধারবন্দ (১১ কিঃমিঃ), উধারবন্দ থেকে হারাঙ্গাজাও (৬০ কিঃমিঃ), হারাঙ্গাজাও থেকে তুরুক (২৭ কিঃমিঃ), তুরুক থেকে সাংবর (৪৮ কিঃমিঃ), সাংবর থেকে উমরাংশু (১৯ কিঃমিঃ), উমরাংশু থেকে পানিমুর (৩০ কিঃমিঃ), পানিমুর

থেকে নেলি থেকে (২৯ কিঃমিঃ), নেলি থেকে জাগিরোড (১৫ কিঃমিঃ) এবং জাগিরোড থেকে গুয়াহাটি (৫৫ কিঃমিঃ) এই পথটির মোট দৈর্ঘ হবে ২৯২ কিঃমিঃ, যা বর্তমান শিলচর-গুয়াহাটি সড়কপথ থেকে দূরত্ব প্রায় ৬০ কিঃমিঃ কম। ফলে রাজধানীতে পৌঁছতে চার ঘণ্টা সময় কম লাগবে।

২০০৭ সালের অক্টোবরে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিংহের সভাপতিত্বে কেন্দ্রের অর্থনৈতিক বিষয়ক কমিটির সভায় উত্তর-পূর্বাঞ্চলের সড়ক উন্নয়নে ৯৯৪ কিঃমিঃ জাতীয় সড়ক নির্মাণে অনুমোদন দেওয়া হয়। এই তালিকায় প্রস্তাবিত নেলি-শিলচর পথটি অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল। ২০১৩ সালের ১৬ ডিসেম্বর তরুণ গগৈ নেতৃত্বাধীন মন্ত্রিসভার অর্থমন্ত্রী অজন্তা নেওগ শিলচর-হারাঙ্গাজাও-তুরুক- জাগিরোড-গুয়াহাটি দু'লেনের সড়ক নির্মাণের জন্য কেন্দ্রের স্থল পরিবহন বিভাগের অর্থানুকূল্যে বিস্তৃত প্রকল্প প্রতিবেদন (ডিপিআর) তৈরি করা হচ্ছে বলে জানিয়েছিলেন। ওই পর্যন্তই। এ নিয়ে সরকারিভাবে আর কোনও কথা শোনা যায়নি। চলতি বছরের (২০২৩) গত ১৩ মার্চ আসাম বিধানসভায় পূর্ত দফতরের দায়িত্বে থাকা মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা এক প্রশ্নের উত্তরে জানান, প্রস্তাবিত শিলচর-তুরুক-জাগিরোড পথটির বিস্তৃত প্রকল্প প্রতিবেদন (ডিপিআর) তৈরির জন্য ম্যানেজমেন্ট কনসালটেন্সি নিয়োগের দরপত্র আহ্বান করা হয়েছে। কেন্দ্রীয় সড়ক পরিবহন ও জাতীয় সড়ক বিভাগ যৌথভাবে এই দরপত্র আহ্বান করেছে। পাশাপাশি প্রস্তাবিত পথের প্রযুক্তিগত মূল্যায়ন প্রক্রিয়াও চলছে। এই দীর্ঘসূত্রিতায় প্রস্তাবিত বিকল্প সড়ক নির্মাণ প্রকল্পের কাজ কার্যত অনিশ্চিত অবস্থায়ই রয়েছে।

সোনাপুর বাইপাস

আসামের ভেতর দিয়ে বরাক ও ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার সড়ক যোগাযোগের যখন এই হাল তখন একমাত্র ভরসাস্থল জোয়াই-বদরপুর জাতীয় সড়কের সোনাপুরে ক্রমাগত ধস পতন উৎকণ্ঠার মাত্রা বাড়াচ্ছে। পথের এই হালে উদ্বিগ্ন পূর্ব জয়ন্তিয়া পার্বত্য জেলার জেলাশাসক অভিলাষ বার্নওয়াল ১৬ জুন, ২০২৩-এ শিলঙে অবস্থিত জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষের (নাহাই) প্রজেক্ট ডিরেক্টরকে এক চিঠি লিখে জোয়াই-বদরপুর পথ দিয়ে সড়ক যোগাযোগ অব্যাহত রাখার জন্য ধস প্রতিরোধী ব্যবস্থা নিতে বলেন। পাশাপাশি সমস্যা সমাধানের বিষয়টি নিয়ে ভাবার যৌক্তিকতাও তুলে ধরেন। এই চিঠি পাওয়ার পর নাহাইর শিলং প্রজেক্ট ডিরেক্টর আনন্দ সিং চৌহান বলেছেন, পরিস্থিতি মোকাবিলার একটা স্থায়ী সমাধান দেখতে হবে। কী হতে পারে স্থায়ী সমাধান, তার একটা রূপরেখা তিনি দিয়েছেন — (১) বর্তমান সুড়ঙ্গকে আরও দীর্ঘায়িত করা, (২) আরও উঁচুপথে করিডর নির্মাণ। এই দুটো ক্ষেত্রেই দিল্লির প্রশাসনিক অনুমোদন ও আর্থিক মজুরি দরকার। কিন্তু তাতেও সমাধান মিলবে, এমন আশা করছেন না ভূতাত্ত্বিক ও অভিজ্ঞ প্রকৌশলীরা।

এই অনিশ্চয়তার মধ্যেই জাতীয় সড়ক ও পরিকাঠামো উন্নয়ন নিগম লিমিটেড (এনএইচআইডিসিএল) শিলং বাইপাস থেকে শিলচর পর্যন্ত উন্নতমানের চারলেন যুক্ত সড়ক তৈরির পরিকল্পনা হাতে নিয়ে তার বিস্তৃত প্রকল্প প্রতিবেদন (ডিপিআর) প্রস্তুতের কাজে হাত দিয়েছে। বলা হয়েছে, তারা এমন এক বিকল্প পথ নির্মাণ করতে চাইছে, যে পথে ৮০ কিঃমিঃ পর্যন্ত গতিতে যান চলাচল করতে পারবে। এজন্য সোনাপুরকে এড়িয়ে সড়কটিকে নিয়ে যেতে তারা আগ্রহী। কিন্তু কবে ডিপিআর হবে, কবে সরকারি অনুমোদন ও আর্থিক মঞ্জুরি মিলবে আর সড়ক হবে গোটা ব্যাপারটা অনিশ্চয়তার ঘেরাটোপে থাকবে হয়তো বহুদিন।

ইতিপূর্বে সোনাপুরের অস্থিতিশীল ভূমি ও ধস প্রবণতা লক্ষ্য করে সীমান্ত সড়ক টাস্ক ফোর্স (বিআরটিএফ) ১৯৯৭ সালে এক সমীক্ষা প্রতিবেদন তৈরি করে গুমড়া- জালালপুর-নাতানপুর-লাড্রিমবাই বিকল্প পথ নির্মাণের প্রস্তাব দিয়েছিল। ১২৪.৪০ কিলোমিটারের প্রস্তাবিত বিকল্প সড়কে ১৪.৮০ কিঃমিঃ

অংশ আসামে এবং বাকি ১০৯.৬০ কিঃমিঃ মেঘালয়ে পড়েছে। এই পথটি নির্মিত হলে বদরপুর থেকে শিলঙের দূরত্ব অন্তত ২৫ কিঃমিঃ হ্রাস পেতে পারে। মেঘালয় সরকার তার এলাকার অংশটি দু'টি পর্যায়ে নির্মাণের সিদ্ধান্ত নেয়। প্রথম পর্যায়ে ৬৩ কিঃমিঃ এবং পরবর্তী সময়ে বাকি অংশের কাজ হবে। ২০১১ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারি উত্তর পূর্ব কাউন্সিল (এনইসি) দফতরে প্রস্তাবিত পথের ডিপিআরও জমা পড়ে। কিন্তু বন বিভাগের ছাড়পত্র, অসম-মেঘালয় আন্তঃরাজ্য সীমা বিবাদ, স্থানীয় জনগণের আপত্তি ইত্যাদি কারণ দর্শিয়ে এনইসি ও মেঘালয় পূর্ত দফতর কার্যত হাত গুটিয়ে রয়েছে, অথচ ২০১৬ সালের ২৪ অক্টোবর কেন্দ্রীয় বন ও পরিবহন মন্ত্রক এই সড়ক নির্মাণের জন্য ৪.২১ হেক্টর বনভূমিতে ছাড়পত্র দেওয়ার কথা মেঘালয় সরকারকে জানায়। ২০১৭ সালের ২৬ ডিসেম্বর ডোনার মন্ত্রক আনুষ্ঠানিকভাবে জানায়, প্রস্তাবিত পথটি কিছু অন্তরায় দূর করে দু'টি পর্যায়ে নির্মিত হবে, কিন্তু সব আশ্বাসই হিমঘরে তুলে রাখা হয়েছে। এ নিয়ে শিলচর পিপল্‌স সোসাইটির তরফে সভাপতি বিদ্যুজ্জ্যোতি পুরকায়স্থ গৌহাটি হাইকোর্টে একটি জনস্বার্থ মামলাও করেছেন। গত ৯ জুন এ বিষয়টি সম্পর্কে গৌহাটি হাইকোর্ট এক নোটিশ জারি করে কেন্দ্র ও মেঘালয় সরকারের কাছে রিপোর্ট চেয়েছে। জল এতটা গড়ালেও রাজনৈতিক স্তরে সোনাপুর বাইপাস সড়ক নিয়ে কোনও আগ্রহই দেখা যাচ্ছে না।

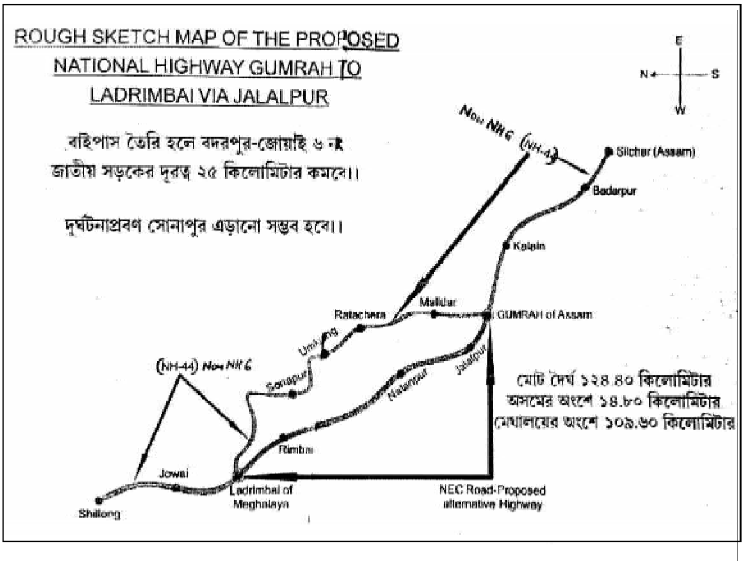
ROUGH SKETCH MAP OF THE PROPOSED NATIONAL HIGHWAY GUMRAH TO LADRIMBAI VIA JALALPUR
বাইপাস তৈরি হলে বদরপুর-জোয়াই ৬ নং জাতীয় সড়কের দূরত্ব ২৫ কিলোমিটার কমবে।।
দুর্ঘটনাপ্রবণ সোনাপুর এড়ানো সম্ভব হবে।।
E
N
S
W
Now NH 6 (NH-44)
Silchar (Assam)
Badarpur
Kalain
Malidar
GUMRAH of Assam
Ratachera
Umkiang
(NH-44) Now NH 6
Sonapur
Natanpur
Jalalpur
মোট দৈর্ঘ ১২৪.৪০ কিলোমিটার
অসমের অংশে ১৪.৮০ কিলোমিটার
মেঘালয়ের অংশে ১০৯.৬০ কিলোমিটার
Rimbai
Jowai
Shillong
Ladrimbai of Meghalaya
NEC Road-Proposed alternative Highway

লঙ্কা-চন্দ্রনাথপুর-শিলচর বিকল্প ব্রডগেজ

বিকল্প সড়কপথের এই সাতকাহনের পর এবার দেখা যাক লামডিং-বদরপুর-শিলচর বর্তমান ব্রডগেজ লাইনের বিকল্প নিয়ে অবস্থানটা কোথায় দাঁড়িয়ে আছে। লামডিং-শিলচর ব্রডগেজ প্রকল্প নির্মাণের অনেক আগে ১৯৮৪ সালে রেল মন্ত্রকের নির্দেশে রেলের সহযোগী সংস্থা রেল ইন্ডিয়া টেকনিক্যাল অ্যান্ড ইকোনমিক সার্ভিসেস লিমিটেড (রাইট্‌স) সমীক্ষা চালিয়ে লঙ্কা-চন্দ্রনাথপুর ব্রডগেজ নির্মাণের পোষকতা করে। রেলমন্ত্রক এই সমীক্ষা প্রতিবেদন গ্রহণ করলেও অর্থাভাবের কারণ দর্শানোয় তা ফাইলবন্দি হয়ে পড়ে। পরবর্তী সময়ে ১৯৯৬ সালে রাজনৈতিক চাপে প্রস্তাবিত পথের পরিবর্তে লামডিং-শিলচর মিটারগেজ পথকেই ব্রডগেজে রূপান্তরের প্রকল্প হাতে নেয় রেলমন্ত্রক। কিন্তু ডিমা হাসাও জেলার ভূমির ভঙ্গুর অবস্থা ও আইন শৃঙ্খলাজনিত সমস্যার কথা মাথায় রেখে রেল বিকল্প চিন্তা শুরু করে। মেঘালয়কে রেল মানচিত্রে আনার জন্য আসামের লঙ্কা থেকে ওই রাজ্যের পূর্ব জয়ন্তিয়া জেলার জোয়াই থেকে ৫৬ কিঃমিঃ দূরে সাকাইন পর্যন্ত রেললাইন

নির্মাণে ২০১২ সালে ইঞ্জিনিয়ারিং ট্রাফিক সমীক্ষা হয়েছিল। ওই পথকে চন্দ্রনাথপুরের সঙ্গে যুক্ত করে শিলচর অবধি নিয়ে যেতে ২০১৩ সালে আরেকটি সমীক্ষা প্রস্তুত করে রেল। এই দুই সমীক্ষার ভিত্তিতে লঙ্কা-সাকাইন-চন্দ্রনাথপুর- শিলচর ২৬৬.৪ কিঃমিঃ বিকল্প রেলপথ প্রকল্প প্রস্তাব যায় রেল মন্ত্রকে। ব্যয় ধরা হয় ৭৯২০ কোটি টাকা। লামডিং-শিলচর ব্রডগেজ পথের বিভিন্ন স্থানে সমস্যা দেখা দেওয়ায় ২০১৩ সালের সমীক্ষাকে নবায়িত করে প্রকল্প প্রতিবেদন তৈরি করা হয়। ২০১৬ সালের ২৪ নভেম্বর প্রধানমন্ত্রীর দফতরের অনুমতি নিয়ে এই নবায়িত প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়েছে বলে রেল দফতর জানায়। কিন্তু এক্ষেত্রেও অর্থাভাবকে প্রতিবন্ধক হিসেবে দেখানো হয়।

তবে পরিস্থিতির দ্রুত পরিবর্তন হওয়ায় রেল বিষয়টিকে আবার ভাবনায় আনে। রেলের কাছে এক্ষেত্রে যে-সব বিচার্য হয়ে দাঁড়িয়েছে তা হল — (১) মণিপুরের জিরিবাম থেকে ইম্ফল, মিজোরামের ভৈরবী থেকে সাইরং এবং ত্রিপুরার আগরতলা থেকে বাংলাদেশের আখাউড়া পর্যন্ত রেললাইন নির্মাণ শেষ হলে বদরপুর-লামডিং পাহাড় লাইনে বাড়তি চাপ পড়বে। (২) রেল সমস্ত পথকে বৈদ্যুতায়ন এবং পর্যায়ক্রমে পাশাপাশি দু'টো লাইন (ডাবল ট্র্যাক) নির্মাণের যে প্রকল্প হাতে নিয়েছে, বর্তমান লামডিং-বদরপুর পথে তা রূপায়ণে নানা প্রতিকূলতা রয়েছে। (৩) ট্রান্স এশিয়ান রেল প্রকল্প অনুসারে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলোর সঙ্গে বাণিজ্য সম্প্রসারণের উদ্দেশ্যে রেল যোগাযোগ স্থাপনের কাজটি শেষ হলে আগামীতে ইম্ফল-জিরিবাম-শিলচর-বদরপুর-লামডিং পথে পণ্য ও যাত্রীরেলের সংখ্যা বেড়ে যাবে। ২০২২ সালের ২৭ মে গুয়াহাটিতে অনুষ্ঠিত অ্যাক্ট ইস্ট ক্লনক্লেভে এই যোগাযোগ ক্ষেত্র নয়া সম্ভাবনা নিয়ে আসবে বলে অভিমত ব্যক্ত করা হয়েছে। এসব কথা মাথায় রেখে রেলমন্ত্রক ২০২২ সালের ১ জুন লঙ্কা-চন্দ্রনাথপুর-শিলচর ২০৮ কিঃমিঃ বিকল্প ব্রডগেজ রেলপথ

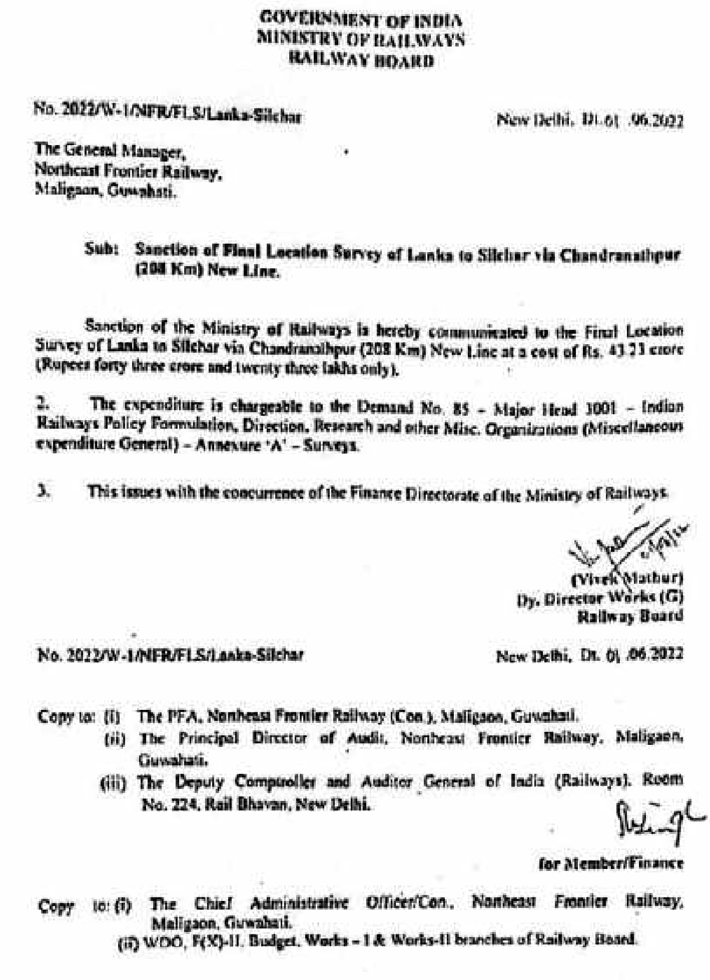

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF RAILWAYS
RAILWAY BOARD

No. 2022/W-1/NFR/FLS/Lanka-Silchar New Delhi, Dt. 01 .06.2022

The General Manager,
Northeast Frontier Railway,
Maligaon, Guwahati.

Sub: Sanction of Final Location Survey of Lanka to Silchar via Chandranathpur (208 Km) New Line.

Sanction of the Ministry of Railways is hereby communicated to the Final Location Survey of Lanka to Silchar via Chandranathpur (208 Km) New Line at a cost of Rs. 43.23 crore (Rupees forty three crore and twenty three lakhs only).

2. The expenditure is chargeable to the Demand No. 85 – Major Head 3001 – Indian Railways Policy Formulation, Direction, Research and other Misc. Organizations (Miscellaneous expenditure General) – Annexure 'A' – Surveys.

3. This issues with the concurrence of the Finance Directorate of the Ministry of Railways.

(Vivek Mathur)
Dy. Director Works (G)
Railway Board

No. 2022/W-1/NFR/FLS/Lanka-Silchar New Delhi, Dt. 01 .06.2022

Copy to: (i) The PFA, Northeast Frontier Railway (Con.), Maligaon, Guwahati.
(ii) The Principal Director of Audit, Northeast Frontier Railway, Maligaon, Guwahati.
(iii) The Deputy Comptroller and Auditor General of India (Railways), Room No. 224, Rail Bhavan, New Delhi.

for Member/Finance

Copy to: (i) The Chief Administrative Officer/Con., Northeast Frontier Railway, Maligaon, Guwahati.
(ii) WDO, F(X)-II, Budget, Works – I & Works-II branches of Railway Board.

*****

নির্মাণের চূড়ান্ত স্থান সমীক্ষার (ফাইনাল লোকেশন সার্ভে) জন্য ৪৩.২৩ কোটি টাকা মঞ্জুর করে উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়েকে তার দায়িত্ব অর্পণ করেছে। ২০২৩-২৪ অর্থবছরে রেলের যে বাজেট সংসদে অনুমোদিত হয়েছে, তার আধারে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের পার্বত্য ও সীমান্ত এলাকাকে সংযুক্তিকরণ এবং গোটা পথের সার্বিক আধুনিকীকরণের জন্য এক লক্ষ কুড়ি হাজার কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। ফলে লঙ্কা-চন্দ্রনাথপুর-শিলচর বিকল্প রেলপথের সম্ভাবনা উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। ১৯৮৭ সালে এই পথের জন্য প্রথম সমীক্ষায় যেখানে নির্মাণ ব্যয় ৬০০ কোটি টাকা অনুমিত হয়েছিল, সেখানে চলতি বছরের মূল্যায়নের হিসেবে এই প্রকল্পের অনুমিত ব্যয় বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৪৫ হাজার কোটি টাকা। লামডিং-শিলচর ব্রডগেজের জন্য বরাক উপত্যকা শবরীর প্রতীক্ষায় ছিল আঠারো বছর, এবার কত বছর লাগবে কে জানে।

বাংলাদেশ দিয়ে করিডর

তবে আশার কথা, বিকল্প যোগাযোগের আরেকটি ক্ষেত্র উন্মোচিত হচ্ছে বাংলাদেশ দিয়ে। রেলপথে এপারের বরাক ওপারের সিলেটকে যুক্ত করার জন্য মহিশাসন ও শাহবাজপুর রেল প্রকল্প বাস্তবায়নের কাজ দ্রুতগতিতে চলছে। ১৯৬৫ সালে পাক-ভারত যুদ্ধের সময় বন্ধ হয়ে যাওয়া এই রেলপথকে ঢেলে সাজাতে ২০১৮ থেকে কাজ চলছে আন্তর্জাতিক সীমান্তের দু'পাশে। নতুনভাবে নির্মিত হচ্ছে মহিশাসন স্টেশন ভবন। পাশাপাশি ত্রিপুরার আগরতলা থেকে আখাউড়া পর্যন্ত রেল সংযোগ চালু করার কাজও অন্তিম পর্যায়ে। শিলচর থেকে সিলেট যাত্রী বাসসেবা চালু করার দাবি দীর্ঘদিনের। গুয়াহাটিতে নিযুক্ত বাংলাদেশের সহকারী হাইকমিশনার রুহুল আমিন উল্লেখ করেছেন, দু'টি প্রতিবেশী দেশ কূটনৈতিক পর্যায়ে এ নিয়ে যে সংলাপ চালাচ্ছে তা সদর্থক গতিতে এগোচ্ছে। এক্ষেত্রে আরেকটি সংযোজন হচ্ছে, করিমগঞ্জ-সিলেট-ডাউকি-শিলং-গুয়াহাটি ট্রানজিট বাস পরিষেবা চালু করার প্রস্তাব। বিষয়টিও কূটনৈতিক পরিসরে আলোচনায় রয়েছে। ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে বর্তমান সম্পর্কের আধারে অদূর ভবিষ্যতে রেল ও সড়কপথে দু'দেশ বাণিজ্যিক ভিত্তিতে সংযোজিত হলে সম্ভাবনার নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হতে পারে।

ইতিমধ্যে বাংলাদেশ-ভারত-মায়ান্মার-চিন অর্থনৈতিক করিডর (বিসিআইএমইসি) গঠনের জন্য যে প্রয়াস শুরু হয়েছে তাতে এসব দেশের কুড়িটি প্রধান শহরকে যুক্ত করার প্রস্তাব রয়েছে। পথটি কলকাতা থেকে বাংলাদেশের যশোর, ঢাকা, সিলেট হয়ে শিলচর, ইম্ফল, মায়ান্মারের কালে, মোনিওয়া, মান্তালে লাশিও, মিউন হয়ে চিনের দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলের ইউনান প্রদেশের রাজধানী কুনমিঙে গিয়ে শেষ হবে। এই করিডরে অন্তর্ভুক্ত দেশগুলো কয়েক দফার বৈঠকে প্রকল্প নিয়ে সহমত হয়েছে। আঞ্চলিক অর্থনৈতিক সহযোগিতায় এই প্রকল্পে বরাক উপত্যকা নিশ্চিতভাবেই গুরুত্বপূর্ণ স্থানে থাকবে।

তবে রাষ্ট্রবাদী অবস্থানের আড়ালে ভাষিক ও ধর্মীয় সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর আর্থিক বিকাশের গণতান্ত্রিক অধিকারকে খর্ব করার ব্যবস্থা চিরতরে পাকাপোক্ত করতে চাওয়া হচ্ছে, আসামে ভূমিপুত্রদের প্রভুত্ব ও সর্বক্ষেত্রে অধিকার কায়েমের ভয়ঙ্কর উগ্র জাতীয়তাবাদী রাজনীতি নয়া মাত্রা নিচ্ছে। এটা অর্থনৈতিক দিক থেকে অবরুদ্ধ বরাক উপত্যকাকে আগামী দিনে আরও কোণঠাসা করবে। এই অবস্থায় এই অঞ্চলের ভবিষ্যৎ নিয়ে ভাবনাকে সঠিক দিশায় নিয়ে যাওয়া এখন সময়ের দাবি। বিকল্প যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে তোলার দাবিকে সর্বস্তরে ছড়িয়ে দেওয়া এবং প্রাপ্ত সুযোগকে আঞ্চলিক আর্থিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে কাজে লাগানো আবশ্যক হয়ে দাঁড়িয়েছে। নির্ভরতার ক্ষেত্র না বদলালে এই উপত্যকা ভবিষ্যতে আর কোনও দিন মাথা তুলে দাঁড়াতে পারবে না। দল, রাজনীতির ঊর্ধ্বে উঠে কথাগুলো মাথায় না আনলে বিপন্নতার দায় নিতে হবে সবাইকে।

বরাকের আর্থিক বিকাশে ব্যাঙ্কিং ক্ষেত্র

আশিস চৌধুরী

যে কোনও ভৌগোলিক অঞ্চলের অর্থনীতির বিকাশ নির্ভর করে সেই অঞ্চলের উৎপাদন ব্যবস্থা অর্থাৎ কৃষি শিল্প (ক্ষুদ্র, মাঝারি বা বৃহৎ শিল্প) ও অন্যান্য নানবিধ বাণিজ্যিক ক্রিয়াকলাপের ওপর। এইসব ক্রিয়াকলাপের সূত্র ধরে ওই অঞ্চলে বসবাসকারী মানুষের জীবন-জীবিকা, কর্মসংস্থান ও সামগ্রিকভাবে অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন নির্ভর করে। বর্তমান বরাক উপত্যকার তিন জেলায় ৪০ লক্ষাধিক মানুষের বসবাস আর দেশের অন্যান্য অঞ্চলের মতো এই অঞ্চলের অর্থনীতিও প্রধানত কৃষিনির্ভর। বরাক উপত্যকার কৃষিনির্ভরতা তুলনামূলকভাবে অনেক বেশি এই কারণে যে, আধুনিক শিল্পের বিকাশ এই অঞ্চলে প্রায় হয়নি আর আবহমানকাল ধরে চলে আসা কুটিরশিল্প বা ছোটখাটো শিল্প প্রতিযোগিতায় টিকতে না পেরে একরকম অস্তিত্ব হারিয়েছে। কৃষিক্ষেত্রে উৎপাদন ব্যবস্থা এখনও আধুনিক ব্যবহৃত উন্নত পদ্ধতি থেকে শতক্রোশ দূরে। চাষবাস প্রধানত চিরাচরিত পদ্ধতিনির্ভর হলেও জমি তৈরিতে ট্র্যাক্টরের ব্যবহার কিছুটা বেড়েছে। সাবেকি গরুর হালই প্রধান ভরসা। সারা বছর ধরে বিবিধ ফসল চাষের প্রথম শর্ত হচ্ছে সেচের জলের জোগান। বর্ষায় প্রাকৃতিকভাবে জল উপলব্ধ হয়ে যায় অনায়াসে, কিন্তু শুকনো দিনে জলের প্রয়োজন মেটাতে দরকার কৃত্রিম ব্যবস্থা। উপত্যকায় বিস্তর নদী, খাল, জলাশয় ইত্যাদির প্রাচুর্য থাকলেও জল সংরক্ষণ ও সেচের আধুনিক ব্যবস্থা এখনও অধরা। পরিণামে ক্ষেত্রবিশেষে নিম্ন জলাভূমি বাদ দিলে সব জমিতে এক ফসলের চাষ, তিন ফসল দূর, দুই ফসল করাও কষ্টসাধ্য। কৃষির আনুষঙ্গিক বিভিন্ন ক্রিয়াকলাপ যথা মৎস্যপালন, পশুপালন, সব্জি ও ফলচাষ ইত্যাদির অবস্থা তেমন উল্লেখযোগ্য নয়। কারণ, এসবের লাভজনক উৎপাদন প্রক্রিয়ার জন্য প্রয়োজনীয় পরিকাঠামো নেই। বড়মাপের দুটো দুগ্ধ উৎপাদন প্রকল্প শিলচরের উপকণ্ঠে ‘কামুল’ আর পাথারকান্দি অঞ্চলে অন্য একটি — কয়েক দশক আগে স্থাপিত হয়ে বেশিদিন স্থায়ী হয়নি। শনবিল, রাতাবিল, আনুয়া, চাতলা ইত্যাদি বড় বড় বিল-হাওর আর অজস্র ছোট-বড় জলাশয় উপত্যকা জুড়ে, তবু মৎস্য উৎপাদনের কোনও সফলা বড় উদ্যোগ বাস্তবায়িত হয়নি। যে কারণে উপত্যকার মানুষের মাছের চাহিদার বড় অংশ আমদানিকৃত মাছের দ্বারা মেটানো হয়। অথচ দেশের অন্যান্য অংশের তুলনায় এখানে মাছের দাম অনেকটা বেশি। ইদানীং অঞ্চল বিশেষে বেশ কিছু উদ্যোগী আধুনিক পদ্ধতিতে জলাশয়ে মৎস্য উৎপাদনের কাজে হাত দিয়েছেন — সফলও হচ্ছেন। এটা শুভ লক্ষণ। উপত্যকার কোনও কোনও অঞ্চলে চাষিরা প্রধানত শীতকালে নানা সব্জি উৎপাদনে বেশ উন্নতি করেছেন, কিন্তু উপত্যকার চাহিদার পক্ষে তা নিতান্ত অপ্রতুল আর তাই প্রায় সারা বছর ধরে ত্রিপুরা, মেঘালয় ও ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার বরপেটা, খারুপেটিয়া, লঙ্কা ইত্যাদি অঞ্চল থেকে আমদানিকৃত শাকসব্জির ওপর বরাক উপত্যকা নির্ভরশীল। ডিম, মুরগি ইত্যাদি উৎপাদনের ক্ষেত্রে বিভিন্ন অংশে বেশ কিছু ছোট ও মাঝারি উদ্যোগ চোখে পড়ে, কিন্তু এগুলো মেঘালয় বা ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার বড় বড় পোলট্রি ফার্মের সঙ্গে তুলনীয় নয়। ডিমের

চাহিদা তো পুরোপুরি প্রায় আমদানিনির্ভর। অফুরন্ত বাঁশ-বেত সহজলভ্য, কিন্তু বাঁশ-বেতজাত শিল্প সামগ্রীর কোনও বড় বাণিজ্যিক উদ্যোগ চোখে পড়ে না, বরং দীর্ঘকাল ধরে চলে আসা স্থানীয় উদ্যোগগুলোও ম্রিয়মাণ। অথচ প্রতিবেশী ত্রিপুরা রাজ্য এক্ষেত্রে দেশজুড়ে বাজার তৈরি করেছে। তাঁত শিল্পেরও একটি করুণ চিত্র। গৃহস্থ তাঁতিরা, বিশেষ করে উপজাতি ও মণিপুরি সম্প্রদায়ের মানুষ নিজেদের ঘরোয়া চাহিদা মেটানোর মতো উৎপাদন করে থাকেন। খুব সীমিতভাবে বাজারজাতও করেন। কিন্তু তাঁতশিল্পের আধুনিকীকরণ ও বাণিজ্যিক উৎপাদনের কোনও প্রচেষ্টা নেই। ঐতিহ্যবাহী শীতল পাটি শিল্প সংকটের আবর্তে পড়েছে বহুকাল হল। কালীগঞ্জের উৎকৃষ্ট শীতল পাটি তৈরির কারিগরদের উত্তরসূরিরা এই পেশা ত্যাগ করেছেন বেশিরভাগ। কাটাখাল অঞ্চলে সামান্য বাণিজ্যিক উৎপাদন এখনও হচ্ছে।

ভারি বা মাঝারি শিল্পের করুণ ছবি অপরিবর্তিত। চরগোলার চিনিকল বন্ধ বহুকাল। হিন্দুস্থান পেপার কর্পোরেশন বা এইচপিসি-র পাঁচগ্রাম কাগজকলের বিলুপ্তির কাহিনি বহুচর্চিত। বদরপুরের ইন্ডাস্ট্রিয়াল এস্টেট ভূতুড়ে বাড়ি হয়ে আছে বহুদিন ধরে। শিলচরের মালিনীবিল শিল্প এলাকা সহ কিছু বিক্ষিপ্ত ব্যক্তিমালিকানায় ক্ষুদ্রশিল্প ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে কিন্তু উপত্যকার সার্বিক অর্থনৈতিক চিত্রে এগুলো তেমন উল্লেখের দাবি রাখে না।

বরাক উপত্যকার অর্থনীতিতে একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে আছে চাষবাস শিল্প। কাছাড় ও শ্রীহট্ট জেলায় ব্রিটিশ শাসন বিস্তার এবং ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার উত্তর আসামে ব্রিটিশদের উদ্যোগে চা-বাগান প্রতিষ্ঠার সূচনা পর্বের সঙ্গেই কাছাড়-শ্রীহট্টে চা-বাগান গড়ে তোলার কাজ শুরু হয়ে যায়। তথ্যসূত্র মতে, ১৮৫৫ সাল নাগাদ বরাক উপত্যকায় ১০০টির মতো চা-বাগান প্রতিষ্ঠিত হয়। সাম্প্রতিক তথ্য অনুসারে বর্তমান বরাক উফত্যকায় তিনটি জেলা মিলিয়ে ১১২টি চা-বাগান রয়েছে। কিন্তু ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার তুলনায় এই উপত্যকার চা-বাগান অর্থনীতির চিত্র হতাশাব্যঞ্জক। বহু ছোট চা-বাগান রুগ্ন হয়ে বন্ধ হয়ে গেছে। বৃহৎ কর্পোরেটের অধীন বড় বাগানগুলো ছাড়া অন্যান্য বাগান ক্রমাগত আর্থিক সংকটের মধ্য দিয়ে অস্তিত্ব রক্ষার লড়াই করছে। চা-শিল্পের অভিজ্ঞ মহলের মতে, মূল লগ্নির অভাব চা-বাগানগুলোর আধুনিকীকরণের প্রধান অন্তরায়। সার চাষ থেকে শুরু করে উৎপাদন যন্ত্র পর্যন্ত আধুনিকীকরণ না হলে প্রতিযোগিতার বাজারে টিকে থাকা দুষ্কর। আরেকটি উদ্বেগজনক দিক হচ্ছে — বহু বড় চা-বাগানে স্থায়ী শ্রমিকদের নিযুক্তি হ্রাস পাচ্ছে, এতে বেকার শ্রমিকদের সংখ্যা বৃদ্ধিতে উপত্যকার গ্রামীণ কর্মসংস্থানের ওপর বিরূপ প্রভাব পড়ছে। চা-বাগান থেকে কর্মচ্যুত বহু শ্রমিককে বাগানের আশপাশ অঞ্চলে ও শহর এলাকায় দিন মজুরের কাজ করতে দেখা যায়। চা-বাগানগুলোর প্রশাসনিক প্রধান কেন্দ্র কলকাতায় অবস্থিত। প্রশাসন, আর্থিক নীতি সব ওখান থেকে নিয়ন্ত্রিত হয়। ফলে উপত্যকার সরকারি-বেসরকারি কোনও ক্রিয়াকলাপের সঙ্গে এদের নিয়মিত কোনও যোগ নেই। চা-বাগান থেকে মুনাফা আদায়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া ছাড়া উপত্যকার বৃহত্তর আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে মৌলিক কোনও অবদান জোগানোর চেষ্টা বাগান কর্তৃপক্ষের দিক থেকে খুবই বিরল। এমনকী বাগান শ্রমিকদের স্বাস্থ্য, আবাস, শিক্ষা ইত্যাদির বুনিয়াদি প্রয়োজনগুলো মেটাতেও এরা উদাসীন। সরকারকে বহুলাংশে এসব দেখতে হয়। মোট কথা, চা-বাগান উপত্যকার অর্থনীতির একটা বৃহদংশ অধিকার করে আছে, অথচ কর্মসংস্থান বা স্থানীয় মানুষের জীবন-জীবিকার উন্নয়নে বিশেষ ভূমিকা নিচ্ছে না। উপত্যকার আনারস, কাঁঠাল, কলা ও অন্যান্য কিছু স্থানীয় ফলের চাষের উন্নতি করার প্রভূত সম্ভাবনা রয়েছে। কিন্তু এক্ষেত্রেও একই স্থবিরতার চিত্র। সত্তরের দশকে লক্ষীপুর অঞ্চলের উৎকৃষ্টমানের আনারস ফলনকে ভিত্তি করে সমবায়ের মাধ্যমে আনারস সংরক্ষণ ও প্রক্রিয়াকরণের একটি কেন্দ্র গড়ে

তোলা হয়েছিল, কিন্তু পরে সেটি বন্ধ হয়ে যায়। এ বছর অবশ্য সরকারের প্রচেষ্টায় মারকুলিনের উৎকৃষ্ট আনারস মধ্যপ্রাচ্যে রফতানির ব্যবস্থা হয়েছে, যা অনেকাংশে আশাব্যঞ্জক।

বরাকের অর্থনীতির প্রেক্ষাপটে এই বাস্তবতা তুলে ধরতে পরিসংখ্যানের বিশেষ প্রয়োজন পড়ে না। নব্বইয়ের দশকের শুরুতে অর্থনৈতিক সংস্কার বা উদারীকরণের পর্ব ব্যাপক আকারে গৃহীত হওয়ার পর থেকে দেশের প্রায় সব অঞ্চলে কমবেশি শিল্প, বাণিজ্য, প্রযুক্তি, কৃষি — সবক্ষেত্রে উন্নয়নের নতুন দিগন্ত খুলে গেছে। ব্রডগেজ রেললাইনের বহু আকাঙ্ক্ষিত সম্প্রসারণ ও সড়ক যোগাযোগের সামান্য উন্নতি ছাড়া বরাক উপত্যকার শিল্প ও বাণিজ্য বিকাশের তেমন কোনও হেরফের হয়নি।

যে কোনও অঞ্চলের অর্থনৈতিক বিকাশে, বিশেষ করে উৎপাদন ব্যবস্থায় পুঁজির জোগাড় দিতে মুখ্য ভূমিকা পালন করে থাকে ব্যাঙ্কিং পরিষেবা। আধুনিক ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থার দ্রুত সম্প্রসারণের হাত ধরে যাবতীয় উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিপণনে ব্যাঙ্কগুলোর বিনিয়োগ প্রধান চালিকাশক্তি। স্বাভাবিকভাবে বরাক উপত্যকার ব্যাঙ্কিং পরিষেবার চিত্রটা এক্ষেত্রে বিশেষ উল্লেখের ও আলোচনার দাবি রাখে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষে বিশ্ব অর্থনীতির ভয়াবহ সংকটের ধাক্কায় এ দেশেও ছোট-বড় অসংখ্য ব্যাঙ্ক, সবই ব্যক্তিমালিকানাধীন, দেউলিয়া হয়ে বন্ধ হয়ে যায়। এই উপত্যকাও এই সংকটের কবলে পড়ে। ফলে অসংখ্য আমানতকারী ব্যাঙ্কে গচ্ছিত সঞ্চয় হারিয়ে বসেন। স্বাধীনতার পর দুই দশককাল পর্যন্ত উপত্যকায় ব্যাঙ্কের উপস্থিতি হাতে গোনা ছিল। স্টেট ব্যাঙ্কের তিনটি শাখা শিলচর, করিমগঞ্জ ও হাইলাকান্দিতে ছিল। বেসরকারি ব্যাঙ্কের মধ্যে অধুনালুপ্ত ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া আর ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাঙ্কের (বর্তমান রাষ্ট্রায়ত্ত ইউকো ব্যাঙ্ক) যথাক্রমে শিলচর ও করিমগঞ্জে একটি করে ও শিলচরে একটি শাখা ছিল। এছাড়া রাজ্যভিত্তিক আসাম কো-অপারেটিভ এপেক্স ব্যাঙ্ক ও জেলাভিত্তিক কাছাড় সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্কের দু'টি করে শাখা ছিল। সত্তর দশকের শেষের দিকে কাছাড় সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক এপেক্স ব্যাঙ্কের সঙ্গে মিশে যায়। ১৯৬৯ সালে দেশের ১৪টি বৃহৎ বেসরকারি ব্যাঙ্ক জাতীয়করণের সঙ্গে সঙ্গে দেশজুড়ে বিশেষ করে গ্রামাঞ্চল ও আধা শহরগুলোতে বিভিন্ন রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কের ব্যাপক ও দ্রুত সম্প্রসারণ হতে শুরু করে। শত শত ব্যাঙ্ক শাখা খুলতে আরম্ভ করে। বরাক উপত্যকায়ও রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কসমূহের ব্যাপক শাখা বিস্তার হয়। সরকারের অগ্রণী ব্যাঙ্ক (Lead Bank) কর্মসূচির অধীনে অবিভক্ত কাছাড় জেলা ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া অগ্রণী ব্যাঙ্কের দায়িত্ব পায়। ইতিমধ্যে গ্রামীণ ব্যাঙ্কের যৌথ উদ্যোগে এক বা একাধিক জেলাভিত্তিক আঞ্চলিক গ্রামীণ ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠিত হয়। বরাক উপত্যকায় প্রতিষ্ঠিত হয় 'কাছাড় গ্রামীণ ব্যাঙ্ক'। গ্রামীণ ব্যাঙ্কের শাখা স্থাপনে প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলও গুরুত্ব পায়। পরবর্তী সময়ে গ্রামীণ ব্যাঙ্ক পূর্বতন প্রক্রিয়ায় 'কাছাড় গ্রামীণ ব্যাঙ্ক' ও আসামের আরও কয়েকটি আঞ্চলিক গ্রামীণ ব্যাঙ্ককে একত্র করে 'আসাম গ্রামীণ বিকাশ ব্যাঙ্ক' গড়ে তোলা হয়। ব্লক পর্যায় থেকে শুরু করে গ্রামাঞ্চলের বিভিন্ন বাজার ও বর্ধিষ্ণু এলাকা চিহ্নিত করে পর্যায়ক্রমে রাষ্ট্রায়ত্ত বিভিন্ন ব্যাঙ্কের ও গ্রামীণ ব্যাঙ্কের শাখা সম্প্রসারণ চলতে থাকে। নব্বইয়ের দশকের শুরু থেকে আর্থিক উদারীকরণ নীতির ফলশ্রুতিতে বেসরকারি ব্যাঙ্কগুলোর শাখা সম্প্রসারণও উপত্যকায় ঘটেছে। এক্ষেত্রে অবশ্য বড় বেসরকারি ব্যাঙ্কগুলো তাদের শাখা স্থাপন জেলা সদর আর কিছু ছোট শহরেই সীমাবদ্ধ রেখেছে। বরং 'বন্ধন ব্যাঙ্ক' নামক বেসরকারি ব্যাঙ্ক 'বন্ধন' নন-ব্যাঙ্কিং প্রতিষ্ঠান থেকে যার জন্ম, গ্রামাঞ্চলেই বেশি শাখা স্থাপন করেছে। এখানে উল্লেখ করা দরকার, নন-ব্যাঙ্কিং প্রতিষ্ঠান হিসেবে 'বন্ধন' বেশ ক'বছর ধরে শহর ও গ্রামাঞ্চলে গোষ্ঠীনির্ভর বা ব্যক্তিগতভাবে প্রান্তিক গরিব মানুষের জন্য বেশ চড়া হারে সুদ নিয়ে আসছে। ঋণ দিয়ে ব্যাঙ্ক হিসেবে আর্থিক ক্ষেত্রে ব্যবসা আরম্ভ করার পরও তাদের এই কাজ অব্যাহত রয়েছে।

চলতি বছরের মার্চ মাস পর্যন্ত পাওয়া তথ্য অনুযায়ী যথাক্রমে কাছাড় জেলায় ১৫৮টি, করিমগঞ্জ জেলায় ৮৬টি আর হাইলাকান্দি জেলায় ৪৩টি — মোট ২৯১টি শাখা রয়েছে। এর মধ্যে সরকারি ও সমবায় ব্যাঙ্কের মোট শাখা ১৮৬টি।

ব্যাঙ্কিং শাখা সম্প্রসারণের মূল লক্ষ্য ছিল দেশের জনসংখ্যার বৃহদাংশকে ব্যাঙ্কিং পরিষেবার অধীনে নিয়ে আসা ও দেশের অর্থনীতির সমস্ত ক্ষেত্রে উৎপাদন প্রক্রিয়ার পুঁজি জোগান নিশ্চিত করার পাশাপাশি গ্রামাঞ্চলে মহাজনী ঋণের অত্যাচার থেকে গ্রামীণ উপার্জনশীল মানুষকে মুক্তি দেওয়া। কৃষি, শিল্প, ক্ষুদ্রশিল্প, বাণিজ্য যাবতীয় অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপে সার্বিক বিকাশ ত্বরান্বিত করা। ধারাবাহিকভাবে কর্মসংস্থান বৃদ্ধি ও স্বনিযুক্তির পথ উন্মুক্ত করা গ্রামীণ ও ছোট জনপদসমূহে আবহমান কাল ধরে চলে আসা সুদখোর মহাজনী ব্যবসার বিকল্প হিসেবে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্ক পরিষেবাকে বিকল্প ব্যবস্থারূপে প্রতিষ্ঠা করা।

ব্যাঙ্ক জাতীয়করণের ৫৩ বছর অতিক্রান্ত। নব্বইয়ের দশকের শুরু থেকে গৃহীত আর্থিক উদারীকরনেরও ৩০ বছর হতে চলল। উদারীকরণের সূত্র ধরে ব্যাঙ্কিং ক্ষেত্রে বেসরকারি ব্যাঙ্কগুলোর ভূমিকা ও বাজার দখল লক্ষণীয়ভাবে বেড়েছে। সরকারি ব্যাঙ্কগুলোর বিলগ্নীকরণ বা আংশিক বেসরকারীকরণের প্রক্রিয়া অব্যাহত। এই পরিপ্রেক্ষিতে বরাক উপত্যকার আর্থিক বিকাশে ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থা আশনুরূপ ভূমিকা নিতে পেরেছে কিনা তা পর্যালোচনা করা জরুরি। শাখাভিত্তিক, ব্যাঙ্কভিত্তিক বা অঞ্চলভিত্তিক অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপে ব্যাঙ্কিং ক্ষেত্রের ভূমিকা কী, তা জানার জন্য একটি সরল অনুপাতই যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ। বাকি বিশ্লেষণ সেই অনুপাতনির্ভর। এই অনুপাতটি হচ্ছে ব্যাঙ্কের জমা ও অগ্রিম বা ঋণের অনুপাত বা Credit Deposit Ratio। আদিকাল থেকে ব্যাঙ্ক ব্যবসার মূল আধার হচ্ছে গ্রাহকদের কাছ থেকে জমারাশি সংগ্রহ করে গচ্ছিত রাখা সুদের বিনিময়ে আর সেই গচ্ছিত জমারাশির অংশ ক্ষেত্রবিশেষে সুদের বিনিময়ে অগ্রিম বা ঋণ প্রদান করা। এই দুই সুদের ব্যবধান থেকে ব্যাঙ্কের ব্যবসার লাভ অর্জিত হয়।

বরাক উপত্যকার তিনটি জেলায় বিস্তৃত সরকারি, বেসরকারি ও সমবায় ব্যাঙ্কগুলির জমা ও অগ্রিমের জেলাভিত্তিক তথ্য (মার্চ ২০২২) নিম্নে প্রদত্ত তিনটি সারিতে সন্নিবিষ্ট করা আছে।

Table - 1 - Cachar District
(aggregate credit deposit ratio is 44.55%)
Table - 2 - Karimganj District
(aggregate credit deposit ratio is 35.08%)
Table - 3 - Hailakandi District
(aggregate credit deposit ratio is 42.94%)

(সূত্র : এস.এল.বি.সি তথ্য ওয়েবসাইট — তিন জেলার অগ্রণী ব্যাঙ্ক হচ্ছে ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া, একত্রিত হয়ে যাওয়ার পর পঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক)।

এই তিনটি সারিতে প্রাপ্ত পরিসংখ্যানগুলোকে অতি সাধারণভাবে বিশ্লেষণ করলে এই সত্যগুলোতে উপনীত হওয়া যায়—

(১) ব্যাঙ্কগুলোর গড় জমা অগ্রিম অনুপাত হচ্ছে কাছাড় জেলায় ৪৪.৫৫ শতাংশ, করিমগঞ্জ জেলায় ৩৫.০৮ শতাংশ ও হাইলাকান্দি জেলায় ৪২.৯৪ শতাংশ। অর্থাৎ, বরাক উপত্যকার মানুষের যে সঞ্চয়রাশি ব্যাঙ্কসমূহে গচ্ছিত আছে গড়ে তার প্রায় ৪০ শতাংশ অগ্রিম হিসেবে বিনিয়োগ হয়েছে। ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ও কেন্দ্র সরকারের নীতি অনুসারে ব্যাঙ্ক বা অঞ্চলভিত্তিক এই জমা অগ্রিম অনুপাত কমপক্ষে ৬০

শতাংশ হওয়া উচিত। এক্ষেত্রে বরাক উপত্যকা অনেকটা পিছিয়ে অর্থাৎ অর্থনৈতিক বিকাশে ব্যাঙ্কগুলোর সংগ্রহণ আশানুরূপ নয়।

(২) এবার জানা যাক জাতীয় ভিত্তিতে জমা-অগ্রিমের অনুপাতে এই চিত্রটি কী? রিজার্ভ ব্যাঙ্কের তথ্য অনুসারে সারা দেশে ব্যাঙ্কসমূহের গড় জমা-অগ্রিম অনুপাত হচ্ছে ৭১.৯ শতাংশ (মার্চ ২০২২)। এই অনুপাত প্রায় ৭৭ শতাংশ ছিল কিন্তু কোভিড পরিস্থিতিতে ব্যাঙ্কসমূহের ঋণদান কমে যাওয়ায় তা নেমে আসে। এখন আবার অগ্রিমের চাহিদা বাড়ছে। অঞ্চলভেদে এই অনুপাতের তারতম্য ভীষণভাবে ভারসাম্যহীন। বরাক উপত্যকায় এই অনুপাত ৪০ শতাংশ ছুঁতে কষ্ট পাচ্ছে তো দেশের উত্তরাঞ্চল ও দক্ষিণাঞ্চলে এই অনুপাত ৯০ শতাংশের ওপর। পশ্চিমাঞ্চলও ৯০ শতাংশের কাছাকাছি। শুধু পূর্বাঞ্চল পিছিয়ে আছে প্রায় ৫০ শতাংশে।

(৩) পরিসংখ্যান সরাসরি এই সিদ্ধান্তে পৌঁছে দেয় যে, বরাক উপত্যকার মানুষ উপত্যকার ব্যাঙ্কসমূহে যে সঞ্চয় গচ্ছিত রেখেছেন, তার অর্ধেকেরও কম অংশ ব্যাঙ্কগুলো এই উপত্যকায় আর্থিক ক্রিয়াকলাপে বিনিয়োগ করতে পেরেছে। আরেকটি ব্যাপার এখানে উল্লেখ করা দরকার। অগ্রিমে কী কী ক্ষেত্র অগ্রাধিকার পাবে সেজন্য রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ও কেন্দ্র সরকারের বেশ নীতি-নির্দেশ রয়েছে। যেমন, কৃষি, ছোট-মাঝারি শিল্প, সব ক্ষুদ্র ব্যবসা, বিভিন্ন স্বনিযুক্তি পেশায় ইত্যাদিতে কমপক্ষে মোট অগ্রিমের ৪০ শতাংশ সুনিশ্চিত করতে হবে। কিন্তু এই নীতি-নির্দেশ সরকারি ব্যাঙ্কগুলোর ক্ষেত্রে যে কঠোরতার সঙ্গে প্রযোজ্য হয়, বেসরকারি ব্যাঙ্কগুলোর তা একেবারেই হয় না। বেসরকারি ব্যাঙ্ক তাদের ইচ্ছানুযায়ী শুধু বেশি লাভজনক ব্যবসায় বা উচ্চবিত্তদের ভোগ্যপণ্যের জন্য অগ্রিম দিয়ে থাকে। তদুপরি ব্যাঙ্ক ব্যবসা সুদের আগে 'বন্ধন' যেভাবে প্রান্তিক গরিব মানুষের মধ্যে বিশেষ করে মহিলাদের ব্যক্তিগত ক্ষুদ্র ঋণ দিত চড়া সুদে, এখনও তা-ই করে যাচ্ছে। এতে উৎপাদনশীলতার কোনও সম্পর্ক নেই। মহিলাদের দেওয়া এই ক্ষুদ্র ঋণের অনেকেই অনাদায়ী হয়ে যাওয়া, অসমর্থ মহিলাদের দাবি মেনে বিগত বিধানসভা নির্বাচনের আগে নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি দিয়ে পরে ক্ষমতায় এসে বর্তমান শাসকদল এই অনাদায়ী ঋণের বড় অংশ সরকারি তহবিল থেকে শোধ দিয়ে ঋণগ্রস্ত মহিলাদের উপকৃত করেছে। বন্ধন ব্যাঙ্ক কিন্তু নিজস্ব তহবিল থেকে কোনও টাকা সাহায্য করেনি। অথচ সরকারি ব্যাঙ্কগুলো যখন এধরনের ঋণ মকুব করে, তবে তা করা হয় ব্যাঙ্কগুলোর নিজস্ব পুঁজি থেকে নতুবা কেন্দ্র সরকারের তহবিল থেকে অনুদান দিয়ে।

(৪) উপত্যকার আর্থিক কর্মকাণ্ডে সার্বিক উন্নতি আনতে গেলে সরকারি-বেসরকারি সব ক্ষেত্রে নানা প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার পাশাপাশি ব্যাঙ্কের সেভিংস বাড়ানোর বিষয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে হবে। ব্যাঙ্কগুলোর জমা-অগ্রিমের অনুপাত বাড়ানোর একমাত্র সম্ভাব্য উপায় হচ্ছে পর্যাপ্ত পরিমাণে অগ্রিম বৃদ্ধি। কারণ, জমা বা সঞ্চয়ের পরিমাণ স্বাভাবিক ধারায় বাড়তে থাকে। অগ্রিম বৃদ্ধির হার হতে হবে তুলনামূলকভাবে বেশি। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক এবং জাতীয় কৃষি ও গ্রামীণ উন্নয়ন ব্যাঙ্ক (NABARD)-র প্রতিনিধিদের উপস্থিতিতে জেলাভিত্তিক ব্যাঙ্কিং পরামর্শমূলক ও পর্যালোচনায় সমিতির বৈঠক নিয়মিতভাবে হয়। পদাধিকার বলে জেলাশাসক এই সমিতির অধ্যক্ষ ও অগ্রণী ব্যাঙ্ক আধিকারিক এর আহ্বায়ক। সব সরকারি বিভাগ এই বৈঠকে অংশ নেয়। ব্যাঙ্কগুলোর অগ্রিম প্রদানে অগ্রগতি ও এক্ষেত্রে সুষ্ঠু ব্যবস্থা নেওয়ার সম্মিলিত প্রয়াস সাধনই এই বৈঠকের মুখ্য আলোচ্য বিষয় হয়। অগ্রিম বাড়াতে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের কাছেও পক্ষান্তরে এক্ষেত্রে ব্যাঙ্কগুলোর সমস্যা প্রাধান্য পায়। কিন্তু ব্যাপক হারে অগ্রিম বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজন বড় আকারের শিল্প বা বৃহৎ প্রকল্প, যা এই উপত্যকায় এখনও অধরা। ক্ষুদ্র ব্যবসা, ক্ষুদ্র কৃষিঋণ, বড়জোর কিছু

ছোট শিল্প ছাড়া সদিচ্ছা থাকা সত্ত্বেও ব্যাঙ্কগুলো প্রত্যাশিত হাতে অগ্রিম বাড়াতে পারছে না। কৃষি, কৃষির সহযোগী বিভিন্ন বৃত্তি, ক্ষুদ্র ও কুটিরশিল্প কোনও কিছুতেই কোনও ব্যবসার সঙ্গেও উদ্যম রূপায়িত হচ্ছে না, যেখানে বৃহৎ পরিমাণে ব্যাঙ্ক ঋণ প্রদানের সুযোগ তৈরি হয়।

বাস্তব বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, জট যুক্তিই বহুলাংশে সত্য, বরং একটু গভীরভাবে ভাবলে দেখা যাবে, দু'টি যুক্তিই পরস্পরের পরিপূরক। ব্যাঙ্কগুলোকে বিভিন্ন বৃত্তিতে জড়িত উপার্জনক্ষম মানুষকে বেশি করে ব্যাঙ্ক পরিষেবার আওতায় আনতে হবে। 'জনধন' প্রকল্প এই ক্ষেত্রে অনেকটা অগ্রগতি ঘটিয়েছে। অন্যদিকে, ব্যাঙ্কের অগ্রিম বৃদ্ধির পথ সুগম করতে কৃষি, শিল্প, ক্ষুদ্র ও কুটিরশিল্প এবং সবরকম বাণিজ্যিক ক্রিয়াকলাপের অগ্রগতির সহায়ক পরিকাঠামো গড়ে তুলতে অবশ্যই সরকারকে অগ্রণী ভূমিকা নিতে হবে। বলাবাহুল্য, যে কোনও উন্নয়নমুখী অর্থনীতির মৌলিক শর্ত হচ্ছে যোগাযোগ, পরিবহন, বিদ্যুৎ জোগান, সেচের সুব্যবস্থা, উৎপাদিত সামগ্রীর সংরক্ষণ ও বাজারজাতকরণ ইত্যাদির জন্য আধুনিক ও উন্নত পরিকাঠামোর নিশ্চয়তা বিধান। এই হলে ব্যাঙ্কসমূহের অগ্রিম প্রদান দ্রুত ও ব্যাপক হারে বৃদ্ধি পাওয়ার অনুকূল পরিবেশ তৈরি হবে। আর সে অর্থেই বরাক উপত্যকার অর্থনৈতিক বিকাশে স্থবিরতার শাপমোচন ঘটবে।

বরাক উপত্যকায় কৃষির সেকাল

আবিদ রাজা মজুমদার

কথায় বলে — 'জীব দিয়েছেন যিনি আহার দিবেন তিনি।' অর্থাৎ, জীব থাকলে বেঁচে থাকবার জন্য তার আহার প্রয়োজন হয়। তবে সকল জীবের আহার এক রকম নয়। মানুষও প্রকৃতিপ্রদত্ত জীববিশেষ— শ্রেষ্ঠ জীব। মানুষেরও আহার বা খাদ্য অবশ্যই প্রয়োজন। মানুষও খাদ্য খেয়ে বাঁচে। তবে পৃথিবীর সব মানুষ একই ধরনের খাদ্য খায় না। কিন্তু একই ধরনের না খেলেও মানুষের প্রধান খাদ্য ভাত আর রুটি।

ভাত হয় ধান থেকে আর রুটি হয় গম থেকে। এ দুটোই কৃষিজাত ফসল। ক্ষেতে ফলাতে হয় এসব খাদ্যশস্য। আমাদের দেশে এই ধান আর গম ব্যাপক হারে চাষ করা হয়ে থাকে। কৃষকেরা এ কাজের সঙ্গে যুক্ত। এদেরই একনিষ্ঠ পরিশ্রমের ফলে আমরা ভাত খাই, গম পাই। গম থেকে হয় রুটি — এ হচ্ছে আমাদের দেশের অর্থনীতির ভিত। এজন্যই বুঝি বলা হয় — 'রুটিরুজির ব্যবস্থা করা।' রুটিরুজির ব্যবস্থা যে পদ্ধতিতে হয়ে থাকে, সেই বিশেষ পদ্ধতির কৃষিকর্ম কবে থেকে শুরু হয়েছে, কোথায় শুরু হয়েছে, কীভাবে শুরু হয়েছে ইত্যাদি নানা প্রশ্ন সামনে এসে দাঁড়ায়।

এসব প্রশ্নের উত্তর পাওয়ার জন্য ইতিহাসের বিভিন্ন অধ্যায় আলোচনা করতে হয়। সে দীর্ঘ ইতিহাসে না গিয়ে সংক্ষেপে বলা যায় — বিশেষজ্ঞদের মতে, 'খ্রিস্টপূর্ব দশ হাজার বছর আগে দক্ষিণ-পশ্চিম এশিয়ার সুমেরিওরাই প্রথম কৃষিকর্মের সূচনা করেছিল।'

অন্য আরেক সমীক্ষায় জানা যায় — 'নব্য প্রস্তর যুগের আদিপর্বে (কুড়ি হাজার থেকে পাঁচ হাজার খ্রিস্টপূর্বাব্দ) চিন দেশে জঙ্গল কেটে সাফ করে বিস্তৃত কৃষিক্ষেত্রে পাথরের তৈরি ধারালো লাঙল ব্যবহার করে চাষবাস করা হত।

১৪০০ খ্রিঃপূঃ 'য়িন' রাজাদের আমলে শস্য উৎপাদন সংক্রান্ত নানা তথ্যের ভিত্তিতে প্রাচীন চিনের চিত্রলিপি রূপ লাভ করেছিল। প্রাচীন চিনের ধান এবং ধানকেন্দ্রিক সংস্কৃতি ক্রমশ গোটা দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় ছড়িয়ে পড়েছিল বলে বিশেষজ্ঞদের ধারণা। উল্লেখ্য, দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার মঙ্গোলয়েড মানবগোষ্ঠীর মানুষের বিভিন্ন দিকে ছড়িয়ে পড়ার ফলে কৃষি সংস্কৃতির প্রসার ঘটেছিল বলে মনে করা হয়। এও বলা হয়, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলোতে অতি প্রাচীনকাল থেকে ধান চাষের আভাস পাওয়া যায়।

এভাবে দেখা যায়, সুদূর অতীতে ১ম ও ২য় শতাব্দীতে উত্তর জাপানে ধানের চাষ হত, ৬ষ্ঠ ও ৭ম শতাব্দীতেও জাপানে প্রচুর ধান উৎপাদন হত বলে গবেষকরা অভিমত ব্যক্ত করেন।

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশ ফিলিপাইনে প্রচুর ধান উৎপাদনের কথা সুবিদিত। থাইল্যান্ডে প্রাচীনকাল থেকে ধানের চাষ চলে আসছে। ব্রহ্মদেশ বা মায়ান্মারে উন্নত ধরনের ধানের চাষ হয়ে থাকে। জাভা, সুমাত্রা, বোর্নিও, সেলভিস দ্বীপে প্রচুর ধান উৎপন্ন হয়।

অনুকুল আবহাওয়া, জলবায়ু, প্রাকৃতিক পরিবেশ ইত্যাদি অবস্থার জন্য পৃথিবীর মধ্যে এশিয়া মহাদেশই ধান চাষের প্রধান কৃষি অঞ্চল অবশ্যই বলা যায়। আমাদের দেশ ভারত এশিয়া মহাদেশের অন্যতম প্রধান কৃষিনির্ভর দেশ। এ দেশেও সুদূর অতীতকাল থেকে কৃষিকাজের ধারা চলে আসছে। এ সম্পর্কে নানা কথা-উপকথা রয়েছে। এক সমীক্ষায় দেখা যায়, পৃথিবীর মোট ধান চাষের ৯০ ভাগ ধান এশিয়া মহাদেশে উৎপন্ন হয়। এই ৯০ ভাগের এক-চতুর্থাংশ ধান ভারতে উৎপাদিত হয়ে থাকে।

মৌসুমী বায়ুর প্রভাবে ভারতে প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়, যে বৃষ্টিপাত ধান এবং গম চাষের পক্ষে অতি উপাদেয় প্রাকৃতিক উপাদান। এজন্য তামিলনাড়ু, কেরল, অন্ধ্রপ্রদেশ, পশ্চিমবঙ্গ, ওডিশা, কর্নাটক ইত্যাদি রাজ্যে ধানের উৎপাদন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে।

হরিয়ানা, পঞ্জাব, উত্তরাখণ্ডেও ধানের ফলন সুনাম অর্জন করেছে। 'পঞ্জাব রাইস' এখন এক জনপ্রিয় আহার সামগ্রী। দেশের পূর্বাঞ্চলে — বিহার, ঝাড়খণ্ড, অসম, ত্রিপুরা, মণিপুরেও প্রচুর ধান উৎপাদিত হয়। এতে আসাম রাজ্যের দুই উপত্যকা ব্রহ্মপুত্র ও বরাক উপত্যকায় কৃষিজাত প্রধান ফসল ধান। উত্তর-পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলোর মধ্যে ধানের উৎপাদনে আসামই প্রধান। এ অঞ্চলের ৭৫ শতাংশ ধানই অসম রাজ্যে উৎপাদিত হয়ে থাকে।

এই উৎপাদন এখন আধুনিক পদ্ধতিতে চাষবাসের ফলে হয়। অথচ এক সময় রাজ্যের দক্ষিণাঞ্চলের সমতল জেলা কাছাড় (বর্তমান বরাক উপত্যকা) ধানের উৎপাদন ছিল নিতান্তই হতাশাব্যঞ্জক। অথচ জেলার ৮০ শতাংশ মানুষই ছিল কৃষিজীবী। সেই ১০০-১২৫ বছর আগে যা ছিল এখনও তা-ই। এদিকে বলা হয়ে থাকে, আমাদের দেশের জাতীয় আয়ের পঞ্চাশ শতাংশই আসে কৃষি থেকে। সুতরাং, কৃষির উন্নতির জন্য কী করা, না করা এ নিয়ে আলোচনা করা এবং প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা সরকার এবং জনসাধারণের যৌথ উদ্যোগেই সফল হওয়া সহজতর পন্থা।

এই ভাবনাকে সামনে রেখে 'বরাক উপত্যকা বঙ্গ সাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্মেলন' নামক সংগঠন বরাক উপত্যকার আর্থ-সামাজিক দিনগুলো নিয়ে নানাভাবে আলোচনার কর্মসূচি হাতে নিয়েছে। এতে 'বরাক উপত্যকায় কৃষির একাল ও সেকাল' শীর্ষক বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করারও সংস্থান রয়েছে। এই সংস্থানের বিষয়বস্তু অবলম্বন করে আলোচনা করলে দেখা যাবে, বরাক উপত্যকায় বর্তমানে যে ধারায় চাষাবাদ করে ধান এবং অন্যান্য ফসল উৎপাদন করছে, এক সময়ে এ পদ্ধতির চাষাবাদ রীতি জানত না। অথচ শুরু থেকেই এ অঞ্চল জনবহুল এবং কৃষিনির্ভর এলাকা। শতাধিক বছর আগেও (১৯০৩-০৪) বলা হয়েছে এ উপত্যকার ৬৬ ভাগ কৃষিজমিতে ধান্যাদি চাষাবাদ হত। ১৯ ভাগ জমিতে ছিল চা-এর চাষ। ৫ ভাগ জমিতে তৈলবীজ ইত্যাদির চাষ হত। ২ ভাগ জমিতে হয়ে থাকত ইক্ষুর চাষ ইত্যাদি। এলাকার কৃষকরা ছিল প্রাচীনপন্থী কৃষক।

কী কী পদ্ধতি অবলম্বন করে চাষাবাদ করলে ফলন ভাল হয়, ফসল সুরক্ষিত রাখা যায়, সঙ্গে চাষযোগ্য ভূমির সংরক্ষণ নিরাপদ হয়— এসব বিষয়ে উপত্যকাবাসী কৃষক গৃহস্থেরা ছিল অজ্ঞ। ফলে কঠোর পরিশ্রম করে চাষাবাদ করলেও চরম অভাব নিয়ে সংসার চলত। কৃষিনির্ভর এ জেলাটি ছিল দেশের অনুন্নত জেলাগুলোর মধ্যে অন্যতম একটি।

ইতিহাসের কাল থেকেই এ অঞ্চলের কৃষকেরা নিজেদের চলে আসা পদ্ধতিতে চাষাবাদ করে আসছে। কাঠের লাঙল, হালের গরু অথবা মহিষ, আনুষঙ্গিক গরুর জোয়াল, মহিষের ছাট বা দু'ডালু, চাষ করা জমির ঢেলা ভাঙা, সমান করা, আগাছা দমন ইত্যাদির জন্য মই দেওয়া ইত্যাদি প্রচলিত প্রথায় চলে আসা নিয়মেই চাষাবাদ চলে এসেছে, এখনও চলে।

তবে আধুনিক প্রথায় চাষাবাদের জন্য কিছু আধুনিক সরঞ্জাম চাষাবাদে যুক্ত হয়েছে। এই সরঞ্জাম এবং চাষের রীতি পদ্ধতির প্রথম অনুশীলন এ জেলায় শুরু হয়েছিল ১৯৬০-র দশকের শুরুর দিকে। উল্লেখ্য, আমাদের দেশ মূলত কষিনির্ভর এক বিশাল ভূখণ্ড। অতএব কৃষির উন্নতিই আমাদের প্রধান লক্ষ্য। এই লক্ষ্য সামনে রেখে দেশে কৃষির ক্ষেত্রে সর্বাধিক পিছিয়ে পড়া অঞ্চলগুলোর উন্নতির কর্মসূচি হাতে নিয়ে সারা দেশ থেকে ৬টি সবচাইতে পিছিয়ে পড়া জেলাকে প্যাকেজ প্রোগ্রামের আওতায় নিয়ে এসে এই জেলাগুলোকে কৃষির ক্ষেত্রে উন্নত করে তোলার কর্মসূচি হাতে নেওয়া হয়েছিল। এরপর আরও ১০টি জেলা এর সঙ্গে জুড়ে দিয়ে মোট ১৬টি জেলাকে বেছে নেওয়া হয়েছিল। দেশের এই অনুন্নত জেলাগুলোর তালিকায় দক্ষিণ অসমের কাছাড় জেলাও ছিল (তখনকার কাছাড় জেলা বর্তমান বরাক উপত্যকা)।

চিরকাল ধরে এই উপত্যকাটি প্রধানত কৃষিনির্ভর হলেও কৃষকের নির্বিঘ্নে ঘরে ফসল তোলার প্রধান অন্তরায় ছিল উপত্যকায় ঘন ঘন বন্যা আর প্রাকৃতিক নানা কারণে ফসলের বিনাশ। এই বিনাশ ঠেকিয়ে আধুনিক পদ্ধতিতে চাষাবাদের জন্য উপত্যকায় এসেছিল প্যাকেজ প্রোগ্রামের অধীনে বিশেষ প্রকল্পে অধিক ফলনশীল ধানের বীজ, কাঠের লাঙলের বদলে লোহার লাঙল, লাইন প্রথায় চাষ, জমিতে প্রয়োজনমত সার প্রয়োগ, কৃত্রিম সারের ব্যবহার, কীটনাশকের ব্যবহার, ধানের রোগের প্রতি লক্ষ্য রেখে প্রতিষেধক প্রয়োগ ইত্যাদি নতুন পদ্ধতি যোগ করে পুরাতন কৃষিব্যবস্থাকে ঢেলে সাজিয়ে উপত্যকাকে কৃষিনির্ভর করে তোলা। রবিশস্যের চাষ এবং অপরাপর চাষ ইত্যাদি বিষয়ে কৃষকদের প্রশিক্ষণ দেওয়ার ব্যবস্থা ইত্যাদি শুরু হয়েছিল।

কৃষির উন্নতির জন্য জেলায় জেলায় কৃষি বিভাগ খোলা হয়েছিল। জেলাভিত্তিক এই বিভাগের প্রত্যক্ষ তদারকি সুবিধার জন্য খণ্ড উন্নয়ন এলাকা (Development Block) ভিত্তিক গ্রামসেবক পর্যায়ের কর্মচারীদের দ্বারা কৃষি বিষয়ক তদারকির ব্যবস্থা করা হয়েছিল, যে বিষয়গুলো নিয়ে এখনও বিভাগীয় কাজ চলে।

এতে আধুনিক প্রযুক্তিবিদ্যার নানা অনুষঙ্গ জুড়ে দিয়ে প্রাচীন প্রথার কৃষিপ্রক্রিয়া এবং চাষাবাদের রীতি-পদ্ধতির সঙ্গে কাছাড়ে শুরু হয়েছিল এক স্বতন্ত্র ধারার চাষাবাদ আন্দোলন — অর্থাৎ কৃষি বিপ্লব। এই ধারা এখনও শেষ হয়ে যায়নি।

এখনও কৃষকের হাল গরু আছে, লাঙল-জোয়াল আছে, মহিষের লাঙ্গল নিয়ে কৃষক মাঠে যায়, প্রচলিত প্রথায় রোপণ ইত্যাদি হয়। তবে ইতিপূর্বে প্রচলিত চাষাবাদ পদ্ধতির সঙ্গে যুক্ত হয়েছে কলের লাঙল (Power Tiller) জলসেচের জন্য পাওয়ার পাম্প, উন্নত ধরনের বীজ এবং সার ও প্রতিষেধক নানা ওষুধ। ওষুধ ব্যবহারের জন্য ছিটান যন্ত্র (Sprayer)-র ব্যবহার ইত্যাদি বেশকিছু নতুন রীতি পদ্ধতি।

ইতিপূর্বে জেলার কৃষকেরা তিন ধরনের মরসুমি ধানের চাষ করত — আউ বা আউশ বা আশু, শাইল বা হাইল আর বোরো বা বরুয়া ক্ষেত।

আউ বা আউশ ক্ষেতের সময় চৈত্র-বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ এবং ধানের প্রজাতি ছিল — বাগমুরালি, কাছালো, দুমাইয়া, টুপিপাটা, মালতি, মায়ামতি ও কইমুরালি ইত্যাদি বছরের প্রথমপাদের ফসল। আউশের ওই জমিতেই আবার শাইল ধানের চাষ হত। এই জমিগুলোকে বলা হত দু'ফসলা জমি। আউশ ধানের চাষ ছিল কৃষকের বাড়তি ফসল বা ফাঁকের খেত। কৃষকের বাড়তি আয়ের এ ছিল অন্যতম প্রধান উৎস। এ সম্পর্কে প্রবাদ প্রচলিত ছিল — 'আউশে রাজা না হয় বাউশে রাজা'। (বাউশ অর্থ রবিশস্য)।

তৎকালীন কৃষকেরা বাড়তি অর্থ উপার্জনের জন্য আউশ ধানের যেমন চাষ করত, সঙ্গে রবিশস্যেরও চাষ করত। রবিশস্যের মধ্যে অন্যতম প্রধান ছিল সরিষার চাষ, কলাই জাতীয় ডাল এবং আলু, মরিচ ইত্যাদি

অথবা কুশিয়ারের চাষও ছিল বাড়তি অর্থ উপার্জনের আরেক উৎস বিশেষ।

প্রচুর আখের চাষ এবং উৎসাহজনক ফলন লক্ষ্য করে কৃষকদের আর্থিকভাবে আরও সচ্ছল করে তোলার লক্ষ্যে উপত্যকার আনিপুরে সরকারিভাবে চিনিকল (Sugar Mill) স্থাপন করা হয়েছিল।

আউশ ধানের ফসলের পর জেলার বা উপত্যকার প্রধান চাষ ছিল শাইল বা শালি অর্থাৎ স্থানীয়ভাবে ‘হাইল ক্ষেত’। জ্যৈষ্ঠ, আষাঢ়, শ্রাবণ ও ভাদ্রের প্রথম ভাগ পর্যন্ত সময়ে শাইল ধানের চাষ চলত — এখনও চলে। তবে সে সময়ে শাইল ধানের যে প্রজাতিগুলো ছিল বর্তমানে সে প্রজাতির অনেক ধানই আর পাওয়া যায় না। শাইল ধানগুলোর মধ্যে কোন্ ধানের ফসল ভালো হয়, কোন্ ধরনের জমিতে কোন্ ধান ভালো ফলে, মরসুমের প্রথমে অথবা পরে কোন্ ধানের চাষ করতে হয় ইত্যাদি বিষয়ে কৃষকদের পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলত।

প্যাকেজ প্রোগ্রাম চালু হওয়ার আগে পর্যন্ত জেলা বা উপত্যকায় যে-সব শাইল ধানের চাষ ছিল সেগুলোর মধ্যে জলাভূমিতে লাকি আছরা, বাদাল আছরা, সোনামুখী আছরা, পানি আছরা ইত্যাদি ছিল ভালো ফসল। মাঝারি উঁচু ধরনের জলাভূমিতে ফলানো হত বালাম, লাটই, ছইয়ামরা, ছাতকি, মূলাশাইল, টিয়াশাইল, মনতেতই, ধলমেঘ ইত্যাদি লম্বা দানা, গোল দানা চালের ধান। অপেক্ষাকৃত উঁচু জমিতে চাষের জন্য কালামেউকরি, ভেড়াপাওয়া, ময়নাশাইল ইত্যাদি ধানের ব্যাপক চাষ ছিল। উৎকৃষ্ট চালের জন্য বিশেষ মনোযোগে কৃষকের চাষ ছিল বিশেষ করে — তুলসীমালা, বাশশাভোগ, অরিনারায়ণ, কালিজিরা, গুয়ারই, সায়বাইল, বাইগনবিচি ইত্যাদি মিহি ও অতি মিহি প্রজাতির ধান। এই ধানের চাল বিশেষ আদরে সম্মানে পরিবেশনের জন্য বিশেষ প্রজাতির অন্নবিশেষ। শাইল ধানের আরেক বিশেষ প্রজাতি বিরুন ধান। বেশ কয়েক ধরনের বিরুন বা বিন্নি ধানের চাষ উপত্যকায় চলে আসছে। এ এক শখের আঠালো ভাতবিশেষ। সামাজিকতা ও সম্মানের ভোজ্যবিশেষ। উপত্যকার বাঙালি সংস্কৃতির সঙ্গে জড়িয়ে থাকা বিশেষ ধরনের ধান। বেশ কয়েক ধরনের বিরুন ধান এ উপত্যকায় চাষ করা হয় যেমন — (১) আউ বিরইন, (২) গন্ধি বিরইন, (৩) পানি বিরইন, (৪) উবা বিরইন, (৫) আছরা বিরইন, (৬) পুটি বিরইন, (৭) লাকি বিরইন, (৮) কার্তিকা বিরইন, (৯) খইয়া বিরইন, (১০) হাবি বিরইন, (১১) খাগড়া বিরইন ইত্যাদি ২২ ধরনের বিরুন ধান রয়েছে বলে প্রকাশ।

শীতের মরসুমে যে ধানের চাষ হয়, সে ধানের নাম বোরো ধান বা বরুয়া ক্ষেত। বিল এবং জলাভূমির যে অংশগুলো শীতের মরসুমে জল ছেড়ে ভেসে ওঠে, ওই জায়গাগুলোতে বোরো বা বরুয়া ধানের চাষ হয়।

এই ধানের বীজ বোনার সময় কার্তিক-অগ্রহায়ণ মাস। পৌষ মাসে রোপণ আর চৈত্র মাসে ধান কাটা, তোলা ইত্যাদি হয় — এটাই সাধারণভাবে বোরো চাষের চলে আসা রীতি। প্রচলিত প্রথায় এমনি ধারা চাষাবাদ রীতি অনুসরণ করে জেলার কৃষকেরা চাষাবাদ করে যে ধান উৎপাদন করত তা দিয়ে খাওয়া-পরা, ছেলেমেয়ের বিয়েবিধি, সামাজিক-সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানাদির খরচ সংকুলান করত। এরপরও উদ্বৃত্ত ধানের বিক্রি করা অর্থ এবং কৃষিসম্পৃক্ত অন্যান্য আয় অর্থাৎ গরু-বাছুর বিক্রি করে প্রাপ্ত অর্থ ইত্যাদি একত্র করে ওই জড়ো করা অর্থে কৃষক গৃহস্থ আরও জমি-বাড়ি ক্রয়-বিক্রয় করত।

উপত্যকার কৃষকেরা ধানের অনুষঙ্গ কৃষিসম্পদরূপে রবিশস্যের চাষ করত। এ ছিল শুকনো মরসুমের চাষবিশেষ। এতে আলু, মাসকলাই, সরিষা, মরিচ এবং অন্যান্য সব্জি ক্ষেত করত। এখনও করে। রবিশস্যের পোশাকি নাম ‘বাউশমিয়ার’ কথাটা বুঝি ‘বহুবিধ চাষ মেহনতগার’ থেকে এসেছে।

সে যাক, আধুনিক উন্নত প্রথায় চাষাবাদ পদ্ধতি শুরু করার আগে পর্যন্ত এমনি ধারায় চাষাবাদ চলে এসেছে। চলে আসা এই পদ্ধতিতে চাষাবাদ করে এদের মধ্যে সমর্পণ কৃষক হওয়ারও প্রতিযোগিতা ছিল। বর্ষায় ধানের চাষ, আলু, মরিচ ইত্যাদি শুকনো মরসুমের চাষ ছাড়াও শ্রমদক্ষ কৃষক গৃহস্থের অর্থকরি আরেক চাষ ছিল কুশিয়ার ক্ষেত বা আখের চাষ। জেলায় অর্থ উপার্জনের এ ছিল আরেক বড় উৎস (প্রচুর কুশিয়ার চাষের উৎসাহ লক্ষ্য করে চিনিকল আনিপুরে স্থাপিত হয়েছিল)। কিন্তু ক্রমেই এই চাষের প্রবণতায় ভাটা পড়তে শুরু করেছে দেখা যায়। এর অন্যতম প্রধান কারণ বুঝি পরিশ্রম এবং সুলভ মূল্যে কুশিয়ার ক্ষেতের পরিশ্রম ঘিরে উপত্যকার কৃষককুলে প্রবাদ প্রচলিত রয়েছে — 'বারো পুয়া তেরো নাতি তে'গি করে কুইয়ার খেতি।' এই চাষে শ্রমদক্ষতা এবং জনবল দুটোই জরুরি। কিন্তু জনবল এবং শ্রম প্রবণতা কমে গিয়ে উপত্যকায় ইক্ষুর চাষ এখন প্রায় অতীতকালের ব্যাপার হয়ে পড়েছে। কেবল চাষাবাদ নয় — কৃষক গৃহস্থের চাষাবাদের সঙ্গে ছিল গৃহস্থালি আনুষঙ্গিকে আরও কিছু সম্পদ, যা কৃষকের অর্থনীতিতে সহযোগিতার জোগান দেয়। এ সম্পদের মধ্যে অন্যতম প্রধান তার গো-সম্পদ। এ সম্পদ কৃষক গৃহস্থের সামাজিক মর্যাদারও মাপকাঠি ছিল। একটি প্রবাদে এর আভাস পাওয়া যায় যেমন — 'যার নাই গরু হে দুনিয়ার হরু' (হেয়)। তবে কেবল গরুই নয়, গৃহস্থালি পশু-পাখিরও যথেষ্ট অর্থনৈতিক গুরুত্ব আঁচ করে নেওয়া যায় প্রচলিত একটি প্রবচন থেকে। যেমন — 'আসে (হাঁসে) উনা, পারোয় (পায়রা) দুনা / ছাগলে পিন্দায় কানোর সোনা।' হাঁস, মুরগি, পায়রা মায় ছাগলও কৃষক গৃহস্থের কৃষি অর্থনীতিকে নিয়ন্ত্রিত করে এসেছে সেই কবে থেকে।

পুরাতন চাষ পদ্ধতির সেকেলে পন্থাপ্রণালীর আনুষঙ্গিকতা ব্যক্ত করতে গিয়ে বলা হত — 'গিরস্তালির নানান তালি'। (গিরস্তালি - গৃহস্থ ধর্ম)। ধান চাষ এবং অন্যান্য চাষাবাদের সঙ্গে গরু-ছাগল, হাঁস-মুরগিও কৃষকের আর্থিক সঙ্গতির অনুষঙ্গ উপাদান বলতেই হয়। অবশ্য চাষের সময় এবং চাষ পদ্ধতির উৎকর্ষতা বিষয়ে সেকেলে চাষারাও ছিল সচেতন। এ সম্বন্ধে একটি প্রবাদ রয়েছে — 'সময়মত চষিও, ভালা করি রসিও, /মাজে মাজে আইল লাগাও নানান শাইল।'

এমনি ধারা কৃষক গৃহস্থের জীবন ঘিরে অভিজ্ঞতালব্ধ পরামর্শমূলক বেশ কিছু প্রবাদ প্রচলিত রয়েছে যে প্রবচন উপত্যকার কৃষি অর্থনীতির একটা জীবনচিত্র আঁচ করে নেওয়া যায়। এক সময় উপত্যকার কৃষককুলের চাষাবাদের বড় অন্তরায় ছিল ঘন ঘন বন্যা। বন্যার জল আশপাশের ধান ক্ষেতের মাঠে প্রবেশ করলে সহজে জল বেরিয়ে যেত না। ফলে ধানের ফসল নষ্ট হয়ে যেত। কৃষকের বহু আকাঙ্ক্ষিত চাষাবাদ ধ্বংস হয়ে যাওয়ায় কৃষক-গৃহস্থ অসহায় হয়ে পড়ত। আগামী দিনের অভাব আঁচ করে নিয়ে প্রমাদ গুনত। অসহায় কৃষক কুল জেলায় কৃষির উন্নতি বিষয়ে বিশেষ প্রকল্পের আওতায় বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও নদীর দুই পাশে বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ নির্মাণ, জল নিষ্কাশনের ব্যবস্থা হওয়ার ফলে আগের তুলনায় বন্যার প্রকোপ অনেক কমে গেছে।

যে সময়ে বন্যার জলে সব ধান ক্ষেত পচে-গলে ধ্বংস হয়ে যেত, এখনও অনেক অনেক সবুজ ধানের মাঠ ধ্বংস হয়ে যায়। বন্যার এই ধ্বংসলীলার হতাশ এবং ক্ষোভ ব্যক্ত হয় এমনি এক প্রচলিত প্রবচনের অভিব্যক্তির মধ্যে —

'অ'ইল ধান পানিয়ে খায়, ই-দুখনি মইলে যায়।' এমনি ধারা উপত্যকার কৃষি সংস্কৃতি নিয়ে আলোচনা করলে এর আর্থ-সামাজিক চিত্র পাওয়া যাবে নানা দিক থেকে। এক সময়ে কৃষির সফলতা-বিফলতা নির্ভর করত প্রকৃতির খেয়ালের ওপর। জলসেচ প্রথা চালু হওয়ার আগে পর্যন্ত কৃষককে বৃষ্টির জলের জন্য

আকাশের দিকে চেয়ে থাকতে হত, এখনও চেয়ে থাকতে হয়। এই প্রকৃতি-নির্ভরতার সূত্র ধরে প্রবাদ রচিত হয়েছে ‘হাগো ভাত আর হাগো মাছ।’ অর্থাৎ, বৃষ্টিপাত হলেই চাষীর চাষ হবে, ধান ফলবে, ভাত হবে জলে মাছ হবে। প্রকৃতির জীবাত্মা রক্ষায় এমনি ধারা তাৎপর্যবাহী অনেক প্রবাদ উপত্যকার জনজীবনকে উজ্জীবিত করে রেখেছে। সঙ্গে সঙ্গে কৃষকের আর্থ-সামাজিক-সাংস্কৃতিক অবস্থার বিশেষ রেখাচিত্রটি আমাদের সামনে ফুটে ওঠে বইকি।

পুরাতন প্রথায় চাষের সরঞ্জাম

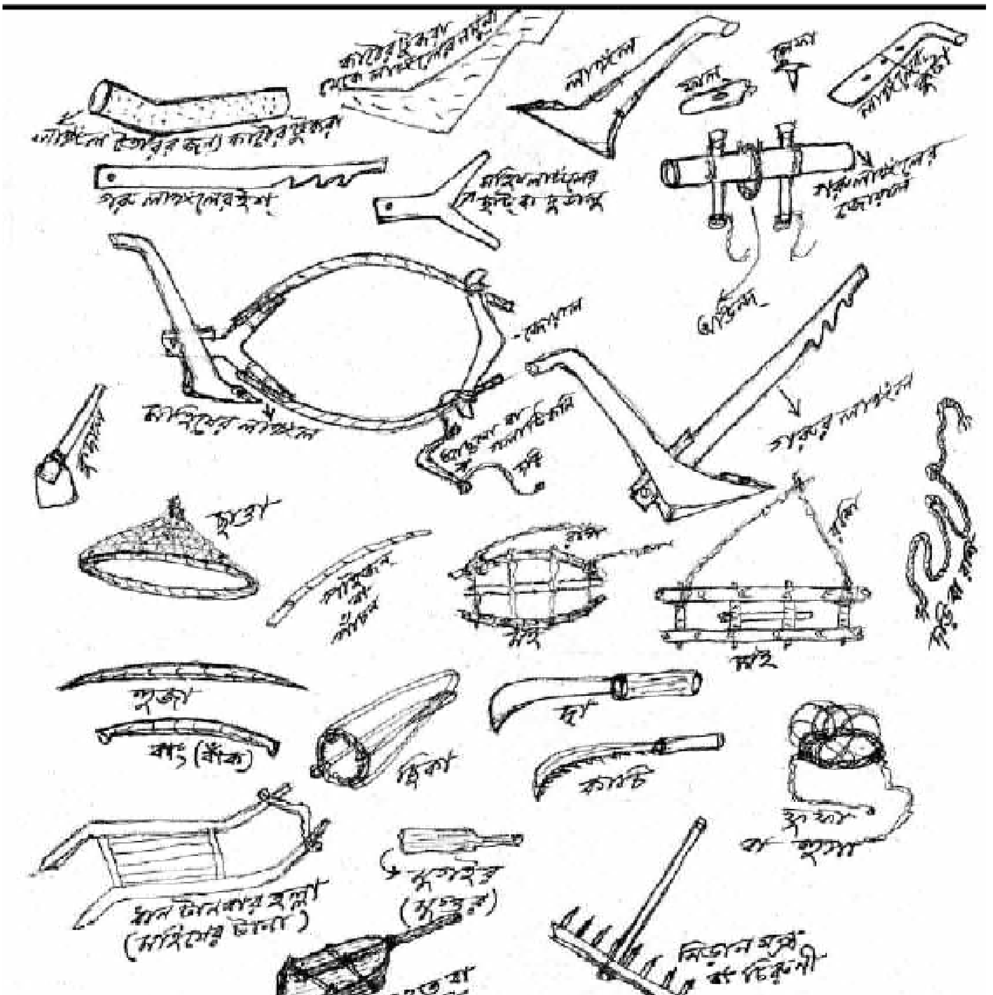
লাঙ্গল তৈরির জন্য কাঠের টুকরা
কাঠের টুকরা থেকে লাঙ্গলের নমুনা
লাঙ্গল
ফাল
গরু লাঙ্গলের ইশ
জোয়াল
দা
কাচি
বাং (বাঁক)
মই

বরাকের কৃষির একাল

সুদীপ্ত দেবরায়

খ্রিস্টীয় প্রথম সহস্রাব্দে এই অঞ্চলে অর্থাৎ অধুনা বরাক উপত্যকায় আর্য-ব্রাহ্মণ্য জনগোষ্ঠীর হাত ধরে কৃষিকাজের সূত্রপাত হয়। জনমনুষ্যহীন, বিপদসঙ্কুল পরিবেশে ব্রাহ্মণদের ভূমিদান ও বসতি স্থাপনের মূল উদ্দেশ্য ছিল কৃষির বিকাশ। এর ফলস্বরূপ এই অঞ্চলের আদিম জনজাতি ধীরে ধীরে কৃষিকাজে আকৃষ্ট হতে শুরু করে। এর অনেক পরে চতুর্দশ শতকে পুনরায় কৃষির বিস্তার ঘটে হজরত শাহজালাল এবং তাঁর আউলিয়াদের মাধ্যমে। তদানীন্তন সিলেট- কাছাড় অঞ্চলে শাহজালালের কৃতিত্বে ইসলাম ও কৃষির বিস্তার ঘটেছিল পাশাপাশি। জঙ্গলাকীর্ণ, দুর্গম, শ্বাপদসংকুল অরণ্যপ্রান্তরকে আউলিয়া ও তাঁদের অনুগামীরা চাষযোগ্য করতে সক্ষম হয়েছিলেন। কথিত আছে, বরাক নদীর জলকেও তাঁরা নাকি মন্ত্রবলে পানযোগ্য ও সুস্বাদু করে তুলেছিলেন। সে কালে কৃষিই ছিল অর্থব্যবস্থার মূল ভিত্তি। এর পরে বিভিন্ন কারণে কৃষিজীবী সমাজ স্থানচ্যুত হয়েছে, ফলে কর্ষিত জমি পুনর্বার জঙ্গলে পরিণত হতে সময় নেয়নি। বহু পরে ইংরেজ আমলে এই শ্রেণির অনেক চাষযোগ্য জমি চা-বাগানের আওতায় চলে যাবার দরুন কৃষিজমি তখন থেকেই কমে যায়। চা-শিল্প থেকে কৃষক কোনওভাবেই উপকৃত হলেন না। বরঞ্চ শ্রমের প্রয়োজন মেটাতে বাইরে থেকে অন্যায়ভাবে নিয়ে আসা হল 'গিরমিটিয়া' আদিবাসীদের। সে আরেক ইতিহাস। পরে অনেক চা-শ্রমিকের বংশধরেরা অবশ্য কৃষিকাজে লিপ্ত হয়েছেন। কিন্তু চা-শিল্প থেকে কৃষক লাভবান হলেন না, শিল্পজাত মুনাফা কৃষক বা কৃষির কোনও কাজে এলো না। তবুও অন্নসংস্থানের উপায় হিসেবে কৃষি গ্রামীণ জীবনে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে এক সহজ ধারায়। জনসংখ্যা, সামাজিক স্থিতি ও জীবনধারায় বড় কোনও পরিবর্তন না ঘটায় বিংশ শতকের মধ্যভাগ পর্যন্ত কৃষিভিত্তিক জীবনধারায় লক্ষণীয় ব্যতিক্রম দেখা যায়নি।

স্বাধীনতার অব্যবহিত পরেও বেশ কিছুকাল এভাবেই চলছিল। গ্রাম-শহরের মানুষ মোটামুটি স্থানীয় কৃষিজাত উৎপাদনের ওপরেই নির্ভরশীল ছিলেন। যোগাযোগ ব্যবস্থার অপ্রতুলতা, অপেক্ষাকৃত কম জনসংখ্যা বা সামগ্রিক চাহিদার বিস্তৃতি সীমিত থাকায় অভাব থাকলেও সে ধরনের চাপ অনুভূত হয়নি। কিন্তু, কিছুদিনের মধ্যেই তা বোঝা গেল। ১৯৪১ সালে অবিভক্ত কাছাড় জেলার জনসংখ্যা ছিল ৪,৩৭,২৮৪ যা ১৯৫১ সালে প্রায় ২৪ শতাংশ বেড়ে গিয়ে দাঁড়ালো ৫,৪১,৮৯১। পরবর্তী দশকেও জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ছিল ২২.৫ শতাংশ। এই বৃদ্ধির পেছনে ছিল স্বাধীনতাকালীন দেশভাগ ও তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে সাম্প্রদায়িক অস্থিরতা।

দেশজুড়েই তখন নিদারুণ খাদ্যাভাব। খাদ্যশস্য থেকে শুরু করে সবরকম কৃষিসামগ্রীর উৎপাদন তখন নিতান্তই কম। নিত্যপ্রয়োজনীয় খাদ্যশস্যের জন্য বিদেশের কাছে হাত পাততে হয়। এই দুরবস্থা থেকে মুক্তি পাবার উদ্দেশ্যে ভারত সরকারের উদ্যোগে শুরু হল IADP (Intensive Agricultural District

Programme) প্রকল্প। ১৯৬০-এ শুরু হওয়া এই অভিলাষী প্রকল্পে কৃষকদের যাবতীয় কৃষি উপকরণের (সার, কীটনাশক, প্রযুক্তি ইত্যাদি) প্যাকেজ জোগান ধরা হল, যার জন্য প্রকল্পটি Package Programme নামেও পরিচিত হল। মূল উদ্দেশ্য ছিল নতুন কৃষিপ্রযুক্তির প্রবর্তন করে উৎপাদন বৃদ্ধি। পরীক্ষামূলক এই প্রকল্পে প্রথমাবস্থায় দেশের ৭টি জেলা ও পরে আরও ৯ টি জেলাকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এর দ্বিতীয় পর্যায়ে মূলত মন্ত্রী মইনুল হক চৌধুরীর প্রচেষ্টায় আসামের একমাত্র জেলা হিসেবে অবিভক্ত কাছাড় জেলা অন্তর্ভুক্ত হয়। তাই কাছাড় জেলার হাত ধরেই আধুনিক কৃষির জগতে এই রাজ্যের প্রথম পদক্ষেপ, এটা বললে অত্যুক্তি হবে না। এখানে আরেকটি তথ্য সংযোজন করা প্রয়োজন। উত্তর-পূর্বাঞ্চলের প্রথম কৃষি গবেষণা কেন্দ্রটি স্থাপিত হয়েছিল করিমগঞ্জের আকবরপুরে ১৯১৩ সালে। অবিভক্ত ভারতের সুরমা-বরাক উপত্যকায় আমাদের অঞ্চলটি যে ধান উৎপাদনে অগ্রণী ছিল, এর প্রত্যক্ষ প্রমাণ বহন করছে এই শতাব্দী-উত্তীর্ণ কেন্দ্রটি, যেখানে আজও ধানের কয়েক হাজার মূল্যবান জাতের বীজ সংরক্ষিত আছে।

ধরার আঁচল ভরে দিলে : শুরুতে আমাদের কৃষক ভাইরা নতুন প্রযুক্তি গ্রহণে দ্বিধাগ্রস্ত থাকলেও সত্বর প্রকল্পের সুফল অনুভব করে নতুন উদ্যোগে চাষাবাদে মনোনিবেশ করলেন। IADP-র প্রথম দিকে চাষাবাদের উন্নত পদ্ধতি প্রবর্তনের ওপর জোর দেওয়া হলো। তখনও কোনও ফসলের HYV বা উচ্চ ফলনশীল জাত কৃষকের হাতে পৌঁছনো সম্ভব হয়নি। তাই উৎপাদনশীলতায় লক্ষণীয় উন্নতি চোখে পড়তে আরও কিছুদিন লেগে গেল। সত্যিকারের পরিবর্তন চোখে পড়ল ১৯৬৯-৭০-র পর। সেই সময় থেকেই তাইচুং নেটিভ-১, জয়া, আই আর -৮'র মত উচ্চ ফলনশীল ধানের জাত কাছাড় জেলার কৃষকদের হাতে তুলে দেওয়া হয়। এই জাতগুলোর অধিক উৎপাদন ক্ষমতা ও চাষাবাদের অন্যান্য উন্নত পদ্ধতি ব্যবহারে এই অঞ্চল রাজ্যের কৃষি উৎপাদনে অভূতপূর্ব দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে সক্ষম হয়। বিভাগীয় আধিকারিক-কর্মীদের শিক্ষানবিশি করার আদর্শ অঞ্চল হয়ে উঠেছিল এই জেলা বা অধুনা বরাক উপত্যকা। জেলার প্রধান ফসল ধান উৎপাদনের সাফল্য কাছাড়কে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের মধ্যে এক অনন্য স্থানে উন্নীত করে। পরবর্তীতে ধানের নানা গুণসম্পন্ন অনেক জাত এসেছে এবং আমাদের কৃষক তার মধ্যে থেকে উৎকৃষ্ট জাত বেছে নিতে দ্বিধা করেননি। এখনও প্রতি একক জমিতে ধানের উৎপাদন যথেষ্ট ভালো। এর পরের পাঁচ দশকে রাজ্যের অন্যান্য জায়গাগুলো কৃষিকার্যে প্রচুর উন্নতিসাধন করলেও বরাক উপত্যকা কিন্তু নানা কারণে তার মর্যাদা কিছুটা হলেও হারিয়েছে, একথা অস্বীকার করার উপায় নেই। যদিও ধানের জমির একক প্রতি উৎপাদনক্ষমতা বেশ ভাল, তবুও মাথাপিছু জমির অপ্রতুলতা, অত্যন্ত দুর্বল জলসেচ পরিকাঠামো, মূল ফসল ধানচাষে লাভের অঙ্ক কমে যাওয়া, আধুনিক প্রজন্মের কৃষির প্রতি অনাগ্রহ ইত্যাদি নানা কারণে সমগ্র রাজ্যে বরাকের কৃষির ঔজ্জ্বল্য সামান্য ম্রিয়মাণ হয়ে পড়েছে। নভেম্বর, ডিসেম্বরে শাইল ধান কাটার পর দীর্ঘ পাঁচ-ছ' মাস সেই জমিতে আর বিশেষ কোনও ফসল হয় না। কারণ, বৃষ্টিহীন এই সময়ে জলসেচের নির্ভরযোগ্য পরিকাঠামো না থাকাটাই মূল সমস্যা। কিন্তু, ৭০ শতাংশের অধিক জনগণের জীবননির্বাহ এবং এই উপত্যকার মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদনের মূল ভিত্তি কৃষির ভবিষ্যৎ কি আরও অনিশ্চয়তার দিকে যাবে, না এক শক্তিশালী বিকল্পের ইঙ্গিত দেবে, এ নিয়ে আলোচনার সুযোগ রয়েছে।

হায়, হেমন্তলক্ষ্মী : আলোচনা আমাদের প্রধান ফসল ধানকে নিয়ে শুরু করা যেতে পারে। বরাক উপত্যকার মাটি বেশিরভাগ কাদা দোআঁশ চরিত্রের। মার্চ থেকে সেপ্টেম্বর-অক্টোবর পর্যন্ত প্রচুর বৃষ্টিপাত ও

অন্যান্য পরিবেশগত সুবিধার জন্য ধান এখানকার প্রধান ফসল। নানা প্রাকৃতিক কারণে বরাক উপত্যকার সব রকম ফসল সুমিষ্ট। অজস্র উচ্চ মান, স্বাদ ও বৈচিত্র্যপূর্ণ জাতের ধানচাষ হয়ে আসছে সুদীর্ঘ কাল থেকে। কিন্তু, উৎপাদনক্ষমতা কম হওয়ার জন্য উচ্চ ফলনশীল জাতের কাছে এই দেশীয় জাতগুলো কবেই হার মেনেছে। এই মুহূর্তে তিনটি জেলাতেই উৎপাদনশীলতা রাজ্যের অন্যান্য অনেক জেলা থেকে এগিয়ে আছে। কিন্তু, আজকের কৃষিতে উৎপাদন শেষ কথা নয়, বাজারটাই আসল। কৃষিকাজ লাভজনক হলেই কৃষক উৎসাহিত হবেন, এ সাধারণ কথা। অপ্রিয় হলেও সত্যি, ধানচাষ এখন আর লাভজনক নেই, কোনওমতে চাষের খরচটি সংকুলান হয় আজকাল। কিন্তু খারিফ মরসুমে বরাক উপত্যকার পরিবেশে ধান ছাড়া আর কোনও ফসল সম্ভব নয়, এছাড়া ধান আমাদের প্রধান খাদ্যশস্যও বটে। তবে এ অবস্থা সাম্প্রতিক নয়, সমস্যাটি পুরনো। বহুকাল থেকেই ভারত সরকার কৃষকদের এ জাতীয় ক্ষতিপুরণের জন্য ন্যূনতম সমর্থন মূল্যে (Minimum Support Price বা MSP) ভারতীয় খাদ্য নিগমের মাধ্যমে ধান কেনে। চলতি বছরে ধানের সমর্থন মূল্য কুইন্টাল প্রতি ১৯৪০ টাকা। এর বিপরীতে উপত্যকার কৃষক খোলা বাজারে ১০০০-১১০০ টাকায় ধান বিক্রি করতে বাধ্য হচ্ছেন, অনেক সময় তা-ও পাচ্ছেন না। খাদ্য নিগম নানা অজুহাতে কোনওদিনই এ অঞ্চল থেকে ধান কিনতে আগ্রহী ছিল না, তারা চিরকাল সিংহভাগ ধান পঞ্জাব, হরিয়ানা প্রভৃতি রাজ্য থেকেই সংগ্রহ করে। কয়েক বছর থেকে বরাক উপত্যকা থেকে ধান সংগ্রহের পরিমাণ একটু একটু করে বাড়তে শুরু করলেও কোনও এক অজ্ঞাত কারণে গতবছর আসাম সরকারের এক নির্দেশে খাদ্য নিগম সহ কোনও সংস্থাই এই তিন জেলায় ধান কেনা থেকে বিরত ছিল। কৃষিমন্ত্রী সহ সংশ্লিষ্ট সব জায়গায় দরবার নিষ্ফলা হয়েছে। পরে অনেক দরবারের শেষে ধান করার একটি ব্যবস্থা হলেও উল্লেখযোগ্য কোনও পরিবর্তন দেখা যায়নি। উল্লেখ্য, এই MSP বজায় রাখা ও আইনে পরিণত করা দিল্লিতে আন্দোলনরত কৃষকদের একটি প্রধান দাবি ছিল। মূলত সমর্থন মূল্যের ওপর নির্ভর করে পঞ্জাব, হরিয়ানার কৃষিব্যবস্থা গড়ে উঠেছে এবং কৃষকরাও সম্পন্ন হয়েছেন। অথচ, আমাদের ধানচাষীরা বিনা লাভে চাষাবাদ করতে বাধ্য হচ্ছেন। জাজ্বল্যমান এই সমস্যা সম্বন্ধে এখানকার রাজনৈতিক দলগুলো অবহিত হলেও চিন্তিত নয়, উপরন্তু বিরোধী দলের অনেকেই পঞ্জাবের কৃষকদের সমর্থনে সোচ্চার হয়েছিলেন। কিন্তু এখানকার কৃষকের সমস্যা কোনও দিন রাজনৈতিক সমস্যা হয়ে ওঠেনি, অধিকাংশ কৃষক যে তিমিরে ছিলেন, সেই তিমিরেই আছেন বা আরও অন্ধকারে নিমজ্জিত হচ্ছেন। অনেকদিন থেকেই ছোট অথবা বড় কৃষকের এক বড় অংশ নিজেরা চাষাবাদ করেন না, ভাগচাষীদের ওপর নির্ভর করেন। আজকাল তথাকথিত ভাগচাষীরাও চাষ করতে চান না, এবং নিতান্ত করতে চাইলেও যে শর্ত আরোপ করেন, তাতে জমিমালিকের ভাগে সুকুমার রায়ের ভাষায়, হাতে থাকে পেন্সিল। ফলে, ধানচাষে জমি কমছে। দু'ফসলি ধানের জমি দ্রুত হ্রাস পাচ্ছে, কাগজেকলমে যা-ই থাকুক না কেন, ধানচাষে এই অনাগ্রহের একটি প্রধান কারণ হল, অজস্র সরকারি প্রকল্প যেগুলোর মাধ্যমে অসম্ভব কম মূল্যে চাল বিতরণ ব্যবস্থা। এর ফলে অর্থনীতির স্বাভাবিক নিয়মে স্থানীয় চালের লাভজনক দাম পাওয়া যায় না। এখানে স্মর্তব্য, বিভিন্ন গণবণ্টন ব্যবস্থায় বিতরণ করা চাল পঞ্জাব, হরিয়ানা সহ সেইসব রাজ্য থেকে আসে, যেখান থেকে সিংহভাগ ধান সংগ্রহ করা হয়। ফলে, পঞ্জাব, হরিয়ানায় ধান স্বাভাবিক ফসল না হওয়া সত্ত্বেও কৃষকরা সরকারি আনুকূল্যে ভাল দাম পান এবং আসাম ধান উৎপাদনে উদ্বৃত্ত হওয়া সত্ত্বেও আমাদের কৃষক ধান চাষে এক হতাশাজনক পরিস্থিতির সম্মুখীন। আমাদের অঞ্চলে যে চাল বিতরণ করা হয়, তার জন্য প্রয়োজনীয় ধান যদি খাদ্য নিগম স্থানীয়ভাবে ন্যূনতম সমর্থন মূল্যে সংগ্রহ করত তবে ধানচাষে লাভের মুখ দেখতেন কৃষক এবং ফলস্বরূপ গ্রামীণ অর্থনীতি প্রাণ ফিরে

পেত। এছাড়া, গ্রামাঞ্চলে অন্যান্য সরকারী প্রকল্প তথা শহরাঞ্চলে বর্ধিত নগরায়নের ফলে কর্মসংস্থানের সুযোগ বেড়ে যাওয়ায় কৃষিশ্রমিক ক্রমশই দুর্লভ হয়ে পড়ছে। আমাদের মূল ফসল ধান চাষের ক্ষেত্রে এ জাতীয় নেতিবাচক প্রভাবের ফলে আধুনিক প্রজন্ম কৃষিকাজে আর খুব উৎসাহিত হচ্ছে না এবং অন্য অর্থকরী পেশায় ব্যাপকহারে প্রব্রজন ঘটেছে গত কয়েক দশকে। অর্থনীতির পণ্ডিতরা এই অবস্থাকে স্বাভাবিক বলেই ভাববেন। কারণ, তাঁদের মতে, কৃষিক্ষেত্রে অত্যধিক ভিড় উন্নতির পরিপন্থী। এমনিতেই বরাক উপত্যকায় মাথাপিছু জমি বা সম্পদ রাজ্যের অন্য জেলার তুলনায় নিতান্তই কম। এর ওপরে প্রজন্মের পর প্রজন্ম একই জমিতে থেকে গেলে, সম্পদের ওপর অনাবশ্যক চাপ পড়ে। সব মিলিয়ে উৎপাদনক্ষমতা সন্তোষজনক হওয়া সত্ত্বেও ধানচাষ লাভজনক হয়ে থাকেনি। প্রতি হেমন্তে কৃষকের ডালা পাকা ফসলে ভরে উঠলেও তার ক্ষুদ্র সিন্দুক ভরে না, যদিও পেটটি মোটামুটি ভরে এবং এজন্যই এখনও তারা আশা ছাড়েনি, কারণ কথায় বলে আশায় বাঁচে চাষা।

আশায় আশায় থাকি : কিন্তু , শুধু আশার ওপর ভরসা করে কি চলে? যেহেতু, খারিফ মরসুমে ধান ছাড়া অন্য কোনও ফসল চাষ করা সম্ভব নয়, তাই প্রথমত, চাষের খরচ কমাবার দিকে নজর দিতে হবে। এর অন্যতম উপায় কৃষি যান্ত্রিকীকরণ। জমি প্রস্তুতির ক্ষেত্রে পাওয়ার টিলার এবং ট্র্যাক্টর আগের গো-মহিষাদির জায়গা নিয়েছে, ফলে খরচ ও সময় দুই-ই বাঁচছে। ইদানীং বিভিন্ন সরকারি সাহায্যে ধান কাটার যন্ত্র ব্যবহার শুরু হয়েছে। পাশপাশি ধান মাড়াইয়ের যন্ত্র ব্যবহার বাড়ছে। এই যুগল প্রযুক্তি ধান চাষের খরচ কমিয়ে একে কিছুটা লাভজনক করবে, এ আশা করা যায়। কৃষিতে যান্ত্রিকীকরণ সময় ও খরচ বাঁচানোর পাশাপাশি গ্রামীণ জনসাধারণের রোজগার বৃদ্ধিতে সহায়ক হয়। যন্ত্রের মালিক, চালক ও সহায়ক পরিষেবার পরিকাঠামো গড়ে ওঠে এবং গ্রামীণ অর্থনীতিতে প্রাণসঞ্চার করে। দ্বিতীয়ত, ধান চাষে ফসল বৈচিত্র্য বাড়ানো। সময়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে গ্রাহক ও বাজারের চাহিদার রকমফের ঘটেছে। চাল এখন শুধু পেট ভরাবার উপকরণ হয়ে থাকেনি, নানারকম পুষ্টি, রুচি ও স্বাদের চাহিদা মেটাতে হয় এই প্রধান খাদ্যশস্যকে। শহরের শপিং মলে অথবা অনলাইনে খোঁজ পড়ে অর্গানিক বা জৈব পদ্ধতিতে উৎপন্ন চালের। ভাল চাহিদা রয়েছে নানারকম গন্ধ চালের। বরাক উপত্যকার সম্পদ কালিজিরা, সাহেবশাইল ইত্যাদি গন্ধ চালের দেশে-বিদেশে প্রচুর চাহিদা আছে। একই কথা আঠালো জাতের ধান অর্থাৎ বিরইন চালের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। সম্প্রতি কাছাড় জেলায় পরীক্ষামূলকভাবে করা ডায়াবেটিস রোগীর উপযুক্ত এক বিশেষ জাতের চাল সীমিতভাবে সাড়া জাগিয়েছে। একইভাবে কয়েকটি জায়গায় চাষ করা ব্ল্যাক রাইস বা কালো চালের চাহিদা বর্তমান। এই বিশেষ জাতের ধানগুলো কিছু নির্দিষ্ট এলাকাজুড়ে চাষ করা এবং সুসংবদ্ধ প্রণালীতে তা বাজারজাত করতে পারলেই ধান এক লাভজনক ফসলে পরিণত হবে। এর পাশাপাশি গড়ে উঠতে হবে ধান ও চালভিত্তিক ছোট-বড় উদ্যোগ।

এখানে প্রশ্ন উঠবে, কেনই বা শুধু ধানের কথা ভাবছি, অন্য ফসল কি নেই? সে বিচারে যাবার আগে ধানচাষের বিষয়টি ভুলে থাকলে চলবে না। কারণ, এখানকার মাটি, জলবায়ু, কৃষিবিন্যাস, খাদ্যাভ্যাস, সবকিছু ধান বা চালনির্ভর। অন্য ফসলের কথা ভাবতে গেলে প্রথমেই আসবে শাকসজির কথা। একটা সামগ্রিক ঘাটতি এখনও আছে। তবে এটা জেনে রাখা ভাল, সব ফসল সব জায়গায় চাষ করা সম্ভব নয়। তবে আমাদের প্রয়োজনের অনেকটাই মেটানো সম্ভব, যদি জলসেচের সুবিধা বাড়ানো যায় । একটু খেয়াল করলেই দেখা যাবে, রবি মরসুম বা শীতকালে উপত্যকার ছোট-বড় নদী, নালা, খালের তীরবর্তী জমি সবুজ হয়ে থাকে। অর্থাৎ, সামান্যতম জলের উৎসকে কাজে লাগাতে কৃষক পিছিয়ে থাকেন না। সেচের সুবিধা

বাড়লে আরও বেশি জমি চাষের আওতায় আসবে, এ ধরে নেওয়া যায়। সব্জি চাষে বরাক উপত্যকায় যে বিশাল সম্ভাবনা রয়েছে, তার দিকে সরকারের নজর আকর্ষণ করা অত্যন্ত জরুরি। ফলমূল চাষের ক্ষেত্রেও প্রায় একই যুক্তি খাটে। স্থানীয় ফল ছাড়াও ইদানীং কিছু উৎসাহী যুবা কৃষক ড্রাগন ফ্রুট, নাগপুরী কমলা, পেয়ারা ইত্যাদি চাষে আগ্রহী হয়েছেন এবং লাভের মুখ দেখছেন। এমন যুবকেরা আরও বেশি সংখ্যায় এগিয়ে এলে কৃষি এক নতুন দিশা পাবে। কৃষক তখনই উৎসাহিত হবেন যদি তাতে লাভ থাকে। এই লাভের রাস্তা দেখানোর দায়িত্ব সরকারের। এজন্য কৃষিপণ্য বাজারীকরণকে উৎপাদনের সহযোগী হতে হবে। আসাম সরকার এই বিষয়ে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছে। Assam Agribusiness & Rural Transformation Project এই প্রকল্পে কৃষিজাত দ্রব্যের মূল্য যোগ করা, ফসল তোলার পরবর্তী পর্যায়ে value chain গড়ে তোলা , ব্যাপক ব্যবসায় মডেলের সাহায্যে ছোট ও মাঝারি কৃষি বাণিজ্যকে উৎসাহিত করবে। এছাড়া পরিবর্তনশীল আবহাওয়ার অনুকূল উৎপাদন ব্যবস্থা গড়ে তোলা এই প্রকল্পের একটি উদ্দেশ্য। উপত্যকার কাছাড় ও হাইলাকান্দি জেলা দুটি এই প্রকল্পের অন্তর্গত হয়েছে।

জল দাও আমায় জল দাও : চণ্ডালিকা নৃত্যনাট্যে বুদ্ধশিষ্য আনন্দের উচ্চারিত এই বাক্য বহুদিন থেকেই বরাকের কৃষকের অন্তরের চাহিদা। একথা কারোর অজানা নেই যে, কৃষির অন্যতম প্রধান উপকরণ জলসেচ। বরাক উপত্যকায় আজ পর্যন্ত কোনও নির্ভরযোগ্য সেচ ব্যবস্থা গড়ে উঠল না। বলতে দ্বিধা নেই, বিগত পঞ্চাশ বছরের অধিক সময়ে অজস্র ছোট ও মাঝারি সেচ প্রকল্প বাস্তবায়িত হয়েছে, তার বেশিরভাগ রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে বা সম্পূর্ণ অবৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গিতে বা অন্য কোনও উদ্দেশ্যে তৈরি হয়ে ধ্বংসের দিকে যাওয়ায় কৃষকদের আস্থা অর্জনে সক্ষম হয়নি। কিছু কিছু জায়গায় কৃষকেরা এই প্রকল্পগুলোর পুরো সুবিধা আদায় করতে পারেননি সত্য, কিন্তু অপ্রতুল জলসেচ পরিকাঠামো বরাকের কৃষি অনগ্রসরতার এক প্রধান কারণ, এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। বছর কয়েক আগে বহু বিজ্ঞাপিত প্রধানমন্ত্রী কৃষি সিঁচাই যোজনা ঢাকঢোল পিটিয়ে শুভারম্ভ হলেও এখন পর্যন্ত চোখে পড়ার মত কোনও পরিবর্তন আনতে সক্ষম হয়নি। কৃষি বিভাগের পক্ষ থেকে ভূগর্ভের জল উত্তোলনের কিছু ব্যবস্থা সহ ভূপৃষ্ঠের জল বিতরণের জন্য কিছু কিছু ব্যবস্থা নিলেও সামগ্রিক বিচারে তা নিতান্তই অপ্রতুল। অনেকদিন আগে কেন্দ্রীয় জল কমিশন বরাক উপত্যকায় ভূগর্ভস্থিত জলের এক জরিপ করে। তখন বলা হয়েছিল যে, ভূগর্ভস্থিত জলের স্তর বেশ গভীর এবং অসমান। তাই সেই জল উত্তোলন এবং কৃষিকাজে ব্যবহার লাভজনক নয়। এর বিপরীত চিত্র ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায়, যেখানে সামান্য গভীরতা থেকে জল তুলে কৃষিক্ষেত্রে এক বিপ্লব ঘটে গেছে। তবে সাম্প্রতিককালে প্রথমে কৃষি বিভাগ ও পরে জলসেচ বিভাগের উদ্যোগে উপত্যকার বহু জায়গায় নিম্ন উত্তোলক পাম্পের সাহায্যে সেচের ছোট ছোট পরিকাঠামো গড়ে তোলা সম্ভব হয়েছে, যা কেন্দ্রীয় জল কমিশনের রিপোর্টকে কিছুটা হলেও নস্যাৎ করতে পেরেছে। আশার কথা, এই পাম্পগুলো বহুলাংশে সৌরশক্তিচালিত। কৃষি বিভাগ থেকে এজন্য লোভনীয় ভর্তুকির ব্যবস্থা করা হয়েছে। এর ফলে হয়তো স্থানবিশেষে কিছু বিশেষ ফসল চাষ সম্ভব হচ্ছে, কিন্তু একটি বলিষ্ঠ প্রগতিশীল কৃষিব্যবস্থা গড়ে ওঠার জন্য যে বিস্তৃত ও স্থিতিশীল জলসেচ পরিকাঠামো দরকার, তা অধরাই থেকে গেছে।

বামে রাখ ভয়ঙ্করী বন্যা মরণ-ঢালা : ফি বছর বন্যায় প্রধান ফসল ধানের ক্ষতিই সবচেয়ে বেশি হয়। খারিফ মরসুম ছাড়াও অনেক সময় চৈত্র-বৈশাখের অকাল বৃষ্টি পাকা বোরো ধানের প্রচুর ক্ষতিসাধন করে।

বন্যায় তাৎক্ষণিক ক্ষতি ছাড়াও আঘাত লাগে কৃষকের আত্মবিশ্বাসে, যার পরোক্ষ প্রভাব পরবর্তী ফসলগুলোর ওপর পড়ে। এর অন্য আরেকটি দিকও আছে। আবহাওয়া ও ভাগ্যের জোরে যদি বোরো ধানের ফলন সন্তোষজনক হয়, তবে সেই কৃষকেরা পরবর্তী শাইল ধান চাষে মন লাগান না, কারণ ঘরে খাবার চাল থাকলে খরচের কথা ভেবে তারা পিছিয়ে যান। তবে কৃষি বিভাগ থেকে সাম্প্রতিক বছরগুলিতে অপেক্ষাকৃত কম সময়কালের ধানের জাত প্রবর্তন করায় বন্যায় ক্ষতির আশঙ্কা থেকে বোরোচাষীরা অনেকটাই মুক্ত হতে পেরেছেন। ভারত সরকারের পক্ষ থেকে বন্যা, খরা ইত্যাদি প্রাকৃতিক দুর্যোগের ক্ষতি সামলানোর জন্য অনেক আগে থেকেই প্রধানমন্ত্রী ফসল বিমা যোজনা চালু করেছেন এবং ইদানীং সরকারি চাপে বিমা সংস্থাগুলো আরও বেশি কৃষককে ফসল বিমার আওতায় নিয়ে আসার চেষ্টা করছে। তবে এখনও তাদের কাজের আন্তরিকতা এবং কার্যকারিতা প্রমাণিত হবার সুযোগ ঘটেনি। যেদিন সত্যিকারের ক্ষতিগ্রস্ত কৃষক সঠিক ক্ষতিপূরণ হাতে পাবেন, সেদিন তাদের দুঃখ-কষ্ট কিছুটা হলেও লাঘব হবে।

আমার সন্তান যেন থাকে দুধেভাতে : অনন্তকাল থেকে বাঙালি মায়ের এই অভিলাষ কিন্তু এখনও অধরা। ভাতের জোগাড় করা গেলেও বরাক উপত্যকার সন্তানদের মুখে যথেষ্ট দুধ তুলে দেওয়া যায়নি। আমুল সমবায় আন্দোলনের ধাঁচে গড়ে উঠেছিল ‘কামুল’। কিন্তু আমাদের অন্য সরকারি উদ্যোগের মতোই এর অকালমৃত্যু ঘটেছে অনেক আগেই। ২০১৯-২০ সালে তৎকালীন জেলাশাসকের উদ্যোগে হাইলাকান্দি জেলায় অনুরূপভাবে আরেকটি সমবায় ‘হিমুল’ গঠনের চেষ্টা জেলাশাসকের বদলির সঙ্গে সঙ্গে গঙ্গাপ্রাপ্তি ঘটে। এখনও বিচ্ছিন্নভাবে অনেক দুগ্ধ উৎপাদক কাজ করে গেলেও সাধারণের জন্য প্রয়োজনীয় দুগ্ধ উৎপাদন ও বিতরণ ব্যবস্থা গড়ে ওঠার কোনও আভাস দেখা যাচ্ছে না। তবুও শহরাঞ্চলে দুগ্ধপ্রেমী সম্পন্ন গ্রাহকদের চাহিদা মেটানোর জন্য শহরের উপকণ্ঠে কিছু দুধ উৎপাদন হয়ে থাকে। কয়েক বছর আগে শিলচর শহরে নিয়মিত দুগ্ধ বিতরণের জন্য ঘুঙ্গুরে একটি আধুনিক প্রক্রিয়াকেন্দ্র স্থাপিত হয় এবং বেশ কিছুদিন পরিষেবা চালু থাকে। পরে অন্যান্য সরকারি প্রকল্পের মতো সেটিরও অকাল মৃত্যু হয়। এর চেয়েও খারাপ অবস্থা ডিম উৎপাদনের। প্রায় পুরো চাহিদাটাই নির্ভর করে আমদানিকৃত ডিমের জোগানের ওপর। তবে, মুরগিজাতীয় মাংসের চাহিদা অনেকটাই স্থানীয়ভাবে মেটানো সম্ভব হয়েছে। পশুপালন বিভাগের এক আধিকারিকের মতে, বরাক উপত্যকায় প্রায় চারশো পোল্ট্রি রয়েছে, যারা নিয়মিত উৎপাদন করে এ অঞ্চলের চাহিদা মেটাতে সক্ষম হচ্ছে। মুরগিপালকরা মোটামুটি একটা ব্যবসা করতে পারছেন, যদিও পাখিদের খাদ্য উৎপাদন স্থানীয়ভাবে করতে না পারায় আশানুরূপ লাভবান হওয়া যাচ্ছে না।

মৎস্য মারিব, খাইব সুখে : সাম্প্রতিককালে যদি কৃষি ও আনুষঙ্গিক ক্ষেত্রে চোখে পড়ার মত উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হয়ে থাকে, তাহলে সে হচ্ছে মৎস্যপালন। একটা সময়ে যখন দৈনন্দিন বা বিশেষ প্রয়োজন মেটাতে ‘চালানি’ মাছ ছাড়া গতি ছিল না, সেই সময়ের তুলনায় আজকের দিনের অবস্থার আকাশপাতাল তফাৎ। ২০১৮-১৯ সালে কাছাড় জেলায় মাছের বার্ষিক চাহিদা ছিল ৩৫,৫০০ মেট্রিক টন এবং সে বছর ঘাটতি ছিল ২,৫৭৭ মেট্রিক টন। ২০২০-২১ সালে চাহিদা দাঁড়ায় ৪০,০০০ মেট্রিক টন, যার বেশিরভাগটাই স্থানীয় উৎপাদনের সাহায্যে মেটানো সম্ভব হয়েছে এবং ১২০০ মেট্রিকটনের বেশি বহির্জেলায় রফতানি হয়েছে, যা নিঃসন্দেহে আশার সংবাদ। ফলে আরও বেশি মৎস্য উৎপাদক আগ্রহী হবেন। কৃষি অর্থনীতির নিয়মে কম বা অনুৎপাদক জমি মৎস্যচাষে ব্যবহৃত হবে। এতে চাষের জমি কিছু কমলেও ক্ষতি নেই, কারণ যে কোনও ক্ষেত্র

থেকেই আর্থিক লাভ গ্রামীণ জনসাধারণ তথা আর্থিক অবস্থার উন্নতিসাধন করবে।

আজকের কৃষি তথা বাজার অর্থনীতিতে কয়েকটা বিষয় স্পষ্ট হয়ে উঠেছে

- শুধুমাত্র উৎপাদন বাড়ালেই চলবে না, উৎপাদন হতে হবে বাজারের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ।
- বর্তমানে কৃষি বাজার ও বাণিজ্য এক জটিল বিষয়। যোগাযোগ ব্যবস্থার সৌজন্যে বাইরে থেকে যেমন নানা কৃষিপণ্য এসে ঢুকছে তেমনই বাইরেও যাচ্ছে।
- সব জায়গায় সব কিছুর উৎপাদন হতে হবে, এমন ধারণা থেকে বেরোতে হবে। প্রতিটি অঞ্চলভেদে সম্ভাবনাময় কৃষিসামগ্রী স্থির করতে হবে এবং তার উৎপাদন ও বাজারিকরণে মনোনিবেশ করতে হবে।
- প্রয়োজনীয় বাকি কৃষিসামগ্রী বাইরে থেকে আসবে যেমন আমাদের উদ্বৃত্ত বাইরে যাবে। উন্নত পরিবহন ব্যবস্থা এর সহায়ক হবে।
- সংরক্ষণ ও প্রক্রিয়াকরণে আরও গুরুত্ব আরোপ করতে হবে। আমাদের উদ্বৃত্ত কৃষিসামগ্রী উন্নত প্রক্রিয়ার পর অধিক মূল্যে বাজারজাত করতে হবে।

শেষকথা : কোভিড পরবর্তীকালে দেশে নিয়োগক্ষেত্রে এক সাংঘাতিক, নীরব পরিবর্তন ঘটে গেছে। বহির্রাজ্যে কর্মরত অসংখ্য শ্রমিককে গ্রামে ফিরতে হয়েছে। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে শিক্ষিত কর্মহীনদের দল। যাদের কিছু জায়গা-জমি থেকে থাকে, তারা আবার কৃষিকাজে বাধ্য হয়ে নিয়োজিত হবার চেষ্টা করতে পারে। উদ্যমী ও সৎ যুবকদের জন্য সরকার থেকে নানা পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে, যার সুযোগ গ্রহণ করাটা খুব কঠিন নয়। এক্ষেত্রে সরকার ছাড়াও গ্রামাঞ্চলের রাজনৈতিক নেতৃত্বকে এগিয়ে আসতে হবে। গ্রামীণ সমাজে একটি কৃষিবান্ধব আবহাওয়া গড়ে তোলা তাদের দায়িত্ব। কারণ, এ ব্যাপারে রাজনীতিকরা চিরদিন উদাসীন থেকেছেন।

স্বাধীনতা-পরবর্তীকালে এই উপত্যকা থেকে অনেক রাজনৈতিক নেতার উত্থান হয়েছে, যাদের অনেকেই গ্রামাঞ্চল থেকে উঠে এসেছেন। এই নেতারা বা শহরের কোনও নেতা কৃষিজীবীর ভোটে নির্বাচিত হয়ে এলেও (মইনুল হক চৌধুরী অবশ্যই ব্যতিক্রম) কৃষির সমস্যা নিয়ে মাথা ঘামাননি। কৃষিজীবীরাও তাদের সমস্যাকে প্রকৃত সমস্যা রূপে তুলে ধরতে ব্যর্থ। রাজনীতি আজও ধর্ম-জাতপাত, রাস্তাঘাট বা অন্যান্য সরকারি অনুদানপ্রাপ্তির চক্রেই ঘোরাফেরা করল। কৃষি যেন রয়ে গেল এক অন্ত্যজ শ্রেণির জীবিকা বা জীবনধারা রূপে। কৃষক আজও সগর্বে মাথা তুলে সমাজের সামনে 'আমি কৃষক' এই ঘোষণা করতে কুণ্ঠিত। যে শ্রেণি সমাজের এক গুরুত্বপূর্ণ অংশ হিসেবে নিজেকেই প্রতিষ্ঠা করতে পারল না, তার কথা কে শোনে। আমাদের সমাজ তো ভুলেই আছে যে কোত্থেকে বা কীভাবে তার খাওয়া জোটে, কারণ তার জন্য তো অসংখ্য অদৃশ্য কৃষক আছে, যাদের সামান্যতম মর্যাদা প্রদানের ভাবনাও আমাদের মনে জাগরিত হয় না। তাই তো তার উত্তরপ্রজন্ম চাকরির খোঁজে, অনুগ্রহের আকাঙ্ক্ষায় প্রভাবশালীদের পেছন পেছন ছুটে বেড়ায় অনেকটা গল্পের কস্তুরীমৃগের মত। এই প্রজন্মের যুবকেরা যদি নিজেদের সম্পদে, সামর্থে আত্মবিশ্বাসী হয়ে না উঠতে পারে, তবে বরাক উপত্যকার কৃষি এভাবেই পুরনো গাড়ির মত ধুঁকে ধুঁকে চলবে। যে আত্মবিশ্বাস ও স্পর্ধায় পঞ্জাব-হরিয়ানার কৃষক দেশের রাজনীতির গতিবিধি পাল্টে দেবার সাহস করে, সেই স্ফুলিঙ্গ আমাদের কৃষকের মধ্যে যদি কোনও দিন আগুন জ্বালাতে পারে, সেদিন রাহুমুক্তি ঘটবে কৃষির।

বরাকের কৃষি : সময়ের অনুভব

সঞ্জীব দেবলস্কর

> ‘‘বলেছিলাম ভালোবাসার বংশবৃদ্ধি হোক
> বলেছিলাম অনন্ত সম্ভাবনার দিকে মুখ করে হাঁটার নাম জীবন-যাপন
> বলেছিলাম গাভীগুলো দুগ্ধবতী হোক
> বলেছিলাম পৃথিবী হোক শস্যশালিনী
> বলেছিলাম আকাশ মধুময়, বলেছিলাম সমুদ্রের বুক উপচে পড়ছে মধু—’’
>
> শক্তিপদ ব্রহ্মচারী

করোনা অতিমারির চরম মুহূর্তে দেখা গেল, বরাক উপত্যকা থেকে এত এত শ্রমিক বেঙ্গালুরু, হায়দরাবাদ, চেন্নাই, মুম্বই, আহমেদাবাদ বা উত্তর ভারতের শিল্পনগরীতে ভাগ্যান্বেষণে গিয়েছিল (অথবা যায়)। এরা এ ভূমি থেকে পালিয়ে যায়, কারণ এ ভূমিতে তাঁদের কোনও সংস্থান নেই। এরা ছিটকে পড়েছে বরাকের উর্বরা ধান ক্ষেত, অসংখ্য নদী-নালা-বিল-হাওর থেকে, যেখান থেকেই তাদের পূর্বপুরুষ সংগ্রহ করে নিতেন জীবন-জীবিকার রসদ। ভূমিটি মূলত কৃষিভিত্তিক। কালের বিবর্তনে ওই মৌল ভিত্তিটি হল অবহেলিত, অথচ এ স্থানে কোনও বিকল্পের সন্ধান পাওয়া গেল না, এক ধরনের প্রক্ষিপ্ত নগরায়নের ঢেউ এসে বরাকের অর্থনীতির মূল ভিতটিকে নড়িয়ে দিয়ে গেল।

চিত্রটি ধরা পড়েছে শক্তিপদ ব্রহ্মচারীর একটি কবিতায় (‘হে কবিতা ক্ষমা কর’, ১৯৯৪); ‘আমাদের সময় যে বুড়ো ছিল সে এখন ফকির/আমাদের সময় যে নৌকা ঠেলত তার নাতি এখন পান সিগেরেটের দোকানি...।’ উত্তর ভারত আর দক্ষিণ ভারতের রাজপথে ছড়িয়ে পড়া এ ভূমির তৃতীয় প্রজন্মের সন্তান-সন্ততিদের দেখলে শক্তিপদ কী বলতেন কে জানে! অতিমারির প্রকোপে শ্রমিকদের গৃহপ্রত্যাগমনের সঠিক পরিসংখ্যান হাতের কাছে নেই-- এদের কতজন আবার ফিরে গেছে, গিয়ে কর্মস্থলে বহাল হতে পেরেছে কিনা এসব কিছুই জানা নেই। তবে গ্রামেগঞ্জে কর্মক্ষম যুবকদের আবার ওই পরিযায়ী শ্রমিক হয়ে যাওয়া ছাড়া গতি নেই। এই কর্মবিহীন কৃষিজীবীদের সঙ্গে এখন এসে যোগ দিয়েছে কর্মহীন চা-বাগানের শ্রমিকেরাও। এ হল একটি দৃশ্য, আরেকটি দৃশ্যের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করি।

ক্যাজুয়াল পোশাকে শহরের রাস্তাঘাটে দক্ষিণ ভারতীয় উচ্চারণে মোবাইলে অবিরাম ইংরেজি-হিন্দি বলতে বলতে বিচরণশীল ছেলেমেয়েদের দেখে বোঝা গেল এরা বর্তমানে ‘ওয়ার্ক ফ্রম হোমে’ আছেন। এই বিরাট মানবসম্পদ আমরা ধরে রাখতে পারিনি। আমাদের ভূমিতে এদের জন্য কোনও কর্মসংস্থান নেই। এরা ইঞ্জিনিয়ারিং, ম্যানেজমেন্ট ইত্যাদি ডিগ্রিধারী। পাঠ সমাপনান্তে এদের জন্য কোনও সংস্থান নেই এ ভূমিতে। এমনি করে পুরো উপত্যকাটি রিক্ত হতে চলেছে। এদের বাদ দিলে আর যে সেক্টরে একটা বিরাট সংখ্যক কর্মী

নিয়োজিত করা যেত, সেই কৃষিক্ষেত্রের প্রতি আমাদের কোনও পরিকল্পনাই রচিত হল না এত দিন। যা আমাদের অর্থনীতির বুনিয়াদ, যাকে কেন্দ্র করে বরাক উপত্যকা স্বয়ং সম্পূর্ণ হয়ে উঠতে পারত, এ হয়ে উঠল আমাদের চরম অবহেলার ক্ষেত্র।

দুই

কয়েকটি প্রজন্ম ধরেই কৃষি বিষয়ে আমরা কতকগুলো সামাজিক বিভ্রমের শিকার। সমাজের অবহেলিত শ্রেণি হিসেবেই কৃষক সমাজ চিহ্নিত। আমরা প্রাত্যহিক জীবনে অশিষ্ট আচরণকে ‘চাষার মতো আচরণ’ বলতে অভ্যস্ত। কয়েকটি দশক আগেও পাঠশালার পণ্ডিতমশাইরা অমনোযোগী ছাত্রকে বইখাতা ছেড়ে লাঙল ধরার উপদেশই দিতেন, যেন এ কাজটি কেবলমাত্র অপদার্থের জন্যই নির্ধারিত। অথচ কাজটি যে কী শ্রমসাধ্য, তা কারও অজানা থাকার কথা নয়। চাষবাস, কৃষিকর্ম নিয়ে আমাদের সামাজিক অবহেলার ফলশ্রুতি হিসেবে কৃষক সমাজের আজ এত দুর্দশা। অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল, শিক্ষায় অনগ্রসর, সামাজিক দিকে অবহেলিত এরা নিজস্ব বৃত্তিতে আর আস্থাশীল নয়। কঠোর পরিশ্রমের বিনিময়ে যে সামান্য ধান এরা উৎপাদন করবে, এর বাজারমূল্য নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর। সরকারি ব্যবস্থাপনায় যেখানে প্রতি কিলো এক টাকা মূল্যের চাল বিতরণ হয়, সেখানে প্রান্তিক ভাগচাষী কিংবা মধ্যবিত্ত মিরাশদার সামান্য পুঁজি এবং শ্রম বিনিয়োগ করে প্রতকৃতপক্ষে কিছুই পাচ্ছে না। চাষবাসে এরা আর উৎসাহী নয়। অভ্যাসবশত যারা এখনও কষ্টেসৃষ্টে চাষ করছে, এরা জানে এমনি ফেলে রাখলে ক্ষেত আবর্জনায় পূর্ণ হয়ে যাবে, ভবিষ্যতে এতে উৎপাদন ব্যাহত হবে। প্রতি মরসুমের শুরুতেই এরা ভাবে আর বুঝি এ কাজ করা সম্ভব হবে না। নিজের সন্তানদের স্কুল-কলেজে পড়িয়ে চাকরিজীবী হিসেবে গড়ে তোলাই এখন তাদের লক্ষ্য। যৎসামান্য জমির প্রতি আর কোনও আকর্ষণও তাদের নেই। এক-ফসলি জমি তাদের অর্থনৈতিক সহায়তা করতে পারছে না। এর চাইতে জমি ইট ভাট্টিওয়ালার কাছে হস্তান্তর করা, নিদেনপক্ষে জমিতে দোকানঘর, গুদাম বানানো বা একটি বসতবাটি বানিয়ে ভাড়া দেওয়াই তাদের কাছে শ্রেয়। সমস্ত আইনকানুন থাকা সত্ত্বেও কৃষিজমিকে অ-কৃষিজমি হিসেবে রূপান্তরিত করার হাজারটি পন্থাও রয়েছে। আর হবে না-ই বা কেন, যে ফসলের কোনও বাজারদর নেই, স্থানীয় বাজার যেখানে পঞ্জাব রাইসে ছয়লাপ, সেখানে এ জমি তো আর asset নয়, liability।

এ প্রসঙ্গে বিস্তারিত যাওয়ার আগে একবার নজর ফেরানো যাক পঞ্জাব-হরিয়ানার দিকে। ওদিকে, কৃষক পরিবারের সন্তান-সন্ততিরা লেখাপড়া করে পৈতৃক পেশা থেকে পলায়নের জন্য নয়, ওই পেশায় নিয়োজিত হয়ে আরও উন্নত প্রথায় উৎপাদন প্রক্রিয়ায় সামিল হওয়ার জন্যই। ইংল্যান্ড, আমেরিকায় পড়াশোনা করেও হরিয়ানা বা পঞ্জাবের যুবকেরা কৃষিকর্মে আত্মনিয়োগ করে। এমনকী উচ্চ সরকারি বা বেসরকারি আধিকারিকও চাষের মরসুম বা ফসল কাটার ঋতুতে ছুটি নিয়ে মাঠে নেমে যান। এজন্য উত্তর ভারতের কৃষকরা হতদরিদ্র নন। এরা যে সারা ভারতকে খাদ্যশস্যের জোগান দেন। সম্প্রতি একবর্ষ ব্যাপী আন্দোলনকারী কৃষকদের যে অনেকে গাড়ি-বাড়িওয়ালা কৃষক বলে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করেছিলেন, এর কারণ হচ্ছে কৃষি সম্বন্ধে এদের, (বাঙালিরা তো এ দলে আছেই) সীমাহীন অজ্ঞতা আর উন্নাসিকতা। এদের ধারণা, কৃষকদের যেন ধনী হতে নেই, অনাহারে, অভাবে, হতাশায় কৃষকদের আত্মহত্যা করাই বুঝি ভবিতব্য।

বাঙালিদের কথা বিশেষ করে বলতেই হবে। উনবিংশ শতকের চিন্তাবিদ ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

যে ‘হাসিম শেখ আর রামা কৈবর্তে’র চিত্র এঁকেছিলেন, বাঙালি কৃষক আজও ওই অবস্থায়ই আছে। কিন্তু বাঙালি কণ্ঠ ছেড়ে গান করে— ‘এমন ধানের ক্ষেতে ঢেউ খেলে যায় বাতাস কাহার দেশে... কোথায় এমন হরিৎ ক্ষেত্র আকাশ তলে মেশে’, কিন্তু হায়! কৃষক বা কৃষি সম্পর্কে এদের মনে কোনও শ্রদ্ধাবোধ নেই। এ গানের রচয়িতা কবি দ্বিজেন্দ্রলাল রায় বিলেত গিয়েছিলেন কৃষিবিদ্যার পাঠ নিতে। (১৮৮৬ সালে ইংল্যান্ডের Cirencester College থেকে FRAS-এ ডিপ্লোমা নিয়ে দেশে আসেন) বাঙালি এ খবর রাখেনি, ওঁরা তাঁর গানটা নিয়েছে, বিদ্যার প্রতি কোনও আগ্রহ দেখায়নি। আর বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের থেকেও এ ক্ষেত্রে বাঙালির কোনও পাঠ নেওয়া হয়নি। তিনিও তাঁর পুত্র রথীন্দ্রনাথকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ইলিওনিস বিশ্ববিদ্যালয়ে কৃষিবিদ্যার পাঠ নিতে পাঠিয়েছিলেন (১৯০৯ সালে স্নাতক হয়ে তিনি ফিরে আসেন)। আমরা ভুলে যাই কবিগুরু বীরভূমের রুক্ষ মরুভূমিতে সবুজের অধিষ্ঠান করেছেন, বোলপুরকে বসবাসযোগ্য করে গড়ে তুলেছেন শান্তিনিকেতন আর শ্রীনিকেতন। বৃক্ষরোপণ, বনমহোৎসব, হলকর্ষণ উৎসবের মাধ্যমে কৃষিকর্মকে গৌরবের আসনে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন। কবি নোবেল পুরস্কারের পুরো অর্থটাই কৃষির উন্নয়নের খাতে বিনিয়োগ করেছেন (সরকারি আইনের ঘোরাটোপে এ টাকাটা যে বিনষ্টও হয়েছে, সে অন্য ব্যাপার)। আমরা তো এসব জানতে চাই না। আমাদের শুধু নাগরিক জলসায় উদ্বাহু নৃত্য—‘পৌষ তোদের ডাক দিয়েছে আয়রে ছুটে আয়,/ ডালা যে তোর ভরেছে আজ পাকা ফসলে মরি হায়’, কিংবা ‘আয়রে মোরা ফসল কাটি’। কিন্তু ফসল কাটার ঋতুতে যে চাষীর সমস্ত ধান পাওনাদার এসে তুলে নিয়ে যায় (তাঁর জন্য ব্যাঙ্কের কৃষিঋণ লাভ অকল্পনীয়) এর খরর কে রাখে! বাকি যেটুকু ভাগে থাকে সেটুকুও কো-অপারেটিভের মাধ্যমে বিক্রি করার সুবিধা তো তাঁকে কেউ দেবে না। ঘোর বর্ষায় নিদানের দিনে চাষীদের নির্ভর করতে হয় গ্রামীণ মহাজনদের ওপর। কৃষিঋণ, স্বল্পমূল্যে সার বীজ, ওষুধপত্র জোগানের কথা কাগজপত্রে থাকলেও প্রকৃতপক্ষে কৃষকের হাতে তা আর পৌঁছয় না। এমনি করে বছরের পর বছর চাষীর মাথায় ঋণের বোঝা বাড়তে বাড়তে এরা এমন জায়গায় এসেছে যে, এরা আর চাষে উৎসাহী নয়। জমিদারকে কাকুতি-মিনতি করে ভাগচাষের জমি ফেরত দিয়ে অব্যাহতিও চাইছে কয়েক বছর থেকে।

আজকাল জমিচাষে ট্র্যাক্টর ব্যবহার হওয়ায় গরু-মহিষেরও প্রয়োজন ফুরিয়ে আসছে। এই গবাদি পশু থাকা সত্ত্বেও এখানে দুগ্ধ উৎপাদনের এবং বিপণনের কোনও ব্যবস্থাও নেই।

বলছিলাম ধানক্ষেতের কথা। নিরুৎসাহী চাষীর ধানক্ষেতেই গজিয়ে উঠছে ইটের ভাট্টা, ফিসারি, ঘরবাড়ি, দোকানপাট, মোটরগাড়ি সারানোর গ্যারেজ ইত্যাদি। জমি সওদাগরদের দাক্ষিণ্যে শহর নেমে আসছে গ্রামের দিকে, গ্রাস করছে ধানের ক্ষেত যেখানে গড়ে উঠছে ইট-কাঠ-পাথর-সিমেন্ট আর লোহার জঞ্জাল— সুপার মার্কেট, শো-রুম, উৎসব ভবন, নার্সিং হোম।

শিলচর শহর দক্ষিণ দিকে বিস্তৃত হয়ে রাঙ্গিরখাড়ি-নাগাটিলা হয়ে উত্তর কৃষ্ণপুর, দক্ষিণ কৃষ্ণপুরের ধানক্ষেত গ্রাস করে সোনাবাড়িঘাট পর্যন্ত পৌঁছে ডান দিকে নরসিংপুর-ভাগা-ধলাই-পালংঘাট-লায়লাপুর বর্ডার পর্যন্ত এগিয়ে গেছে। আর বামদিকে সোনাই হয়ে নগরায়নের ঢেউ এগিয়ে চলছে একদিকে মতিনগর হয়ে ভুবন পাহাড় অবধি, আরেকদিকে স্বাধীনবাজার, কচুদরম হয়ে আরও দূরে। শিলচর হাইলাকান্দি রোড ধরে এগিয়ে গেলে মেহেরপুর, ঘুঙ্গুর হয়ে বড়জালেঙ্গা, দরগাকোণা ধরে ধানক্ষেত প্রায় নিশ্চিহ্ন হতে চলেছে।

এদিকে, সদরঘাটে বরাক ব্রিজ পেরিয়ে উধারবন্দ-কুম্ভীরগ্রাম কিংবা কাশিপুর-বাঁশকান্দি-লক্ষীপুর-

জয়পুর-রাজাবাজার-বিন্নাকান্দি-কুমাছড়া যতদূরেই যান না কেন হরিৎক্ষেত্র আজ যুদ্ধবিধ্বস্ত। আকাশে-বাতাসে ভাসছে চাষীদের হাহাকার, শোনার কেউ নেই। রামনগর হয়ে বড়যাত্রাপুর- কাটিগড়া-কালাইন-গুমড়া কিংবা শ্রীকোণা, আলমবাগ হয়ে যেতে থাকুন হাইলাকান্দির দিকে, অথবা বরাক পেরিয়ে জাটিঙ্গামুখ-বড়খলা-বিক্রমপুর-সোনাপুর যেতে থাকুন, যেদিকে চোখ যাবে ক্ষতবিক্ষত ধানক্ষেত। হাইলাকান্দি আর করিমগঞ্জ জেলার সোনার ক্ষেত আজ রিক্ত। এই যে হাজার হাজার বিঘা জমির ওপর নির্ভরশীল কৃষক, এরা কোথায় গেল, এটা নিয়ে কি কেউ ভেবেছে? যে মুষ্টিমেয় কিছু শ্রমিক আজও কৃষিতে আটকে রয়েছে—এরা নিতান্ত নিরূপায় তাই লাঙল ঠেলছে। নইলে শহর বা শহরতলিতে রিক্সা টানতো, পথে পথে ফেরিওয়ালা হয়ে ঘুরত অন্যদের মত। পূর্বপুরুষের পেশা ছেড়ে এরা এখন প্রকৃত অর্থেই সর্বহারা। কৃষির সার্বিক অবক্ষয় এদের ভিখিরি বানিয়েছে, এদের সন্তান-সন্ততিরা তাই আজ পরিযায়ী শ্রমিক। গত ষাট বছর এদের দিকে কেউ মুখ তুলে তাকায়নি। এদের জন্য সব প্রকল্পই কাগজেপত্রে।

ছয়ের দশকে কাছাড়ে এসেছিল কৃষির উন্নয়নে ‘প্যাকেজ প্রোগ্রাম’। কোথা থেকে এল ঢেউ, দিনকতক পুরো জেলাটিকে নাড়িয়ে দিয়ে সত্তর সাল ছোঁয়ার আগেই হাওয়ায় মিলিয়ে গেল, রয়ে গেল কিছু কথকতা, স্মৃতি— আর উপত্যকাকে উপহার দিয়ে গেল কিছু নব্য ধনাঢ্য ঠিকাদার, কনট্র্যাকটার। ওই প্রকল্পের কোনও পরম্পরা রইল না। ১৯৬৩-৬৪ সালে আসামের কৃষিমন্ত্রী মইনুল হক চৌধুরীর প্রয়াসে এই প্রকল্পের মাধ্যমে কাছাড়ে জলসেচ, বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে চাষবাস, উন্নতমানের বীজ, রাসায়নিক সার, কীটনাশক ওষুধ, পাওয়ার টিলার এসবের কথা কাছাড়ের (অবিভক্ত) কৃষক প্রথম শুনল। কিন্তু এসবই ক্রমে হয়ে গেল ইতিহাস। জেলায় কৃষি আধিকারিক, গ্রামসেবকের পোস্ট এল, কৃষি বিভাগের অফিস হল, মাটি পরীক্ষাগার এল, গ্রামসেবক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র হল অরুণাচল, পশু চিকিৎসালয় এল, ঘুঙ্গুরে প্রতিষ্ঠা হল ভেটেরিনারি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র। সিন্ধ্রি থেকে এল রাসায়নিক সার, আসামের নামরূপ সার কারখানায় উৎপাদনও শুরু হল বলে। এদিক থেকে একজন, দু’জন কৃষি মহাবিদ্যালয়, পশুবিজ্ঞান মহাবিদ্যালয়ে পড়তে যাওয়া শুরু করলেন। কিন্তু প্রক্রিয়াটি আর এগোলো না। যে ক’টি পশু চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এর সংখ্যাটি আর বাড়ল না, বরং যেগুলো ছিল সেগুলো বন্ধ হতে চলল।

আমার পিতৃদত্ত একখণ্ড জমিতে একটি পূর্ণাঙ্গ পশু চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল (১৯৬৬) যেখানে স্বয়ং রাজ্যের কৃষিমন্ত্রী মইনুল হক চৌধুরীর উপস্থিতিতে মহাসমারোহে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে আমরা গেয়েছিলাম ‘ওই মহামানব আসে’। উচ্ছ্বাস ভরে উচ্চারণ করেছিলাম, ‘উদয়শিখরে জাগে মা ভৈ মা ভৈ, নব জীবনের আশ্বাসে।’ গ্রামের একেবারে সাধারণ চাষীরা কী বুঝেছিল আজ জানি না, কিন্তু গতবছর ওই হাসপাতাল বাড়িতে গিয়ে বুঝলাম সেদিনের সব আশ্বাস সত্যিই আজ ‘ধূলিতলে হয়ে গেল ভগ্ন’। বড়খলার অন্তর্গত হরিণছড়া টিলার নীচে ওই হাসপাতাল কৃষকদের আশাভরসার স্থল হয়েই আত্মপ্রকাশ করেছিল। ডাক্তার (লোকে বলত সার্জন), কম্পাউন্ডার, তাদের সহকারী মিলে ছিল বড় একটা টিম, সবার জন্য সুদৃশ্য কোয়ার্টার, পশুদের (রোগীদের) জন্য সুরক্ষিত শেড, শিশি-কৌটা নিয়ে ওষুধের ঘর, জলের জন্য টিউবওয়েল, ফুলে ফলে সাজানো ছিল পুরো বাড়িটা। এখন সব কিছু ধ্বংসের মুখে, দরজা-জানালা নেই পরিত্যক্ত বাড়িটার, আগাছায় ভরে আছে সবকিছু, কোনও ডাক্তার, নিদেনপক্ষে চৌকিদারের পদার্পণ পড়ে কিনা সন্দেহ। দেখে এলাম সেই বক্তৃতা মঞ্চের স্থানটি, যেখানে দাঁড়িয়ে মন্ত্রীমশাই বক্তৃতা করেছিলেন দীর্ঘক্ষণ। ক্লাস ফাইভের ছাত্র আমার স্মৃতিতে উজ্জ্বল হয়ে আছে মন্ত্রী মহোদয়ের সেই পচন সার তৈরির

পরামর্শ। তিনি ব্যঙ্গ করে বলেছিলেন, আমরা বাথান থেকে একটানে কোদাল দিয়ে গোবর বাইরে ফেলে সব সাফ করে ফেলি, এবং হাত দিয়ে কোদাল টানা ভঙ্গি করে সবাইকে হাসিয়েই বিনীত পরামর্শ, 'এইটা কোনও কাজের কাজ নায়, আরও সামান্য পরিশ্রম করিয়া একটা গর্ত করা আর এইখানে বাথানের আবর্জনা সহ বাড়ির হাবিজাবি সব জমা করিলে যা হয়, তাহাকে বলে পচন সার। একেবারে নিখরচায়।' প্যাকেজ প্রোগ্রামের অংশ হিসেবেই এরকম অনেক কিছুই হয়েছিল— পশু হাসপাতাল, কৃষি গবেষণা কেন্দ্র, গ্রামসেবক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (অরুণাচল), ধানবীজ গবেষণা কেন্দ্র (আলমবাগ) ইত্যাদি। কিন্তু সব কোথায় হারিয়ে গেল। শিলচর শহরে সত্তরের শুরুতে দেখেছি ভূমিপরীক্ষা কেন্দ্র (Soil testing Centre), ভাঙা বাড়িটা আজও দেখা যায়, বোঝা যায় না ভেতরে কোনও কাজ হয় কিনা। ইতিপূর্বে এখান থেকে যোরহাট কৃষি মহাবিদ্যালয়ে পড়তে যেতেন কেউ কেউ, তবে সংখ্যাটা মোটেই উল্লেখযোগ্য নয়, ইদানীং তো সংখ্যাটা আরও কম। এক্সটেনশন অফিসার, এসএমএস ইত্যাদি পদে স্থানীয়দের দেখা যেত, ভেটেরিনারি কলেজ থেকে পাস করে আসা ডাক্তারদের মধ্যেও স্থানীয়দের খুব বেশি আর দেখা যায় না। গ্রামসেবকের অফিসগুলো অবশ্য নিশ্চিহ্ন, সেবকদেরও খুব একটা দেখা যায় না। এমনি করে প্যাকেজ প্রোগ্রামে যার সূচনা হয়েছিল, তা একেবারে নিঃশেষ।

মনে আছে, তখন আগে মাঝে মাঝেই গ্রামে কৃষি সচেতনতামূলক অনুষ্ঠান হত—লাইন ধরে ধান রোপণ, উন্নত বীজ এবং চারা ব্যবহার, কীটনাশক, সার ইত্যাদির প্রয়োগ জনপ্রিয় করার নানা প্রচেষ্টা নেওয়া হত, কৃষিজীবী, গ্রামের সাধারণ মানুষ ছাড়াও স্কুলের পড়ুয়ারা জমা হত এসব প্রত্যক্ষ করতে। আর সন্ধ্যায় প্রজেক্টরে ছায়াছবিতেও অনেক কিছু দেখানো হত। গ্রামের মানুষ গভীর আগ্রহে দেখত বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে কৃষি, ট্র্যাক্টরে জমি চাষ, পাম্পের সাহায্যে জলসেচ, স্প্রেয়ার দিয়ে কীটনাশক প্রয়োগ, আগাছা সাফ করার যন্ত্র। প্যাকেজ প্রোগ্রামের কর্মসূচি হিসেবে আয়োজিত অনুষ্ঠানে আমাদের আরেকটি প্রাপ্তি হল মাইক দেখা, মাইকে বাজানো রেকর্ডে আধুনিক বাংলা গান শোনা।

বরাক উপত্যকায় কৃষি নিয়ে এর পর আর কোনও উদ্যোগের কথা শোনা যায়নি। এ নিয়ে আমাদের জনপ্রতিনিধিদের কোনও তৎপরতাও দেখা যায়নি। কারও মাথায় একটা কৃষি মহাবিদ্যালয় স্থাপনের চিন্তাও জাগেনি, বিশ্ববিদ্যালয়ের কথা তো স্বপ্নেরও অতীত। যে ভূমিতে শিল্পপ্রযুক্তির কোনও সম্ভাবনা নেই, যেখানে কায়িক শ্রমিক সহজলভ্য, যেখানে নদী-নালা, খাল-বিলে পর্যাপ্ত জলের জোগান, অনেক কিছু হারিয়েও যেখানে প্রাকৃতিক সম্পদের প্রাচুর্য, সেখানে অর্থনীতির ভিত্তি পুনর্নির্মাণ করতে কৃষি ছাড়া আর বিকল্প এখনও নেই।

বরাক উপত্যকায় উন্নতমানের নিজস্ব ধানবীজ রয়েছে, যাকে বলে heritage rice। এগুলোকে টিকিয়ে রাখা এবং এ ধানগুলোকে জনপ্রিয় করে তোলা ভীষণ প্রয়োজন। বরাক উপত্যকার বিশেষ ধানের মধ্যে রয়েছে আড়ি জড়িয়া, ইকড় ধাড়িয়া, আউশ মুরালি, বিরইন, আছরা, আমন, উবা বিরইন, কই মুরালি, কুইয়ারি, কালিজিরা, কালি মেউকরি, কার্তিকা, কাছালো, খাকি বিরইন, গন্ধি বিরইন, গুয়াবরই, চিনি বিরইন, শাইল, ছইয়ামরা, তেরাবালি, বালাম, ভেড়াপাওয়া, মুরালি, লাকি শাইল, লাটাই, সায়বাইল, অরিনারায়ণ ইত্যাদি। তালিকাটি আরও দীর্ঘ করা যায়। (লোকসঙ্গীত শিল্পী বিধান লস্করের একটি গানে বরাকের ধানের পরিচিতি ধরা পড়েছে)। এই বিচিত্র ধানের ভাণ্ডার আজ রিক্ত। বীজধান যত্নের সঙ্গে আলাদা করে রাখার সুযোগের অভাবে সংমিশ্রণ ঘটে নিজস্ব চরিত্র লক্ষণহারা হয়ে যাচ্ছে। আগে অতি যত্নে খড়ের গোলাকৃতি

পুঁটলি (মচা) বানিয়ে অন্য ধানের ছোঁওয়া বাঁচিয়ে বীজ রাখা হত। হতদরিদ্র কৃষকের পক্ষে এসব আজ আর সম্ভব হচ্ছে না। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে উৎপাদন করলে, বিশেষ করে বিরইন, ভেড়াপাওয়া, অরিনারায়ণ, কালিমেউকরি, কালিজিরা কিংবা মুরালির দক্ষিণ এশিয়ায় আন্তর্জাতিক বাজার সম্ভাবনা রয়েছে। উত্তর ভারত, দক্ষিণ ভারত ছাড়াও পশ্চিমবঙ্গেও এসবের চাহিদা থাকবে।

সম্প্রতি একটি সংবাদসূত্রে প্রকাশ হয়েছে, গত চার বছরে কাছাড় জেলায় ১৪,৮৪৩ হেক্টর কৃষিজমি হ্রাস পেয়েছে। (সাময়িক প্রসঙ্গ, ১৭ নভেম্বর, ২০২১)। উপত্যকার অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে এই হ্রাসের নেতিবাচক প্রভাব তো আছেই। এ প্রবণতা আসামের অপরাপর জেলায়ও সমান। সারা রাজ্যেই গত চার বছরে ১,০২,০০৫ হেক্টর কৃষিজমি হ্রাস পেয়েছে। ওই সূত্র আরও জানিয়েছে, ২০১৫-১৬ অর্থবর্ষে রাজ্যে কৃষিজমির পরিমাণ ছিল ২৮,০১,৪৭২ হেক্টর। ২০১৬-১৭ অর্থবর্ষে তা কমে হয়েছে ২৭,৭৩, ৮৫৫ হেক্টর, আর ২০১৭-১৮ অর্থবর্ষে তা কমে দাঁড়িয়েছে এসে ২৭,২২,৫৩০ হেক্টরে। আর সর্বশেষ হিসেব অনুযায়ী ২০১৯-২০ অর্থবর্ষে তা এসে দাঁড়িয়েছে ২৬,৯৯,৪৬৭ হেক্টরে। এই প্রক্রিয়া চলতে থাকলে কৃষি অর্থনীতি যেমন ধ্বংস হবে তেমনই বিঘ্নিত হবে পরিবেশ ভারসাম্য, এবং সর্বোপরি সামাজিক জীবনে এর নেতিবাচক প্রভাবও পড়বে।

একটা কৃষিভিত্তিক সমাজের জীবনে যে প্রশান্তি এবং নিরাপত্তা ছিল, ছিল কৃষিভিত্তিক সংস্কৃতির আচ্ছাদন, বারো মাসের তেরো পার্বণে কৃষির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট লোকাচার, ধর্মাচার সবই হারিয়ে গেলে একদিকে যেমন সাংস্কৃতিক বিচ্যুতি, অন্যদিকে তেমনই কৃষিরও অবক্ষয় হতে বাধ্য।

তিন

বলেছিলাম সামাজিক জীবনের কথা। কৃষিভিত্তিক সমাজের সঙ্গে সম্পৃক্ত সংস্কৃতির দিকে একটু আলোকপাত করা প্রয়োজন। কৃষির সঙ্গেই একটা জনগোষ্ঠীর জীবন ও সংস্কৃতি গভীরভাবে সম্পর্কিত। অর্থনৈতিক জীবনের সঙ্গে সংস্কৃতির সাযুজ্য না থাকলে জীবন হয় অনির্দিষ্ট, অস্থির, ছন্নছাড়া—যেমন আধুনিক নাগরিক জীবন, শিল্পনগরী কিংবা নগরায়ন প্রভাবিত সমাজজীবন। এ পরিপ্রেক্ষিতেই আমাদের এদিকে কৃষির প্রতি মানুষের আগ্রহ, আকর্ষণ বা শ্রদ্ধাবোধ কমে যেতে থাকল। বসন্তপঞ্চমীতে হলকর্ষণ দিয়ে যে সূচনা, এর প্রথম পর্ব হত আউশ মুরালির ফলনে। প্রথম ধান তোলা হলে লাল চাল দিয়ে সেদ্ধ পিঠা (মেড়া পিঠা) দিয়ে উৎসব। হিন্দু-মুসলিম উভয়েই এতে সামিল হত, আজও হয়। আর শ্রাবণ-ভাদ্র-আশ্বিন মাসজুড়ে চাষের মরসুম। ভোর হতে না হতে গরু-মহিষ নিয়ে মাঠে, মাথায় ঝড়-জল-বৃষ্টি, পায়ের নীচে কাদা, কিন্তু প্রাণে আনন্দ। মাঠ চাষ করে রোপণের উপযোগী করে তোলার নানা প্রক্রিয়া, জলসেচ, আইল দিয়ে জল আটকে রাখা, হালি চারার বীজতলি তৈরি করা, রাতের অন্ধকারে হালি তোলা এবং দিনের প্রথমভাগে হালি রোপণ। কঠোর পরিশ্রম এসবের মধ্যেও ছিল একটা উৎসবের মেজাজ। পুরো কৃষক পরিবার, এমনকী সারা গ্রামবাসীরও এতে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভূমিকা ছিল। ধান্য রোপণ থেকে নবান্ন—এর মধ্যে কত ধরনের সংস্কার, রিচ্যুয়েলস, নানা ধরনের লোকায়ত উপাদানের তৈরি খাবার, বিভিন্ন তিথিতে বিশেষ ধরনের শাক ভক্ষণ, ধানকাটার ঋতুতে পরিশ্রমের সঙ্গে আনন্দ মিলেমিশে একাকার। বিশেষ করে উল্লেখ করতে হয় কার্তিক মাসের সংক্রান্তির। এটাকে গ্রামবরাক (বাংলায়ও) বলে গর্ভসংক্রান্তি, এতে শস্যক্ষেত্রকে আসন্নপ্রসবা জন্মদাত্রী হিসেবে অর্ঘ্য নিবেদন করা হয়। বোঝা গেল কৃষিকর্ম নিতান্ত জীবিকানির্বাহের বিষয় না

থেকে হয়ে যায় লোকায়ত ধর্মাচারে। ওদিকে, গরুমহিষের মঙ্গল কামনায় কার্তিক মাসে রাখাল বালকদের বাড়ি বাড়ি গীত গেয়ে মাগন করে রাখাল রাজা এবং বাঘাইয়ের সেবা দিয়ে পরবর্তী পর্বের জন্য প্রস্তুতি, তীব্র শীতের সন্ধ্যায় ধান মাড়াই, ঝাড়াই, আর খড়ের আগুন জ্বালিয়ে শরীর উষ্ণ রাখা, কীর্তন, কথকতা, কিচ্ছা শোনার পালা। এই জীবন আজ বিস্মৃত ইতিহাস। কৃষি নেই অথচ বিকল্প কিছুই নেই। আগে যারা ক্ষেত করত, ভাগচাষী হিসেবে, বা নিজের একটুকরো জমিতেই, এরা এখন দিনমজুর, আগে যারা দিনমজুরি করত এরা আর নেই, আগের ছোট-বড়, মাঝারি মিরাশদার, জমিদার কৃষি থেকে এদের কোনও জীবিকানির্বাহের সুযোগ নেই। পিতৃপুরুষের জীবিকা থেকে বিচ্যুত হয়ে এদের আজ শেকড়বিহীন, একধরনের বাস্তুহারা হতদরিদ্র অবস্থা।

বরাকে কৃষিভিত্তিক ব্যবসায়ের সম্ভাবনা

সুভাষ ভট্টাচার্য

কৃষিভিত্তিক ব্যবসা এবং খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ ইউনিটের প্রভূত উন্নতির সম্ভাবনা রয়েছে। কারণ, এটি এখন বেশ মুনাফার জায়গা। প্রাকৃতিক সম্পদের প্রাচুর্য তো রয়েছেই। এখন এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে কেন্দ্র সরকারের অনুকূল নিয়মনীতি, আর্থিক দিক থেকে উৎসাহব্যঞ্জক নানা ঘোষণা এবং সুবিধা প্রদান। ফলে ভারত তো বটেই, দেশের এই উত্তর-পূর্বাঞ্চলও কৃষিভিত্তিক ব্যবসা এবং খাদ্য প্রক্রিয়াকরণে বিনিয়োগের আকর্ষণীয় কেন্দ্র হয়ে উঠছে। নগরায়ন বাড়ছে, বাড়ছে মানুষের রোজগারও। সবাই এখন প্যাকেট করা এবং সব প্রক্রিয়া সেরে একেবারে মুখে তুলে দেওয়ার মতো সামগ্রী বেশি পছন্দ করেন। এছাড়া যুবাদের সংখ্যাধিক্যও এ ক্ষেত্রে বড় আশার কথা।

কিন্তু এরপরও সত্যটা হলো, ভারতে কৃষিভিত্তিক ব্যবসা এবং খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ সেই তুলনায় এগোচ্ছে না। এর দরুন প্রতিবছর ৯৫ হাজার কোটি টাকার উৎপাদিত কৃষিসামগ্রী নষ্ট হচ্ছে। বিষয়টি অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক। এই বিশাল জাতীয় লোকসান থেকে দেশকে বাঁচানোর জন্য প্রয়োজন উন্নততর প্রযুক্তি, যাতে মাঠে উৎপাদিত সামগ্রী শৃঙ্খলাবদ্ধভাবে গ্রাহকের টেবিলে গিয়ে পৌঁছয়।

কাছাড়, করিমগঞ্জ ও হাইলাকান্দি তিন জেলাকে নিয়ে গঠিত বরাক উপত্যকা আসামের দক্ষিণাঞ্চলে অবস্থিত। এর প্রধান শহর শিলচর। এরপরই ক্রমান্বয়ে করিমগঞ্জ ও হাইলাকান্দি। এই অঞ্চলের অনেক সুবিধার জায়গা রয়েছে। সীমান্তবর্তী অবস্থান, প্রচুর প্রাকৃতিক সম্পদ, কৃষির উপযোগী জলবায়ু। এছাড়া রয়েছে, বিভিন্ন ধরনের কৃষিসামগ্রী উৎপাদনের সেই পরম্পরা। এখানকার তাপমাত্রা মোটামুটিভাবে ২৫ থেকে ৩০ ডিগ্রি সেলসিয়াসেই থাকে। বৃষ্টিপাতের পরিমাণও ১০০ থেকে ২০০ সেঃমিঃ। এমন জলবায়ু পাটচাষের জন্য উৎকৃষ্ট।

বরাক উপত্যকার সম্ভাবনার জায়গাগুলো আসলে সঠিকভাবে খতিয়ে দেখা হয়নি। এর মধ্যে রয়েছে ফল, জৈব রন্ধনমশলা, খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ, বস্ত্র, হস্ততাঁত এবং প্রকৃতি-পর্যটন। মনোরম জলবায়ু এবং সুন্দর ভূ-ভাগ এবং প্রচুর চা-বাগান থাকার পরও বরাক উপত্যকার প্রতি পর্যটকদের আকৃষ্ট করা যায়নি।

ধানই এখানে প্রধান কৃষিসামগ্রী। তবে উদ্যানজাত সামগ্রীও এখন কৃষকদের ভরসাস্থল হয়ে উঠছে। আনারস বরাক উপত্যকার বড় অর্থকরী ফল। ভাতই যেহেতু এখানকার প্রধান খাদ্য, তাই এই অঞ্চলকে খাদ্যশস্য উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণ করতে ধানভিত্তিক কৃষিব্যবস্থায় গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে।

কৃষি এবং উদ্যানজাত উৎপাদনের শক্তি, সুবিধা ও সম্ভাবনার জায়গাগুলোকে এভাবে বিবৃত করা যেতে পারে—

কৃষিশক্তি সম্ভাবনা (Agricuiture Potential)

--চাষীদের বড় অংশই বুদ্ধিমান এবং প্রযুক্তির ব্যাপারটাও বোঝেন।

--কৃষিযোগ্য জমির অধিকাংশই নদী-উপনদী বিধৌত।

--জলস্তরও এমন মাত্রায় রয়েছে যে, মনে হয় উত্তোলিত হতে একেবারে তৈরি।

--রাজ্যের বাইরে বাজারজাত করার মতো শস্য ভাল পরিমাণেই উৎপাদিত হয়।

সুযোগ :

--শস্য ও জীবনজীবিকায় বৈচিত্র্য।

--জৈবচাষের সীমাবৃদ্ধি ও বিপণনের ব্যবস্থা।

--কৃষি এবং উদ্যোগীদের উন্নয়ন।

--দূরপ্রাচ্যের সঙ্গে পর্যন্ত অর্থনৈতিক অলিন্দ গড়ে তোলা।

সম্ভাবনা :

--ক্ষুদ্র পরিসরে প্রক্রিয়াকরণ শিল্প স্থাপন।

--কৃষি পরিকাঠামো উন্নয়নে বিনিয়োগ।

--অর্গানিক প্রোডাক্টসের প্রসেসিং, সর্টিং, গ্রেডিং ও মার্কেটিং।

উদ্যানশস্যের সম্ভাবনা (Horticulture Potential)

--উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি করে মোট উৎপাদন বাড়ানো যায়।

--চাহিদার সঙ্গে তাল মিলিয়ে উচ্চ ফলনশীল বীজ ব্যবহারের মাধ্যমে অধিকতর এলাকায় উৎপাদন সম্ভব।

--উন্নত চাষের মাধ্যমে বিভিন্ন শিল্প-কলকারখানার কাঁচামালের উৎপাদনও বাড়ানো যায়।

সুবিধা :

--কাঁঠাল, আনারস ও লেবু প্রকৃতির দয়াতেই এখানে ভাল ফলন হয় এবং সরাসরি হোক বা প্রক্রিয়াজাত চেহারায় হোক, এসবের বিশাল বাজার রয়েছে।

--কাঁটাতারের বেড়া বসানোর দরুন বাংলাদেশে পাচার বন্ধ হওয়ায় বাজারে কাঁঠালের পরিমাণ বেড়েছে।

--বরাক উপত্যকায় আদার ব্যাপক ফলন হয়।

সম্ভাবনা :

--কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের প্রকল্পে আর্থিক সহায়তা নিয়ে ফলন-উত্তর পরিকাঠামো তৈরি করা যায়।

--সরাসরি বা প্রক্রিয়াজাত করে আনারস, কাঁঠাল ও লেবুর রফতানি বৃদ্ধি।

--খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ ইউনিটের বিরাট সম্ভাবনার জায়গা।

কিন্তু এতসব সুবিধার জায়গা থাকার পরও আসামের দক্ষিণের জেলাসমূহ তথা বরাক উপত্যকায় দেশের অন্য অঞ্চলের সঙ্গে তাল মিলিয়ে উৎপাদন হচ্ছে না । এর কারণ, উদ্যান ক্ষেত্রের সম্ভাবনার জায়গাটা ঠিকঠাক ধরাই যাচ্ছে না। বাজারের নিরিখে উৎপাদন স্থির করার অভ্যাসটাই হয়নি এখনও, চাষীদের বাণিজ্যিক বিষয়সমূহ বোঝার সমস্যা, চাষীদের কাজের অপর্যাপ্ত পরিকাঠামো, বেহাল পরিবহন ব্যবস্থা

ইত্যাদির দরুন শুধু যে ফলন-উত্তর লোকসান বেড়ে চলে, তা-ই নয়, চাষীদের অন্যের ওপর নির্ভরতাও অনেকটা বেড়ে যায়। আসলে বরাক উপত্যকার কৃষি-উদ্যানের যে সম্ভাবনার জায়গা রয়েছে, একে ঠিকভাবে ধরা হচ্ছে না। সময় বেঁধে প্রকল্প তৈরি, তহবিল আদায়ে সঠিক তদারকি, উপযুক্ত বিপণন এবং উৎপাদিত পণ্যের ব্র্যান্ডিং ঠিকঠাক করা গেলে 'সোনার খনি' এই উপত্যকাকে উদ্যানজাত সামগ্রীর ব্যবসা-বাণিজ্যের লাভজনক হাবে পরিণত করা যায়।

উদ্যান বিকাশে শ্রমের মূল্য অনুপাতে চাষীদের উৎপাদিত সামগ্রীর দাম পাওয়ার ব্যাপারে ভারত সরকার বর্তমানে যে উদ্যোগ নিচ্ছে, এর সঙ্গে প্রয়োজন যথাযথ কৌশল নিরূপণ। যেমন, বাজারের নিরিখে উৎপাদন ব্যবস্থা, উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি এবং সঠিক প্যাকেজিং, পণ্যের লোডিং-আনলোডিং ও প্যাক হাউস কনসেপ্ট, প্রোডাকশন ক্লাস্টার অনুসারে কালেকশন সেন্টার তৈরি, হিমঘর, প্রক্রিয়াকরণের প্রতি ধাপে মূল্য সংযোজন, পরিবহনের পর্যাপ্ত পরিকাঠামো তৈরি এবং সংগঠিত বিপণন ব্যবস্থা। ফল এবং সব্জি প্রক্রিয়াকরণ শিল্পের যে বিরাট সম্ভাবনার ক্ষেত্র রয়েছে, তা বরাক উপত্যকার তিন জেলার অর্থনৈতিক উন্নয়নে মূল ভূমিকা নিতে পারে। এজন্য চাই ফল, সব্জি ও মশলার প্রক্রিয়াকরণের আধুনিক ফুড প্রসেসিং ইউনিট। এতে কৃষকরা যেমন সরাসরি উপকৃত হবেন, তেমনই অপচয়ের দরুন যে উৎপাদন-পরবর্তী লোকসানটা হয়, একেও ঠেকানো যাবে। তাতে গ্রামীণ যুবাদের প্রচুর প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ কর্মসংস্থানের সৃষ্টি হবে। তবে ফল ও সব্জির ক্ষেত্রে একর প্রতি উৎপাদন বৃদ্ধি তথা মিশন ফর ইনটেগ্রেটেড ডেভেলপমেন্ট অব হর্টিকালচার এবং মিশন ফর অর্গানিক ভ্যালু চেন ডেভেলপমেন্ট ফর নর্থ ইস্ট রিজিয়ন-র মতো সংস্থাগুলোর সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য ভারত সরকার যেভাবে গুরুত্ব প্রদান করছে, তা অদূর ভবিষ্যতে ফল ও সব্জি প্রক্রিয়াকরণ শিল্পের সার্বিক বিকাশকে নিশ্চিত করবে। এতকাল যে-সব উৎপাদিত উদ্যানজাত পণ্য অপচয় হচ্ছিল, এর প্রক্রিয়াকরণ, সংরক্ষণ এবং মূল্য সংযোজন কৃষকদের অতিরিক্ত আয়ের পথ দেখাবে। লাভবান হবেন ফুড বিজনেস অপারেটর, সদ্য শুরু করা উদ্যোগী, মধ্যস্থতাকারী এবং বেকার যুবারা।

খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্প মন্ত্রকের অধীনস্থ আত্মনির্ভর ভারত অভিযানের অঙ্গ হিসেবে পিএম ফর্মালাইজেশন অব মাইক্রো ফুড প্রসেসিং এন্টারপ্রাইজেস স্কিমে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে মাইক্রো বা কটেজ স্কেল ইন্ডাস্ট্রিকে কারিগরি সহায়তা, প্রশিক্ষণ, দক্ষতা বিকাশ এবং এমনকী প্রক্রিয়াজাতকরণ, সংরক্ষণ ও মূল্য সংযোজনে কৌশল এবং অবস্থানগত সহায়তাও প্রদান করে। এর সফল বাস্তবায়নের নীতিকৌশল পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপায়ণের জন্য এই স্কিমে ওয়ান ডিস্ট্রিক্ট ওয়ান প্রোডাক্ট চিহ্নিত করা হয়েছে। বিভিন্ন প্রয়োজনীয় সামগ্রী এনে রাখা, সাধারণ সেবা গ্রহণ এবং পণ্যের বিপণনে ওয়ান ডিস্ট্রিক্ট ওয়ান প্রোডাক্ট প্রোগ্রাম ফলদায়ক হবে। উত্তর-পূর্বের রাজ্যগুলোতে এই প্রকল্পের খরচ ৯০:১০ অনুপাতে বহন করা হয়।

বরাক উপত্যকার জেলাগুলোতে ওয়ান ডিস্ট্রিক্ট ওয়ান প্রোডাক্ট প্রোগ্রামে কাছাড়ে আনারস এবং করিমগঞ্জ ও হাইলাকান্দিতে সুপারি উৎপাদনকে চিহ্নিত করা হয়েছে।

আনারস : আনারস থেকে জ্যাম, জুস, জুস কনসেন্ট্রেট, স্কোয়াশ হতে পারে। আনারসের ক্যান্ডি, ডি-হাইড্রেটেড আনারসের টুকরো বা বিশেষ প্রক্রিয়ায় আনারস রসহীন করে ক্যানভর্তি করা যায়।

সুপারি : লাল সুপারি, সাদা সুপারি ইত্যাদি তৈরি হতে পারে। রয়েছে সুগন্ধি সুপারি, পানমশলাও। সুপারির খোলের সাহায্যে কাপ, প্লেট, থালা, বাটিও তৈরি করা যায়।

এক জেলা এক সামগ্রী প্রকল্পে প্রযুক্তিগত সুবিধার জন্য যোগাযোগ করা যেতে পারে নীচে উল্লিখিত সংস্থাগুলোর সঙ্গে—

* সেন্ট্রাল ফুড টেকনোলজিক্যাল ইনস্টিট্যুট www.cftri.res.in

* ন্যাশনাল ইনস্টিট্যুট অব ফুড টেকনোলজি এন্ট্রেপ্রেনারশিপ অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট www.niftem.ac.in

* ইন্ডিয়ান ইনস্টিট্যুট অব ফুড প্রসেসিং টেকনোলজি www.iifpt.edu.in

খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ মন্ত্রকের নোডাল এজেন্সি হচ্ছে শিল্প দফতর। আসাম ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশনের (www.aidcltd.assam.gov.in) মাধ্যমে রাজ্যের প্রায় সব জেলায় পিএমএফপিএমই প্রকল্প চালু রয়েছে।

বরাক উপত্যকায় একটি সংগঠিত ফল ও সব্জি প্রক্রিয়াকরণ ক্ষেত্র গড়তে হলে জরুরি হলো উপযুক্ত কৌশল নিরূপণ। সার্বিক পরিকাঠামোগত উন্নয়নের সঙ্গে প্রয়োজন পোস্ট-হারভেস্ট ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমের আধুনিকীকরণ। মশলার ক্ষেত্রে আদা, হলুদও উপত্যকায় ভাল পরিমাণে উৎপাদিত হয়। আজকের দিনে এগুলোই যে সুপার ফুড, সে-কথা মাথায় রেখে ভবিষ্যতের জন্য পরিকল্পনা প্রস্তুত করতে হবে। ভাবনায় রাখতে হবে ভ্যালু অ্যাডিশন এবং মার্কেটিংয়ের কথা।

এছাড়া, কৃষিভিত্তিক ব্যবসা ও প্রক্রিয়াকরণ শিল্পের কর্মপরিকল্পনা তৈরির জন্য ভারত সরকারের এমওভিসিডিএনএআর, সিবিবিও-র মতো বিভিন্ন প্রকল্পে জড়িত ফার্মার্স প্রডিউসার্স অর্গানাইজেশন (এফপিও) এবং ফার্মার্স প্রডিউসার্স কোম্পানি (এফপিসি)-র ভূমিকাও খতিয়ে দেখতে হবে।

এখানে-ওখানে ফল, সব্জি বা মশলার পাঁচমেশালি প্রক্রিয়াকরণ না করে নিশ্চিত সাফল্য পেতে হলে আগে দেখতে হবে উপত্যকার বর্তমান অবস্থা, কোথায় কী হতে পারে ইত্যাদি বিষয়। এরপর কোন্‌টার পর কী কাজ করতে হবে, তা একেবারে ছক কষে চূড়ান্ত করতে হবে।

বরাক উপত্যকায় এই ক্ষেত্রের উন্নয়নের জন্য যে-সব কার্যকর সূচি গ্রহণ করা যেতে পারে—

— ফল ও সব্জি ক্লাস্টারে প্রাথমিক সংগ্রহ কেন্দ্র (পিসিসি) তৈরি।

— প্রাথমিক সংগ্রহ কেন্দ্রের আশেপাশে প্রাথমিক প্রক্রিয়াকরণ কেন্দ্র (পিপিসি) তৈরি।

— সেন্ট্রাল প্রসেসিং ইউনিট (সিপিইউ) তৈরি।

— মোবাইল ফ্রুট প্রসেসিং ইউনিটের বিকাশ।

— সংগঠিত সাপ্লাই চেনের উন্নয়ন।

— কোল্ড চেনের উন্নয়ন।

— তাজা ও প্রক্রিয়াজাত ফল ও সব্জির বিপণন নেটওয়ার্কের বিকাশ।

— খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্প মন্ত্রকের প্রকল্পে অ্যাগ্রো প্রসেসিং ক্লাস্টারে মিনি ফুড পার্ক তৈরি।

কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য করণীয় বিষয়াদি চূড়ান্ত করার সময় উপত্যকার জন্য যথাযথ প্রযুক্তির ওপরও গুরুত্ব আরোপ করতে হবে। সেজন্য মনে রাখা দরকার—

— উৎপাদিত সামগ্রী তরতাজা রাখার জন্য প্রতিষ্ঠানে সৌরবিদ্যুৎভিত্তিক এবং কম বিদ্যুৎ টানার মতো প্রি-কুলার (পোর্টেবল হলেই ভাল) প্রয়োজন।

— উৎপাদিত সামগ্রী টাটকা থাকা অবস্থায় পরিচ্ছন্নতার সঙ্গে বাছাই, গ্রেডে ভাগ করা এবং গুচ্ছ প্যাকিংয়ের জন্য আধুনিক প্যাক হাউস নির্মাণ।

— পিসিসি এবং পিপিসি-র জন্য সৌরবিদ্যুৎভিত্তিক এবং কম বিদ্যুৎ টানার মতো হিমঘর তৈরি।

— মাশরুম, জৈব সারে উৎপাদিত কলা, আনারসের মতো মূল্যবান সামগ্রী ডি-হাইড্রেশনের জন্য ভ্যাকুয়াম ফ্রিজ ড্রায়ার বা মাইক্রোওয়েভ ভ্যাকুয়াম ড্রায়ার বসানো এবং উৎপাদিত টাটকা সামগ্রী ডি-হাইড্রেট করার জন্য ক্লোজড লুপ হিট পাম্প ড্রায়ার আনা।

— স্টেট অব আর্ট কন্টেনারাইজ্‌ড্ জুস এক্সট্র্যাকশন ইউনিট প্রয়োজন, যেখানে ফার্ম লেভেল প্রসেসিংয়ের জন্য চিলিং ফ্যাসিলিটি সহ এসএস ট্যাঙ্ক থাকে।

— আনারস, টম্যাটো, কমলালেবু ইত্যাদি থেকে ফ্রুট পাল্প, পিউরি, জুস কনসেনট্রেক উৎপাদনের জন্য ফ্রুট প্রসেসিং লাইন।

— সুগার সিরাপে নোনা জল ও ফল-সব্জি সংরক্ষণের জন্য লাগাতার বা মোটামুটি লাগাতার চলার জন্য আধুনিক ক্যানিং ইউনিট।

— বাছাই করা ফল এবং সব্জির আইকিউএফের জন্য সুসংহত প্রসেসিং লাইন তৈরি।

— আচার, টম্যাটো কেচআপ, চাটনি বা সস তৈরির জন্য ক্ষুদ্র শিল্পের ডিজাইন্‌ড লাইন।

বরাক উপত্যকার পাহাড়ঘেরা প্রকৃতি এবং অবস্থানের কথা খেয়াল রেখে মাঝারি, ক্ষুদ্র ও অতি ক্ষুদ্র সেক্টরে মূল্য সংযোজন এবং প্রক্রিয়াকরণ শিল্প গড়াই উচিত। প্রতিষ্ঠিত ভারতীয় কোনও ব্র্যান্ডের সঙ্গে যোগাযোগ করে তাদের কাছে নিজেদের উৎপাদিত পণ্য তুলে দিতে পারলে প্রাথমিক পর্যায়ে বিপণনের হ্যাপা থেকে রেহাই মিলবে। প্রতিষ্ঠিত ব্র্যান্ডের মাধ্যমে বিপণন করা গেলেই প্রসেসিং ইউনিট টিঁকিয়ে রাখা নিয়ে আশঙ্কা কমবে। উপত্যকা তো বটেই, আসামের পার্বত্য জেলা এবং প্রতিবেশী রাজ্যগুলোতে যে-সব উদ্যানজাত সামগ্রী মেলে, সেগুলোর কথা খেয়াল রেখে কৃষি-উদ্যান ক্ষেত্রে কাজ করা গেলেও টিকে থাকার সম্ভাবনা বাড়ে।

লাভজনক ফল ও সব্জি প্রক্রিয়াকরণ প্রকল্পের অনুমিত মূলধনী ব্যয়:

সারণি

ক্রম প্রস্তাবিত প্রজেক্ট ক্যাটাগরি ক্ষমতা মূলধনী ব্যয় প্ল্যান্ট ব্যয়

১.	ডি-হাইড্রেশন প্ল্যান্ট ছোট ৫ টিপিডি ৩৩০ ১৭০ লক্ষ
২.	ভ্যাকু ফ্রিজ ড্রাইং ইউনিট মিডিয়াম ২ টিপিডি ১২০০ ৭০০ লক্ষ
৩.	আরটিডি ফ্রুট জুস ইন পেট স্মল ২.৫ টিপিডি ৪৫০ ১৫০
৪.	ফ্রুট জুস কনসেনট্রেট মিডিয়াম ৫০০ টিপিডি ২০০০ ১২০০
৫.	ফ্রুট জ্যাম ইন পেট স্মল ১ টিপিডি ১৫০ ৬০
৬.	ফল-সব্জির ক্যানিং ইউনিট স্মল ২.৫ টিপিডি ৭০০ ৩৫০
৭.	কাঁঠাল প্রক্রিয়াকরণ প্ল্যান্ট স্মল ৫ টিপিডি ৮৫০ ৫৫০

(টিপিডি—টন পার ডে/টন প্রতিদিনে)

— বর্তমান সময়ে দেশীয় বাজারে বিক্রি বা রফতানির ক্ষেত্রে বিপণন এবং প্যাকেটিং করা এক বিরাট এবং উল্লেখযোগ্য ব্যবসা। এফএমসিজির ক্ষেত্রে দেশীয় এবং রফতানি বাজারের দীর্ঘ সম্পর্ক। তাই কৃষিজাত সামগ্রীর ব্যবসা এবং খাদ্য প্রক্রিয়াকরণে প্যাকেটিংয়ের তাৎপর্য এবং গুরুত্ব যথেষ্ট।

বাংলাদেশ একেবারে লাগোয়া বলে উপত্যকা থেকে সরাসরি তৃতীয় পক্ষের মাধ্যমে বিপণনের জন্য প্যাকেটিং ও ব্র্যান্ডিংয়ে গুরুত্ব দিতে হবে। প্যাকেটিংয়ে থাকতে হবে উদ্ভাবনী ছাপ, হতে হবে গুণসম্পন্ন এবং ক্রেতাদের রুচি-পছন্দমতো। ব্যান্ডিং যেন হয় লক্ষ্যমাত্রা-নির্দিষ্ট, সচেতনতা-সমৃদ্ধ বিশ্বস্ত এবং দৃঢ়তর।

বিভিন্ন পণ্যের বিক্রি এবং ক্রেতাদের অগ্রাধিকারের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধানের ক্ষেত্রে বিশ্বজুড়ে কৃষিজাত পণ্যের ব্যবসা ও খাদ্য প্রক্রিয়াকরণে নানা চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করতে হচ্ছে। বাণিজ্যিক সাফল্যের জন্য যথাযথ প্রযুক্তি গ্রহণ, প্যাকেটিং, ব্র্যান্ডিং অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। উপত্যকার কৃষিপণ্যের ব্যবসা এবং খাদ্য প্রক্রিয়াকরণের সম্ভাবনা খতিয়ে দেখে পরিকল্পনা তৈরির ক্ষেত্রে একথা সর্বদা খেয়াল রাখতে হবে কৃষক, উৎপাদক এবং কৃষিভিত্তিক ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলোও যেন লাভবান হতে পারে।

(লেখক ভারত সরকারের ডোনার মন্ত্রকের অধীনস্থ নেরাম্যাক লিমিটেডের প্রাক্তন ম্যানেজিং ডিরেক্টর এবং গুয়াহাটির নর্থ-ইস্ট মেগা ফুড পার্কের ইন্ডিপেন্ডেন্ট ডিরেক্টর।)

বরাকের অর্থনীতিতে চা-শিল্প

তমাল সেন

বরাক উপত্যকার অর্থনীতিতে চা-শিল্পের অপরিসীম অবদান। সেই ব্রিটিশ রাজত্বকালে ওদের হাত ধরেই বরাকের চা-বাগানের গোড়াপত্তন হয় ১৮ শতকের প্রথমার্ধে। তখন থেকে আজ পর্যন্ত বরাকের শিল্প বলতে একমাত্র চা-শিল্প, ছোটখাটো কিছু শিল্প হয়তো আছে কিন্তু সেগুলো ধর্তব্যের মধ্যে নয়। বরাকজুড়ে প্রচুর চা-বাগান এবং তার বেশিরভাগই স্থাপিত হয়েছিল দেশ স্বাধীন হওয়ার আগে। চা-শিল্প যেহেতু এক কৃষিভিত্তিক শিল্প, তাই চা-বাগানের গোড়াপত্তন করতে গিয়ে প্রচুর পরিমাণে অদক্ষ শ্রমিকের প্রয়োজন হয়। তখন দালাল মারফত দেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে, যেমন বিহার, মধ্যপ্রদেশ, ওড়িশা, পশ্চিমবঙ্গের আদিবাসী অধ্যুষিত অঞ্চল, এসব এলাকা থেকে প্রচুর পরিমাণে শ্রমিক নিয়োগ করা হয়। এছাড়া দেশভাগের পরবর্তী সময়কালে পূর্ববঙ্গ অর্থাৎ অধুনা বাংলাদেশ থেকে বাস্তুভিটে ছেড়ে পালিয়ে আসা বৃহৎ সংখ্যক দক্ষ শ্রমিক এবং করণিক শ্রেণির লোক বরাকের বাগানগুলোতে চাকরি গ্রহণ করে এই অঞ্চলে পাকাপাকিভাবে বসবাস শুরু করেন। ভিন রাজ্য এবং পূর্ববঙ্গ থেকে আগত এসব লোকই চা-বাগানের জন্মলগ্ন থেকে আজ পর্যন্ত এই শিল্পের হাল ধরে আছেন। স্বাভাবিকভাবে এই বৃহৎ সংখ্যক লোক এবং তাদের পরবর্তী প্রজন্ম ধীরে ধীরে বরাকের শহরাঞ্চল এবং গ্রামাঞ্চলে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে বসবাস শুরু করেন এবং বরাকের অর্থনীতিতে তাদের অবদান রাখতে শুরু করেন, যেটা আজ অবধি নিরবচ্ছিন্নভাবে চলছে।

বরাকের অর্থনীতিতে চা-শিল্পের অবদান অনস্বীকার্য, তবে এর সঙ্গে আরও কিছু সহযোগী শিল্প হয়তো গড়ে উঠতে পারত, কিন্তু কেন যে গড়ে ওঠেনি, সেটা বিশেষজ্ঞরা ভাল বলতে পারবেন। চা-বাগানের গোড়াপত্তন কাল থেকে এই কিছুকাল আগে পর্যন্ত উৎপাদিত চা বাক্সবন্দি করার জন্য প্লাইউডকেই প্রাধান্য দেওয়া হতো। কিন্তু চাহিদা থাকা সত্ত্বেও এই অঞ্চলে কোনও ভাল প্লাইউড তৈরির কারখানা গড়ে ওঠেনি, অথচ প্লাইউড তৈরির কাঁচামালের অভাব বরাক উপত্যকার বনাঞ্চলে সেই সময়ে ছিল না। আজকাল আবার প্লাইউডের বদলে জুটব্যাগ ব্যবহার করা হচ্ছে। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়, আজ পর্যন্ত এই অঞ্চলে কোনও পাটশিল্প গড়ে ওঠার কথা শুনিনি। চা-বাগানকে কেন্দ্র করে এধরনের অন্যান্য শিল্প গড়ে উঠলে বরাকের অর্থনীতি যে আরও চাঙ্গা হতো, তাতে কোনও সন্দেহ নেই।

ইদানীং ক্ষুদ্র চা-চাষের একটা প্রবণতা দেখা যাচ্ছে, যা খুবই ভাল লক্ষণ এবং সরকারের পক্ষ থেকেও এসব ক্ষুদ্র চাষিকে যথাসম্ভব সাহায্য-সহযোগিতা করা একান্ত বাঞ্ছনীয়। ব্রিটিশ-পরবর্তীকালে সে রকম বড় চা-বাগানের আর গোড়াপত্তন হয়নি, দু'-একটা হয়তো হয়েছে তবে সেটা একেবারে নগণ্য। বড় শিল্পপতিরা কেন এগিয়ে আসছেন না সেটা বোধগম্য নয়, তবে বরাক উপত্যকায় বড় কর্পোরেট হাউস তথা বিড়লাদেরও চা-বাগান আছে, যদিও সেগুলোর উৎপাদন ক্ষমতা বহুদিন থেকে এক জায়গায় স্থির। কারণ, নতুন চা-গাছ রোপণের স্থানাভাব এবং বোধহয় কিছুটা ব্যবসা বৃদ্ধির অনীহা। নতুন চা-বাগান স্থাপন করা তো

দূর, যেগুলো আছে সেগুলোও ধীরে ধীরে রুগ্‌ণ হয়ে যাচ্ছে। বরাকের বেশিরভাগ বাগানে যে চাকচিক্য ছিল সেটা এখন আর লক্ষ্য করা যায় না। স্থানীয় স্তরে যে জনসেবামূলক কাজকর্ম অনেক চা-বাগান কর্তৃপক্ষ দ্বারা সম্পাদিত হতো, সে-সব বর্তমানে সীমিত হয়ে এসেছে। মালিকপক্ষ শুধু মুনাফা অর্জন করতেই ব্যস্ত। এর সাম্প্রতিকতম উদাহরণ, ডলু চা-বাগান কর্তৃপক্ষের দুরভিসন্ধিমূলক মনোভাবের জন্য স্থানীয় প্রশাসনের বিমানবন্দর স্থাপনের জন্য জমি অধিগ্রহণ করা। সাম্প্রতিক অতীতেও এই ডলু চা-বাগান বরাক উপত্যকার মধ্যে এক বর্ধিষ্ণু বাগান ছিল, যেটা বর্তমানে একপ্রকার ধ্বংসস্তূপে পরিণত।

সামগ্রিকভাবে বরাকের চা-বাগানসমূহের যে উৎপাদন ক্ষমতা, সেটার বিশেষ কোনও তারতম্য গত বেশ কয়েক বছরের মধ্যে হয়নি। দাম যেমন কিছুটা বেড়েছে, সেই তুলনায় পাল্লা দিয়ে উৎপাদন খরচও বৃদ্ধি পেয়েছে। এমনিতে দেশের অন্যান্য স্থানের সঙ্গে বরাকের চায়ের গুণগত মান কিছুটা নিম্ন থাকায় দামের কিছু ফারাক সবসময়ই ছিল, এখনও আছে। অবশ্য তাতে বরাকের চা-বাগানের মালিকপক্ষের মুনাফা অর্জনের ক্ষেত্রে বিশেষ কোনও অন্তরায় সৃষ্টি হয়নি। কেননা, এই বিক্রয় মূল্যের ফারাকের অজুহাতে বরাকের চা-বাগান শ্রমিকদের মজুরি ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার থেকে বেশ কিছুটা কম।

সাম্প্রতিককালে বরাকের চা-বাগানগুলোতে আরও একটা ধ্বংসাত্মক প্রবণতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। সেটা হলো, যখন থেকে মেঘালয়ের কয়লা সরবরাহ নিয়ে একটা ডামাডোলের সৃষ্টি হয়েছে তখন থেকে বরাকের অনেক চা-বাগানের কারখানায় ড্রায়ার মেশিন চালানোর জন্য কয়লার পরিবর্তে স্থানীয় বনাঞ্চল থেকে সংগ্রহ করা জ্বালানি কাঠ ব্যবহার হচ্ছে। এতে বন ধ্বংস তো হচ্ছেই, তাছাড়া অনেক বাগানে বনাঞ্চল খালি হয়ে যাওয়ায় চা-গাছে ছায়া প্রদানকারী (বাগানের ভাষায় শেড ট্রি) বড় বড় গাছ কাটা হচ্ছে, এটা এক আত্মহননকারী প্রক্রিয়া। এতে সাময়িকভাবে সমস্যার সমাধান হচ্ছে ঠিক, কিন্তু এর সুদূরপ্রসারী প্রভাব অবশ্যম্ভাবীভাবে চায়ের উৎপাদনের ওপর পড়বেই। আর এসব কারণে এক-একটা চা-বাগান ধীরে ধীরে রুগ্‌ণ হয়ে যাচ্ছে। দীর্ঘদিন থেকে সামগ্রিকভাবে বরাকের চায়ের উৎপাদন ঊর্ধ্বমুখী তো নয়ই, এক জায়গায় যে দাঁড়িয়ে আছে সেটাও নয়, বরং বলতে গেলে সেটা নিম্নমুখী। বরাকের চা-শিল্পে যদি ধস নামে তবে সেটা বরাকের অর্থনীতির জন্য মোটেই সুখকর নয়। কিছুটা পরিসংখ্যান দিয়ে আমি ব্যাপারটা খোলসা করার চেষ্টা করছি। (পরিসংখ্যান সূত্র : গুগল)

বরাক উপত্যকার মোট চা-বাগান কাছাড়ে ৫৬, করিমগঞ্জে ২৩, হাইলাকান্দিতে ১৯। চা-চাষের আওতাধীন জমির পরিমাণ ৬০ হাজার হেক্টর, মোট চা উৎপাদনের পরিমাণ বছরে ৫৫ মিলিয়ন কেজি। কাছাড়ের চা-বাগানগুলোর মধ্যে এক বিশেষ নাম হচ্ছে কুম্ভা চা-বাগান, আমার জন্মস্থান এবং দীর্ঘদিনের কর্মস্থান। সেই কুম্ভা বাগানকেই উদাহরণস্বরূপ নিয়ে, বরাকের অর্থনীতিতে চা-শিল্পের ভূমিকা নিয়ে আলোচনাটা এগিয়ে নিয়ে যাব। কুম্ভার চা-চাষের আওতাধীন মোট জমির পরিমাণ বর্তমানে মোটামুটিভাবে ৮৫০ হেক্টর, মোট উৎপাদিত চায়ের পরিমাণ সাম্প্রতিক সময়ে বছরে ১৬ থেকে ১৭ লক্ষ কেজি। এই কুম্ভা বাগানে বর্তমানে স্থায়ী শ্রমিকের সংখ্যা ৯০০ থেকে ৯৫০। শুধুমাত্র স্থায়ী শ্রমিক দিয়ে তো আর বাগান চলছে না এবং সেটা শুধু কুম্ভা নয়, প্রতিটি বাগান। এক-একটা বাগানে অস্থায়ী শ্রমিকের সংখ্যা স্থায়ী শ্রমিকের চেয়ে অন্তত তিন গুণ বেশি। যেমন, কুম্ভাতে স্থায়ী শ্রমিক কম-বেশি ৯০০ হলেও প্রতিদিন গড়ে ২৫০০ থেকে ২৭০০ শ্রমিক ওখানে কাজ করে। এই যে বৃহৎ সংখ্যক লোকের কর্মসংস্থান কুম্ভায় হচ্ছে, সেটা শুধু বর্তমানে নয়, শুরুর সময় থেকেই চলছে। অনেককাল আগে ১৯৭৮-৭৯ সালে এই প্রতিবেদকের কুম্ভার আশেপাশের

গ্রামাঞ্চল এবং বস্তি এলাকা থেকে ঠিকাভিত্তিতে শ্রমিক সরবরাহ করার অভিজ্ঞতা আছে। এ তো গেল শুধু একটা বাগানের উদাহরণ, বরাক উপত্যকার প্রত্যেকটা বাগানেই এই অলিখিত নিয়ম অনেক আগে থেকেই চলে আসছে এবং এখনও চলছে। কিছু পরিসংখ্যান এবং একটা বাগানের উদাহরণ দিয়ে এটাই বোঝাতে চাইছি যে, বরাক উপত্যকায় শুধু বাগান অঞ্চল নয়, প্রত্যেক চা-বাগানের আশেপাশের এলাকার বৃহৎ সংখ্যক মানুষের কর্মসংস্থান সৃষ্টির ক্ষেত্রে সংলগ্ন চা-বাগানের এক বৃহৎ ভূমিকা আছে। এসব মাথায় রাখলে বরাকের অর্থনীতিতে চা-শিল্পের যে এক বিশাল অবদান আছে, সেটা সহজেই অনুমেয়।

বরাকের বেশিরভাগ চা-বাগান রুগ্‌ণ হওয়ার একটা বড় কারণ হচ্ছে নতুন চা-গাছ রোপণের প্রতি মালিকপক্ষের অনীহা। একটা চা-গাছ তো আর অনন্তকাল ফলনশীল থাকতে পারে না, একটা সময়ের পর তার উৎপাদন ক্ষমতা স্বাভাবিকভাবেই কমে আসে। তখন ওইসব চারাগাছ উৎপাটন করে সেখানে নতুন চারাগাছ রোপণ করাই যুক্তিযুক্ত। কিন্তু, দুর্ভাগ্যের বিষয়, বরাকের বেশিরভাগ বাগানে এই নতুনভাবে রোপণের কাজটা ঠিকমতো করা হয় না। কারণ, অতিরিক্ত মুনাফা অর্জনের প্রবণতা। ফলনশীল গাছ উৎপাটন করে নতুনভাবে চা-চাষ যেমন ব্যয়সাপেক্ষ, তেমনই সময়সাপেক্ষও বটে। তাই বেশিরভাগ মালিকপক্ষ ওইসব ঝামেলায় না গিয়ে তৎকাল মুনাফাকেই শ্রেয় মনে করে। বরাকের বেশিরভাগ বাগানেই চা উৎপাদনের আওতাধীন জমিতে ফলনশীল গাছ শুকিয়ে যাওয়ার ফলে যে শূন্যতার সৃষ্টি হয়েছে, সেগুলো আর ভরাট করা হয় না। এতেও মালিকপক্ষের সদিচ্ছার অভাব। তাইতো বরাক উপত্যকার চা-চাষের আওতাধীন জমির পরিমাণ কম-বেশি ৬০ হাজার হেক্টর হলেও বাস্তবে সেটা অনেক কম। তবে কিছু ব্যতিক্রম হয়তো আছে। কোনও কোনও বাগান কর্তৃপক্ষ নিয়মিত নতুন চা-গাছ রোপণ করে যাচ্ছে, যদিও সেটা একেবারে হাতে গোনা।

এখানে আমার ব্যক্তিগত উপলব্ধি থেকে একটা কথা বলতে পারি, বরাকের চা-বাগান যাদের দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে অর্থাৎ মালিকপক্ষ এবং তাদের ম্যানেজার, তারা বেশিরভাগই উপত্যকার বাইরের লোক, স্বভাবতই তাদের এই অঞ্চলের প্রতি দরদ অনেক কম। মালিকদের কেউ হয়তো গুজরাট, রাজস্থান ইত্যাদি এলাকার বাসিন্দা অথবা এনআরআই, বছরে একবার বাগান পরিদর্শনে আসেন কিনা, তার ঠিক নেই। শুধু মুনাফা গুনতেই ব্যস্ত। ম্যানেজার যিনি আছেন তার মানসিকতা হলো, নিজের কার্যকালটা যেন নির্ভেজাল কেটে যায়, মালিকের মুনাফা ঠিক রেখে নিজেও যাতে কিছু কামিয়ে নিতে পারেন, সেই চিন্তাতেই ব্যস্ত। ব্যতিক্রম নিশ্চয়ই আছেন। তবে যা লিখলাম, বেশিরভাগের মানসিকতা কিন্তু তা-ই। এর থেকে পরিত্রাণের একটা ক্ষীণ আশার আলো অবশ্য দেখা যাচ্ছে এই অঞ্চলের ক্ষুদ্র চা-চাষীদের মাধ্যমে, যা আমি আগেই উল্লেখ করেছি। বরাকের স্থানীয় লোকদের মধ্যে খুব ধীরে হলেও চা-চাষের প্রবণতা বৃদ্ধি পাচ্ছে, বাস্তবিক অর্থেই যেটা এক সুলক্ষণ। আশা করি, ওদের হাত ধরেই অদূর ভবিষ্যতে বৃহৎ চা-বাগানও প্রতিষ্ঠিত হবে। আর এরকম হলে বরাকের চা-বাগান যেভাবে ধীরে ধীরে অন্ধকারের অতলে তলিয়ে যাচ্ছে, সেটা থেকে পরিত্রাণ পাওয়া সম্ভব হবে।

বরাকের অর্থনীতি যেহেতু প্রচণ্ডভাবে চা-শিল্পের ওপর নির্ভরশীল, তাই যে কোনও মূল্যে এই শিল্পের উজ্জীবন সবার কাছেই একান্ত কাম্য। এই পুনরুজ্জীবনের ব্যাপারে সর্বাগ্রে এগিয়ে আসতে হবে রাজ্য সরকার এবং সঙ্গে কেন্দ্র সরকারকেও। মালিকপক্ষের উৎসাহ বাড়াতে সরকারের পক্ষ থেকে চা-চাষের উপযোগী প্রকল্প ঘোষণা করে তার বাস্তবায়নের প্রতিও লক্ষ্য রাখতে হবে। প্রতিটি বাগান কর্তৃপক্ষ যাতে Tea

Plantation Act, 1951 অক্ষরে অক্ষরে পালন করে, সে ব্যাপারে সরকারের সদা জাগ্রত থাকাই বাঞ্ছনীয়। কেন্দ্র সরকারের সংস্থা টি বোর্ডকে আরও উদার মনোভাব নিয়ে বিভিন্নভাবে সাবসিডি ইত্যাদি দিয়ে প্রান্তিক চা-চাষী তথা প্রতিষ্ঠিত বাগানমালিকদের দিকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিতে হবে। সরকারপক্ষ, মালিকপক্ষ, বিভিন্ন কর্মচারী ও শ্রমিক সংগঠন, তার সঙ্গে অভিজ্ঞ পেশাদার চা-করদের নিয়ে উপদেষ্টামণ্ডলী গঠন করে বরাকের চা-শিল্পের দুরবস্থার মোকাবিলা করা যেতে পারে।

পরিশেষে এটাই বলব, বরাক উপত্যকার এই একমাত্র শিল্প মন্দাভাব থেকে যত তাড়াতাড়ি মুক্তি পায় ততই মঙ্গল। কারণ, বরাকের অর্থনীতির মেরুদণ্ড হচ্ছে চা-শিল্প। দুর্ভাগ্যবশত, চা-শিল্প ছাড়া অন্য কোনও শিল্প আজ পর্যন্ত বরাক উপত্যকায় গড়ে ওঠেনি, আর নিকট ভবিষ্যতে যে গড়ে উঠবে, তারও সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে না। তাই এই শিল্পকে বাঁচিয়ে রাখার দায়িত্ব সবার। চা-শিল্প যদি ফুলেফেঁপে ওঠে তবে বরাকের অর্থনীতিও চাঙ্গা হয়ে উঠবে আর তাতেই আপামর বরাকবাসীর মঙ্গল। অন্য কোনও শিল্প গড়ে না ওঠা পর্যন্ত চা-শিল্পই হচ্ছে বরাক উপত্যকার অর্থনীতির ভবিষ্যৎ।

বরাকের অর্থনীতিতে বাঁশ শিল্প

পার্থপ্রতিম দাস

‘গরিবের কাঠ-উৎপাদক গাছ’ হিসেবে পরিচিত বাঁশ আমাদের দেশের গ্রামাঞ্চলের, বিশেষ করে উত্তর-পূর্বাঞ্চলে অর্থনীতিকে সতেজ করতে এক প্রধান ভূমিকা পালন করছে। এই তৃণ জাতীয় উদ্ভিদ বিস্তীর্ণ অঞ্চলকে ঝড়ের প্রকোপ থেকে রক্ষা করতে পারে। যেহেতু জাতীয় বাঁশ-সম্পদের প্রায় ৬৫ শতাংশ উত্তর-পূর্বাঞ্চলে উৎপন্ন হয়ে থাকে, তাই এই ‘সবুজ সোনা’-র বহুমুখী প্রয়োগের দ্বারা এ অঞ্চলের অর্থনীতিকে পুনর্জীবন দান করতে পারে।

প্ল্যানিং কমিশনের বিশেষ সূত্র মতে, উত্তর-পূর্বাঞ্চলে বাঁশ চাষের ক্ষেত্রে মিজোরাম প্রথম স্থানাধিকারী। তারপরে ক্রমান্বয়ে আসাম, অরুণাচল প্রদেশ, মণিপুর, মেঘালয়, ত্রিপুরা ও নাগাল্যান্ডের স্থান। শুধু চিরবঞ্চিত আমাদের বরাক তথা পূর্বাঞ্চল।

বাঁশ হলো বৃক্ষসদৃশ কাষ্ঠল তৃণ। এই উদ্ভিদের ৭৫টি জাতি এবং ১,২৫০টি প্রজাতি আছে। বিভিন্ন ধরনের বাঁশের আকৃতি ভিন্ন ভিন্ন। কোনও প্রজাতির বাঁশ সরু, আবার কোনওটা বিশাল আকৃতির। বরাক উপত্যকায় বিভিন্ন জাতের বাঁশ পাহাড়ে জন্ম নেয়। যেমন, মুলি, ডলু, বাকাল, পাড়য়া, মুর্তিঙ্গা, রূপই, কাঠখোয়াই, বড়মুলি ইত্যাদি। গ্রামে কনকইত, জাই, বরুয়া, বেতুয়া, বাকাল, টেটুয়া, বস্ত্রি, মুলি ইত্যাদি জন্মায়। কিছুদিন আগে গৌহাটি বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্ভিদবিজ্ঞানীরা কিছু নতুন প্রজাতির বাঁশ খুঁজে পেয়েছেন। তাঁরা অরুণাচল প্রদেশের সিয়াং জেলায় এক প্রজাতির বাঁশ খুঁজে পেয়েছেন, যার ভেতর অন্যান্য বাঁশের মতো ফাঁপা নয়। এছাড়া আসামের লখিমপুর জেলায় লতা জাতীয় বাঁশ পাওয়া গেছে, যা প্রায় ৩০০ মিটার উঁচুতে বেয়ে উঠতে পারে। সাধারণত এই উদ্ভিদ প্রায় ৬০ মিটার দীর্ঘ হয়ে থাকে। বাঁশ বিশ্বের সবচেয়ে দ্রুতবর্ধনশীল ও দৃঢ় উদ্ভিদ। বাঁশ ইউক্যালিপটাস উদ্ভিদের চেয়ে তিনগুণ দ্রুত বাড়তে পারে।

বাঁশ সাধারণত বিশ্বের গ্রীষ্মপ্রধান ও নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চল, বিশেষ করে এশিয়া মহাদেশে প্রচুর পরিমাণে দেখা যায়। বাঁশ সারবিহীন বা অনুর্বর জমি ও উর্বর জমি সবধরনের মাটিতে জন্মে এবং ১,০২০ মিঃমিঃ, আর্দ্রতায় ও ৬,৩৫০ মিঃমিঃ-র অধিক বৃষ্টিপাতযুক্ত আবহাওয়ায়, শুষ্ক বা জলাভূমি সব জায়গায় জন্মাতে পারে। অবশ্য কাদাযুক্ত দোআঁশলা মাটি থেকে বালুযুক্ত দোআঁশলা মাটিতে বাঁশের ফলন ভাল হয়।

আমাদের দেশে বাঁশের ২৩টি জাতি ও ১৩৬টি প্রজাতি পাওয়া যায়।প্রজাতির বিভিন্নতা ও বাঁশ ক্ষেত্রের বিস্তৃতির দিক দিয়ে চিনের পরেই ভারতের স্থান। দেশের বনাঞ্চলের ১২.১০ শতাংশ অর্থাৎ প্রায় ৮.৯৬ মিলিয়ন হেক্টর জমিতে বাঁশ জন্মে থাকে। উত্তর-পূর্বাঞ্চল বাঁশের ৫৮টি প্রজাতি ও ১০টি জাতি দ্বারা সমৃদ্ধ এবং সমগ্র দেশের ৬৫ শতাংশ বাঁশ উৎপাদন করে থাকে।

বাঁশ ও অর্থনীতি : বাঁশের আন্তর্জাতিক বাজারমূল্য প্রায় ১০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। বাঁশ সংক্রান্ত অর্থনীতিতে চিন বিশ্বের প্রথম স্থানে। ২০০১ সালে চিনের বাঁশ অর্থনীতির আয়তন ছিল ২০ বিলিয়ন ইয়েন।

২০০৪ সালে আমাদের দেশের বাঁশ শিল্পের আয়তন ছিল ২,০৪৩ কোটি টাকা, যা আশানুরূপভাবে ৪,৪৬৩ কোটি টাকায় পৌঁছতে সক্ষম হয়। বর্তমানে আমাদের দেশের বাঁশ শিল্পের আয়তন প্রায় ৬,৫০৬ কোটি টাকার, যা ২০১৫ সালে ২৬,০০০ কোটি টাকায় পৌঁছে যাবে বলে অনুমান করা হচ্ছে।

বাঁশ অর্থনীতির কিছু পরিসংখ্যান : (ক) প্রায় ২৫,০০০ বাঁশভিত্তিক শিল্প প্রতিষ্ঠান দেশের ২ কোটি লোকের কর্মসংস্থান দিয়েছে। (খ) পার্বত্য অঞ্চলে বাঁশের মাদুর তৈরির কাজে বছরে ৩ মিলিয়ন কারিগরের জোগান দিচ্ছে। (গ) বাঁশ-শিল্পের ওপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠা ক্ষুদ্র শিল্পোদ্যোগ ও আধুনিক শিল্প প্রতিষ্ঠান উন্নয়নের ফলস্বরূপ ৫০ মিলিয়ন লোকের রুটি-রুজির পথ খুলে দেবে। (ঘ) আধুনিক বাঁশজাত উৎপাদন, যা প্রধানত গৃহসজ্জার কাজে ব্যবহৃত হয়, তা প্রায় ২৬,০০০ কোটি টাকার বাজার তৈরি করতে সক্ষম।

বাঁশজাত দ্রব্যাদি : (ক) বাঁশজাত খাদ্য : বাঁশের কোঁড় বা কোমল কাণ্ড তাজা সব্জি হিসেবে, টিনবন্দি সংরক্ষিত খাদ্য হিসেবে, আচার তৈরি করতে, প্যাকেটে রান্না করা খাদ্য হিসেবে, শুকনো খাদ্য হিসেবে, বিয়ার প্রস্তুত করতে ব্যবহৃত হয়।

(খ) গৃহ নির্মাণের জন্য ব্যবহৃত উপাদান : মাচা বা ভারা, খড়খড়ি সিঁড়ি বা মই, বেড়া, চাল, ছাদ, ইত্যাদি তৈরি করতে।

(গ) ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প : ধূপকাঠির কাঠি, আইসক্রিমের কাঠি, দেশলাইর কাঠি, পেন্সিল, মাদুর, আতসবাজির কাঠি, বঁড়শি, ঘুড়ি, টুথপিক, হাত-পাখা, জানালার পর্দা ইত্যাদি প্রস্তুত করতে।

(ঘ) হস্তশিল্প : সাবেকি ও আধুনিক গৃহসজ্জার সামগ্রী, নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রী ইত্যাদি প্রস্তুত করতে।

(ঙ) অত্যাধুনিক সামগ্রী : ঘরের মেঝের জন্য লামিনেটস, দরজা-জানালার পাল্লা, ম্যাট বোর্ডস, পার্টিকল বোর্ডস, ভিনিয়ার বোর্ডস, করোগেটেড শিট্স, অ্যাক্টিভেটেড কার্বন, তন্তু, ভিনিগার ইত্যাদি প্রস্তুত করতে।

(চ) ঔষধি দ্রব্য : বাঁশের পাতা, কোমল কাণ্ড, ছাল, শেকড় ইত্যাদি বিভিন্ন রোগে টোটকা হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

(ছ) বৃহৎ শিল্প : কাগজকলে বাঁশের শাঁস ব্যবহৃত হয়।

বাঁশ উত্তর-পূর্বাঞ্চলের জনজীবনের চিরকালীন অবলম্বন। এই উদ্ভিদ গ্রামের মানুষের জীবনের প্রতিটি পদক্ষেপে জড়িয়ে আছে। শিশুদের দোলনা থেকে শুরু করে শবাধার, গৃহনির্মাণ থেকে সাঁকো, দৈনন্দিন জীবনযাত্রার সামগ্রী থেকে কারিগরিবিদ্যায় ব্যবহৃত উপকরণ, গৃহসজ্জার সামগ্রী থেকে বাদ্যযন্ত্র, কাগজ, বস্ত্রশিল্প সর্বত্রই বাঁশের ছোঁয়া দেখা যায়। বাঁশকে কমপক্ষে ৫০০ ধরনের কাজে ব্যবহার করা যেতে পারে। ঘরের কাঠামো, শক্তি উৎপাদন, বুলেটপ্রুফ জ্যাকেট, যানবাহনের যন্ত্রাংশ ইত্যাদি তৈরির কাজে বাঁশ সাফল্যের সঙ্গে ব্যবহৃত হচ্ছে। এমনকী কৃত্রিম পা তৈরির কাজেও বাঁশ লাগে। আন্দামানের সুনামিপীড়িত লোকদের পুনর্বাসনের জন্য বাসস্থান তৈরি করতে উত্তর-পূর্বাঞ্চল থেকে বাঁশের তৈরি প্রায় ৯,০০০টি বাসগৃহের কাঠামো পাঠানো হয়েছে। এধরনের সামগ্রী সিয়াচিন ও অনুরূপ আবহাওয়াযুক্ত সীমান্ত অঞ্চলে সেনাবাহিনীর প্রয়োজনের জন্য পাঠানো হচ্ছে। জম্মু ও কাশ্মীরে ভূমিকম্প-আক্রান্ত লোকদের পুনর্বাসনের কাজেও বাঁশ ব্যবহার করা হয়। এখন অত্যাধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে বাঁশজাত সামগ্রীকে আগুন ও জলরোধী করা হয়েছে। অরুণাচল প্রদেশের পাসিঘাটে ৫০টি শয্যাবিশিষ্ট শিশু হাসপাতালটি এধরনের বাঁশ সামগ্রী দিয়ে তৈরি এবং যা সাম্প্রতিক অগ্নিদুর্ঘটনায়ও ক্ষতিগ্রস্ত হয়নি। বাঁশের তৈরি বুলেটপ্রুফ জ্যাকেটের ওজন মাত্র ৪ কেজি। পরীক্ষা করে দেখা গেছে, লাইভ ফায়ারিং টেস্টের পর তা ৬-৮ মাস পর্যন্ত টিকে থাকে।

বাঁশ থেকে বিভিন্ন নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রী তৈরি করা হয়। যেমন, বঁড়শি, ঝুড়ি, ধামা, চাটাই, মই, জোয়াল, ডালা, কুলা, চালনি, টুকরি, হাত-পাখা, ট্রে, ছাতা, লাঠি, মোড়া, খেলনা ইত্যাদি। এছাড়া দক্ষ কারিগররা বাঁশের নিত্যনতুন সামগ্রী তৈরি করছে। যেমন, কৃত্রিম ফুল, ফুলদানি, কলমদানি, বাঁশের পাত্র, ল্যাম্প হোল্ডার, বাঁশের পর্দা, ওয়াল হ্যাঙ্গার ইত্যাদি অসংখ্য গৃহসজ্জার সামগ্রী। এধরনের সামগ্রী খুব কম খরচে তৈরি করা যায়। বহনযোগ্য-অভঙ্গুর হওয়ায় বহুদিন টিকে থাকে। উত্তর-পূর্বাঞ্চলের বাসিন্দারা পুরাকাল থেকে বাঁশকে ঔষধি হিসেবে ব্যবহার করে আসছেন। সে পরম্পরা আজও অম্লান। বাঁশের সবুজ কাণ্ড থেঁতো করে মলম বানিয়ে সদ্য কেটে যাওয়া স্থানে লাগানো হয়। দাঁতের ব্যথায় বাঁশের কচি ডগাকে আগুনে গরম করে ব্যথাকাতর স্থানে লাগালে ব্যথার সাময়িক উপশম হয়। বাঁশের গোড়ায় থাকা আবরণ পুড়িয়ে প্রস্তুত করা ছাই মাথার খুসকি দূর তাড়াতে সাহায্য করে। এছাড়া পাকা বাঁশ জ্বলার সময় যে ধোঁয়া বের হয়, তা মাথাধরা ও সাইনোসাইটিসের উপশম করে। বর্তমানে বাঁশ থেকে প্রস্তুত তেল বিভিন্ন প্রসাধন দ্রব্যে ব্যবহৃত হচ্ছে। গবেষণায় দেখা গেছে, এই তেল ত্বকের বিভিন্ন সংক্রামক রোগের বিরুদ্ধে কার্যকর। ওই তেলে থাকা জৈব উপাদান পচা দুর্গন্ধ দূর করে। এজন্য একে ডিওডোরান্ট হিসেবে ব্যবহার করা যেতে পারে। বাঁশের তেলে জীবাণুনাশক ও কীটনাশক উপাদান থাকার জন্য তা খাদ্য সংরক্ষক হিসেবেও ব্যবহার করা হয়ে থাকে। এছাড়া নানা ভেষজ গুণ থাকায় বাঁশ থেকে বিভিন্ন ওষুধ প্রস্তুতকরণে গবেষণা চলছে।

সম্প্রতি মিজোরামের এক ইঞ্জিনিয়ার বেঞ্জামিন এল থলুম্‌টি, যিনি আমেরিকার ‘গ্রিনফিল্ড প্রজেক্ট’-র সঙ্গে যুক্ত, বাঁশের গুঁড়ো থেকে বিদ্যুৎশক্তি উৎপাদনের পদ্ধতি আবিষ্কার করেছেন। সেই লক্ষ্যে পৌঁছতে আইজলের সেইরাং নামক স্থানে বেঙ্গালুরুর ‘ইন্ডিয়ান ইনস্টিট্যুট অব সায়েন্স’-র প্রযুক্তিগত সাহায্য নিয়ে একটি শক্তি উৎপাদন কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে। উল্লেখ্য, বরাক উপত্যকার বদরপুরেও ধানের তুষ থেকে বিদ্যুৎ শক্তি উৎপাদন করা হয়ে থাকে। থলুম্‌টির মতে, সেইরাংয়ের শক্তি উৎপাদন কেন্দ্র থেকে প্রাথমিক অবস্থায় মাত্র ৫০০ কেভি বিদ্যুৎ শক্তি উৎপাদন করা সম্ভব। কিন্তু যদি আর্থিক সাহায্য পাওয়া যায়, তবে এই উৎপাদন বহুলাংশে বেড়ে যাবে। তিনি আরও বলেন, এই প্রকল্পে বাঁশের অব্যবহৃত অংশকে ছোট ছোট টুকরো করে গুঁড়ো করা হয়। এরপর তা থেকে গ্যাস উৎপাদন করা হয়। যা শক্তিকেন্দ্রে বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য জ্বালানি হিসেবে ব্যবহৃত হয়। আর এই পদ্ধতি পরিবেশ দূষণ করে না। জীবজগতের বৈচিত্র্য রক্ষা করতে বাঁশ উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নেয়। বাঁশ একপ্রকার পরিবেশ-সুহৃদ উদ্ভিদ প্রজাতি এবং সেসঙ্গে ভূমিক্ষয় রোধ করে। বাঁশের শেকড় খুব দীর্ঘ ও গুচ্ছাকৃতির হয়। ফলে মাটিকে দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরে মাটির ক্ষয় রোধ করে। নদীর তীরবর্তী স্থানে বাঁশ রোপণ করলে বর্ষাকালে ভূমিধস হ্রাস পাবে। বাঁশের পাতা পশুখাদ্য হিসেবে ব্যবহৃত হয়। এছাড়া বাঁশের পাতা দিয়ে ঘরের ছাউনি, ছাতা ইত্যাদি তৈরি করা হয়। পৌষ-পার্বণে গ্রামের ঘরে ঘরে ডলু বাঁশের ‘চোঙ্গা’ কেটে তার মধ্যে বিরুনি চাল ও জল ভরে মুখ বন্ধ করে পুড়িয়ে ‘চোঙ্গা পিঠা’ বানানো হয়। কাঁচা বাঁশের ছালকে টল বলা হয়। তা খুব ধারালো বলে প্রাচীনকালে খৎনার কাজে ও নবজাতকের নাড়ি কাটতে ব্যবহৃত হতো। মহরম মাসে লাঠিখেলার দৃশ্য গ্রামাঞ্চলে চোখে পড়ে। শৈশব থেকে মৃত্যু পর্যন্ত বাঁশের ব্যবহার দেখা যায়। তাই সাধক কবি বলে গেছেন —

‘মনরে ঘরের পিছের বেড়ুয়া বাঁশ সেই মোদের ভাই
মরণকালে সেই ভিন্ন সঙ্গে যাওয়া নাই।’

বাঁশ উৎপাদন কৃষিক্ষেত্রে কিছু কিছু সমস্যার সমাধান করতে পারে। যেমন, ক্রপ ইনফেস্টেশন এবং জল সংরক্ষণ। বাঁশ শুষ্ক ও জলাভূমি উভয়স্থানে জন্মাতে পারে বলে খরাকবলিত এলাকায় চাষীদের এক

উৎকৃষ্ট বিকল্প উদ্ভিদ হিসেবে জনপ্রিয় হচ্ছে।

বাঁশচাষের প্রধান অন্তরায় হচ্ছে চাষের জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণের অভাব। তামিলনাড়ুর 'Grow more Biotech'-র ডিরেক্টর ড. এন ভারতীর মতে, কিছু সংখ্যক কাঁটাবিহীন বাঁশ-প্রজাতির প্রয়োগের ফলে দরিদ্র চাষীরা আর্থিক দিক দিয়ে লাভবান হবেন। তাছাড়া পরিবেশগতভাবেও এধরনে প্রজাতি উপকারী।

কিছু প্রজাতির বাঁশ দিনে ৩০ সেঃমিঃ, আবার কিছু বাঁশ ৯০ সেঃমিঃ বাড়তে পারে। একটি বাঁশ গাছ রোপণ করার ৩০ দিনের মধ্যে পূর্ণ দৈর্ঘ্য হয়ে ওঠে। যদিও রোপণের তিন বছর পর বাঁশ সংগ্রহ করতে উপদেশ দেওয়া হয়। অন্যান্য ফসল যেমন– শাকসব্জি বা ফলমূল চাষের তুলনায় বাঁশ চাষে কম পরিশ্রম লাগে। কাঁটাবিহীন বাঁশ Drip irrigation system-এ চাষ করা হয়ে থাকে। প্রথম চার বছরে বাঁশ চাষে ব্যয় হয় একর প্রতি প্রায় ৪০-৫০ হাজার টাকা। সঠিক পদ্ধতিতে চাষ হলে একটি বাঁশঝাড়ে প্রায় ৪০-৫০টি বিভিন্ন বয়সের বাঁশ হয়ে থাকে, যা থেকে প্রতি বছর প্রায় ১০টি পোক্ত বাঁশ পাওয়া যেতে পারে।

ড. ভারতীর মতে, প্রাথমিক স্তরে প্রতি একরে Drip irrigation system-এ ২০০টি বাঁশের চারা রোপণের খরচ প্রায় ২২,০০০ টাকা। পরবর্তী বছরের বার্ষিক খরচ কমে ৯,০০০ এবং ১০,০০০ টাকা হতে থাকবে। তিনি আরও বলেন, ১৫ বছরের মধ্যে একজন চাষী প্রায় ৪ লক্ষ টাকা আয় করতে পারবেন।

বাঁশ চাষের জন্য প্রথমেই মাটি সম্পূর্ণভাবে জলমুক্ত করতে হবে। বাঁশের জন্য চারা রোপণের গর্তগুলো ২x২x২ ফুট আকারে করতে হবে। চারা থেকে চারার দূরত্ব হতে হবে ১৩ ফুট এবং সারি থেকে সারির দূরত্ব হতে হবে ১৭ ফুট। গর্তগুলো কমপক্ষে তিন মাস সূর্যালোক পাওয়ার জন্য খোলা রাখতে হবে। এভাবে ১ একর জমিতে প্রায় ২০০টি চারা রোপণ করা সম্ভব। রোপণের আগে গর্তের এক-চতুর্থাংশ সারযুক্ত মাটি দিয়ে ভর্তি করতে হবে এবং গর্তে একবার করে জল দিতে হবে, যাতে মাটি বসে যায়। এরপর চারা খুব সাবধানে রোপণ করতে হবে ও লক্ষ্য রাখতে হবে, যাতে চারা গর্তের উপরের স্তরে লাগানো হয়। কারণ, বাঁশের শেকড় খুব সংবেদনশীল হয়। যদি চারা গর্তের ভেতরের স্তরে রোপণ করা হয়, তা হলে বাঁশের বৃদ্ধি দেরিতে হবে। চারা যাতে দমকা হাওয়ায় পড়ে না যায়, এজন্য প্রয়োজনে খুঁটি বা অন্য কোনও অবলম্বন দিতে হবে।

বাঁশ চাষ করার প্রথম দু'মাস পর্যন্ত প্রতিদিন পাঁচ লিটার করে জলসেচ করতে হবে। ক্রমশ বাড়তে বাড়তে এই পরিমাণ এক বছরে হবে প্রতিদিন ২৫ লিটার করে (চারাপ্রতি)। চার বছর পর প্রতি গাছে ৫০-১০০ লিটার জলের প্রয়োজন হয়। প্রতিটি চারায় বার্ষিক প্রায় ৪ কেজি ইউরিয়া, ১ কেজি ডাই-এমোনিয়াম ফসফেট এবং ৪.৫ কেজি মিউরেট অব পটাশ সার প্রয়োজন। ৫-৮ বছরের মধ্যে এই মিশ্র সারগুলো দশ ভাগে ভাগ করে প্রয়োগ করা উচিত। কিন্তু রাসায়নিক সার যাতে সরাসরি গুঁড়িতে প্রয়োগ না করা হয়, সে বিষয়ে লক্ষ্য রাখতে হবে। আবার, যে ধরনের মাটি ৮-১২ ইঞ্চি পর্যন্ত জলসিক্ত, সে স্থানে ডিপ ইরিগেশন পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয়। এ পদ্ধতি ব্যবহারে লক্ষ্য রাখতে হবে, যাতে মাটি ভালভাবে সিক্ত হয়, কিন্তু শুধু তিনদিনে একবার। ড. ভারতীর মতে, বর্তমানে ১ টন বাঁশের চারার দর ১,০০০ টাকা। যা থেকে একজন চাষী বছরে এক একর জমি থেকে প্রায় পঞ্চাশ হাজার টাকার বাঁশ বিক্রি করতে পারবেন। এই প্রজাতির (কাঁটাবিহীন) বাঁশের ব্যাপারে কিছু জানতে চাইলে পাঠক-পাঠিকারা নীচের ঠিকানায় যোগাযোগ করতে পারবেন --

Dr. N. Bharathi, Director.
Grow More Biotech Ltd.
4th Sipcot Phase II
Hosur-635109.

Tamil Nadu.
Phone: 04344-260564, 260565.
e-mail: growmore@vsnl.com

বাঁশফুল আতঙ্ক : প্রাকৃতিক নিয়ম অনুযায়ী ৪৫-৫০ বছর পরপর বাঁশে ফুল আসে। সেই ফুল খেয়ে ইঁদুরের অস্বাভাবিক হারে বংশবৃদ্ধি হয় এবং জঙ্গলে তাদের খাদ্য ফুরিয়ে গেলে তারা পার্শ্ববর্তী এলাকার ফসলাদি বিনষ্ট করে। ফলস্বরূপ দেখা দেয় দুর্ভিক্ষ ও মহামারির। ১৯৫৯ সালে মিজোরাম, ত্রিপুরা ও আসামের বরাক উপত্যকায় হয়েছিল এধরনের প্রাকৃতিক দুর্যোগ। উল্লেখ্য, ২০০২ সালে অনুষ্ঠিত 'বর্ষারণ্য গবেষণা প্রতিষ্ঠান' আয়োজিত এক জাতীয় পর্যায়ের আলোচনাচক্রে ঘোষণা করা হয়েছিল, ২০০৫-০৭ সালের মধ্যে আসাম সহ উত্তর-পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলোতে ব্যাপক হারে মুলিবাঁশের বৃদ্ধির সঙ্গে দেখা যাবে ফুল ফুটতে, যা ভয়ঙ্কর দুর্ভিক্ষের অশনি সঙ্কেত। অতএব, যেমন করে হোক ইঁদুরের বংশবৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। কারণ, গবেষণায় দেখা গেছে, মুলিবাঁশের ফুল খেলে ইঁদুরের প্রজনন ক্ষমতা বেড়ে যায়। এ অবস্থায় কেন্দ্র সরকার উত্তর-পূর্বাঞ্চলের জন্য ৩৬৬ কোটি টাকা মঞ্জুর করে। বাঁশ গাছে ফুল আসার পরিপ্রেক্ষিতে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে মিজোরাম। তাই সর্বাধিক ২৩ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়। ত্রিপুরাকে ২১ কোটি, আসামকে ১০ কোটি, মণিপুরকে ৯.৯ কোটি, নাগাল্যান্ডকে ৮ কোটি, মেঘালয়কে ৬.৮ কোটি এবং অরুণাচল প্রদেশকে ১.৫ কোটি টাকা দেওয়া হয়। বরাকের তিন জেলা, উত্তর কাছাড় পার্বত্য জেলা ও কার্বি আংলঙের জন্য বিশেষ প্রকল্প গ্রহণ করা হয়। এই প্রকল্প অনুসারে জেলাগুলোকে ৫০ লক্ষ টাকা করে দেওয়া হয়। ওই টাকা দুর্গম অঞ্চলে বাঁশঝাড়ে যাওয়ার রাস্তা নির্মাণ ও ফুলযুক্ত বাঁশঝাড় ধ্বংসের জন্য ব্যয় করা হয়।

এছাড়া কেন্দ্র সরকারের বরাদ্দ টাকায় প্রত্যেক রাজ্যে ইঁদুর মারার উন্নত কৌশল তৈরি করা ছাড়াও রাজ্য বনবিভাগকে পরামর্শ দেওয়া হয়েছে, কোন্ কোন্ এলাকায় ইঁদুরের বংশবৃদ্ধি হয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে তা দেখতে, যাতে প্রথম থেকেই তার মোকাবিলা করা সহজ হয়। এছাড়া কোন্ ধরনের বাঁশঝাড়ে ফুল আসছে ও তা কত দ্রুত বেড়ে উঠছে, এসব লক্ষ্য রাখা, ফুলযুক্ত বাঁশঝাড় এলাকার মানচিত্র তৈরি করা ইত্যাদি। মিজোরাম সরকার এ বিষয়ে তিনটি পদক্ষেপ নিয়েছে– ফুলযুক্ত বাঁশঝাড় কেটে ফেলা, খালি জমিতে আবার বাঁশ গাছ উৎপাদন, ইঁদুরের বংশবৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণ করা।

এছাড়া রাজ্য সরকার কৃষক সম্প্রদায়কে উপদেশ দিয়েছে যে বাঁশঝাড়ে ফুল আসার সম্ভাবনা দেখা দিলে তারা যেন ধান চাষের পরিবর্তে অন্যান্য অর্থকরী ফসল যেমন হলুদ, আদা ইত্যাদি চাষ করেন। ফলে দুর্ভিক্ষের প্রকোপ থেকে সাধারণ মানুষ রক্ষা পেতে পারে। অবশ্য কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের সহযোগিতায় বিভিন্ন পরিকল্পনা নেওয়ার ফলে বাঁশফুল এখন আতঙ্কের কারণ নয়। সম্প্রতি, বাঁশফুলের বীজ পুষ্টিকর ও শক্তিকারক খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করা হচ্ছে। মিজো লোকেরা বিশ্বাস করেন, বাঁশের বীজ প্রজনন ক্ষমতা বৃদ্ধি করে। যদিও এ বিষয় এখনও গবেষণাধীন। সাধারণ মানুষ এখন আর বাঁশফুল আতঙ্কে ভীত না হয়ে বাঁশফুল, ফল ও বীজকে কীভাবে লাভজনক কাজে ব্যবহার করা যায় তা ভাবছেন।

ন্যাশনাল ব্যাম্বু মিশন : ন্যাশনাল ব্যাম্বু মিশন হচ্ছে কেন্দ্র সরকারের পৃষ্ঠপোষকতায় গঠিত হওয়া কৃষিমন্ত্রকের কৃষি ও সমবায় বিভাগ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত এক প্রকল্প, যা সমগ্র দেশে বাঁশ চাষ ও বাঁশ শিল্পকে জনপ্রিয় করে তুলবে। সেজন্য কেন্দ্র সরকার দশম ও একাদশ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় Forest land, Non-forest land উভয় ভূমিতে মোট ১,৭৬,০০০ হেক্টরে বাঁশক্ষেত্র উৎপাদন করার লক্ষ্যমাত্রা রেখেছে। এই মিশনের

কেন্দ্রবিন্দু হলো উত্তর-পূর্বাঞ্চল। সেই লক্ষ্যে পৌঁছার জন্য NBM Zonal Bamboo Technical Support Groups (BTSG) নামে চারটি বিশেষ আঞ্চলিক গোষ্ঠী স্থাপন করেছে। সংস্থাগুলো কারিগরিগতভাবে এই মিশনকে সাহায্য করবে। North Eastern Council (NEC) নিয়ন্ত্রিত Cane and Bamboo Technology Centre (CBTC) হচ্ছে এরূপ একটি গোষ্ঠী, যা সমগ্র উত্তর-পূর্বাঞ্চল, পশ্চিমবঙ্গের পূর্বদিকের রাজ্যগুলো, ঝাড়খণ্ড ও ওড়িশার বাঁশভূমির জন্য কাজ করছে। কেন্দ্র সরকার ওই মিশনের জন্য ৫৬,৮২৩ কোটি টাকা বরাদ্দ করেছে। এই প্রকল্পের প্রধান উদ্দেশ্য হলো, প্রয়োজন অনুযায়ী নানা অঞ্চলে বিভিন্ন কৌশল প্রয়োগ করে বাঁশক্ষেত্রে সুপরিকল্পিত বৃদ্ধিতে সাহায্য করা, বাঁশের চারাঘর স্থাপন, উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য বাঁশভূমিতে সঠিক প্রজাতির বাঁশ চাষ করা এবং সাধারণ বাঁশ ক্ষেত্রকে অর্থকরী বাঁশ ক্ষেত্রে রূপান্তরিত করা, বাঁশ সংগ্রহ, পণ্য উৎপাদন এবং বিপণনে সাহায্য করা। এছাড়া, বাঁশচাষীদের প্রশিক্ষণ দেওয়া, বাঁশ চাষকে জনপ্রিয় করে তোলার জন্য সচেতনতা শিবির, সভা ইত্যাদির আয়োজন, আন্তর্জাতিক শিল্পমেলায় যোগদান, বড় বড় শহরে বাঁশজাত পণ্যের বাজার, দোকান ইত্যাদি স্থাপন করা।

বাঁশ উৎসব : বাঁশ চাষ, আধুনিক প্রযুক্তিনির্ভর বাঁশ-শিল্প সম্পর্কে উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্যগুলোতে বিপুল উৎসাহ জেগেছে। এ ব্যাপারে জনগণকে আগ্রহী ও সচেতন করে তোলার জন্য North Eastern Council (NEC) Cane and Bamboo Technology Centre (CBTC) নামে একটি সংস্থা স্থাপন করেছে। ওই সংস্থা উত্তর-পূর্বাঞ্চলের বিভিন্ন রাজ্যে বাঁশ শিল্পমেলা, প্রদর্শনী ও প্রশিক্ষণের আয়োজন করে থাকে। ইতিপূর্বে শিলং, গুয়াহাটি ও আগরতলায় তিনটি বাঁশ উৎসব হয়ে গেছে। এক সপ্তাহব্যাপী চলা এই উৎসবে বিভিন্ন দেশ থেকে বৈজ্ঞানিক, প্রযুক্তিবিদ, উদ্যোগী, সরকারি প্রতিনিধি, গ্রামীণ শিল্পী এবং বাঁশ শিল্পে জড়িত ব্যক্তিরা অংশগ্রহণ করেন এবং একে-অপরকে বাঁশ শিল্প সম্পর্কিত জ্ঞান ও সংস্কৃতির আদান-প্রদান করে থাকেন। উৎসবের অঙ্গ হিসেবে আন্তর্জাতিক বাঁশ শিল্প প্রক্রিয়াকরণ এবং বাঁশ ও বেত শিল্পের ওপর প্রশিক্ষণ শিবিরের আয়োজন করা হয়ে থাকে। ওই শিবিরে সার্ক দেশসমূহ ছাড়াও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া, আফ্রিকা ও দক্ষিণ আমেরিকার বিভিন্ন দেশ থেকে বহু প্রশিক্ষার্থী যোগ দিয়ে থাকেন। এর উদ্দেশ্য, আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে দক্ষতা বাড়ানো এবং বিভিন্ন দেশের বাঁশ ও বেতশিল্পীদের মধ্যে অভিজ্ঞতা, কর্মকুশলতা ও সংস্কৃতি বিনিময় করা। বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থার প্রতিনিধি, মাস্টার ক্রাফ্‌টস্‌ম্যান, বিশেষজ্ঞরা প্রশিক্ষণের কাজে প্রয়োজনীয় সাহায্য বা পরামর্শ দিয়ে থাকেন। এছাড়া বাঁশের ওপর ভিত্তি করে ক্রীড়া, সঙ্গীত ও খাদ্য-উৎসব ইত্যাদি উৎসবের অন্যতম অঙ্গ। আনন্দের বিষয়, উত্তর-পূর্বাঞ্চলের বাঁশ উৎসব শুধু নিজের অঞ্চলে সীমাবদ্ধ নয়। এই উৎসব World Bamboo Organisation-র দ্বারা আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি লাভ করেছে এবং ফলস্বরূপ নয়াদিল্লিতে World Bamboo Expo-র সঙ্গে সম্মিলিতভাবে পরবর্তী বাঁশ উৎসব আয়োজিত হয়।

বাঁশ উত্তর-পূর্বাঞ্চলের জনজীবনের এক অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। এই শিল্পের সঙ্গে জড়িত লক্ষ লক্ষ মানুষ। যদিও গ্রামাঞ্চলের প্রতিটি মানুষ বাঁশ-বেতের কাজ জানে এবং এটা তাদের দৈনন্দিন কাজের অন্তর্গত। আবার, মানুষ বাঁশ ও বেতশিল্পকে জীবিকা হিসেবে গ্রহণ করেছে। এই শিল্প বহু পরিবারের মুখে দু'মুঠো ভাত জুগিয়ে দিচ্ছে। তাছাড়া বহু দক্ষ শিল্পী নিজেদের শিল্পকর্মের কুশলতা দেখিয়ে পুরস্কৃত হচ্ছেন ও দেশের সুনাম বৃদ্ধি করছেন। উত্তর-পূর্বাঞ্চলের বিভিন্ন স্থানে অসংখ্য আত্মসহায়ক দল আছে, যেগুলো বাঁশ-বেত ও অন্যান্য কুটিরশিল্পের সঙ্গে যুক্ত। এসব দল দেশের বিভিন্ন স্থানে, এমনকী বিদেশেও নিজের শিল্পসামগ্রী রফতানি করে যশ ও অর্থ দুই-ই উপার্জন করছে। কিন্তু বরাক উপত্যকায় এধরনের সংগঠনের সংখ্যা খুবই কম। এখানে

কাঁচামালের অভাব নেই। অভাব জনগণের মধ্যে সচেতনতা ও পৃষ্ঠপোষকতার। মুষ্টিমেয় দরিদ্র শিল্পীরা অর্থ ও সহযোগিতার অভাবে এই পেশা ছেড়ে দিতে বাধ্য হচ্ছেন। এই ঐতিহ্যবাহী শিল্পকে জীবিত রাখা আমাদের প্রত্যেকের কর্তব্য। দুস্থ শিল্পীদের সরকারি ঋণ দেওয়া হলে শিল্পটির অকাল মৃত্যু হবে না। তাছাড়া নবপ্রজন্মকে উৎসাহিত করা, এ অঞ্চলে প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, আর্ট অ্যান্ড ক্রাফ্‌ট কলেজ স্থাপন করা অত্যন্ত প্রয়োজন। এতে বেকার সমস্যার কিছুটা সুরাহা হবে। আমাদের পার্শ্ববর্তী রাজ্য ত্রিপুরায় খুমুলুঙ নামক স্থানে বাঁশভিত্তিক কারখানার শিলান্যাস করা হয়েছে, যেখানে বাঁশের করোগেটেড শিট ও ম্যাট বোর্ড তৈরি হবে। তিন কোটি টাকার প্রকল্পটি বেকার যুবক-যুবতীর কর্মসংস্থানের সুযোগ করে দিচ্ছে।

বরাক উপত্যকার উল্লেখযোগ্য প্রাচীন শিল্প হচ্ছে শীতলপাটি। প্রাচীন লৌহশিল্পের পর শীতলপাটির অবস্থান। শীতলপাটি বেতের তৈরি এক বিস্ময়কর শিল্প হিসেবে আন্তর্জাতিক স্তরে স্থান পেয়েছে। প্রাচীনকাল থেকেই শীতলপাটি কুটিরশিল্প হিসেবে পরিচিত। আমাদের পার্শ্ববর্তী দেশ বাংলাদেশের সিলেটে অঞ্চলে এই শিল্প খুব বিখ্যাত। 'মূর্তা' নামক একপ্রকার সরু গাছের ছাল থেকে হালকা বেত বিভিন্ন পর্যায়ে উপযোগী করে শীতলপাটি তৈরি করা হয়। ঐতিহাসিক অচ্যুতচরণ চৌধুরী (তত্ত্বনিধি) বলেছেন, 'বেত্র যত চিকণ হয়, মূল্য তত বর্ধিত হয়।' উল্লেখ্য, তখনকার সময়ের তাজমহল-জাতীয় নক্সা-আঁকা পাটি ঐতিহ্যের ধারক ও বাহক ছিল। প্রায় দু'হাজার বছর আগে চিনের বণিকরা তেজপাতার বিনিময়ে শীতলপাটি ক্রয় করতেন। নবাবি আমলে পাটি ১০০ টাকায় বিক্রি হতো। বিছানা, বিয়ে-শাদি, জায়নামাজ, মসজিদের মাদুর ইত্যাদি কাজে শীতলপাটির ব্যবহার হতো। বর্তমানে প্লাস্টিকের বেতের চাটাই ক্রমে এর স্থান দখল করেছে। কথিত আছে, সিলেটে বিশেষ ধরনের শীতলপাটি তৈরি হতো, যার উপর দিয়ে সরীসৃপ জাতীয় প্রাণী হেঁটে যেতে পারত না, শিল্পীর সূক্ষ্ম ও নিখুঁত বুননের কৌশলে পিছলে যেত। কোনও রঙের ব্যবহার না করে কেবল বুননের কৌশলে শীতলপাটিতে বিভিন্ন নক্সা, মিনার, মন্দির, নৌকা, তাজমহল, দাবা খেলার ছক, কল্পিত রাজদরবার, প্রাকৃতিক দৃশ্য ইত্যাদির চিত্র ফুটিয়ে তোলা হতো।

জনৈক পল্লীকবি গেয়েছেন –

'শীতলপাটি বিছাইয়া কন্যা
বালিশ লইল কোলে
নিদারুণ রুহিলার বালিশ
বোলাইলে না বুলে।'

অন্য কবি বলেছেন –

'আর মাছ বানাইতে কন্যা
লয় ছালিমাটি
ইলিশ বানাইতে কন্যা
বিছায় শীতলপাটি।'

তখনকার দিনে শীতলপাটি শিল্পে সুরমা বরাকের কারিগররা ছিলেন প্রধান কারিগর। উল্লেখ্য, সিলেটের উৎকৃষ্ট শীতলপাটি সম্রাট আকবরকে উপহার হিসেবে দেওয়া হতো। দক্ষ শীতলপাটির কারিগররা বিশালাকৃতির একটি শীতলপাটি এত সূক্ষ্মভাবে বোনেন যে, এটি ভাঁজ করে ছোট ব্যাগে ভরে রাখা যায়। শীতলপাটি দেখতে মসৃণ ও চমৎকার। বৈশিষ্ট্যযুক্ত, আরামদায়ক ও বহনযোগ্য হওয়ায় সৌখিনদের কাছে একটি মূল্যবান

সামগ্রী হিসেবে গণ্য হয়ে আসছে। বর্তমানে শীতলপাটি দিয়ে ব্যাগ, চটি, ফাইল কভার, ওয়াল হ্যাঙ্গার ইত্যাদি বহু সামগ্রী তৈরি করা হচ্ছে। বরাক উপত্যকার কালীগঞ্জ শীতলপাটির জন্য ভারত-বিখ্যাত। কথিত আছে, কাজি উমর সাহেব নামে জনৈক সুফি পীর ও তাঁর সহযোগীরা এই অঞ্চলে পাটিশিল্পের সূচনা করেন। ক্রমশ গ্রামের বেশিরভাগ মানুষই পাটিশিল্পকে পেশা হিসেবে গ্রহণ করেন। সেই থেকে কালীগঞ্জের বলেশ্বর গ্রামের ভারতে একটি স্বতন্ত্র পরিচিতি গড়ে ওঠে। ভিন্ন বর্ণের সম্মিলিত বসবাস আর একই পেশা জন্ম দেয় একটি মিশ্র সম্প্রদায়ের। যেটা আজ পাটিয়ারা বা পাটিকর সম্প্রদায় বলে অধিক পরিচিত।

অত্যন্ত দুঃখের বিষয়, লোভী সুদখোর ব্যবসায়ীদের শোষণের ফলে এ অঞ্চলের পাটিশিল্প বিলুপ্তির পথে। শিক্ষা-দীক্ষায় অনগ্রসর-হতদরিদ্র পাটিশিল্পীরা অভাবের তাড়নায় জলের দরে পাটি বিক্রি করতে বাধ্য হন। সারাদিন হাড়ভাঙা পরিশ্রম করে উপযুক্ত মজুরি পান না। এমনকী নিজেদের তৈরি সামগ্রীর মূল্য নির্ধারণ করার অধিকারও তাদের নেই। অথচ মহাজনেরা কমদামে পাটি ক্রয় করে বাইরে চালান করে মুনাফা লুটছে। সমবায় সমিতি বা সরকারের তরফ থেকে অসহায় পাটিশিল্পীরা কোনও ধরনের আর্থিক সাহায্য বা সহযোগিতা পাচ্ছেন না। ক্ষুদ্র ও কুটিরশিল্পের উন্নয়নে সরকার বিভিন্ন প্রকল্পের অধীনে ঋণ মঞ্জুর করে আর্থিক সাহায্য প্রদান করলেও পাটিশিল্পের উন্নয়নে আজও কোনও আর্থিক সাহায্য মেলেনি। অথচ শুধুমাত্র আর্থিক সঙ্কটের জন্যই ঐতিহ্যশালী শিল্পটি ধীরে ধীরে বিলুপ্ত হতে চলেছে। অবশ্য কিছু কিছু আত্মসহায়ক দল ও বেসরকারি সংস্থা আসাম সরকারের সাহায্য ছাড়াও এই শিল্পকে পুনর্জীবিত করতে আপ্রাণ চেষ্টা করছে।

ঋণস্বীকার : অঞ্জনা দাস।

পর্যটন শিল্পে বরাকের সম্ভাবনা

সঞ্জীব ভট্টাচার্য

দু'বছর ধরে পৃথিবীজুড়ে চলা করোনা অতিমারি ও তার ফলস্বরূপ ঘটে যাওয়া আর্থিক মন্দার কথা বাদ দিলে সার্বিকভাবে বিশ্ব অর্থনীতিতে পর্যটন শিল্প নিজেকে এক সম্মানজনক অবস্থানে প্রতিষ্ঠিত করে নিয়েছে।

পর্যটন অথবা ভ্রমণ শব্দগুলো আমাদের কাছে নতুন কিছু নয়। তবে পর্যটনকে এক অর্থনৈতিক প্রক্রিয়া হিসেবে পরিভাষিত করাটা অবশ্যই সাবেক অর্থনৈতিক প্রক্রিয়া মাত্র নয়, তা হচ্ছে এক শিল্প। কারণ, কী কর্মসংস্থানে, কী বিনিয়োগ প্রক্রিয়ায় পর্যটনের ব্যাপ্তি প্রসারিত সব ক্ষেত্রেই। বলা হচ্ছে, একমাত্র পেট্রোলিয়াম শিল্প ছাড়া কোনও ক্ষেত্রেই এত বিশাল অঙ্কের টাকার বিনিময় হয় না, যতটা কিনা পর্যটন শিল্পে হয় আজকের দুনিয়াতে।[১] পর্যটনকে তাই শিল্প হিসেবে ঘোষণা করেছে পৃথিবীর অনেক দেশ। ভারতও তার ব্যতিক্রম নয় এবং ১৯৮৭ সালেই কেন্দ্র সরকার পর্যটনকে শিল্পের মর্যাদা আনুষ্ঠানিকভাবে প্রদান করেছে।[২] তারও আগে, ১৯৮২ সালেই এ দেশে প্রথমবারের মতো পর্যটন নীতি ঘোষণা করা হয়েছে। এর থেকে এটা অনুধাবন করা যায়, পর্যটনের ব্যাপারে সরকারিভাবে ভাবনাচিন্তা আমাদের দেশে শুরু হয়েছে অন্তত চার দশকের বেশি সময় আগে থেকে।

এককালে পর্যটন ছিল ব্যবসা-বাণিজ্য বা শিল্পের সঙ্গে যুক্ত একটি অর্থনৈতিক প্রক্রিয়া, কিন্তু কালে কালে তা নিজেই একটি ব্যবসার উপকরণ হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করে নিয়েছে। আর সেজন্যই পর্যটনকে শিল্পের মর্যাদা দান করা হয়েছে। এই শিল্পের বিস্তৃতি এত ব্যাপক যে আজকের পৃথিবীতে আর্থিক লেনদেন এবং কর্মসংস্থানের নিরিখে তাকে দ্বিতীয় বৃহত্তম শিল্প বলা যায়।[৩]

আজ বিশ্ব অর্থনীতিতে পর্যটন শিল্পের প্রভাব এত ব্যাপক এবং গঠনমূলক যে কর্মসংস্থানের বেলায় প্রতি ষোলোজন রোজগেরে ব্যক্তির মধ্যে অন্তত একজন প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষভাবে এই শিল্পের সঙ্গে জড়িত।[৪] মাইক্রোসফট্স-র প্রাক্তন কর্ণধার বিল গেট্স একবার বলেছিলেন, আগামী দশকগুলোতে পর্যটন শিল্প প্রতি আড়াই সেকেন্ডে একজন করে লোকের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থার জোগান দেবে।[৫]

আমাদের আলোচনার শুরুতেই বলা হয়েছে, পর্যটন ব্যাপারটা মানব সভ্যতায় কোনও নতুন ব্যাপার নয়। হাজার হাজার বছর ধরেই মানুষ পর্যটন করে আসছে। তবে প্রাচীনকালের পর্যটন ছিল বেঁচে থাকার এক তাগিদ। কালের প্রবাহে বিভিন্ন জনগোষ্ঠীতে বিভক্ত হয়ে মানুষ যখন এককেটা জায়গায় বসতি বা সভ্যতা স্থাপন করে ভিন্ন ভিন্ন জাতি হিসেবে পরিচিতি লাভ করল, তখন তার মধ্যে ভ্রমণের তাগিদ এক নতুন মাত্রা পেল। সেই তাগিদের পেছনে একদিকে যেমন ছিল অজানাকে জানার কৌতূহল, তেমনই ছিল আর্থিকভাবে, সামাজিকভাবে অথবা বৌদ্ধিকভাবে নিজেকে সমৃদ্ধ তথা প্রতিষ্ঠিত করার বাসনা।

তাছাড়া ধর্মীয় আস্থা পর্যটনের ক্ষেত্রে এক বিরাট অবদান রেখে আসছে যুগ যুগ ধরে। আমাদের দেশে প্রয়াগরাজে বারো বছর অন্তর অন্তর কুম্ভমেলার আয়োজন হয়ে আসছে যুগ যুগ ধরে।[৬] লক্ষ লক্ষ লোক

হাজার বছর আগেও কুম্ভমেলায় যোগদান করার কথা আমরা ইতিহাসে পাই। সেরকমই কলহনের রাজতরঙ্গিনীতে উল্লেখ পাই, দশম এবং একাদশ শতাব্দীতেও কাশ্মীরের অম্বরেশ্বর শিবধাম গুহা বা অমরনাথ গুহাতে বরফের শিবলিঙ্গ দর্শনের জন্য হাজার হাজার লোকের তীর্থ ভ্রমণের কথা।[৭]

সে অর্থে ধর্মীয় আস্থা নিয়ে যুগ যুগ থেকে চলে আসা যে তীর্থ ভ্রমণের উল্লেখ পাই, তা-ও কিন্তু পর্যটনেরই এক প্রকারভেদ। যদিও আজকের পরিভাষায় পর্যটনের পরিসীমা অনেক ব্যাপক। আজ পর্যন্ত যেহেতু একটি শিল্প এবং তা শুধু অর্থনৈতিক প্রক্রিয়ার মধ্যে সীমাবদ্ধ না থেকে হয়ে উঠেছে এক পাঠ্য ও গবেষণার বিষয়, তাই পর্যটন এবং পর্যটক দুটো শব্দেরই পরিভাষিক সংজ্ঞায়নের প্রয়োজন। বিশ্ব পর্যটন সংস্থা (World Tourism Organisation) বলছে,[৮] পর্যটক হচ্ছে সেই ব্যক্তি যে কিনা এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় গমন করে সেখানে অন্তত ২৪ ঘণ্টা থেকে বেশি কিন্তু ৬ মাস থেকে কম সময় অবস্থান করে। অন্য এক সংজ্ঞা বলে, দৈনন্দিন জীবন যাত্রার বাইরে যখন কেউ আনন্দ পেতে অথবা অনুসন্ধিৎসু মন নিয়ে নিজ বাসস্থানের থেকে দূরে গমন করে তখন তাকে পর্যটক বলা যায়।[৯]

আলোচনাকে এগিয়ে নিয়ে পর্যটন শিল্পের একটু গভীরে গিয়ে দুটো বিষয়ের ওপর আমাদের আলোকপাত করতে হবে। এক— মানুষ কেন পর্যটনকারী? কোন্ জিনিসের অভাবে মানুষ তার নিজস্ব সুখী গৃহকোণ ভেঙে কিছু সময় বা দিনের জন্য বহির্মুখী হয়? পর্যটক হয়েই কী-ই বা তার প্রাপ্তি হয়? দুই— কীসের ওপর ভিত্তি করে কিছু কিছু জায়গা পর্যটনস্থল হিসেবে গড়ে ওঠে?

মানুষ কেন পর্যটক, এই প্রশ্নের উত্তর খুজতে গিয়ে গবেষকরা মোটামুটি কয়েকটি কারণকে প্রধান হিসেবে বেছে নিয়েছেন, যেগুলোকে ইংরেজিতে tourist motivational factor[১০] (পর্যটন প্রেরণাদায়ী উপাদান) হিসেবে পরিভাষিত করা হয়েছে।

প্রথমত : দৈনন্দিন জীবনযাপনে প্রতিটি মানুষকে এক যান্ত্রিক যন্ত্রণায় বিদ্ধ করে অহরহ। বিশেষত, নাগরিক জীবনের ছকে ফেলা ক্লান্তিকর জীবনের একঘেয়েমি থেকে মুক্তি পেতে মানুষ পর্যটনকে বেছে নেয় এক সুযোগ হিসেবে। তাই tourist motivational factor হিসেবে ছকবাঁধা জীবন থেকে সাময়িক মুক্তিকেই প্রধান হিসেবে গণ্য করে।

দ্বিতীয়ত : সৌন্দর্যের আকর্ষণ মানবমনে চিরায়ত। আর তাই সৌন্দর্যের খুঁজে মানুষ আকাশ, পাথর, সমুদ্র, অরণ্য সবকিছুর প্রতি আকর্ষিত হয়। সৌন্দর্যের প্রধান উপাদান হিসেবে প্রকৃতির স্থান যদিও সবকিছুর ওপর। তবে মানবনির্মিত নান্দনিক বস্তুসমূহকেও এক্ষেত্রে বাদ দেওয়া যায় না।

তৃতীয়ত : অজানাকে জানার আগ্রহ মানবমনে চিরন্তন। আর অজানা বিষয়ও সীমাহীন। হতে পারে তা কোনও প্রাগৈতিহাসিক অথবা ঐতিহাসিক বিষয়, ভৌগোলিক অথবা বিজ্ঞানের বিষয়। তাই হারানো ইতিহাসের খুঁজে ভৌগোলিক উপাদান অবলোকনে অথবা আস্বাদনে, বিজ্ঞানের আবিষ্কার অথবা উদ্ভাবনের প্রত্যক্ষায়নে মানুষের মনে থাকে নিরন্তর এক আকর্ষণ। আর তার খুঁজে, অজানাকে জানার তাগিদ থেকে মানুষকে রাখে চঞ্চল করে তাকে সুদূরের পিয়াসী। পর্যটন গবেষকের কাছে সে-ও এক tourist motivational factor বা পর্যটন প্রেরণাদায় উপাদান।

কোনও স্থানকে পর্যটনস্থল হিসেবে গড়ে উঠতে হলে তার মধ্যে এমন কিছু উপাদানের উপস্থিতি থাকতে হবে, যেগুলোর সঙ্গে পূর্বালোচিত tourist motivational factor-গুলোর মধ্যে এক বা একাধিক উপকরণের সম্পর্ক স্থাপন করা যায়। পর্যটনস্থল হিসেবে পরিচিত পৃথিবীজুড়ে জায়গাগুলোকে তাদের নিজস্ব

উপাদান বিচার করে আমরা পর্যটনস্থলগুলোকে বিভিন্ন ভাগে ভাগ করে নিতে পারি নিম্নরূপে:

১) প্রাকৃতিক পর্যটনস্থল : যার প্রধান উপকরণ হচ্ছে জলবায়ু, আবহাওয়া, প্রাকৃতিক সৌন্দর্য, পাহাড়, পর্বত, নদী, সমুদ্র সৈকত, জীবজন্তু, অরণ্যানী ইত্যাদি।

২) ঐতিহাসিক পর্যটনস্থল : যার উপকরণগুলো মূলত ঐতিহাসিক সৌধ, প্রাচীন ইমারত অথবা তার ধ্বংসাবশেষ।

৩) আত্মিক তথা ধর্মীয় পর্যটনস্থল : যার উপকরণগুলো মূলত উপাসনাস্থল, ধর্মস্থান, ঐতিহ্যবাহী মন্দির, সৌধ ইত্যাদি।

৪) প্রমোদ কেন্দ্র : যার প্রধান উপাদানই হচ্ছে আনন্দ উপকরণ, প্রামোদবিহার, খেলাধুলো, প্রত্নতাত্ত্বিক উপকরণ ইত্যাদি।

৫) স্বাস্থ্য তথা চিকিৎসাস্থল : যার উপাদানগুলো স্বাস্থ্যকর আবহাওয়া, উন্নত স্বাস্থ্য তথা চিকিৎসা ব্যবস্থা, হাসপাতাল সুবিধা ইত্যাদি।

৬) শিক্ষা কেন্দ্র : যার উপাদান মূলত উন্নত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়, গবেষণা কেন্দ্র, কারিগরি তথা ব্যতিক্রমী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ইত্যাদি।

৭) বাণিজ্যিক পর্যটনস্থল : যার প্রধান উপকরণসমূহ মূলত ব্যবসা-বাণিজ্যের সুবিধা, শিল্প প্রতিষ্ঠান, দোকানপাট ইত্যাদি।

তাছাড়া আমরা উল্লেখ করতে পারি, লোকশিল্প, হস্তকলা, সঙ্গীত, নৃত্যকলা ইত্যাদির ওপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠা অনেক পর্যটনস্থলের কথা। আমরা আলোচনাতে আগেই উল্লেখ করেছি, কোনও পর্যটনস্থল গড়ে ওঠে তখনই, যখন তার পর্যটন উপকরণগুলোর সঙ্গে তার সম্ভাব্য পর্যটকদের motivational factor-গুলোর এক সাযুজ্য গড়ে ওঠে। সম্ভাব্য পর্যটকদের সঙ্গে পর্যটনস্থলের অবিরাম আনাগোনা এবং সেই আনাগোনাকে সফল করার উপযুক্ত পন্থা অনুধাবন এবং উদ্ভাবনের ওপর নির্ভর করে পর্যটনস্থল গড়ে ওঠার নেপথ্য বার্তা।

যে কথাটা এখানে সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করা প্রয়োজন, পর্যটন উপাদান থাকা মানেই কোনও স্থান পর্যটনস্থল হিসেবে পরিগণিত হয়ে যাবে, এমনটা ভাবার অবকাশ নেই। পর্যটন মানচিত্রে স্থান পেতে হলে তার পেছনে প্রয়োজন সুচিন্তিত ভাবনাচিন্তা। এ ব্যাপারে সরকারি এবং বেসরকারি উভয় ক্ষেত্রেরই দায়িত্ব রয়েছে। সরকার বড়জোর পরিকাঠামো গড়ে দিতে পারেন, কিন্তু তাকে ঠিকমতো রক্ষণাবেক্ষণ করে এক পর্যটকবান্ধব পরিবেশ গড়ে তোলার দায়িত্ব কিন্তু বেসরকারি উদ্যোগকে নিতে হবে। বেসরকারি উদ্যোগ প্রতিষ্ঠানকে এগিয়ে আসতে হবে নিজেদেরই স্বার্থে। আসলে পর্যটনের উন্নয়নের সঙ্গে করে কোনও স্থানে যে অর্থনৈতিক উন্নয়নের ব্যাপক সম্ভাবনার উদয় হয়, সেই বোধটুকু থেকেই বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের অবদান বা দায়িত্ব পালনের কথা ভাবতে পারা যায়।

আলোচনার দ্বিতীয় পর্যায়ে আমরা বরাক উপত্যকার নিরিখে পর্যটনশিল্প নিয়ে কিছু বলার চেষ্টা করব।

কাছাড়, করিমগঞ্জ ও হাইলাকান্দি — এই তিন জেলা নিয়ে বড়াইল পাহাড়ের পাদদেশে যে ভূমি দক্ষিণে মিজোরাম এবং পূর্বে মণিপুর সীমানায় শেষ হয়েছে, তাকে বরাক উপত্যকা হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। এর পশ্চিম সীমান্তে পার্শ্ববর্তী ত্রিপুরা রাজ্য আর বাংলাদেশের সঙ্গে আন্তর্জাতিক সীমানা। ভৌগোলিকভাবে তার অবস্থান উত্তর গোলার্ধের ২৫°১২″ থেকে ২৪°১০″ অক্ষাংশ এবং ৯২°১৫″ থেকে ৯৩°১৫″ দ্রাঘিমাংশের অন্তর্বর্তী অংশ।

যদিও আজ পর্যন্ত বরাক উপত্যকার পর্যটন শিল্প বা তার সম্ভাবনা নিয়ে সে রকম সঠিক গবেষণা হয়নি, তবুও বিভিন্ন আলোচনায় বা স্থানীয় পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত মতামত অথবা উত্তর সম্পাদকীয়তে ছাপানো নিবন্ধ ভিত্তি করে আমরা এই উপত্যকার কিছু সম্ভাব্য পর্যটনস্থলের নাম উল্লেখ করতে পারি।

১) ভুবন পাহাড় ও ভুবন তীর্থ : বরাক উপত্যকার প্রধান শহর শিলচর থেকে প্রায় ২৫ কিঃমিঃ দূরে এই পাহাড়ের পাদদেশ। ভুবন তীর্থ শৈবসংস্কৃতির এক প্রত্নস্থল। দুর্গম এই তীর্থে অতি প্রাচীন ভুবনেশ্বর তথা শিব এবং ভুবনেশ্বরীর মূর্তি অবস্থিত। তাছাড়াও এখানে আছে এক ভূতল গুহা, যার প্রাচীন নির্মাণশৈলী অবাক করার মতো। প্রতিবছর শিবরাত্রির মেলা উপলক্ষে এই তীর্থে প্রায় লক্ষাধিক লোকের সমাগম হয়।

২) খাসপুর : শিলচর থেকে ২০ কিঃমিঃ দূরে অবস্থিত ডিমাসা-কাছাড়ি রাজাদের হেড়ম্ব রাজ্যের প্রাচীন রাজধানী। মনোরম প্রাকৃতিক পরিবেশে বিস্তীর্ণ প্রাচীন এই রাজধানী নগরে আজও দণ্ডায়মান অপূর্ব কারুকার্যমণ্ডিত রাজস্নানাগার, যাতে আজও রাজপুত স্থাপত্যশিল্প, মোগল শিল্পশৈলী ও আঞ্চলিক নির্মাণ পদ্ধতির ছাপ আজও বিদ্যমান।

৩) সিদ্ধেশ্বর শিবমন্দির : শিলচর-করিমগঞ্জ মোটর ও রেলপথের গা-ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আছে সিদ্ধেশ্বর শিবমন্দির কপিলাশ্রম। এখানে আছে কালো পাথরের এক বিশাল শিবলিঙ্গ। আর আছে পাথরের চাতালে খাঁচা হাতে খোদাই করা পুরুষ অবয়ব। দুটো বুদ্ধের মূর্তি ও অন্যান্য বিগ্রহ। লোকশ্রুতি যে, সাংখ্যদর্শনের স্রষ্টা কপিলমুনি এই আশ্রমে বসে শিবের তপস্যা করেছিলেন বলে এই তীর্থকে কপিলাশ্রম বলা হয়ে থাকে।

৪) সিপাহি বিদ্রোহের স্মৃতিবিজড়িত লাতু-মালেগড় : করিমগঞ্জ শহর থেকে ১১ কিঃমিঃ দূরত্বে ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত-ঘেঁষে লাতু-মালেগড় টিলা, যেখানে ৩০ জন সেনানী যারা ১৮৫৭ সালের সিপাহি বিদ্রোহে নিহত হয়েছিলেন, তাদের সমাধি বর্তমান। ইতিহাস-অনুসন্ধিৎসু পর্যটকদের জন্য এই মালেগড় টিলাকে এক পর্যটনস্থল হিসেবে উপস্থাপনা করা হয়েছে বিভিন্ন আলোচনায়, লোকগাঁথায়।

৫) শনবিল : করিমগঞ্জ জেলায় অবস্থিত প্রায় ৮০ বর্গ কিঃমিঃ এলাকা নিয়ে অবস্থিত শনবিল ভারতের মধ্যে বৃহত্তম বিল বা wet land-র মধ্যে একটি। যদিও তার অবস্থান করিমগঞ্জ জেলায় কিন্তু যোগাযোগের জন্য এটি হাইলাকান্দি শহরের অনেক কাছে। দূরত্ব মাত্র ১৫ কিঃমিঃ। শনবিল একদিকে যেমন এক বৃহৎ মৎস্য চারণক্ষেত্র, তেমনই শীতকালে এখানে দেখা যায় অসংখ্য পরিযায়ী পাখির সমাহার।

এছাড়াও বিভিন্ন আলোচনাতে আমরা আরো কিছু আকর্ষণ কেন্দ্র যেমন, চাতলা হাওর, ডলু চা বাগান, দোহালিয়া পাহাড়, বদরপুর ঘাটের দুর্গ — এগুলোর উল্লেখ পাই, যেগুলোকে পর্যটনস্থল বলে মান্যতা দেবার দাবিও উঠে আসে।

এক্ষেত্রে পেশাগত আলোচনায় আসতে গেলে আমাদের দুটো জিনিসের কথা ভাবতে হবে।

প্রথমত : বরাক উপত্যকা পর্যটনের জন্য কারা আমাদের সম্ভাব্য পর্যটক (target group of tourists)?

দ্বিতীয়ত : বরাক উপত্যকার সম্ভাব্য পর্যটনস্থলগুলোতে তাদের প্রাকৃতিক, ঐতিহাসিক অথবা ধর্মীয় উপকরণের ওপর ভিত্তি করে ভারতের অন্য রাজ্যগুলোর পর্যটনস্থল থেকে আলাদা করে চিহ্নিত করার কী কী মাপদণ্ড হবে?

যেহেতু আমাদের আলোচনায় এখনও পর্যন্ত ধর্মীয়, ঐতিহাসিক আর প্রাকৃতিক এই তিনটি উপকরণের কথা এসেছে, তাই তাদের ওপরই আলোচনাটা সীমাবদ্ধ রাখার চেষ্টা করব।

ভারতে শত শত তীর্থ ক্ষেত্র আছে। তবে পর্যটন কেন্দ্র হিসেবে যেগুলো স্থান পেয়েছে। যেমন, কাশী, বৃন্দাবন, গয়া, পুরী, হরিদ্বার, নাসিক, সোমনাথ, কেদারনাথ অথবা দক্ষিণের তিরুপতি থেকে রামেশ্বরম— যে

কোনও তীর্থক্ষেত্রের কথাই ভাবা যাক, আমরা দেখব প্রতিটি তীর্থস্থানের সঙ্গে মানুষের আস্থা জড়িয়ে আছে হাজার হাজার বছর ধরে। স্ব-স্ব মহিমায় প্রতিটি তীর্থক্ষেত্র প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পেরেছে হাজার বছরের যাত্রাপথ পেরিয়ে। বলা যায়, উত্তর থেকে দক্ষিণ, পূর্ব থেকে পশ্চিম, ভারতের প্রতিটি কোণায় তাদের পরিচিতি। তাছাড়া প্রায় প্রতিটি তীর্থস্থল তার ভৌগোলিক উপাদান, সৌন্দর্যের উপকরণ, ঐতিহাসিক যাত্রায় বিশেষ মাত্রা লাভ করতে সক্ষম হয়েছে।

তবে নতুন করেও যে তীর্থস্থল বা উপাসনা স্থল গড়ে ওঠেনি, তা-ও বলা যায় না। মায়াপুর ইস্কনের চন্দ্রোদয় মন্দির, শিরডি (মহারাষ্ট্র) সাঁই মন্দির — এগুলোকে অলোচনায় আনা যায়। তবে মনে রাখতে হবে, নান্দনিকতার নিরিখে এগুলো অতুলনীয়। সেই প্রেক্ষাপটে ভুবনতীর্থ, সিদ্ধেশ্বর কপিলাশ্রম অথবা উধারবন্দের কাঁচাকান্তি কালীমন্দির কাউকেই তুলনায় আনা যায় কিনা তা ভাবার অবকাশ আছে বইকি।

এরকমই যদি আমরা ঐতিহাসিক উপকরণের ওপর ভিত্তি করে বরাক উপত্যকায় পর্যটন শিল্পের সম্ভাবনার কথা চিন্তা করি এবং তার জন্য খাসপুরের কাছাড়ি রাজবাড়ির ধ্বংসাবশেষ বা বদরপুরঘাটের দুর্গ অথবা লাতু-মালেগড়ের সিপাহি বিদ্রোহের স্মৃতিবিজড়িত টিলার কথা তুলে ধরি, তা হলেও ভারতের অন্যান্য স্থানের ঐতিহাসিক পর্যটনস্থলের সঙ্গে এক তুলনামূলক আলোচনার অবকাশ থাকে।

ভারতে যে-সব পর্যটনস্থল তাদের ঐতিহাসিক উপকরণের ওপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, যেমন জয়পুর (রাজস্থান) হাম্পি (কর্নাটক), মহীশূর (কর্নাটক), নালন্দা (বিহার), রায়গড় (মহারাষ্ট্র) বা আরও অনেক জায়গা, সেগুলোতে পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যাবে প্রতিটি স্থানেই যে ইতিহাসের আকর বর্তমান— স্বমহিমায় অথবা সবদিক দিয়েই অনুপম দৃষ্টান্তস্বরূপ। সেই প্রেক্ষাপটে বরাক উপত্যকার ঐতিহাসিক উপকরণগুলো কিন্তু স্থাপত্য, ভাস্কর্য অথবা নান্দনিকতায় সেই মাপদণ্ডে উন্নীত করা যায় না। এমনকী, আমাদের প্রতিবেশী দুই রাজ্যের মধ্যে ত্রিপুরার মানিক্য রাজবাড়ি বা নীরমহল অথবা কোচবিহার (পশ্চিমবঙ্গ) রাজবাড়ির সঙ্গে তুলনামূলক বিচার করলেও নান্দনিকতার দিক দিয়ে তাদের অনেক এগিয়ে রাখতে হবে।

মনে রাখতে হবে, ইতিহাস গবেষণার আকর মানেই যে পর্যটক-মনে অনুসন্ধিৎসুতা জাগাবে এমন ভাবার কোনও কারণ নেই। ঠিক একথাগুলোই খাটে বদরপুরঘাটের দুর্গ অথবা লাতু-মালেগড়ের সিপাহি বিদ্রোহের স্মৃতিফলকের ব্যাপারেও।

যে কথাটা ইতিমধ্যে অবতারণা করা হয়েছে, বরাক উপত্যকায় পর্যটন উন্নয়নের রূপরেখা তৈরি করতে গেলে আগে আমাদের সম্ভাব্য পর্যটক (target group of tourists) চিহ্নিত করতে হবে। দেশি এবং বিদেশি পর্যটকদের চাহিদা, সংস্কার, দৃষ্টিভঙ্গি সবকিছুর মধ্যেই পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। পর্যটন পরিকাঠামো গড়ে তোলার জন্য এ ব্যাপারগুলোর প্রতি বিশেষভাবে নজর দিতে হবে। তবে দেশি অথবা বিদেশি পর্যটক যাদের কথাই ভাবা হোক, বরাক উপত্যকার যোগাযোগ ব্যবস্থা এক্ষেত্রে প্রধান অন্তরায়। প্রাকৃতিক কারণেই হোক বা দুর্বল পরিষেবার জন্য হোক, এ উপত্যকার যোগাযোগ ব্যবস্থা আজও অনুন্নতই রয়ে গেল। শিলচর- সৌরাষ্ট্র মহাসড়কের কাজ আজও অসম্পূর্ণ। পুরো বর্ষাঋতুই যাত্রীদের জীবনে ঝুঁকি নিয়ে যাতায়াত করতে হয় সড়কপথে। অনুন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা পর্যটনের ক্ষেত্রে অবশ্যই বাধা হয়ে দাঁড়ায়।

উল্লেখ্য, পর্যটনের উপকরণকেই একমাত্র বিচার্য মনে করে কোনও স্থানের পর্যটন সম্ভাবনা বিচার করা যায় না। পর্যটনের ওপর গবেষণা করে বলা হয়েছে, কোনও স্থানে পর্যটন শিল্প গড়ে ওঠে কয়েকটি বিষয়কে ভিত্তি করে। যেগুলো মোটামুটি :—

— পর্যটন উপকরণ বা tourist attraction factors.
— যোগাযোগের উপকরণ বা communication factors.
— থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থাপনা বা accomodation factors
— পরিকাঠামো ব্যবস্থা বা infrastructure factors.
এবং
— পর্যটন সংস্থা এবং পরিকল্পনা বা tourist organisations and development factors.

বরাক উপত্যকার পর্যটন উপাদান এবং তার দুর্বল যোগাযোগ ব্যবস্থার কথা ইতিমধ্যে আলোচিত হয়েছে। তৃতীয় উপকরণ বা accomodation factors নিয়েও একটু আলোচনার প্রয়োজন। সমগ্র বরাক উপত্যকার তিনটি প্রধান শহর শিলচর, করিমগঞ্জ ও হাইলাকান্দিতে যতগুলো হোটেল আছে তাতে প্রতিরাতে হাজারজন পর্যটকের অবস্থানের আজও ব্যবস্থা নেই। শিলচরের গুটিকয়েক অভিজাত হোটেল নেহাৎই নগণ্য সংখ্যক পর্যটককে আবাসন দিতে সক্ষম। করিমগঞ্জ এবং হাইলাকান্দিতে এখনও সে রকম ব্যবস্থাই গড়ে ওঠেনি। বিদেশি পর্যটকের রুচি ও চাহিদা অনুযায়ী হোটেলের সংখ্যা নেই বললেই চলে।

তেমনই অবস্থা পরিকাঠামোর দিক দিয়েও। পরিকাঠামো ব্যবস্থা বলতে আমরা থাকা-খাওয়ার সঙ্গে করে স্বাস্থ্য পরিষেবা, আইনি ব্যবস্থা, নিরাপত্তা সবকিছুই আসে। এ ব্যাপারে কর্তৃপক্ষকে নজর দিতে হবে। আসলে পরিকাঠামো ব্যবস্থা বলতে আমরা এক সম্পূর্ণ পর্যটকবান্ধব পরিকাঠামো বুঝি। তাই সরকার থেকে আরম্ভ করে স্থানীয় ব্যবসায়ী সমাজ তথা সাধারণ জনগণের দায়িত্ব এ ব্যাপারে প্রচুর।

সবশেষ উপাদান যেটা পর্যটন সংস্থা, সাংগঠনিক তথা প্রশাসনিক পরিকাঠামো তার বিষয়ে কিছু আলোকপাত এখানে প্রাসঙ্গিক। আমাদের রাজ্যে পর্যটনের বিকাশের জন্য দায়িত্ব ন্যস্ত আছে সরকারি বিভাগ তথা পর্যটন মন্ত্রকের ওপর, যার অধীনে ডিরেক্টর অব ট্যুরিজমকে রাজ্যের পর্যটন উপকরণের ওপর ভিত্তি করে পর্যটনস্থলসমূহ চিহ্নিত করে সেগুলোকে প্রচারের আলোকে নিয়ে আসার (marketing and promotion) দায়িত্ব অর্পিত করা হয়েছে। এই ডিরেক্টর অব ট্যুরিজম সরকারকে যাবতীয় তথ্য প্রদান করে পর্যটন উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় রোডম্যাপ তৈরি করে সরকারকে তার পর্যটননীতি যথোপযুক্ত রূপায়ণের ব্যবস্থা করে দেয়। আর আছে আসাম ট্যুরিজম ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন, যার দায়িত্ব হচ্ছে রাজ্যে পর্যটন পরিকাঠামো গড়ে তোলা, যেমন, হোটেল নির্মাণ, বিশ্রামাগার নির্মাণ, বিশেষভাবে সনাক্ত পর্যটনস্থলের সঙ্গে সংযোগ পথ নির্মাণ ইত্যাদি।

সরকারি বিভাগ ডিরেক্টর অব ট্যুরিজম আসামে বেশ কয়েকটি পর্যটনস্থলের নাম সনাক্ত করে তাদের প্রচারের আলোয় নিয়ে আসার চেষ্টা করছে। সময়ে সময়ে বিভিন্ন ক্রোড়পত্র ছাপিয়ে সেগুলোকে বহির্রাজ্যে পাঠাবার ব্যবস্থা করে এই বিভাগটি tourism marketing এবং promotion করে আসছে। তাদের ক্রোড়পত্রে[১২] সনাক্ত করা পর্যটনস্থলগুলোর একটা তালিকা এরূপ :—

১) গুয়াহাটি :—

উত্তর-পূর্ব ভারতের প্রবেশদ্বার। কামাখ্যা তীর্থ, বশিষ্ঠ আশ্রম, নবগ্রহ মন্দির, শুক্রেশ্বর মন্দির, রাজ্য চিড়িয়াখানা ও উদ্ভিদ উদ্যান, তারাঘর, জাদুঘর, শংকরদেব কলাক্ষেত্র, ভূপেন হাজরিকার সমাধি মন্দির, দীপর বিল।

২) উত্তর গুয়াহাটি :—

দীর্ঘেশ্বরী মন্দির, অশ্বক্লান্ত ঘাট ও মন্দির, দৌল গোবিন্দ মন্দির, মণিকর্ণেশ্বর মন্দির।

৩) শুয়ালকুচি :—

আসামের বিখ্যাত মুগা ও পাট সিল্কের আঁতুড়ঘর।

৪) হাজো :—

হিন্দু-বৌদ্ধ-ইসলাম তিন ধর্মের মিলনস্থল।

৫) চানভুবি :—

প্রাকৃতিক জলাভূমি, সবুজের সমাহার এবং চড়ুইভাঁতির উৎকৃষ্ট স্থান।

৬) ভৈরবকুণ্ড :—

মনোরম চড়ুইভাতির স্থান।

৭) কাজিরাঙা জাতীয় উদ্যান :—

আসামের প্রথম জাতীয় উদ্যান। একশৃঙ্গি গণ্ডার ছাড়াও অনেক বিরল প্রজাতির বন্যজন্তুর বাসস্থান।

৮) শিবসাগর :—

ঐতিহাসিক শহর। আহোম রাজাদের পূর্বতন রাজধানী। রংঘর, করেংঘর, তলাতলঘর, শিবদৌল, গৌরীদৌল ইত্যাদির জন্য বিখ্যাত।

৯) হাফলং :—

আসামের একমাত্র শৈলশহর।

১০) জাটিঙ্গা :—

সবুজ অরণ্যানী আর পক্ষীদের আত্মহননের কারণে পরিচিত।

১১) তেজপুর :—

প্রাকৃতিক সৌন্দর্য, প্রাচীন স্থাপত্যকলার ধ্বংসাবশেষ।

১২) পরিতরা অভয়ারণ্য :—

বন্যজন্তুদের বিচরণ ভূমি, জলপ্রপাত।

১৩) মানস জাতীয় উদ্যান :—

জাতীয় উদ্যান, বন্য জীবজন্তুর বিচরণ ভূমি।

১৪) ভালুকপুতু :—

প্রাকৃতিক সৌন্দর্য, জলক্রীড়া।

১৫) ওরাং জাতীয় উদ্যান :—

বন্য জীবজন্তুর বিচরণ ভূমি তথা জাতীয় উদ্যান।

১৬) ডিব্রু সইখোয়া জাতীয় উদ্যান :—

বন্য জীবজন্তুর বিচরণ ভূমি তথা জাতীয় উদ্যান।

তাছাড়া অন্য যে দু'টি পর্যটনস্থলের নাম পাই, সেগুলো হলো ডিগবয়, যেখানে আছে পৃথিবীর প্রাচীনতম তৈল শোধনাগার আর অত্যন্ত মনোরম পরিবেশে গলফ কোর্স। অন্য পর্যটনস্থলটি মদন কামদেব, যেখানে একাদশ বা দ্বাদশ শতাব্দীর ভাস্কর্য যেগুলো খাজুরাহোর ভাস্কর্যের দৃষ্টিকোণ নিয়ে তৈরি।

তাৎপর্যমূলক তথ্য হলো, ডিরেক্টরেট অব ট্যুরিজম তাদের কোনও ক্রোড়পত্রেই বরাক উপত্যকার কোনও পর্যটনস্থলকেই সে অর্থে স্বীকৃতি প্রদান আজও করেনি। তবে এই বিভাগ কর্তৃক প্রকাশিত ২০১৮

সালের আসাম ট্রাভেল গাইডে (Assam Travel Guide)[১৩] চারটি স্থানের নাম উল্লেখ করা হয়েছে। যেগুলো হচ্ছে খাসপুর, ভুবনতীর্থ, কাঁচাকান্তি কালীমন্দির এবং ভুবন পাহাড়ের মণিহরণ সুড়ঙ্গ।

রাজ্যের পর্যটন মন্ত্রক বা ডিরেক্টরেট অব ট্যুরিজম তাদের ক্রোড়পত্রে বরাক উপত্যকার পযটনস্থলগুলোকে পর্যটন মানচিত্রে ঠিকমতো নিয়ে না এলেও আসাম ট্যুরিজম ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন কিন্তু শিলচর এবং সিদ্ধেশর কপিলাশ্রমে দু'টি ট্যুরিস্ট লজ তৈরি করে তার পরিচালনার ভার পর্যটন বিভাগকে অর্পিত করেছে। এখন, সার্বিকভাবে সদর্থক প্রচেষ্টার অভাবের কারণ অনুসন্ধান করা এই আলোচনার মুখ্য বিষয় নয়। তাই জেলা আধিকারিকদের অপারগতা নাকি জনপ্রতিনিধিদের ব্যর্থতা অথবা বৌদ্ধিক চেতনার অভাব এ ব্যাপারে আলোচনা করার কোনও প্রয়োজন দেখি না। আমাদের আলোচনা সীমাবদ্ধ রাখব সম্ভাব্য রূপরেখা সম্বন্ধে।

আলোচনার শেষ প্রান্তে এসে আমরা বরাক উপত্যকার পর্যটন শিল্পের সম্ভাব্য রূপরেখা নিয়ে কিছু বলব। এ পর্যন্ত আলোচিত সম্ভাব্য পর্যটনস্থলগুলোর প্রধান উপকরণকে আমরা দেখেছি ঐতিহাসিক এবং ধর্মীয় আস্থার দৃষ্টিকোণ নিয়ে। তবে সবচেয়ে প্রধান উপকরণ কিন্তু প্রাকৃতিক উপাদান এবং ভৌগোলিক অবস্থান। আজকাল যে বিষয়ের ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে, তা হলো Eco tourism বা প্রকৃতিনির্ভর পর্যটন, যেটাকে সবুজ পর্যটনও বলা চলে। বরাক উপত্যকা তার চিরহরিৎ অরণ্যানী নিয়ে পর্যটনের মানচিত্রে নিজেদের পর্যটনের আকরগুলোকে Eco tourism-র মোড়কে এনে যথাযথ package তৈরির ওপর নির্ভর করছে এই উপত্যকার পর্যটন শিল্পের সম্ভাবনা। আর যা প্রয়োজন, মনে রাখতে হবে পর্যটন গড়ে ওঠে একটা বিশেষ স্থানের ওপর ভিত্তি করে নয়। বরং দেখা যায়, তার জন্য একটা circuit বা প্রদক্ষিণ পথ। সে কারণেই প্রতিবেশী জেলা বা রাজ্যের পর্যটনস্থলগুলোকে নিয়ে পর্যটন প্রদক্ষিণ পথের পরিকল্পনা করা একান্ত প্রয়োজন। এ ব্যাপারে ডিমা হাসাও জেলার হাফলং ও জাটিঙ্গা, ত্রিপুরা রাজ্যের উনকোটি, মিজোরামের আইজলকেও tourist circuit-এ নিয়ে আসা যায়। এ ব্যাপারে আমাদের সম্ভাব্য tourist circuit-গুলো হতে পারে :

— শিলচর-ভুবন পাহাড়-আইজল।
— শিলচর-শনবিল-উনকোটি-শিলচর।
— শিলচর-হাফলং-জাটিঙ্গা-শিলচর।
— শিলচর-খাসপুর-হাফলং-শিলচর।
— শিলচর-ইম্ফল-শিলচর।

তবে একথা অনস্বীকার্য, পর্যটন প্রদক্ষিণ পথ পরিকল্পনার জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে অভ্যন্তরীণ যোগাযোগ ব্যবস্থা। এ ব্যাপারে মনোযোগ দেওয়া একান্ত আবশ্যক। এর পাশাপাশি বহির্ভারতের সঙ্গে রেল, সড়ক এবং বিমানের যোগযোগের ব্যবস্থা আরও উন্নত করা প্রয়োজন।

বরাক উপত্যকার ভৌগোলিক অবস্থান বিবেচনা করলে তাকে আন্তর্জাতিক পর্যটন মানচিত্রে নিয়ে আসাটাও কিন্তু অসম্ভব বলে ভাববার কারণ নেই। ভারত সরকার ইতিমধ্যে তার Look East Policy থেকে আরম্ভ করে Act East Policy বিবেচনা করছে এবং এ বিষয়ে বিশেষ গুরুত্ব দিচ্ছে। পূর্ব এশিয়ার দেশসমূহ, যেমন মায়ান্মার, থাইল্যান্ড, কম্বোডিয়া, ভিয়েতনাম, লাওস থেকে মালয়েশিয়া বা ইন্দোনেশিয়া সবার সঙ্গে ভারতের রয়েছে সুদীর্ঘকালের সাংস্কৃতিক যোগসূত্র। উত্তর-স্বাধীনতাকালে আশিয়ান অন্তর্ভুক্ত দেশগুলোর সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক অনেকটা শীতল থাকলেও ভারত সরকার বর্তমানে এই ঐতিহাসিক সাংস্কৃতিক সম্পূর্ণ

পুনঃসংস্থাপনের চেষ্টা করছে এবং অনেকাংশে সফলও হয়েছে। প্রস্তাবিত Trans Asian Roadways এবং Trans Asian Railways বাস্তবায়িত হলে শিলচরের সঙ্গে এই দেশগুলোর সড়ক ও রেলপথে যোগাযোগ স্থাপন হয়ে যাবে। এর ফলে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে শিলচর এক বিরাট ভূমিকা পালন করতে পারবে। তাছাড়া পূর্ব এশিয়ার দেশসমূহ থেকে বিপুল সংখ্যক পর্যটকের আগমনের সম্ভাবনা থাকবে। এই দু'টি প্রকল্প বাস্তবায়িত হলে সড়ক তথা রেলপথে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে সমগ্র বরাক উপত্যকা এপি সেন্টার হিসেবে পরিগণিত না হওয়ার কোনও কারণ নেই। যদিও তা সময়সাপেক্ষ কিন্তু পরিকল্পনা সেরকমই এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে।

সবশেষে আরেকটি বিষয়ের অবতারণা করে আমরা আলোচনার ইতি টানব। হাল আমলে পর্যটনের ক্ষেত্রে এক নতুন দিক উন্মোচিত হয়েছে, যাতে বলা হচ্ছে Health tourism বা স্বাস্থ্য পর্যটন। উন্নত চিকিৎসা সুবিধা লাভের আশায় মানুষ পর্যটন করে। দক্ষির ভারতের চেন্নাই, বেঙ্গালুরু এবং হায়দরাবাদ এক্ষেত্রে দেশীয় তথা আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে নিজেদের দৃষ্টান্ত রাখতে সক্ষম হয়েছে।

বরাক উপত্যকায় বিশেষ করে শিলচরে স্বাস্থ্য পরিষেবা এবং চিকিৎসা ক্ষেত্রে মোটামুটি একটা মাত্রা লাভে সক্ষম হয়েছে। পার্শ্ববর্তী জেলা এবং প্রতিবেশী রাজ্য থেকে অনেক লোকই কিন্তু চিকিৎসার সুযোগ লাভের সন্ধানে শিলচরের বিভিন্ন হাসপাতালে, বিশেষ করে কাছাড় ক্যান্সার হাসপাতাল ও রিসার্চ সেন্টারে আসেন। হয়তো কোনও সরকারি তথ্যে তার উল্লেখ পাওয়া যাবে না কিন্তু শিলচরের হোটেলগুলোতে গিয়ে তাদের পর্যটকের তালিকা দেখলেই তার প্রমাণ পাওয়া যাবে। তাই স্বাস্থ্য পরিষেবা আরও উন্নত করে তাকে প্রচারের আলোতে নিয়ে আসতে পারলে স্বাস্থ্য পর্যটনের ক্ষেত্রে এই উপত্যকার জন্য উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ আশা করা যায়। স্বাস্থ্য ব্যবস্থার সঙ্গে বিভিন্ন পর্যটনস্থলের নাম জুড়ে বিভিন্ন প্যাকেজ তৈরি করে তা পর্যটকদের সামনে তুলে ধরতে হবে। ভগ্ন স্বাস্থ্য উদ্ধারের সঙ্গে সবুজ ভূমিতে পর্যটন এক বাড়তি পাওনা হিসেবে গ্রহণ করবে আগামীদিনের পর্যটকরা।

পরিশেষে যে কথাটি বলতে চাই, পর্যটনের উন্নতি সব ক্ষেত্রেই সময়সাপেক্ষ। এজন্য চাই যথাযথ পরিকল্পনা এবং স্থানীয় মানুষজনের মনোভাব এবং আগ্রহ। পর্যটনের উন্নতি মানে স্থানীয় অর্থনীতির উন্নতি, এই বার্তাটুকু যেন বরাক উপত্যকার প্রতিটি মানুষের মনে জাগ্রত হয়।

তথ্যসূত্র :

১। World Trade and Tourism Council (1997) : Travel and Tourism - Jobs for the Millenium, পৃষ্ঠা- ১

২। M. P. Bezbaruah (199) : Indian Tourism Beyond the Millenium, Gyan Publishing House, New Delhi, পৃষ্ঠা-১৯

৩। Ratnadeep Singh (2000) : Tourism Marketing ; Principles, Policies and Strategies, Kanishka Publishers, New Delhi, পৃষ্ঠা- ১৫৬

৪। M. P. Bezbaruah (1999) : প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৯

৫। A. K. Sarkar (1998) : Action Plan and Priorities in Tourism Development, Kanishka Publishers, New Delhi, পৃষ্ঠা-১৮

৬। Akhtar Javaid (1993) : Tourism Management in India, Asian Publishing House, New Delhi, পৃষ্ঠা- ১৩

৭। M. A. Stein (2017) : Kalhama's Rajatarangini : A Chronicle of the Kings of Kashmir, Motilal Banaridas, New Delhi
৮। WTO (1999) : Tourism Marketing Trends. পৃষ্ঠা- ৮০
৯। D. J. Greenwood (1976) : Tourism - An Agent of Change, Annals of Tourism Research 3 (3) পৃষ্ঠা- ১২৮
১০। Victor T. C. Middleten (1950 : Marketing of Travel and Tourism, Butterworth - Heinmann, London, পৃষ্ঠা - ৮০
১১। বরাক উৎসব ২০০৫, স্মরণিকা, পর্যটন বিভাগ, অসম সরকার।
১২। Tourist Guide Map of Assam : Directorate of Tourism, Assam.
১৩। Assam Travel Guide (2018) : Directorate of Tourism, Assam. পৃষ্ঠা- ১৩৬

উপত্যকার বিকাশে শনবিল

মানবেন্দ্র দত্তচৌধুরী

শনবিল বরাক উপত্যকার শুধু নয়, সমগ্র দেশের এক বিশাল জলসম্পদ। এই জলসম্পদের যথাযথ ব্যবহার অবশ্যই উপত্যকার অর্থনৈতিক উন্নয়নে একটা গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে পারত। কিন্তু উপযুক্ত পরিকল্পনা বাস্তবায়নের অভাবে যা আজও হয়ে ওঠেনি তেমন করে।

শনবিল নিয়ে আজ থেকে দু'দশক আগে যখন আন্দোলন শুরু করি, তখন বরাক উপত্যকার মানুষের কাছেই শনবিলের তেমন পরিচিতি ছিল না। যা ছিল, তা হল, কেবল করিমগঞ্জ জেলায় শুধু শনবিলের মাছের জন্য পরিচিতি। আমাদের আন্দোলনের প্রথম পর্ব ছিল তা-ই প্রচার। শনবিলকে বরাক উপত্যকা সহ সমগ্র উত্তর-পূর্বে একটা পরিচিতি দিতে হবে এই লক্ষ্য নিয়ে শুরু হয় লেখালেখি পত্রপত্রিকায়, ম্যাগাজিন ইত্যাদিতে। বিভিন্ন স্কুল-কলেজের ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষামূলক ভ্রমণে শনবিল যেতে অনুপ্রেরণা জোগানো হয় এবং তাদের অনুরোধ করা হয় যদি শনবিল তাদের ভাল লেগে থাকে তবে তারা যেন তাদের মত করে শনবিলের প্রচার করে। সামাজিক মাধ্যম এতে একটা বিশাল অবদান রাখে। যার ফলে শনবিল আজ বরাক উপত্যকার এতটাই পরিচিত পর্যটনস্থল, ছুটির দিনে শনবিল গেলে গাড়ি রাখার জায়গার সমস্যা হয়। দ্বিতীয় পর্বের আন্দোলনে আমাদের লক্ষ্য ছিল শনবিল সংরক্ষণ। শনবিলের সমস্যা অনুধাবন করে তার সংরক্ষণের লক্ষ্যে বিস্তারিত প্রকল্প তৈরি করা হয় পর্যায়ক্রমে ২০০৪, ২০০৯ এবং ২০২১ সালে। ২০০৪ এবং ২০০৯-র বিস্তারিত প্রকল্পের কিছু কাজ বাস্তবায়িত হলেও মূল সংরক্ষণের কাজ আজও হয়নি। ফলে আসামের মুখ্যমন্ত্রীর ইচ্ছায় করিমগঞ্জের জেলাশাসকের আমন্ত্রণে ২০২১ সালে আবার ১১৭ কোটি টাকার প্রকল্প তৈরি করি। আমরা আশাবাদী, আমাদের আন্দোলনের দ্বিতীয় পর্ব সাফল্য পাবে, যদি এ বছর তৈরি করা প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হয়।

শনবিল একান্ত নিজের মত করেই আজ বরাক উপত্যকার একটি পর্যটন কেন্দ্র হিসেবে গড়ে উঠেছে এবং এই পর্যটনকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে কিছু ছোট ব্যবসা প্রতিষ্ঠান, যা অবশ্যই অল্পমাত্রায় হলেও স্থানীয় অর্থনীতিতে অবদান রাখছে। ৫০টির বেশি মেশিনচালিত নৌকা আজ শনবিলে চলছে। ভাড়া দিনপ্রতি ১ থেকে ১.৫ হাজার টাকা। এতে মোটামুটিভাবে ৫০টি পরিবার এবং তার সঙ্গে ৫০ জন নৌকাচালকের একটা আর্থিক জোগান হচ্ছে। দেবদ্বার মাছ বাজারে গজিয়ে উঠেছে ছোট ছোট চা-পকোড়ার দোকান। এতে বেশ কিছু পরিবার একটা আর্থিক জোগানের মুখ দেখছে। গজিয়ে উঠেছে শনবিল ধাবা, এতে মালিক সহ কর্মচারীদের একটা আর্থিক জোগান অবশ্যই থাকছে। আমাদের আন্দোলনের দ্বিতীয় পর্বে আমরা ঠিক এটাই চেয়েছিলাম। মাছ উৎপাদনের সঙ্গে সঙ্গে পর্যটনের মধ্যে দিয়ে একটা অর্থনৈতিক জাগরণ করবে শনবিল, বিশেষ করে স্থানীয় জনগণের জন্য। এই ছিল আমাদের স্বপ্ন। খানিকটা হলেও স্বপ্ন যে বাস্তবায়িত হচ্ছে, তার একটা আভাস এই মুহূর্তে শনবিল দিচ্ছে। কিন্তু যে পরিমাণ নীল বিপ্লব শনবিল ঘটাবার ক্ষমতা রাখে, যে

পরিমাণ পর্যটনভিত্তিক অর্থনৈতিক জোগান শনবিল দিতে পারত, সেই সীমায় আমরা আজও যে পৌঁছতে পারিনি, এটা নিঃসংকোচে বলা যায়। এর কারণ, শনবিলের সম্পদের পাশাপাশি কিছু সমস্যাও রয়েছে, যে সমস্যাগুলো নিরসনে দরকার গুচ্ছ পরিকল্পনার। ২০০৯ এবং ২০২১ সালে তৈরি করে দেওয়া প্রকল্পে তারই আভাস দিয়ে বলা হয়েছে, একক কোনও ছোট্ট প্রকল্পের মাধ্যমে শনবিলে সাফল্য আনতে পারবে না। দরকার গুচ্ছ পরিকল্পনা বাস্তবায়নের। তবেই শনবিল বরাক উপত্যকা সহ সমগ্র উত্তর-পূর্বে মাছের বিপ্লব ঘটাতে পারবে, তবেই শনবিল সমগ্র উত্তর-পূর্বের একটি উন্নত পর্যটন কেন্দ্র হতে পারবে।

শনবিলের সম্পদ কী, তার সমস্যা কী এবং কীভাবে শনবিলকে ব্যবহার করে বরাক উপত্যকায় অর্থনৈতিক বিপ্লব ঘটানো, যায় তার একটি সংক্ষিপ্ত বিশ্লেষণ এখানে তুলে ধরা হলো জনসচেতনতা জাগরণের লক্ষ্যে।

২৪°৩০′-২০°৪৫′ উত্তর অক্ষাংশ এবং ৯২°১৫′- ৯২°৩০′ পূর্ব দ্রাঘিমাংশে অবস্থিত শনবিল একটি প্রাকৃতিক জলাধার, সিংলা ও কচুয়া নদীর সঙ্গমস্থলে। আসামের করিমগঞ্জ জেলার উত্তরাংশে হাইলাকান্দি জেলার সীমাসংলগ্নে অবস্থিত এই বিল। প্রায় ডিম্বাকৃতি হওয়ায় শনবিলের তীর দু'টি। বিলের পশ্চিম তীরে খানিকটা অংশ করিমগঞ্জ-দুল্লভছড়া রেললাইন দিয়ে যুক্ত। রয়েছে গাড়ি চলাচলের রাস্তাও। বিলের পূর্ব তীর যুক্ত হয়েছে করিমগঞ্জ ও হাইলাকান্দি শহরের সঙ্গে দুটো পথে। শনবিলের একটি অংশ দেবদ্বার গ্রাম হাইলাকান্দি শহর থেকে ভৈরবনগর হয়ে প্রায় ১২ কিঃমিঃ দূরত্বে। অন্য অংশ কালীবাড়ি বাজার করিমগঞ্জ শহর থেকে রামকৃষ্ণনগর হয়ে প্রায় ৬৫ কিঃমিঃ।

প্রায় ৫০ হাজার স্থানীয় লোকের জীবিকা সরাসরি যুক্ত শনবিলের উৎপাদনের ওপর। মাছ এবং বোরো ধান হচ্ছে শনবিলের মূল উৎপাদন। ২০০৩-০৪ সালে করা একটি সমীক্ষায় দেখা গিয়েছিল যে, শনবিল বছরে প্রায় আড়াই কোটি টাকার মাছ উৎপাদন করে কোনও বিজ্ঞানভিত্তিক প্রযুক্তির ব্যবহার ছাড়াই। ওই বছরে রাজ্য সরকার শনবিলের মাছ থেকে রাজস্ব পায় ৩.৫ লক্ষ।

শনবিল নিয়ে গবেষণায় লিপ্ত হয়ে শনবিল প্রকল্প তৈরি করতে গিয়ে মোট তিনটি সংজ্ঞা নির্ধারণ করা হয়।

প্রথম সংজ্ঞা :

বর্ষায় জলে ডুবে যাওয়া দক্ষিণে বাজারঘাট থেকে উত্তরে বেলালা গ্রাম এবং পূর্বে সিঙ্গুয়া থেকে পশ্চিমে কেদাইরগুল অথবা পূর্বে কল্যাণপুর থেকে পশ্চিমে নয়াগ্রাম এই বিশাল অঞ্চল শনবিল। এতে উত্তরে-দক্ষিণে বিলের দৈর্ঘ্য প্রায় ১২ কিঃমিঃ এবং পূর্বে-পশ্চিমে প্রায় ৪ কিঃমিঃ। অর্থাৎ, বর্ষায় জলে ডুবে যাওয়া এই প্রায় ৫০ বর্গ কিঃমিঃ জলাশয় হচ্ছে শনবিল। কিন্তু এই বিশাল অঞ্চল প্রকল্প বাস্তবায়নের পক্ষে সুবিধাজনক নয়। কারণ, এতে রয়েছে ব্যক্তিগত মালিকানাধীন জমি।

২য় সংজ্ঞা :

শনবিল গ্রুপ ফিসারি নামে ২৪টি বিলের একটি সমষ্টি হচ্ছে শনবিল। রামকৃষ্ণনগর সার্কল অফিসের তথ্য মতে, এই ২৪টি বিলের মোট আয়তন ৩১৬৯ একর। কোনও বিশাল প্রকল্প বাস্তবায়নের পক্ষে যা যথেষ্ট নয়।

৩য় সংজ্ঞা :

শনবিল গ্রুফ ফিসারির প্রতিটি বিল তুলনামূলক উঁচুভূমিকে খাস ভূমি বলা হয়েছে। প্রতিটি বিলের সঙ্গে ওই ভূমির পরিমাণকে যোগ করলে মোট ব্যবহারযোগ্য আয়তন দাঁড়ায় ৬০০০ একর। এই ৬০০০ একর

অঞ্চলে কোনও ব্যক্তিগত মালিকানাধীন জমি নেই। সুতরাং, শনবিল প্রকল্প বাস্তবায়নে আমাদের লক্ষ্য এই তৃতীয় সংজ্ঞাটি।

শনবিলের অন্যতম প্রধান উপাদান মাছ ধরাতে দু'টি পদ্ধতি অবলম্বন করা হয় যেমন —

১) প্রতিবছর এপ্রিল থেকে সেপ্টেম্বর শনবিল মুক্ত থাকে যে কোনও মৎস্যজীবীর মাছ ধরার অবাধ অঞ্চল হিসেবে।

২) অক্টোবর থেকে মার্চ — এই সময়ে শনবিল মাছ ধরার জন্য চলে যায় শনবিল মৎস্যজীবী সমবায় সমিতির হাতে, যারা বছরপ্রতি রাজ্য মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশন থেকে শনবিলে কেবল মাছ ধরার জন্য চুক্তি নেয়। ১৯৭৫ সালের আগে শনবিল ছিল দেওয়ান মানিক চাঁদ কোর্ট অব ওয়ার্ডস-র সম্পত্তি। ১৯৭৫ সালে রাজ্য সরকার এই বিলটি অধিগ্রহণ করে এবং শনবিলের মৎস উন্নয়নের দায়িত্ব চলে যায় শনবিল মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশনের হাতে। এবার আলোচনা করা যাক শনবিলের সমস্যাগুলো কী, এর সম্ভাবনা কী এবং কী প্রকল্প বাস্তবায়িত হলে শনবিল বরাক উপত্যকার অর্থনীতিতে একটা গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে পারবে।

(ক) শনবিলের সমস্যা :

(১) বর্ষায় শনবিল এক সাগর, কিন্তু শীতে শুকনো এক পরিত্যক্ত ভূমি।

(২) বর্ষায় এই বিল প্লাবিত হয় জলে আর শীতে হাহাকার করে জলের জন্য।

(৩) এর প্রধান কারণ, শনবিলের ভূতল দক্ষিণ থেকে উত্তরে ৩০° হেলানো। ফলে বর্ষায় জমা জল শীতে কচুয়া নদী দিয়ে বেরিয়ে যায়।

(৪) জলস্তর নীচে যেতে শুরু করলে তুলনায় উঁচু জমিতে বোরো ধান চাষ হয়। কিন্তু অকাল বর্ষণে প্রায় প্রতিবছর জলস্তর বেড়ে যাওয়ায় বোরো ধান জলে ডুবে যায়।

(৫) জলের অভাবে তুলনাত্মক উঁচু জমি শীতে ফলনহীন থাকে।

(৬) ক্রমাগত জমা হওয়া পলিতে শনবিলের ভূতল উপরে উঠে আবার এর জলধারণ ক্ষমতা কমে যায়। ফলস্বরূপ আশপাশ অঞ্চলে বন্যার প্রাদুর্ভাব বেড়ে যায়।

(৭) পরিযায়ী পাখিদের নির্বিচার হত্যা এদের এই জলাশয়ে আসা বন্ধ করে দিয়েছে।

(৮) খাস জমিতে ব্যক্তিগত অধিগ্রহণ বিলের ব্যবহারযোগ্য ভূমি কমিয়ে দিচ্ছে।

(খ) শনবিলের সম্ভাবনা :

(১) শনবিল বরাক উপত্যকায় মৎস্য বিপ্লবের উৎস হতে পারে।

(২) শনবিল বরাক উপত্যকায় পর্যটন শিল্পের কেন্দ্রবিন্দু হতে পারে।

(৩) শনবিল বরাক উপত্যাকার Rice Bowl হতে পারে।

(৪) শনবিলকে রামসার অঞ্চল ঘোষণা করে জাতীয় জলাশয়ের মর্যাদা দেওয়া যেতে পারে।

(৫) শনবিল এই অঞ্চলে আর্সেনিক-মুক্ত পানীয়জলের উৎস হতে পারে।

(৬) শনবিল এই অঞ্চলে জল পরিবহনের উৎস হতে পারে।

(গ) শনবিলে কী করণীয় :

(১) মাত্র যে একটি কাজ, যা শনবিল সংরক্ষণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে, তা হচ্ছে কচুয়ার উৎপত্তিস্থলে একটি অত্যাধুনিক বাঁধ তৈরি করা, যে বাঁধ ইচ্ছানুসারে শনবিলে জল সংরক্ষণ করতে পারবে। ফলে শীতে শনবিল জলশূন্য হবে না। বেলালা ও সেকিকানিশাইল গ্রামের মধ্যে কচুয়া নদীতে ১৭০ মিঃ দীর্ঘ

৩০ ফুট উঁচু অত্যাধুনিক বাঁধ তৈরি করে জল সংরক্ষণ করলে শীতে শনবিলের জলের দৈর্ঘ্য হবে ৬ কিঃমিঃ এবং প্রস্থ ২.৫ কিঃমিঃ। এভাবে জল সংরক্ষণ হলে বর্ষব্যাপী শনবিল পর্যটনের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে থাকতে পারবে।

(২) সারা বছর একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ অঞ্চলে ন্যূনতম জল ধরে রাখতে পারলে যথেষ্ট পরিমাণে পর্যটন কুটির তৈরি করা যেতে পারে দেবদ্বার, মোকাম কালীবাড়ি ও কল্যাণপুর অঞ্চলে।

(৩) শনবিলের সিপাহিটিলাকে ১৮৫৭-র ঐতিহাসিক নিদর্শন হিসেবে তুলে ধরে একটা স্মৃতিসৌধ তৈরি করা যেতে পারে পর্যটন আকর্ষণকে লক্ষ্য রেখে।

(৪) ‘শনবিল যুদ্ধে’র অন্য একটা স্মৃতিসৌধ শনবিলে করা যেতে পারে।

(৫) পর্যটক আকর্ষণে শনবিলে সরকারি নিয়ম-কানুনমাফিক নৌকা ভ্রমণের আয়োজন করা যেতে পারে।

(৬) শনবিলের ২৪টি বিলের ২-১টিকে সংরক্ষিত করে সব ধরনের মাছ ধরায় নিষেধাজ্ঞা জারি করলে শনবিলে মৎস উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে। এনইসি রাস্তার ওপারে ২-১টি বিলকে এজন্য নির্ধারণ করা যায়।

(৭) শনবিলের অন্যতম সৌন্দর্য হিজল গাছের সংরক্ষণে ব্যবস্থা নেওয়া যায়।

(৮) শনবিলকে ‘রামসার’ অঞ্চল ঘোষণা করে শনবিলের মাছ ধরায় নিয়ম-কানুন চালু করা যেতে পারে। এই কাজগুলোর মাধ্যমে যে তিনটি মূল লক্ষ্যে পৌঁছানো সম্ভব, তা হল —

(১) শনবিল জল সংরক্ষণ।

(২) শনবিলে মৎস্য বিপ্লব ঘটানো।

(৩) শনবিলকে কেন্দ্র করে বরাক উপত্যকায় পর্যটন বিপ্লব ঘটানো।

এই তিনটি মূল লক্ষ্যে পৌঁছনো গেলে তবেই শনবিল বরাক উপত্যকার অর্থনীতিতে বিশেষ অবদান রাখতে পারবে। তবে শনবিল প্রকল্প বাস্তবায়নের কিছু দার্শনিক ভিত্তি আছে, সেগুলোকে গুরুত্ব দেওয়া দরকার। যেমন—

(১) জল সংরক্ষণ প্রকল্প হাতে নেওয়ার আগে অন্য কোনও একক এবং বিচ্ছিন্ন প্রকল্প শনবিলে সাফল্য পাবে না।

(২) দরকার গুচ্ছ পরিকল্পনার একসঙ্গে বাস্তবায়ন। কোনও একক এবং বিচ্ছিন্ন প্রকল্প সাফল্য পাবে না শনবিলে।

(৩) ইস্ট কলকাতা ওয়েট ল্যান্ড ম্যানেজমেন্ট অথরিটির মতো শনবিল ওয়েট ল্যান্ড ম্যানেজমেন্ট অথরিটি থাকা দরকার।

(৪) শনবিল পর্যটন বোর্ড নামে একটি বোর্ড থাকা দরকার, যা শনবিলের দৈনন্দিন পর্যটক সম্পর্কিত কাজকর্ম দেখাশোনা করবে। গুচ্ছ প্রকল্প বাস্তবায়নের আগে প্রকল্পগুলোর যথাযথ বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ জরুরি।

আসুন, আমরা সবাই মিলে শনবিল সংরক্ষণ আন্দোলনে সামিল হই এবং শনবিলকে কেন্দ্র করে বরাক উপত্যকায় অর্থনৈতিক বিপ্লবের যে সম্ভাবনা রয়েছে, সেই সম্ভাবনা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সহযাত্রী হই।

কালীগঞ্জের শীতলপাটি : ঐতিহ্য, সম্ভাবনা

সব্যসাচী রায়

ভূমিকা

সমৃদ্ধি ছিল। ছিল বলেই তো সিলেটকে আসামের সঙ্গে সংযুক্ত করা হয়েছিল। কিন্তু, আসাম প্রভিন্সে সংযুক্তির পর বঞ্চনার সেই 'সোর্ড অব ড্যামোক্লেস' সিলেটের ঘাড়ে প্রতিনিয়ত নিঃশ্বাস ফেলে যাচ্ছিল। ১৮৭৪ থেকে ১৯৪৭ সালের দেশভাগ পর্যন্ত সিলেট ঝুলিতে প্রাপ্তি ছিল অবজ্ঞাই। এর সর্বশেষ নিদর্শন সিলেট বিভাজন। দেশভাগের পরিপ্রেক্ষিতে সিলেটের ন'টির মধ্যে সাড়ে-তিন থানা ভারতভূমে থাকল, যা আজ আসাম রাজ্যের করিমগঞ্জ জেলার অন্তর্ভুক্ত। তারপর! তারপর, কুশিয়ারা-সুরমার স্রোতের সঙ্গে পঁচাত্তরটি বছর পেরিয়ে গেছে। আজকের দিনে, খণ্ডিত সিলেটের এপারের অংশ করিমগঞ্জে দাঁড়িয়ে যে সমৃদ্ধির জয়গান গাইবার কথা ছিল, এর বিপরীতে এই অঞ্চলের প্রাকৃতিক সম্ভারের অব্যবহার এবং অপব্যবহারের করুণ চিত্রই চোখে ভেসে ওঠে, ভেসে ওঠে স্বপ্নভঙ্গের কাহিনি।

এমনই এক করুণ পরিস্থিতিতে দীর্ঘ এক শতক (বা, তারও বেশি সময়) ধরে ধুঁকছে কালীগঞ্জের শীতলপাটি শিল্প। নেই কোনও অনুপ্রেরণা, নেই কোনও পৃষ্ঠপোষকতা। টিকে আছে, এই যা। নিজেদের সৃজনশীল সত্তাকে টিকিয়ে রাখার এই শিল্পের সঙ্গে যুক্ত পাটিকর সম্প্রদায়ের তাড়না এবং তাদের জীবন-জীবিকার তাগিদগুলোর সুতো ধরেই টিকে আছে এই শিল্প ও শিল্পকলা। কিন্তু, ন্যূনতম সহযোগিতা পেয়ে গেলে এই কুটিরশিল্পটি সারা দেশে, এমনকী সারা পৃথিবীতে নিজের এক বিশ্বজনীন পরিচয় গঠন করতে পারত।

একটি অঞ্চলে শিল্প গঠন তথা সার্বিক বিকাশের প্রাথমিক শর্ত হচ্ছে এক উন্নয়নমুখী পরিকাঠামো, যে পরিকাঠামো তৈরির ক্ষেত্রে সবচাইতে বেশি অবদান রাখে অঞ্চলটির যোগাযোগ ব্যবস্থা। এরপর আসে কাঁচামাল, দক্ষ শ্রমিক, বাজার ও তার চাহিদা ইত্যাদি। দুর্ভাগ্য, প্রায় সবক্ষেত্রেই সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও স্বাধীনতা-পূর্ব সিলেট-সুরমা উপত্যকায় বা স্বাধীনতা-উত্তর বরাক উপত্যকায় সেভাবে কোনও স্থিতিশীল শিল্প গঠন হয়নি। স্বাধীনতার পর যে দু'-একটা শিল্প স্থাপন হয়েছে (চিনিকল ও কাগজকল) সেগুলো অবহেলা, অপশাসন এবং অপ্রয়োজনীয় রাজনৈতিক হস্তক্ষেপে কয়েক দশকের মাথায়ই মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছে।

স্বাধীনতা-পূর্ব সুরমা উপত্যকায়, বিশেষ করে সিলেটের করিমগঞ্জে শিল্প স্থাপনের পর্যাপ্ত সম্ভাবনা ছিল। জলপথে যোগাযোগ সহজ থাকায় প্রাক্-ব্রিটিশ সময়কাল থেকে করিমগঞ্জ ছিল বাংলার একটি গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্যকেন্দ্র। বাঁশ, কাঠ, উল, মোম, কাচ ইত্যাদি সামগ্রী রফতানি হতো এখান থেকে। করিমগঞ্জের পাথারকান্দি ও নিলামবাজার অঞ্চল থেকে পার্শ্ববর্তী সিলেট বাজারে প্রচুর বাঁশ ও কাঠের সামগ্রী জোগান দেওয়া হতো। লক্ষীপুর-করিমগঞ্জ-সিলেট নৌপথটি সে-সময় বাণিজ্য ও যোগাযোগের অন্যতম

প্রধান সম্বল ছিল। প্রশাসনের আয়ের গুরুত্বপূর্ণ সংস্থান ছিল জলকর। বিশ শতকের শুরুতে রেল যোগাযোগের সূচনার পর জলপথে বাণিজ্যের গুরুত্ব কিছুটা কমে যায়। তবুও, ১৯৬৫ সালের ভারত-পাক যুদ্ধের আগে পর্যন্ত করিমগঞ্জের মধ্য দিয়ে ভারত ও পূর্ব-পাকিস্তানের মধ্যে জলপথে বাণিজ্য চালু ছিল। ধীরে ধীরে এই নদীপথে বাণিজ্য কমতে থাকে। একুশ শতকে সেটা কেবল কয়লা ও সামান্য ক'টি খাদ্যসামগ্রী রফতানির মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে। পরবর্তীতে, সড়ক বা রেল যোগাযোগের নবীকরণের ফলেও বরাক উপত্যকা এর থেকে সেরকম বিশেষ কিছু লাভ করতে পারেনি। বিগত কয়েক দশকে উপত্যকায় নতুন কোনও শিল্প গঠিত হয়নি, নতুন শিল্প গঠনে যে-সব ক্ষেত্রে সম্ভাবনা ছিল সেগুলোর প্রতি সহায়তা বা অনুপ্রেরণা দেখানো হয়নি। যার পরিণাম— শিল্পায়ন বা বাণিজ্যে করিমগঞ্জ তথা বরাক উপত্যকার ঝুলি আজ শূন্য, অঞ্চলটি আজ গুরুত্বহীন।

কিন্তু, এমনটি হওয়ার কথা ছিল না। সিলেটের সমৃদ্ধির সূত্র ধরে সম্ভাবনা ছিল অঢেল। প্যারীচরণ দাস তাইতো বলেছিলেন— *'প্রকৃতির ভাণ্ডারেতে শ্রীহট্টের মাঝে // কত শোভা মনোলভা সর্ব্বত্র বিরাজে।'* সিলেটের (বর্তমান ভারতের করিমগঞ্জ) এমনই এক শিল্প গঠনের ভরপুর সম্ভাবনার নাম কালীগঞ্জের শীতলপাটি।

করিমগঞ্জের কালীগঞ্জ অঞ্চলে পাটিশিল্পের গড়ে ওঠার ইতিহাস প্রায় সাতশো বছর পুরনো। পাটিশিল্পের সঙ্গে যুক্ত লোকদের পাটিকর বা পাটিয়ার বলে সম্বোধন করা হয়। আনুমানিক খ্রিস্টিয় তেরো শতকে পাটিকরেরা করিমগঞ্জের কালীগঞ্জ অঞ্চলে পাটি তৈরির কাজ শুরু করেন। লোকমুখে শোনা আখ্যান অনুসারে, কালীগঞ্জ বাজারের পাশ দিয়ে বয়ে যাওয়া কাঁকড়া নদীর তীরে পাটিকরেরা রন্দটিলা নামের একটি গ্রাম স্থাপন করেন এবং সেই অঞ্চলে শীতল পাটি উৎপাদনের কাজ শুরু হয়। এই রন্দটিলা গ্রামটি বলেশ্বর রাজস্ব গ্রাম হিসেবে পরে পরিচিতি লাভ করে। জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে কালীগঞ্জ বাজারের উত্তর দিকে রতনপুর নামের আরেকটি গ্রাম স্থাপন করেন পাটিকরেরা। আজকের দিনে, মাঝখানে বয়ে যাওয়া কাঁকড়া নদীর দু'ধারে থাকা বলেশ্বর ও রতনপুর গ্রাম-সহ কালীগঞ্জ বাজার থেকে প্রায় পাঁচ কিলোমিটার পূর্বে থাকা করিমপুর গ্রাম পর্যন্ত এই পাটিকরদের বসতি। বলেশ্বর ও রতনপুর গ্রাম কালীগঞ্জ গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে, করিমপুর গ্রামটি মনসাঙ্গন গ্রাম পঞ্চায়েতের আওতাধীন। এই তিনটি গ্রামে প্রায় ত্রিশ হাজার পাটিকর গোষ্ঠীর লোক রয়েছেন। তাদের মধ্যে প্রায় আঠারো হাজার লোক আজকের দিনে পাটি শিল্পের সঙ্গে জড়িত। এই পাটিকর গোষ্ঠীর অনেকে আবার আসামের নগাঁও, হোজাই জেলা এবং নাগাল্যান্ডের ডিমাপুরে স্থানান্তরিত হয়ে সেখানে পাটির ব্যবসায় নিয়োজিত রয়েছেন।

এই কুটিরশিল্পটি এই পাটিকরদের হাত ধরেই টিকে রয়েছে, রাষ্ট্রের তরফ থেকে কোনও উৎসাহ বা সহযোগিতা ছাড়াই। এটা সম্ভব হচ্ছে এর অনন্যতায় এবং তাদের বংশানুক্রমিক পরম্পরাকে টিকিয়ে রাখতে শিল্পীদের আন্তরিকতায়। কিন্তু, এই পাটিকর সম্প্রদায়ের আর্থ-সামাজিক পরিকাঠামো বড়ই করুণ। দৈনন্দিন জীবনে রীতিমতো কঠোর সংগ্রাম করে তারা তাদের শিল্প ও শিল্পীসত্তাকে টিকিয়ে রাখার সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছেন। এটাই যে তাদের জীবন-জীবিকার একমাত্র সম্বল। তাইতো তারা এই শিল্পকে যক্ষের ধনের মতো আগলে রাখতে পারছেন। তাদের শিল্পের নান্দনিকতা খুবই দৃষ্টিনন্দন। তাদের হাতের অপরূপ শিল্পনৈপুণ্য ও কারিগরি দক্ষতার মাধ্যমে শিল্পটির রূপ-মাধুর্য ফুটে ওঠার পর স্বাভাবিকভাবেই পাটিশিল্পটি ক্রেতাদের আকৃষ্ট করে। তাদের কঠোর পরিশ্রম, নিষ্ঠা এবং ধৈর্যের ফলে এই উৎকৃষ্ট মানের শিল্পটি দেশে-বিদেশে এক সমাদৃত শিল্প হিসেবে এখন পর্যন্ত টিকে আছে। কিন্তু, শিল্পের সমাদর থাকলেও শিল্পীরা বরাবরই অবহেলিত

থেকে গেছেন। এই অসংগঠিত শিল্পক্ষেত্রটি পায়নি কোনও পৃষ্ঠপোষকতা, কোনও প্রযুক্তির ছোঁয়া। টিকে আছে সেই চিরাচরিত শ্রমভিত্তিক উৎপাদন-পদ্ধতির ওপর ভরসা করে। আধুনিকতার স্পর্শ এখনও এই শিল্পটির ধরাছোঁয়ার বাইরে। তবে, তাদের শিল্পনৈপুণ্যের কদর কিন্তু ঠিকই রয়েছে, আর তাই এই শীতলপাটির চাহিদাও কমেনি।

কালীগঞ্জের শীতল পাটিশিল্পীরা সাধারণত বিভিন্ন ধরনের গুণমানসম্পন্ন পাটি প্রস্তুত করেন। শীতলপাটি তৈরির জন্য একমাত্র কাঁচামাল হচ্ছে 'মুর্তা', যা বাঁশের কঞ্চির মতো ছোট ছোট এক ধরনের গুল্মজাতীয় গাছ। মুর্তার ছাল থেকে পাটি তৈরি হয়ে থাকে। প্রথমে মুর্তা থেকে অতি সরু সরু 'বেত' তৈরি করে রোদে শুকিয়ে এরপর সেই বেতের ভেতরের অংশ থেকে আবারও দাঁত দিয়ে অতি সূক্ষ্ম বেত বের করা হয়। সেই বেতের পিঠের অংশ দিয়ে মাঝারি পাটি প্রস্তুত করা হয়। আবার, সেই বেতের ভেতরের বা বুকের অংশ থেকে বের করা বেতের উপর স্বযত্নে বিভিন্ন রঙের প্রলেপ দিয়ে নীরস স্তরের মানসম্পন্ন পাটি তৈরি করা হয়। তবে সেদ্ধ পাটির গুণগত মান সবচাইতে উৎকৃষ্ট। এই উৎকৃষ্ট মানের পাটি তৈরি করতে শিল্পীদের অনেক পরিশ্রম ও সময় ব্যয় করতে হয়। প্রথমে নিখুঁত মুর্তা থেকে বেত তৈরি করা হয়। সেই বেতগুলো কোমল অবস্থায় থাকাকালীন একটি বড় পাত্রে দীর্ঘক্ষণ সেদ্ধ করতে হয়। এরপর সেদ্ধ বেত রোদে অল্প শুকিয়ে শিল্পীরা সেগুলোকে বুনন করে পাটি তৈরি করেন। সেদ্ধ পাটি অত্যন্ত কোমল ও আরামদায়ক, দৃষ্টিনন্দন তো বটেই।

কালীগঞ্জের পাটিশিল্পীরা বিভিন্ন আকার এবং আকৃতির পাটি প্রস্তুত করে থাকেন। তবে, বাজারের চাহিদা আনুসারে মূলত চার ধরনের আকার-আকৃতির পাটি বহুল পরিমাণে উৎপাদন করা হয়। এই চার ধরনের পাটির আকার এবং আনুমানিক পাইকারি মুল্য যথাক্রমে :

৭ ফুট x ৬ ফুট (King size/খাটে ঘুমানো পাটি, বড়) = ১৫০০ থেকে ২৫০০ টাকা।
৭ ফুট x ৫ ফুট (Standard size/খাটে ঘুমানো পাটি, ছোট) = ৭০০ থেকে ১০০০ টাকা।
৫ ফুট x ৪ ফুট (Medium size/বিভিন্ন কাজে ব্যবহারের পাটি) = ৫০০ থেকে ৮০০ টাকা।
২ ফুট x ৩ ফুট (Prayer Mat/নামাজের চিউনি) = ২০০ থেকে ২৫০ টাকা।

তবে সেদ্ধ পাটির ক্ষেত্রে এই দর ন্যূনতম কুড়ি শতাংশ বেশি। প্রসঙ্গত, পাটিশিল্পীরা তাদের নৈপুণ্য শুধু উপরিউক্ত চার ধরনের শীতলপাটি তৈরির মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখেন না। এই শীতলপাটি দিয়ে মাথার টুপি, পেন-স্ট্যান্ড, এগজিকিউটিভ ব্যাগ, ফুলদানি, এমনকী হাতপাখাও তৈরি করেন তারা। আরও অনেক অভিনব রকমারি সামগ্রী প্রস্তুত করার প্রতিভাও রয়েছে তাদের।

কিন্তু, এই শীতলপাটি তৈরির কাঁচামাল মুর্তা উৎপাদনের জন্য পাটিকরদের সে রকম কোনও নিজস্ব জমি নেই। সাধারণত নদী, খাল, বিল এবং জলাশয়ে এই মুর্তা চাষ হয়। তাই কাঁচামাল সংগ্রহ করতে প্রতিটি বাড়ির পুরুষ লোকদের ছুটে যেতে হয় বরাক উপত্যকা সহ প্রতিবেশী ত্রিপুরা রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে। মুর্তা ক্রয় করার জন্য যে পুঁজির প্রয়োজন সেই পুঁজি নিম্ন-মধ্যবিত্তের পাটিকর সম্প্রদায়ের অধিকাংশ পরিবারের কাছে না থাকায় গ্রামীণ মহাজনদের কাছে থেকে চড়া সুদে তাদের টাকা ধার করতে হয়। অনেকে কাঁচামাল সংগ্রহ করতে মাইক্রো-ফিনান্স থেকেও ঋণ নিতে বাধ্য হন। পরবর্তীতে পাটি তৈরি করে তা বিক্রির পর যে অর্থ আসে, সেটা দিয়ে মহাজন বা মাইক্রো-ফিনান্সের ঋণ সুদে-মূলে মিটিয়ে দেওয়ার পর অবশিষ্ট প্রায় কিছুই তাদের হাতে থাকে না! তাই, দিনের পর দিন, বছরের পর বছর তাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থা সেই একই তিমিরে থেকে যায়।

জানা যায়, এই অসংগঠিত শিল্পকে সংগঠিত রূপ দেওয়ার উদ্দেশে কালীগঞ্জে ১৯৫৮ সালে 'কালীগঞ্জ পাটিকর সোসাইটি লিঃ' নামের এক সমবায় সমিতি গঠন করা হয়েছিল (Regd no. S-152 dated 10-03-1958)। শুরুতে মাত্র কুড়িজন অংশীদারের পুঁজি নিয়ে এই সমবায় সমিতি যাত্রা শুরু করেছিল। কিন্তু, বিগত অর্ধশতকের বেশি সময়ের যাত্রায় এই সমবায় সমিতি সঠিক অর্থে পাটিকর সম্প্রদায়ের এবং শীতলপাটি উৎপাদন ও বাজারজাতকরণের ক্ষেত্রে সঠিক অবদান রাখতে সমর্থ হতে পারেনি। সূচনালগ্নে সমিতির একটি অস্থায়ী কার্যালয় কালীগঞ্জ বাজারে থাকলেও আজকের দিনে সেটিও নেই। আজ তাই সভাপতি ও সম্পাদকের বাড়ি থেকেই সমিতির দৈনন্দিন কাজ পরিচালিত হচ্ছে। একথাটি সত্য যে, শীতলপাটি উৎপাদনের সঙ্গে জড়িত বৃহৎ সংখ্যক শিল্পীর প্রতি আজও সঠিক অর্থে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিতে পারেনি এই সমিতি।

কালীগঞ্জ বাজারে শীতলপাটির একটি বিশেষ হাট রয়েছে, যা মূলত মহাজনকেন্দ্রিক। সেখানে দর কষাকষির কোনও নিয়ম নেই। নিজেদের হাতে প্রস্তুত করা পণ্যের মূল্য নির্ধারণ করার সুযোগ নেই শিল্পীদের। পরম্পরাগতভাবে মহাজনেরা শিল্পের গুণমান বিচার করে শিল্পের মূল্য নির্ধারণ করেন এবং সেই নির্ধারিত মূল্যের বিনিময়ে শিল্পীরা তাদের হাতের তৈরি শিল্পকর্মটি হাতবদল করেন মাত্র। প্রতিবছর প্রায় পাঁচ কোটি টাকার শীতলপাটি ভারতের বিভিন্ন বাজারে রফতানি হয় বলে এক তথ্যসূত্রে জানা গেছে। কিন্তু, উৎপাদনের সঙ্গে জড়িত শিল্পীরা এই বিশাল অর্থরাশির এক নগণ্য অংশের ভাগিদার মাত্র।

উল্লেখ্য, বাংলাদেশের বালাগঞ্জ, পশ্চিমবঙ্গের কোচবিহারে পাটি তৈরি হয়। আমাদের বরাক উপত্যকার হাইলাকান্দি জেলার কাটাখাল অঞ্চলেও শীতলপাটির উৎপাদন হয়। কিন্তু, কালীগঞ্জের শিল্পীদের প্রস্তুত করা শীতলপাটি তুলনামূলকভাবে বেশি মসৃণ এবং কোমল। এর প্রধান কারণ, কাটাখালের শিল্পীরা মুর্তা থেকে যে বেত তৈরি করেন, সেই বেতের দৈর্ঘ্য খুবই কম। তাই, পাটি তৈরি করতে ঘন ঘন বেতের জোড়া দিতে হয়। সেই জোড়া বহুলাংশে অমসৃণ থাকে। অন্যদিকে, কালীগঞ্জের পাটিশিল্পীরা মুর্তা থেকে খুবই সরু এবং লম্বা বেত তৈরি করতে সক্ষম বলেই তাদের প্রস্তুত করা পাটিতে জোড়ার সংখ্যা অনেক কম এবং এই পাটি তুলনামূলকভাবে অনেক বেশি আরামদায়ক। তাই, কালীগঞ্জের শীতলপাটির কদরও অনেক বেশি।

আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হচ্ছে, মুর্তা থেকে বেত তৈরি করে এই শিল্পটির যাবতীয় উপকরণ প্রস্তুতকরণ ও আসল রূপমাধুর্য ফুটিয়ে তোলার সিংহভাগ দায়িত্ব পালন করে থাকেন পরিবারের মহিলারা। তাই, শীতলপাটি উৎপাদনে মহিলাদের গুরুত্ব খুবই বেশি। কালীগঞ্জ এলাকায় গাঁয়ের গৃহবধূ ও কিশোরীদের অন্যতম প্রধান কাজ শীতলপাটি বুনন। বলা আবশ্যক, অতীতে একটা সময় পাটি বুননের জ্ঞানকে বিবাহযোগ্য কন্যার বিশেষ যোগ্যতা হিসেবেও বিবেচনা করা হতো।

বলেশ্বর গ্রামের পাটিকরদের সঙ্গে আলোচনার মাধ্যমে জানা যায়, কালীগঞ্জের পাটিকরেরা আসামের বিভিন্ন জেলা, প্রতিবেশী রাজ্য ত্রিপুরা, নাগাল্যান্ড, মণিপুর, পশ্চিমবঙ্গ সহ অন্যান্য রাজ্যে শীতলপাটির জোগান দিয়ে থাকেন। তবে অনেক সময় অনেক বাধ্যবাধকতা এবং অসুবিধার জন্য বাজারের চাহিদা অনুসারে তাদের পক্ষে পাটি জোগান দেওয়া সম্ভবপর হয়ে ওঠে না। অনেকের মতে, শীতলপাটি তৈরির মূল উপাদান বেতি তৈরিতে অনেক পরিশ্রমের প্রয়োজন। পরিশ্রমের বিপরীতে বাজারদর ভাল না হওয়ায় দিন দিন একেবারে আগ্রহ হারিয়ে ফেলছেন পাটি তৈরির কারিগরেরা। আবার, বাজারে শীতলপাটির চাহিদা থাকলেও বিকল্প পণ্যের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় তা টিকছে না। পাটিকরদের ভাষ্য অনুসারে, বাজারে প্রায়

সবধরনের সামগ্রীর মূল্যবৃদ্ধি হলেও পাটির দাম বাড়ছে না। উপরন্তু, মুনাফাখোর মহাজন-নিয়ন্ত্রিত পাটি-বাজারে পাটির সঠিক মূল্য পাচ্ছেন না তারা। পাটিশিল্পের কাজ করে সংসার প্রতিপালন অসম্ভব হয়ে যাচ্ছে। পাটিকর সম্প্রদায়ের অধিকাংশকেই আজকের দিনে দরিদ্রসীমার নীচে থেকে জীবনযুদ্ধ চালিয়ে যেতে হচ্ছে। এই পরিস্থিতিগত কারণে, অনেক শিল্পী তাদের বংশানুপারম্পরিক শিল্পটি ছেড়ে বিকল্প পেশায় মনোনিবেশ করতে বাধ্য হচ্ছেন। অস্তিত্ব হারিয়ে ফেলছে সম্ভাবনাময় এই কুটিরশিল্পটি। কিন্তু মাত্র তিন দশক আগেও তাদের সবার মূল পেশা ছিল এই পাটিশিল্প। তাই, সবার আগে বাজার ব্যবস্থা ঠিক করতে হবে। পাটিকরদের প্রতি বাড়িয়ে দিতে হবে আর্থিক সহযোগিতা, সাব্যস্ত করতে হবে সঠিক বাজারদর এবং বিপণন পদ্ধতি।

ইদানীং, রাজ্য সরকার দক্ষতা বিকাশ নাম দিয়ে পৃথক বিভাগ স্থাপন করেছে। কিন্তু, এই সরকারি উদ্যোগের ঢেউ কালীগঞ্জের শীতলপাটি শিল্প পর্যন্ত পৌঁছয়নি। কালীগঞ্জের শীতলপাটির উৎপাদন ও বাজারজাতকরণের সঠিক পরিকল্পনা গ্রহণ, শিল্পীদের দক্ষতার বিকাশসাধন এবং এই শিল্পকে দেশজ শিল্প হিসেবে তুলে ধরতে সরকারকে এগিয়ে আসতে হবে। পাটিশিল্পীরা ঋণের বোঝায় ভারাক্রান্ত হয়ে আজ আশাহত, সরকারকে তাদের প্রতি আর্থিক সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিতে হবে। প্রয়োজনে নতুন করে একটি সমবায় সমিতি গঠনে উদ্যোগী হতে হবে সরকারকে, যে সমিতি শিল্পীদের সঙ্গে আলোচনার মাধ্যমে উৎপাদিত সামগ্রীর সঠিক বাজারদর নির্ধারণ করবে এবং এগুলোকে বাজারজাত করার দায়িত্বটুকু যথাযথভাবে পালন করবে। এই শিল্পের সঙ্গে যুক্ত পরিবারগুলোকে কাঁচামাল উৎপাদনের লক্ষ্যে সরকারি অব্যবহৃত খাস জলাভূমির পাট্টা প্রদান করতে হবে।

আধুনিকতার স্পর্শ আজও এই শিল্পটির ধরাছোঁয়ার বাইরে। যে নিপুণ কারিগরি দক্ষতায় শিল্পীরা পাটি তৈরি করেন তার বিকাশে সরকারকে এগিয়ে আসতে হবে, তাদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে। পাটি উৎপাদনে আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহারের পরিকল্পনা করতে হবে সরকারকে। আজকের নতুন প্রযুক্তির যুগে, সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা ছাড়া এই কুটিরশিল্পের পুনরুজ্জীবন সম্ভব নয়। সরকার আন্তরিকভাবে সহযোগিতায় এগিয়ে এলে এই শিল্পটি নিঃসন্দেহে এক স্বকীয় বিশ্বজনীন পরিচিতি লাভ করতে সক্ষম হবে এবং বরাক উপত্যকা-সহ পুরো রাজ্যের অর্থনৈতিক বুনিয়াদ গঠনে এক গুরুত্বপূর্ণ অবদানের স্বাক্ষর রাখতে সমর্থ হবে।

(আসাম সরকারের মিডিয়া ফেলোশিপপ্রাপ্ত দৈনিক নববার্তা প্রসঙ্গের বরিষ্ঠ সাংবাদিক বিভাস বর্ধন পরিচালিত ‘কালীগঞ্জের শীতলপাটি’ শীর্ষক প্রকল্পটির কাজ চলাকালীন বর্ধনের সঙ্গে ক্ষেত্র পরিদর্শনে সঙ্গী ছিলেন এই প্রতিবেদক। উদ্দেশ্য ছিল কালীগঞ্জ অঞ্চলের শীতলপাটি শিল্প, পাটিকরদের জীবনযাত্রা ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়ে বাস্তব ধারণা অর্জন। সেই অভিজ্ঞতার ভিত্তিতেই এই প্রতিবেদন। তথ্য সংগ্রহে সহযোগিতার জন্য বিভাস বর্ধনের প্রতি ঋণস্বীকার করেছেন প্রতিবেদক।)

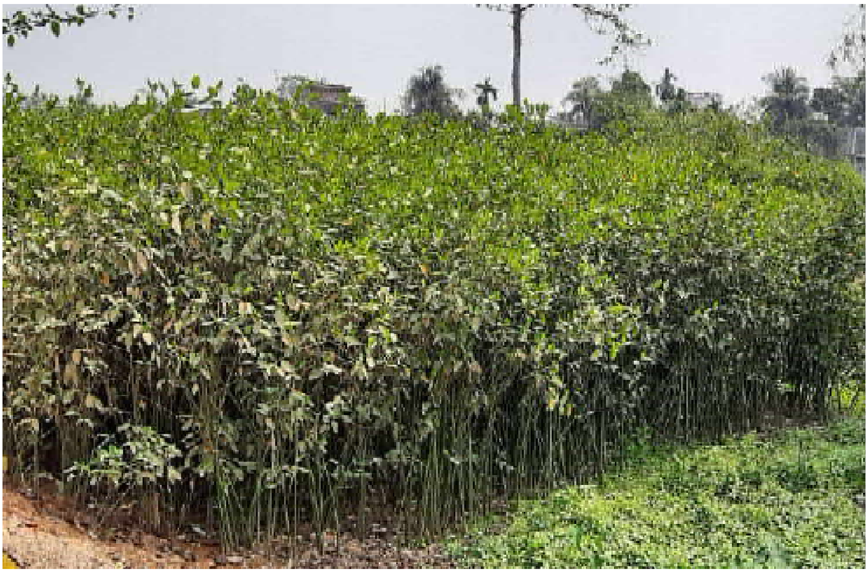

মুর্তা উৎপাদনের ক্ষেত।

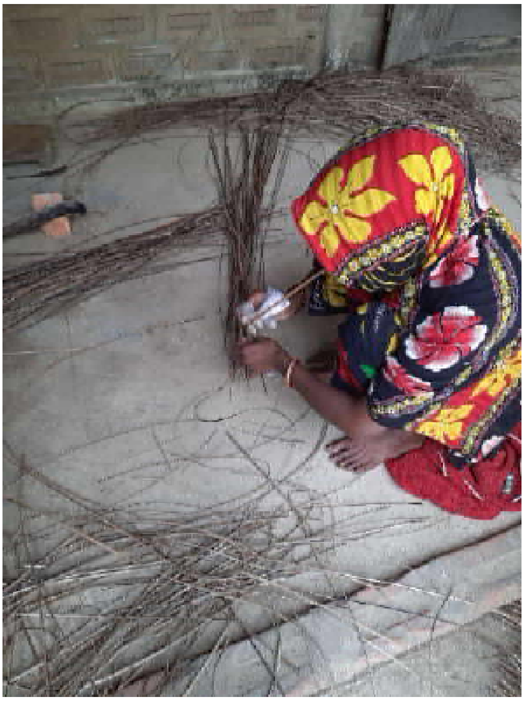

দাঁত দিতে মুর্তার বেতের ছাল ছিঁড়ছেন এক শিল্পী।

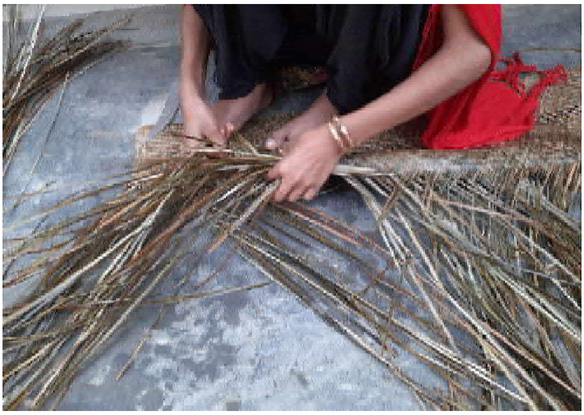

উঠোনের এককোণে বসে পাটি বুনছেন এক মহিলা (স্থান— বলেশ্বর, কালীগঞ্জ)

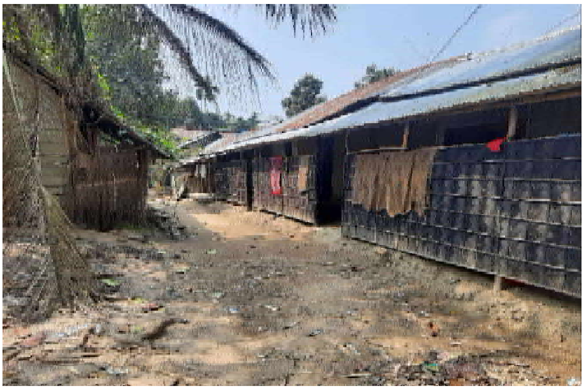

পাটিকর সম্প্রদায়ের বসতি (বলেশ্বর, কালীগঞ্জ)।

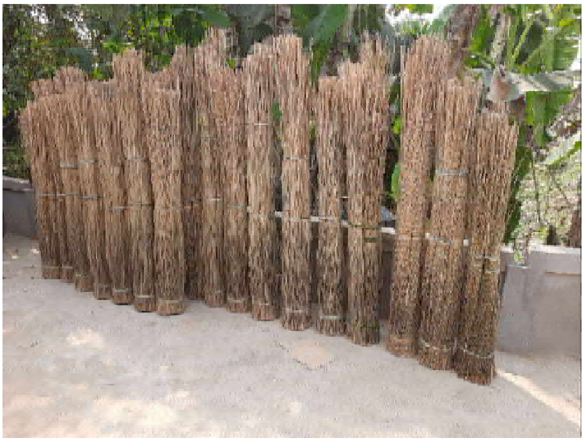

পাটি বুননের জন্য তৈরি করা মুর্তার বেতির আটি

কাছাড় চিনিকল :   একটি পর্যালোচনা

অরিজিৎ চৌধুরী

১৯৭১ সালের লোকসভা নির্বাচনের আগে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী শিলচরের পুলিশ প্যারেড গ্রাউন্ডে আয়োজিত এক বিশাল নির্বাচনী সভায় ভাষণ দেন। তারিখটা ছিল ৪ ফেব্রুয়ারি। ওই সভায় ইন্দিরা কাছাড়কে একটি অনুন্নত জেলা বলে উল্লেখ করে 'এখানে কাগজের কল ও চিনির কল স্থাপনের সরকারি সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন।' (সাপ্তাহিক যুগশক্তি, করিমগঞ্জ, ১২-০২-১৯৭১)। তখনকার মুখ্যমন্ত্রী মহেন্দ্রমোহন চৌধুরী সভায় ভাষণ দেওয়ার সময় বলেন, 'কিছুদিন আগে কাছাড় ভ্রমণকালে আমি আশ্বাস দিয়েছিলাম কাছাড়ের সমস্যাগুলি সম্পর্কে ওয়াকিবহাল করার জন্য প্রধানমন্ত্রীকে এখানে নিয়ে আসব। আমি সেই প্রতিশ্রুতি রক্ষা করতে পেরেছি। এখানে প্রধানমন্ত্রীকে অনুরোধ করব কাছাড়ের বহু সমস্যা সমাধানে আমাদের অক্ষমতা দূর করতে তিনি যেন সাহায্য করেন।' উল্লেখ্য, মহেন্দ্রমোহন চৌধুরী যখন মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন, তখন তিনি একাধিকবার অবিভক্ত কাছাড়ে এসেছেন এবং কাছাড়ের দুর্দশামোচনে প্রয়াসী হয়েছেন। তবে মহেন্দ্রমোহন মাত্র দেড় বছর মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন (১১ নভেম্বর, ১৯৭০ থেকে ৩০ জানুয়ারি, ১৯৭২)। কাছাড় সুগার মিলের শিলান্যাস তিনিই করেছিলেন।

কাছাড় জেলার করিমগঞ্জ মহকুমার (বর্তমান করিমগঞ্জ জেলার) দুল্লভছড়া (দুর্লভছড়া) এলাকায় পর্যাপ্ত আখ চাষের সদ্ব্যবহারের কথা চিন্তা করে সেখানে একটি চিনিকল স্থাপনের দাবি উঠেছিল। এর প্রেক্ষিতে তৎকালীন কংগ্রেস সরকার দুল্লভছড়ার কাছে ৫ বিঘা জমির ব্যবস্থা করে। এছাড়া নিকটবর্তী মোকামছড়ায় এই মিলের আবাসিক এলাকা নির্মাণ ও অন্যান্য প্রয়োজন পূরণের জন্য আরও ২০০ বিঘা জমির ব্যবস্থা করা হয়। ১৯৭১ সালের ২৯ ডিসেম্বর মুখ্যমন্ত্রী মহেন্দ্রমোহন চৌধুরী দুল্লভছড়ায় কাছাড় সুগার মিলের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। সেখানে এই উপলক্ষে আয়োজিত সভায় বিপুল জনসমাগম হয় এবং তুমুল উৎসাহ-উদ্দীপনা পরিলক্ষিত হয়। সভায় রাজ্যের শিল্পমন্ত্রী বিশ্বদেব শর্মা ও রাতাবাড়ির বিধায়ক বিশ্বনাথ উপাধ্যায়ও ভাষণ দেন। চিনিকলের শিলান্যাস ছাড়াও মুখ্যমন্ত্রী ওইদিন করিমগঞ্জ শহরের উপকণ্ঠে লঙ্গাই নদীর ওপর নির্মিত বহুপ্রতীক্ষিত সেতুরও উদ্বোধন করেন।

মহেন্দ্রমোহন চৌধুরী দুল্লভছড়ায় সুগার মিলের শিলান্যাস করলেও সেখানে কিন্তু মিলটি স্থাপন করা হলো না। রাজনীতির কুটিল আবর্তে পড়ে সেটি স্থানান্তরিত হলো রাতাবাড়ি এলাকার চরগোলায় (করিমগঞ্জ-শিলচর সড়কের চরগোলা নয়)। এটা চা-বাগান এলাকা ছিল এবং একজন হিন্দিভাষী মালিকের নিয়ন্ত্রণাধীন ছিল। সংক্ষেপে তখনকার রাজনীতির কথা কিছুটা না বললে বিষয়টা বোঝা যাবে না। ১৯৬৯-এ কংগ্রেস বিভাজনের পর ১৯৭১ সালের মার্চ মাসে লোকসভার অন্তর্বর্তীকালীন নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় এবং সেই নির্বাচনে প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর নেতৃত্বাধীন কংগ্রেস-আর (যাকে তখন নব কংগ্রেস বা শাসক কংগ্রেস বলা হতো) বিপুল সংখ্যাধিক্য লাভ করে। মোরারজি দেশাই, কে কামরাজ প্রমুখ বর্ষীয়ান কংগ্রেসির

নেতৃত্বাধীন কংগ্রেস-ও (যা তখন আদি কংগ্রেস নামে পরিচিত ছিল) এবং অন্যান্য বিরোধী দল খুব কম আসন পায়। নব কংগ্রেসের সভাপতি ছিলেন বাবু জগজীবন রাম এবং এস নিজলিঙ্গাপ্পা ছিলেন আদি কংগ্রেসের সভাপতি। মহেন্দ্রমোহন চৌধুরী নিজেও ছিলেন প্রবীণ কংগ্রেস নেতা এবং আদি কংগ্রেসের সঙ্গে স্বভাবতই একসময় তাঁর কিছুটা ঘনিষ্ঠতা ছিল। ইন্দিরা গান্ধী সেই কারণে আসাম কংগ্রেসে মহেন্দ্রমোহন চৌধুরীর বিরোধী গোষ্ঠীকে মদত দেওয়া শ্রেয় বলে মনে করলেন। চৌধুরী-বিরোধী গোষ্ঠী অর্থাৎ দেবকান্ত বরুয়া (তিনি ১৯৭৫-৭৭ সময়কালে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতি ছিলেন), শরৎচন্দ্র সিংহ, মইনলু হক চৌধুরী প্রমুখ। এঁরা স্বাধীনতা সংগ্রামী মহেন্দ্রমোহন চৌধুরী, বিজয়চন্দ্র ভাগবতীদের বিরোধী ছিলেন। মইনুল হক চৌধুরী তখন কাছাড় জেলার সোনাই আসনের বিধায়ক ছিলেন। ১৯৬৭ সালে বিমলাপ্রসাদ চলিহা তাঁকে মন্ত্রিসভায় নেননি । কিন্তু ১৯৭১-র লোকসভা নির্বাচনে তিনি ধুবড়ি আসনে কংগ্রেসের মনোনয়ন পান এবং বিজয়ী হন। ১৯৭১ সালের ১৮ মার্চ ইন্দিরা গান্ধীর নেতৃত্বাধীন কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা শপথ নেয়। ইন্দিরা গান্ধী মইনুল হক চৌধুরীকে ওই মন্ত্রিসভায় অন্তর্ভুক্ত করেন এবং শিল্পোন্নয়ন দফতরের দায়িত্ব দেন। (খুব বেশিদিন অবশ্য তিনি কেন্দ্রীয় মন্ত্রী থাকতে পারেননি। বিভিন্ন অভিযোগের প্রেক্ষিতে ষোল মাস পরে ১৯৭২ সালের ২১ জুলাই তাঁকে মন্ত্রিসভা থেকে ইস্তফা দিতে হয়।) কেন্দ্রে গুরুত্বপূর্ণ দফতরের ক্যাবিনেট মন্ত্রী হওয়ার পর প্রাক্তন মুসলিম লিগ নেতা মইনুল হক চৌধুরী আসামে কংগ্রেসে খুবই প্রতিপত্তিশালী হয়ে ওঠেন। ক্ষুদ্র রাজনৈতিক স্বার্থ পরিহার করে অবিভক্ত কাছাড় ও অন্যান্য অনগ্রসর এলাকার উন্নয়নকল্পে তিনি প্রয়াসী হবেন, এটাই প্রত্যাশিত ছিল। কিন্তু দেখা গেল নানা ইস্যুতে তিনি আসামে মহেন্দ্র চৌধুরী সরকারের কঠোর সমালোচনা করতেই বেশি উৎসাহী। একই দলের সরকার কেন্দ্রে ও রাজ্যে, অথচ দেখা যেত একজন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী প্রকাশ্য জনসভায় রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে অভিযোগ করতেই বেশি ব্যস্ত। অবস্থা এমন পর্যায়ে গিয়ে দাঁড়ায় যে, ১৯৭১ সালের জুলাই মাসে আসাম সরকারকে ৪০ পৃষ্ঠার প্রেসনোট প্রকাশ করে হক চৌধুরীর অভিযোগগুলো খণ্ডন করতে হয়। প্রেসনোটে প্রস্তাবিত চিনিকল, কাগজকল, ফল সংরক্ষণ কারখানা, বরাক ডাম ও আঞ্চলিক ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ সম্পর্কে আসাম সরকারের বক্তব্য প্রকাশিত হয় (যুগশক্তি, ২৩-০৭-১৯৭১)। আমরা এখানে শুধু চিনিকল বা সুগার মিলের কথাই উল্লেখ করব। প্রেসনোটে বলা হয়েছে (ভাষা ও বানান অপরিবর্তিত), ‘ভারত সরকারের শিল্পোন্নয়ন ও আভ্যন্তরীণ বাণিজ্য বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী শ্রী মইনুল হক চৌধুরী কর্তৃক কাছাড়ের চিনির কল, ফল সংরক্ষণ কেন্দ্র, কাগজের কল, বরাক ড্যাম ইত্যাদি স্থাপন সম্পর্কে গত মে মাসের প্রথম সপ্তাহে শিলচর, সোনাই ও হাইলাকান্দিতে প্রদত্ত বক্তৃতাবলীতে রাজ্য সরকারের প্রতি যে সব অভিযোগ করা হইয়াছে, তৎপ্রতি আসাম সরকারের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছে। মইনুল হক চৌধুরী সোনাইতে প্রদত্ত তাঁহার বক্তৃতায় বলিয়াছেন যে তিনি শিল্পে অনগ্রসর হিসাবে যে দুইশতটি জেলার নাম ঘোষণা করিয়াছেন, কাছাড় জেলাও তার মধ্যে আছে এবং সেই অনসুারে কাছাড়ে চিনির কল স্থাপনের জন্য তিনি প্রথম আদেশ দিয়াছেন। শিলচরে প্রদত্ত শ্রী মইনুল হক চৌধুরীর এতদসম্পর্কিত বক্তৃতার একাংশ নিম্নরূপ :

‘আমি সুনিশ্চিতভাবে আপনাদিগকে বলিতেছি যে আমি সমবায় সমিতি ছাড়াও ব্যক্তি বিশেষকে লাইসেন্স দেওয়ার নিয়ম সংশোধন করিব। ফলে কেন্দ্রীয় সরকারের অর্থানুকুল্যে কাছাড়ে চিনির কল স্থাপিত হইবে। এখন কথা হইতেছে যদিও চিনির কল প্রতিষ্ঠিত হইবে, তথাপি আপনাদের এখন হইতেই আন্দোলন আরম্ভ করিতে হইবে যাতে স্থানীয় (কাছাড়ের) যুবকেরা চাকুরী পায়। আসাম সরকার কেন্দ্রের নিকট হইতে টাকা নিয়া কল প্রতিষ্ঠা করিবেন এবং কর্মীদেরও তাঁরা নিয়োগ করিবেন। যদি অফিস শিলং কিংবা গৌহাটিতে

থাকে তাহা হইলে আপনারা চাকুরী পাইবেন না। বন্ধুগণ বিশ্বাস করুন যদি আপনারা চাকুরী পান তবে সেগুলি হইবে বস্তা ও কুশিয়ার বহন করিবার এবং কল পরিষ্কার করার কাজ। আপনারা বড় চাকুরী পাইবেন না; কারণ সে জন্য দরকার প্রশিক্ষণের। এখন হইতেই আপনারা কেন্দ্রস্থলের জন্য দাবী জানান যে ভাবে গোয়ালপাড়াবাসী কাগজের মিলের জন্য দাবী জানাইতেছেন। আমি এর বেশী আর বলিতে পারি না।

উপরোক্ত বক্তৃতাবলীর মধ্যে অন্তঃসারশূন্যতা ছাড়াও তথ্যের সঙ্গে সামঞ্জস্য নাই। —আসাম সরকারের ১৯৭০ সালের ২০শে মে তারিখের চিঠির সুপারিশ অনুযায়ী পরিকল্পনা কমিশন কর্তৃক জেলাগুলিকে শিল্পে অনগ্রসর হিসাবে ঘোষণা করা হইয়াছে। শ্রীহক চৌধুরী মন্ত্রী হওয়ার বহু আগেই আসাম সরকার রাজ্যের মূলধন দ্বারা সরকারী উদ্যোগে চিনির কল স্থাপনের সিদ্ধান্ত নিয়াছেন। যতদূর জানা যায়, ভারত সরকার কেন্দ্রীয় উদ্যোগে কাছাড়ে কোনও চিনির কল প্রতিষ্ঠা করিবেন না।’

এই প্রেসনোট থেকে জানা যায়, এর আগে যখন দেখা গেল ব্যক্তিগত মালিকানায় বা সমবায়ের ভিত্তিতে কাছাড়ে চিনির কল স্থাপন সম্ভব হচ্ছে না, তখন আসাম সরকার নিজেদের উদ্যোগে চিনির কল স্থাপনের প্রস্তাব দাখিল করে। মইনলু হক চৌধুরী তখন মন্ত্রী ছিলেন না। তৎকালীন রাজস্বমন্ত্রী মহেন্দ্রমোহন চৌধুরী সুগার মিলের বিষয়টি নিয়ে তখনকার কেন্দ্রীয় খাদ্য ও কৃষিমন্ত্রী জগজীবন রামের সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে আলোচনা করেন এবং এই আলোচনার সূত্র ধরে তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী (প্রয়াত) বিমলাপ্রসাদ চলিহা ১৯৭০ সালের ২৬ জুন জগজীবন রামের কাছে একটি চিঠি লেখেন। ওই চিঠিতে বলা হয়, কেন্দ্রীয় কৃষিমন্ত্রী যদি চিনি কলের লাইসেন্স দানে রাজি হন, তাহলে তাঁরা (আসাম সরকার) আসাম ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশনের (এআইডিসি) মাধ্যমে কেন্দ্রের কাছে আনুষ্ঠানিকভাবে দরখাস্ত পেশ করবেন। এছাড়াও প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী ১৯৭০ সালের ২ অক্টোবর যখন আসাম সফরে আসেন, তখন রাজ্য সরকার তাঁকে একটি স্মারকলিপি দেয়। ওই স্মারকলিপিতেও প্রধানমন্ত্রীকে বিশেষভাবে অনুরোধ করা হয়, কাছাড়ে অর্থনৈতিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত করার জন্য তিনি যেন অবিলম্বে এই চিনি কলের লাইসেন্স প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। এসব মইনুল হক কেন্দ্রীয় মন্ত্রী হওয়ার অনেক আগের ব্যাপার। কেন্দ্রীয় কৃষিমন্ত্রী (তখন ফকরুদ্দিন আলি আহমদ) মধ্যবর্তী নির্বাচনের আগে বিষয়টি আন্তরিকতার সঙ্গে বিবেচনা করেছিলেন এবং তাঁরই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী শ্রী হক চৌধুরীর হস্তক্ষেপের সুযোগ ঘটার আগেই ‘কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক ১৯৭১ সালের মার্চ মাসে দৃঢ় সংকল্পজনিত পত্র জারি করা হয়।’ ওই প্রেসনোটে আরও বলা হয়, এটা অত্যন্ত দুঃখের বিষয় শ্রী হক চৌধুরী রাজ্য সরকার কর্তৃক কাছাড়ে চিনির কল স্থাপনের প্রচেষ্টার প্রশংসার পরিবর্তে নিজে কৃতিত্ব নিতে চাইছেন এবং ‘তথ্যের বিরূপ পরিবেশন দ্বারা রাজ্য সরকারের দুর্নাম’ করতে প্রয়াসী হয়েছেন ও কাছাড়ের বেকার ব্যক্তিদের রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করতে পর্যন্ত সচেষ্ট হয়েছেন। অথচ আসাম সরকার স্থানীয় যুবকদের প্রশিক্ষণের জন্য আগেই একটি পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে যাতে তাঁরা অধিকতর দায়িত্বশীল কাজে নিয়োজিত হতে পারেন। প্রেসনোটে জানানো হয়, আসাম সরকার দুর্লভছড়ার কাছে চিনিকলের জন্য জমি নিয়েছে এবং যন্ত্রপাতির জন্য টেন্ডার ইত্যাদি পাওয়া গিয়েছে। এ-ও বলা হয়, শীঘ্রই এই সুগার মিলের শিলান্যাস করা হবে। প্রেসনোটের কোনও উত্তর মইনুল হক চৌধুরী দিতে পারেননি।

এর মাস ছয়েক পর ইন্দিরা গান্ধী আচমকা মহেন্দ্রমোহন চৌধুরীকে মুখ্যমন্ত্রী পদ থেকে সরিয়ে দেন এবং শরৎচন্দ্র সিংহকে এই পদে বসিয়ে দেন। শরৎ সিংহ তখন বিধায়কও ছিলেন না। এটা মইনুল হক-শরৎ সিংহ গোষ্ঠীর বিরাট জয় হিসেবে প্রতিভাত হলো। এর মাসখানেক পর ১৯৭২ সালের মার্চ মাসে আসামে বিধানসভা নির্বাচন হয়। অবিভক্ত কাছাড়ে ৭ ও ১১ মার্চ দু’টি পর্বে ভোট নেওয়া হয়। নির্বাচনে কাছাড়ে যাঁরা

কংগ্রেসের মনোনয়ন পেলেন, তাঁদের মধ্যে অনেকেই ছিলেন মইনুল হক চৌধুরীর আশীর্বাদধন্য। কাছাড়ের ১৪টি আসনেই কংগ্রেস বিজয়ী হলো। আসামে কংগ্রেস বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়ে মন্ত্রিসভা গঠন করল। শরৎচন্দ্র সিংহই মুখ্যমন্ত্রী হলেন। দুল্লভছড়া ও চরগোলা দুটো জায়গাই রাতাবাড়ি বিধানসভা নির্বাচন কেন্দ্রের অন্তর্গত। রাতাবাড়িরও বিধায়ক বদল হলো। দুল্লভছড়া ধর্মীয় সংখ্যাগরিষ্ঠ অধ্যুষিত এলাকা ছিল এবং চরগোলা হচ্ছে ধর্মীয় সংখ্যালঘু অধ্যুষিত এলাকা। মইনুল হক চৌধুরী ও তাঁর অনুগামীরা চিনি কলটি চরগোলায় নিয়ে আসার জন্য সচেষ্ট হলেন, যদিও আগের মুখ্যমন্ত্রী দুল্লভছড়ায় এর শিলান্যাস করেছিলেন। উল্লেখ্য, বিশেষজ্ঞরা বিভিন্ন দিক বিচার-বিবেচনার পরই দুল্লভছড়াকে চিনিকল স্থাপনের উপযুক্ত স্থান বলে নির্বাচন করেছিলেন। কিন্তু রাজনৈতিক ক্ষমতার অপপ্রয়োগের কাছে সব যুক্তি, রীতি নীতি, সৌজন্য সবকিছুই নস্যাৎ হয়ে যায়।

দুল্লভছড়া সুগার মিল ডিমান্ড কমিটি ১৯৭২ সালের ১২ মে রাতাবাড়ির বিভিন্ন নেতৃবর্গের উপস্থিতিতে এক সভার আয়োজন করে। সভায় যে স্থানে শিলান্যাস করা হয়েছে, সেই স্থানেই মিল স্থাপনের অনুকূলে মতপ্রকাশ করা হয়। ওই সময় করিমগঞ্জ মহকুমা থেকে কয়েকজন শিলং গিয়ে রাজ্যের শিল্পমন্ত্রী মোহাম্মদ ইদ্রিসের সঙ্গে দেখা করে এ নিয়ে কথা বলেন। শিলঙের নবভারত পত্রিকা জানায়, শিল্পমন্ত্রী এক্সপার্ট কমিটিকে নির্দেশ দেন যে তাঁরা যেন তদন্ত করে দেখেন কেন চিনিকলের স্থান দুল্লভছড়া থেকে সরানোর কথা উঠছে। কিন্তু এসবে কোনও লাভ হয়নি। রাজ্য সরকার ন্যায়-নীতি বিসর্জন দিয়ে কিছুদিনের মধ্যেই চরগোলাতেই সুগার মিল নির্মাণের কাজ শুরু করে। পরবর্তীকালে অনেকেই এই মত পোষণ করেছেন, দুল্লভছড়ায় যদি মিল স্থাপন করা হতো, তা হলে হয়তো চিনিকলটির এই দশা হতো না।

চরগোলায় কাছাড় সুগার মিলের উদ্বোধন হয় ১৯৭৭ সালের ৭ মার্চ। মুখ্যমন্ত্রী শরৎচন্দ্র সিংহ মিলটির উদ্বোধন করেন। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বনমন্ত্রী ডাঃ লুৎফুর রহমান। আসাম শিল্পোন্নয়ন নিগমের (এআইডিসি) পরিচালক মণ্ডলীর সভাপতি প্রফুল্লচন্দ্র বরুয়াও এতে ভাষণ দেন। এআইডিসি-র ম্যানেজিং ডিরেক্টর ডিএন বরুয়া তাঁর ভাষণে মিল-সম্পর্কিত নানা তথ্য তুলে ধরেন। তখন মিলে ৩৫০ জন কর্মী নিয়ে কাজ শুরু হয়ে ছিল। মিলের আখ নিংড়ানোর ক্ষমতা দৈনিক ১২৫০ মেট্রিক টন। ৬ কোটি ৪০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে নির্মিত এই মিল সম্পর্ণূভাবে চালু হবার পর প্রত্যক্ষভাবে ৬০০ জন কর্মচারী এবং পরোক্ষভাবে ২০ হাজার আখচাষি কর্ম সংস্থানের সুযোগ পাবেন বলে আশা করা হয়। কাছাড় সুগার মিল সম্পর্কে কোনও সরকারি নির্ভরযোগ্য তথ্যভাণ্ডার পাওয়া দুষ্কর। বিশেষ করে, আমার মতো যাঁরা এখন আসামের বাইরে থাকেন, তাঁদের পক্ষে। অতীতে যখন আসামে চাকরিরত ছিলাম, তখনও দেখেছি রাজ্যে যে-সব রাজনীতিক বা আমলার হাতে ক্ষমতার চাবিকাঠি, তাঁরা সুগার মিল-সংক্রান্ত তথ্যের কথা উঠলেই এমন ভাব করতেন যেন (অবিভক্ত) কাছাড়ের মতো জায়গায় মিলটি স্থাপন করাই ভুল ছিল। উল্লেখ্য, উত্তর-পূর্বাঞ্চলের চারটি (আসামের নগাঁও জেলার কামপুর, গোলাঘাটের নিকটবর্তী বরুয়াবামুনগাঁও ও করিমগঞ্জের নিকটবর্তী চরগোলার সুগার মিল এবং নাগাল্যান্ডের একটি সুগার মিল) চিনিকলই বন্ধ হয়ে গিয়েছে। মিল পরিচালনার ক্ষেত্রে অপেশাদারি ও দীর্ঘসূত্রী মনোভাবই এর প্রধান কারণ বলে মনে করা হয়।

কাছাড় চিনিকল চালু হওয়ার পর কয়েক বছর নিয়মিত আখ মাড়াই বা ক্রাশিং হয়েছে। এই মিলে একসময় বিভিন্ন স্তরে চাকরি করেছেন, এমন কিছু ব্যক্তির সঙ্গে আমি সম্প্রতি কথা বলি। এঁদের মধ্যে ওই মিলের কর্মচারী ইউনিয়নের নেতাও আছেন। এই চিনিকলের ব্যাপারে মতামত সবক্ষেত্রে অভিন্ন নয়, তবে এ ব্যাপারে তাঁরা একমত যে, দক্ষ পরিচালকের হাতে পড়লে মিলটির অকাল মৃত্যু হতো না। এই প্রসঙ্গে কেউ

কেউ আইএএস অফিসার সুরজিৎ মিত্রের কথা উল্লেখ করেন। ১৯৮৫ সালে অসম গণ পরিষদ (অগপ) যখন ক্ষমতায় আসে, তখন তাঁকে কাছাড় চিনিকলের ম্যানেজিং ডিরেক্টর (এমডি) করে পাঠানো হয়। সুরজিৎবাবু তখন যথেষ্ট সিনিয়র। এই পদে তাঁর আসারই কথা নয়। নতুন সরকারের পছন্দের তালিকায় না থাকায় তাঁকে এই পোস্টিং দেওয়া হয়। তিনি অবশ্য চিনিকলে ন্যূনতম সময় কাটিয়েই দিল্লি চলে যান। তবে তিনি কর্মীদের বলেছিলেন, 'আমি যদি এখানে থাকি, তা হলে মিল চলবে। আপনারা মাইনেও পাবেন। আপনাদের মাইনে ইত্যাদির যে টাকা দিশপুরে আটকে আছে, আমি সেটা কয়েকদিনের মধ্যে রিলিজ করিয়ে দেব।' তিনি সেটা দিল্লি যাওয়ার পথে করিয়েও দিয়েছিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত, তিনি আর কাছাড় সুগার মিলে ফেরেননি। এই মিলে যাঁরা এমডি ছিলেন, তাঁদের মধ্যে রয়েছেন পিকে শর্মা, সিআর দে, জ্যোতির্ময় চক্রবর্তী, পূর্ণেন্দু সেন। করিমগঞ্জের অতিরিক্ত জেলাশাসকরাও কখনও কখনও দায়িত্বে থেকেছেন (যেমন, এমএ মজমুদার, শ্রীকান্ত চক্রবর্তী)। আশির দশকে চেয়ারম্যান হিসেবে ছিলেন মন্ত্রী আব্দুল মুক্তাদির চৌধুরী, বিধায়ক মওলানা আব্দুল জলিল চৌধুরী, মন্ত্রী শহিদুল আলম চৌধুরী।

এই সুগার মিলের তৎকালীন কর্মীদের অনেকেই জানান যে, আশির দশকের প্রথমে একবার মিলে সবচেয়ে বেশি ক্রাশিং হয়েছিল। তখন 'প্রফিট' হয়েছিল বলেও তাঁরা দাবি করেন। কিন্তু পরবর্তীকালে সরকারি গাফিলতির দরুণ এই ধারা অব্যাহত রাখা যায়নি। ভারতের কন্ট্রোলার অ্যান্ড অডিটর জেনারেল তাঁদের ১৯৮০-৮১ সালের রিপোর্টে কাছাড় সুগার মিলের আখ মাড়াই সম্পর্কে কিছু তথ্য সন্নিবিষ্ট করেছেন (যুগশক্তি : ২৮-১০-১৯৮৪)। ওই প্রতিবেদনে দেখা যায়, ১৯৭৬-৭৭ সালে মিলে দৈনিক আখ মাড়াইয়ের লক্ষ্যমাত্রা ছিল ১০০০ মেট্রিক টন। ২৪ দিনে মাড়াই হয়েছে ৬৬১ মেট্রিক টন। ১৯৭৭-৭৮ সালে ৩৪ দিনে মাড়াই হয়েছে ৬ হাজার ৩৩৪ মেট্রিক টন আখ। ১৯৭৮-৭৯ সালে লক্ষ্যমাত্রা ছিল দৈনিক ১১০০ মেট্রিক টন। ৬০ দিনে মাড়াই হয়েছে ২৪ হাজার ২২৫ মেট্রিক টন আখ। ১৯৭৯-৮০ সালে দৈনিক লক্ষ্যমাত্রা ছিল ১২৫০ মেট্রিক টন আর ৮৩ দিনে মাড়াই হয়েছে ২০ হাজার ৩০ মেট্রিক টন আখ। ১৯৮০-৮১ সালে দৈনিক লক্ষ্যমাত্রা একই ছিল। ওই বছর ১১০ দিনে ২১ হাজার ৭ মেট্রিক টন আখ মাড়াই করা হয়। — ওই পত্রিকার সংবাদে বলা হয়েছে, ১৯৮১-৮২ সালে ৫৩ হাজার মেট্রিক টন এবং ১৯৮২-৮৩ সালে ৪৭ হাজার মেট্রিক টন আখ মাড়াই করা হয়। ১৯৮৩-৮৪ সালে অর্থাভাবে আখ মাড়াই করা যায়নি। ১৯৮৪ সালের ১১ এপ্রিল করিমগঞ্জ মহকুমা পরিষদের মুখ্য প্রশাসক মাধবেন্দ্র দত্তচৌধুরী কাছাড় সুগার মিলের অচলাবস্থা নিয়ে আলোচনার জন্য আখ উৎপাদক সংস্থা, কর্মচারী ইউনিয়ন, ব্যাঙ্ক, জেলা প্রশাসন, মিল কর্তৃপক্ষ, সমবায় বিভাগ এবং বিভিন্ন শ্রেণির জনপ্রতিনিধি ও বিশিষ্ট নাগরিকদের এক সভা আহ্বান করেন।

ওই সভায় সুগার মিলের এমডি পূর্ণেন্দু সেন তাঁর বক্তৃতায় স্পষ্টভাষায় বলেন, 'আর্থিক অসচ্ছলতার জন্যই মিলে এ বছর ক্রাশিং শুরু করা যায়নি। ১৯৮২-৮৩ সালের জন্য প্রদত্ত অর্থও অনেক দেরিতে মঞ্জুর করা হয়। তা-ও প্রয়োজনীয় অর্থ পাওয়া যায়নি।' পূর্ণেন্দু সেন অবসরপ্রাপ্ত আইএএস (নমিনেটেড) অফিসার ছিলেন। সর্বজনশ্রদ্ধেয় পূর্ণেন্দুবাবু গ্রামোন্নয়ন বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত আধিকারিক অমলেন্দু শ্যামকে সঙ্গে নিয়ে চেষ্টা করেছিলেন কাছাড় চিনিকলটিকে সচল করার, কিন্তু ব্যর্থ মনোরথ হন। তিনি কিছুদিন পর এই চিনিকলের লোকসানের একটা হিসেব প্রকাশ করেছিলেন। হিসেবটা এরকম, ১৯৭৭-৭৮ সালে ১ কোটি ৯৯ লক্ষ টাকা, ১৯৭৮-৭৯-সালে ১ কোটি ৪৮ লক্ষ, ১৯৭৯-৮০ সালে ১ কোটি ২৩ লক্ষ, ১৯৮০-৮১ সালে ১ কোটি ১০ লক্ষ, ১৯৮১-৮২ সালে ১ কোটি ১৯ লক্ষ, ১৯৮২-৮৩ সালে ১ কোটি ১৭ লক্ষ টাকা। তবে এই লোকসানের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে বিভিন্ন অর্থলগ্নি সংস্থা থেকে প্রাপ্ত ঋণের সুদ ও বার্ষিক কিস্তির

অর্থ যার পরিমাণ দাঁড়ায় গড়ে বছরে ৬৮ লক্ষ টাকা। (যুগশক্তি : ৮-৭-১৯৮৪)।

১৯৮৪-৮৫ সালে আখ মাড়াই করার জন্য প্রস্তুতি নেওয়া হয়। ১৯৮৪ সালের পয়লা ডিসেম্বর আখ মাড়াই কর্মসূচির উদ্বোধন করেন রাজ্যের শিল্প প্রতিমন্ত্রী (দক্ষিণ করিমগঞ্জের বিধায়ক) আব্দুল মুক্তাদির চৌধুরী। কিন্তু ক্রাশিং সেদিন শুরু হলো না টার্বাইনে গোলযোগ থাকায়।

পরে অবশ্য চিনি উৎপাদন শুরু হয়। ডিসেম্বর, জানুয়ারি— এই দু'মাসে ৭ হাজার ৭০০ মেট্রিক টন আখ মাড়াই করা হয়, যা লক্ষ্যমাত্রা ৩০ হাজার মেট্রিক টনের প্রায় ২৫ শতাংশ। শীর্ষস্তরে ঔদাসীন্য ও সঠিক পরিকল্পনার অভাবেই ক্রাশিং পুরোমাত্রায় হয়নি। এরপর থেকেই শুরু হয় সুগার মিলের চরম আর্থিক দৈন্যদশা। কর্মচারীদের বেতন বন্ধ, আখচাষিদের পেমেন্ট বন্ধ, মিলে কোনও স্থায়ী প্রশাসক নেই, এমডি-সহ অনেক গুরুত্বপূর্ণ পদ শূন্য। অবস্থা এমন পর্যায়ে পৌঁছয় যে, এপ্রিল মাসে করিমগঞ্জ রেডক্রস সুগার মিলে ত্রাণসামগ্রী পাঠাতে শুরু করে। করিমগঞ্জ মহকুমা পরিষদ তিন কুইন্টাল চাল বণ্টন করে। ১৯৮৫ সালের ২৮ জুলাই যুগশক্তি পত্রিকায় 'সুগার মিলের নাভিশ্বাস: কে দায়ী' শীর্ষক একটি নিবন্ধ বেরোয়। লেখক সৌগত সেন (সুজিৎ চৌধুরীর ছদ্মনাম)। এই নিবন্ধ থেকে জানা যায়, ওই সময় কাছাড় চিনিকলের তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণির কর্মচারীদের এক প্রতিনিধিদল মুখ্যমন্ত্রী হিতেশ্বর শইকিয়ার সঙ্গে দেখা করেন। কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী নাকি তাঁদের বলেন যে, মিলের কর্মচারীরা দুর্নীতিপরায়ণ বলেই মিলের এত ক্ষতি হচ্ছে। ওই নিবন্ধে বলা হয়েছে, দেখা যাচ্ছে মিলের ক্ষতির জন্য কে বা কারা দায়ী সে সিদ্ধান্তটা মুখ্যমন্ত্রী অতি অনায়াসেই নিয়ে ফেলেছেন। অথচ সত্যিকার দায়িত্বটা কার, তা বের করার জন্য মুখ্যমন্ত্রীকে বিশেষ পরিশ্রম করতে হতো না, রাজ্য সরকার নিজেদের উদ্যোগেই কাছাড় সুগার মিলের ব্যাপারে দুটো বিশিষ্ট সংস্থাকে দিয়ে যে তদন্ত করিয়েছিলেন, তার মধ্যেই জবাবটা পেয়ে যেতেন। রাজ্য সরকার ন্যাশনাল ফেডারেশন অব কো-অপারেটিভ সুগার ফ্যাক্টরিজ লিমিটেড নামক সর্বভারতীয় একটি সংস্থাকে দিয়ে তদন্ত করিয়েছিলেন কাছাড় সুগার মিলের পরিস্থিতি সম্পর্কে। —তাদের রিপোর্টে বলা হয়েছে, 'The overrun in the project of 233.47 lakhs was exclusively met by raising additional interest bearing loan capital. This has totally distorted the project financing pattern i.e. equity/debt ratio which has changed from 40-60 to 26-74 having an adverse impact on the financial viability of the project since commissioning of the plant. This has also been one of the causes of aggravating financial sickness of the company due to heavy burden of interest in loan capital.' —এই অবস্থাটা কারা তৈরি করল? নিশ্চয়ই তৃতীয় বা চতুর্থ শ্রেণির কর্মচারীরা নয়। করেছেন আসাম ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডেভেলাপমেন্ট কর্পোরেশন, রাজ্য সরকারের ইন্ডাস্ট্রি বিভাগ এবং অন্যান্য কর্তাব্যক্তিরা। — জন্মলগ্নেই সুগার মিলের ভবিষ্যতকে যাঁরা মৃত্যুর দরজায় বন্ধক রেখেছিলেন, তাঁরাই আজ দিব্যি সাধু সেজে বক্তৃতা ঝাড়ছেন, আর দায়িত্ব এসে পড়ছে তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণির কর্মচারীদের ওপর। একেই বলে 'তুমি মহারাজ সাধু হলে আজ, আমি আজ চোর বটে!' রাজ্য সরকার খুব বড়গলায় বলছে যে সুগার মিলের জন্য বিভিন্ন সময়ে তারা বহু টাকা বরাদ্দ করেছে। করেছে সত্যিই, কিন্তু সে বরাদ্দ করা হয়েছে প্রয়োজনের সময়ে নয়, প্রয়োজন ফুরিয়ে যাওয়ার বহু পরে। সে টাকাটা তাই মিলের কাজে আসেনি। এই সংবাদ সংগ্রহের জন্য মুখ্যমন্ত্রীকে খুব বেশিদূরে যেতে হতো না, তাঁর নিজেরই প্রতিষ্ঠান, রাজ্য সরকারের Evaluation and monitoring division-র রিপোর্টটির ওপর চোখ বোলালেই ব্যাপারটা তিনি বুঝতে পারবেন। ইক্ষুচাষীদের ঋণদানের ব্যাপারটা এঁরা অনুসন্ধান করেছিলেন। তাঁরা রিপোর্ট দিয়েছেন, 'not a single sample beneficiary received assistance at the

time of sugarcane cultivation, that is, during January to March, when usually plantation is started. It was observed that in 1980-81, such assistance was provided to growers in the last part of May–and out of 50 sample beneficiaries, 30 were provided with loan during the month of August in 1980-81. In 1981-82, only 12(24%) sample beneficiaries were able to get loan.The rest of the samples were not willing to take loan because it was not given in time.' উল্লেখ্য, ন্যাশনাল ফেডারেশনের রিপোর্টের জন্য রাজ্য সরকার নাকি ৫৫ হাজার টাকা খরচ করেছিল। কিন্তু রিপোর্টটি কেউ পড়ে দেখেছেন বলে মনে হয় না। কারণ, মিলকে বাঁচানোর জন্য রিপোর্টে যে-সব সুপারিশ করা হয়েছিল, সেগুলো কর্তাব্যক্তিদের কাছে কোনও গুরুত্ব পায়নি।

এর কয়েকদিন পরই 'আসাম চুক্তি' স্বাক্ষরিত হয় এবং ১৯৮৫ সালের ডিসেম্বর মাসে প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধীর বদান্যতায় অসম গণ পরিষদ সরকার ক্ষমতাসীন হয়। তথাকথিত বিদেশি বিতাড়ন আন্দোলনের নেতাদের নিয়ে গঠিত সরকারের মুখ্যমন্ত্রী হন প্রফুল্লকুমার মহন্ত। বাঙালি-অধ্যুষিত বরাক উপত্যকা সম্পর্কে এঁদের মনোভাব কী, তা সবাই জানেন। ক্ষমতায় এসে তাঁরা কাছাড় সুগার মিলকে পুনরুজ্জীবিত করার ব্যাপারে বিশেষ কোনও উৎসাহ দেখালেন না। ১৯৮৬ সালের ৮ জুলাই কাছাড় চিনিকলের শ্রমিক-কর্মচারীদের চার সদস্যের এক প্রতিনিধিদল রাজ্যের শিল্পমন্ত্রী দিগেন বরার সঙ্গে দেখা করে মিলের অচলাবস্থা দূর করার জন্য আবেদন জানায়। কিন্তু বরা তাঁদের জানান, রাজ্য সরকার এই চিনিকলের কর্মীদের সাময়িকভাবে কর্মচ্যুত (Lay off) করার কথা ভাবছে। তবে স্থায়ী কর্মীদের ছাঁটাই করা হবে না। কিছু 'বেয়া' (খারাপ) মানুষকে মিল থেকে সরাতে হবে বলেও তিনি উল্লেখ করেন। তাঁরা মিলের চেয়ারম্যান ও মন্ত্রী শহিদুল আলম চৌধুরীর সঙ্গে দেখা করলে তিনি 'আমি এখন শিলচর যাচ্ছি' বলে প্রতিনিধি দলকে এড়িয়ে যান। প্রফুল্লকুমার মহন্তের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, কাছাড় সুগার মিলের ব্যাপারটা তিনি দিগেন বরা ও শহিদুল আলম চৌধুরীর ওপর ছেড়ে দিয়েছেন। শিল্পমন্ত্রীর বক্তব্য মুখ্যমন্ত্রীকে জানালে তিনি এ সম্পর্কে আর কিছু বলেননি। আরেক অগপ মন্ত্রী পদ্মেশ্বর দোলে ৪ মার্চ (১৯৮৬) শিল্প প্রতিমন্ত্রী থাকাকালীন কাছাড় সুগার মিল পরিদর্শন করেছিলেন। মিরি সম্প্রদায়ভুক্ত এই মন্ত্রী তখন মিলের শ্রমিক-কর্মচারীদের আশ্বাস দিয়ে বলেছিলেন, অগপ সরকার শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলোকে চাঙ্গা করে তোলার নীতি গ্রহণ করেছে। তাই মিল বন্ধ করার প্রশ্ন ওঠে না। ওই প্রতিনিধিদল দোলের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলে তিনি বলেন, 'আমি শিল্প দপ্তরে থাকার সময়ে কাছাড় চিনিকলকে ৭৫ লক্ষ টাকা দেবার কথা ছিল। এ সম্পর্কিত প্রস্তাব পরে শিল্প সচিবের (জ্যোতি রাজখোয়া) কাছে যাবার পর কি হল বোঝা গেল না।—' (যুগশক্তি: ২০-৭-১৯৮৬)।

১৯৮৬ সালের আগস্ট মাসের শেষ সপ্তাহে রাজ্য সরকার একটি পর্যবেক্ষক দলকে কাছাড় চিনিকলে প্রেরণ করে। বরুয়াবামুনগাঁওর কো-অপারেটিভ সুগার মিল থেকে আগত দলটির নেতৃত্বে ছিলেন এই মিলের ম্যানেজিং ডিরেক্টর এম চাওলা, আইএএস। মিলের চিফ ইঞ্জিনিয়ার, চিফ কেমিস্ট, কেইন ম্যানেজার প্রমুখও এই দলে ছিলেন। এআইডিসি-র দু'জন আধিকারিকও এঁদের সঙ্গে ছিলেন। এই পর্যবেক্ষক দল পাঁচদিন অক্লান্ত পরিশ্রম করে মিল-সংক্রান্ত বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ করে। ২৬ আগস্ট (১৯৮৬) সংযুক্ত সংখ্যালঘু মোর্চার (ইউএমএফ) চার সদস্যের এক প্রতিনিধিদল কাছাড় সুগার মিলে গিয়ে মিলের ভারপ্রাপ্ত এমডি মুসব্বির আলি মজুমদার ও পর্যবেক্ষক দলের নেতা এম চাওলার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে। মোর্চার প্রতিনিধিদলে ছিলেন ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার তিন বিধায়ক ডাঃ অর্ধেন্দু দে, মোক্তার হোসেন ও আব্দুল হামিদ এবং দলের যুগ্ম সম্পাদক (কাটিগড়ার প্রাক্তন বিধায়ক) তারাপদ ভট্টাচার্য। বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তরে এম চাওলা

মোর্চার প্রতিনিধিদের জানান, কাছাড় সুগার মিলের যন্ত্রপাতির অবস্থা বেশ ভাল এবং বর্তমানে আখ ক্ষেতে আখের পরিমাণ পর্যাপ্ত না হলেও যথেষ্ট। চেষ্টা করলে আরও উন্নয়ন সম্ভব। তিনি বলেন, এই মিলের বর্তমান যা অবস্থা তাতে এটা চালু না হওয়ার কোনও কারণ নেই। তবে তিনি এ-ও বলেন, আরও তথ্য সংগ্রহ করা হচ্ছে এবং এ সম্পর্কে এখনই চূড়ান্তভাবে কিছু বলা যাচ্ছে না।

১৯৮৭ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে এই মিলের শ্রমিক-কর্মচারীরা তিন সদস্যের এক প্রতিনিধিদলকে দিসপুর পাঠান। এর আগের ডিসেম্বর পর্যন্ত বেতন তাঁরা বিস্তর তদ্বির করার পর পেয়েছেন বটে, কিন্তু মিল চালু করার ব্যাপারে কোনও উদ্যোগ দেখা যাচ্ছে না। অথচ সময়মতো ইক্ষু চাষ শুরু না করলে ১৯৮৭-৮৮ মরসুমেও চিনি উৎপাদিত হবে না। এই অবস্থার প্রেক্ষিতে ওই প্রতিনিধিদল দিসপুরে গিয়ে শিল্প বিভাগের আয়ুক্ত জেপি রাজখোয়া, সচিব অরোরা, যুগ্ম সচিব সঞ্জয় শ্রীবাস্তব এবং দুই মন্ত্রী দিগেন বরা ও শহিদুল আলম চৌধুরীর সঙ্গে দেখা করেন ও স্মারকলিপি দেন। মুখ্যমন্ত্রী এবং কাছাড়-করিমগঞ্জ-পার্বত্য এলাকার কমিশনার টিকে কামিলা (তিনিও কিছুদিন আগে মিল পরিদর্শন করেছিলেন) বাইরে থাকায় তাঁদের সঙ্গে তাঁরা সাক্ষাৎ করতে পারেন নি। ওই সময় (সম্ভবত ৭ ফেব্রুয়ারি, ১৯৮৭) দিসপুরের জনতা ভবনে মুখ্যসচিব একে শইকিয়ার পৌরোহিত্যে অনুষ্ঠিত এক উচ্চ পর্যায়ের বৈঠকে রাজ্যের রুগ্ণ শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলো সম্পর্কে আলোচনা করা হয়। জানা যায়, বৈঠকে কাছাড় সুগার মিলের প্রসঙ্গ উঠলে এআইডিসি-র ম্যানেজিং ডিরেক্টর বুড়াগোহাঞি ও শিল্প বিভাগের ডিরেক্টর টিএল বরুয়া মিল পুনরুজ্জীবনের বিরুদ্ধে নানা যুক্তি প্রদর্শন করেন। কিন্তু শিল্প বিভাগের যুগ্ম সচিব শ্রীবাস্তব (যিনি ১৯৮৬ সালের ২৭ আগস্ট সুগার মিল পরিদর্শন করেছিলেন) তাঁদের যুক্তি খণ্ডন করে কাছাড় চিনিকলকে পুনরুজ্জীবিত করার সপক্ষে বক্তব্য উপস্থাপন করেন। শেষপর্যন্ত শিল্প আয়ুক্ত ঘোষণা করেন, কাছাড় চিনিকল বন্ধ করা হবে না বলে সিদ্ধান্ত নেওয়া হলো। স্থির হয়, একজন টেকনোক্র্যাপট ম্যানেজিং ডিরেক্টর ও যোগ্য চিফ ইঞ্জিনিয়ারের সন্ধান করা হবে। উল্লেখ্য, বৈঠকের ঠিক আগে এই চিনিকলের শ্রমিক-কর্মচারীদের প্রতিনিধিদের সঙ্গে শিল্প বিভাগের উচ্চপদস্থ আধিকারিকদের বিস্তারিত আলোচনা হয়।

মার্চ মাসে আসাম বিধানসভায় বদরপুরের সিপিএম বিধায়ক রামেন্দ্র দে-র প্রশ্নের উত্তরে শিল্পমন্ত্রী দিগেন বরা জানান, কাছাড় চিনিকলকে পুনরুজ্জীবিত করার প্রস্তাব রাজ্য সরকার সক্রিয়ভাবে বিবেচনা করছে। তিনি এ-ও বলেন, তৎকালীন ক্ষমতাসীন দলের একজন রাজনীতিকের প্রভাবে ভুল জায়গায় মিলটি স্থাপিত হয়েছিল এবং আখের সমস্যা শুরু থেকেই লেগে রয়েছে। রাতাবাড়ির কংগ্রেস (ই) বিধায়ক কুমারী রবিদাস পরিপূরক প্রশ্ন উত্থাপন করে বলেন, চিনিকলের জন্য প্রয়োজনীয় আখ ওই অঞ্চলে উৎপাদিত হয় না বলে শিল্পমন্ত্রী যে মন্তব্য করেছেন, তা সঠিক নয়।

অগপ সরকার ১৯৮৫-র ডিসেম্বর থেকে ১৯৯০ সালের নভেম্বর পর্যন্ত ক্ষমতাসীন ছিল। এই সরকারের আমলে কাছাড় চিনিকল আর চালু হলোই না। কাছাড় সুগার মিলে শেষ চিনি উৎপাদিত হয় কংগ্রেস সরকারের আমলে ১৯৮৪-৮৫ সালে। ১৯৮৫-৮৬ সালে মিল চালু না করতে পারার জন্য দায়ী রাজ্যের কংগ্রেস সরকার। ঠিক তেমনই ১৯৮৬-৮৭ এবং তার পরবর্তী চার বছর মিল চালু করতে ব্যর্থ হওয়ার দায় বর্তায় অগপ সরকারের ওপর। প্রফুল্ল মহন্ত সরকারের মেয়াদ শেষ হওয়ার পর সাত মাস আসামে ছিল রাষ্ট্রপতির শাসন। তারপর নির্বাচন হয় এবং কংগ্রেস ফের ক্ষমতা দখল করে। ১৯৯১ সালের মাঝামাঝি হিতেশ্বর শইকিয়া পুনরায় মুখ্যমন্ত্রী হন। ১৯৯৬ সালে অগপ ফের ক্ষমতাসীন হয় এবং ২০০১-এ কংগ্রেস আবার গদি দখল করে। ২০১৬ ও ২০২১ সালে বিজেপি আসামে সরকার গঠন করে। একের পর

এক সরকারের বদল হলো, কাছাড় সুগার মিল কিন্তু আর পুনরুজ্জীবিত হলো না। ১৯৯৫ সালে রাজনৈতিক মহল থেকে প্রচার চালানো হয়, শিলচরের একটি ফ্লাওয়ার মিলের মালিক মহাবীরপ্রসাদ জৈনকে চিনিকলটি হস্তান্তর করা হয়েছে। খোঁজখবর নিয়ে দেখা যায়, চিনিকলটির লেসি হিসেবে 'অরিহান্ট সুগার লিমিটেড' নামে একটি কোম্পানির মাধ্যমে মহাবীর জৈনের চিনিকলটি চালানোর কথা। রাজ্য সরকারের সঙ্গে এই সংস্থার কোনও সমঝোতাপত্র স্বাক্ষরিত হয়েছিল কিনা সে সম্পর্কে সংশয় রয়েছে। হয়ে থাকলেও তা কোনও কাজে আসেনি। মিল বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের হাতে তুলে দেওয়াটা রাজ্যের কংগ্রেস সরকারের নির্বাচনী ভাঁওতা ছিল বলে কোনও কোনও মহল মনে করে। অন্যদিকে, কাছাড় চিনিকল শ্রমিক-কর্মচারী সংস্থার নেতারা তখন জানান, চিনিকলের ব্যাপারে বরাক উপত্যকার ৯ জন বিজেপি বিধায়কের ভূমিকায় তাঁরা বীতশ্রদ্ধ। এঁরা মিলের শ্রমিক-কর্মচারীদের স্বার্থের কথা ভুলে লেসি জৈনের স্বার্থটাই দেখছেন বলে তাঁরা অভিযোগ করেন। (যুগশক্তি : ৪-৬-১৯৯৫)। শেষপর্যন্ত ২০০৭ সালের ১ এপ্রিল মিল বন্ধ হয়েছে বলে ঘোষণা করা হয় (ঘোষণাটি করা হয় বছর দুয়েক পরে) এবং ওই তারিখ পর্যন্ত মিলের কর্মচারীদের বকেয়া অর্থ ২০১১ সালে দেওয়া হয়। কিন্তু কর্মচারীরা তাঁদের ন্যায্য পাওনা পাননি বলে অভিযোগ রয়েছে।

কাছাড় সুগার মিল রাতাবাড়ি এলাকার চরগোলায় স্থাপন করা হয়েছিল। ওই অঞ্চলে চুরি, ডাকাতি ইত্যাদি প্রায়শই হতো। সুগার মিল স্থাপন করার পর সে-সব কিন্তু অনেক কমে গিয়েছিল। মিল যখন চালু ছিল, তখন ওই এলাকায় গেলে অর্থনৈতিক উন্নয়নের আভাস উপলব্ধি করা যেত। দুল্লভছড়ায় মিল স্থাপন করলে আখ উৎপাদন ও পরিবহনে সুবিধে হতো এবং স্থানীয় রাজনীতিকদের হস্তক্ষেপ তুলনামূলকভাবে কম হতো বলে অনেক মনে করেন। তা সত্ত্বেও বলা যায়, চরগোলায়ও মিল সুচারুরূপে চালানো যেত যদি রাজ্য সরকার সময়মতো (আখ উৎপাদন মরসুম শুরু হওয়ার আগে) ফান্ড রিলিজ করত এবং শিল্প বিভাগ ও এআইডিসি সার্বিকভাবে সহযোগিতা করত। ওপরের আলোচনায় একটু মনোনিবেশ করলে দেখা যাবে, অন্তত তিনজন অভিজ্ঞ আইএএস অফিসার (এস মিত্র, এম চাওলা ও এস শ্রীবাস্তব) মিল চলবে বলে মত প্রকাশ করেছিলেন। কেউ কেউ বলেন, বিহার, ইউপি-র মতো চিনিকলের কাছাকাছি এলাকায় বিশাল আখ উৎপাদন ক্ষেত্র নেই বলে কাছাড় চিনিকল চালানো সম্ভব হয়নি। উল্লিখিত আমলারা কিন্তু এই মত ব্যক্ত করেননি। কাছাড় চিনিকলের ক্ষেত্রে সমস্যাটা ছিল মানসিকতার। উপযুক্ত সময়ে সঠিক পদক্ষেপ না নিলে সম্ভাবনাময় শিল্পেরও অপমৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। কাছাড় সুগার মিলের ক্ষেত্রেও তা-ই হয়েছে।

কাগজকলের রুদ্ধ দুয়ার— সম্ভাবনার অপমৃত্যু

পরিতোষচন্দ্র দত্ত

আসাম রাজ্যের দক্ষিণ প্রান্তে অবস্থিত বরাক উপত্যকার অর্থনীতি মূলত কৃষি নির্ভরশীল। অধিকাংশ মানুষই কৃষির ওপর নির্ভর করে জীবনযাপন করে চলেছে। কিন্তু একটি অঞ্চলের অর্থনৈতিক উন্নয়ন শুধুমাত্র কৃষির ওপর নির্ভর করে চলতে পারে না। উপত্যকায় কর্মসংস্থানের বৃদ্ধি ঘটাতে হলে কৃষির পাশাপাশি শিল্পক্ষেত্রেও উন্নত হওয়ার প্রয়োজন রয়েছে। শিল্পোন্নয়ন হচ্ছে অর্থনৈতিক উন্নয়নের অপরিহার্য পূর্বশর্ত। তাই উপত্যকার মানুষের জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন তথা অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য শিল্পোন্নয়ন খুবই জরুরি। অর্থনৈতিক উন্নয়ন এমন একটি প্রক্রিয়াকে বোঝায়, যা উদীয়মান অর্থনীতিগুলোকে উন্নতমান অর্থনীতিতে পরিণত করে। আবার এটাও বলা যেতে পারে, যে প্রক্রিয়ার মাধ্যমে নিম্ন জীবন মানদণ্ড থেকে উচ্চ জীবনযাত্রার মানদণ্ডে পরিণত করা যায়, তাকেই অর্থনৈতিক উন্নয়ন বলা যেতে পারে। আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহারের মাধ্যমে অর্থনীতিতে উৎপাদন স্তরের বৃদ্ধি ঘটানোর পাশাপাশি জীবনযাত্রার মানোন্নয়নেই সম্ভব অর্থনৈতিক উন্নয়ন। সরকারের উচিত, অর্থনীতি তথা দেশের উন্নয়নের স্বার্থে দক্ষ শ্রমশক্তি গড়ে তোলার দিকে নজর দেওয়া। আবার, শিল্পকে অগ্রাধিকার দিয়ে এক অর্থনীতিবিদ উদাহরণ টেনে এনে বলেছেন, দশ বিঘা কৃষিজমি যে ক'জন মানুষের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে পারে, তার চেয়ে ওই জমিতে স্থাপিত একটি শিল্প প্রতিষ্ঠান শতগুণ মানুষের কর্মসংস্থানের জোগান দিতে সক্ষম। কিন্তু স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন আসবে, কৃষির উন্নতি ছাড়া তো শিল্পে অগ্রগতি সম্ভব নয়। বিজ্ঞানের বিভিন্ন দিকে নানা আবিষ্কার হওয়া সত্ত্বেও কাগজবিহীন জীবন সম্পূর্ণ অকল্পনীয়। আধুনিক সমাজে কাগজ যে ভূমিকা পালন করে চলেছে, তার গুরুত্ব ব্যাখ্যা করার কোনও প্রয়োজন আছে বলে মনে হয় না। তবে উল্লেখ করা প্রয়োজন, একটি বই, ম্যাগাজিন, সংবাদপত্র ইত্যাদিতে বিশেষত মুদ্রণের সঙ্গে সম্পর্কিত এবং মানবজাতির বৌদ্ধিক স্তর বাড়াতে কাগজের কার্যকর ভূমিকা রয়েছে। বর্তমান সভ্যতার গুরুত্বপূর্ণ শিল্পপণ্যের মধ্যে কাগজশিল্প অন্যতম।

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন রকমের ও মানের কাগজ তৈরি হচ্ছে। উপাদান ও প্রস্তুত প্রণালীর ওপর কাগজের মান নির্ভর করে। লেখা ও ছাপার কাগজ না থাকলে শিক্ষা, শিল্পকারখানা, সরকারও অচল হয়ে পড়বে। কাগজ শুধুমাত্র একটি শিল্পপণ্য নয় বরং বলা যেতে পারে এর চেয়ে অনেক বেশি। অনেকের মতে, কাগজশিল্পকে একটি জাতির সাংস্কৃতিক ব্যারোমিটার হিসেবে গণ্য করা যেতে পারে। জ্ঞানের সীমানা প্রশস্ত করার জন্য আমাদের দৈনন্দিন জীবনের প্রতি মূহূর্তে কাগজের প্রয়োজন রয়েছে। তবুও, বেশ কিছু বছর আগের তথ্যানুযায়ী ভারতে মাথাপিছু বার্ষিক কাগজের ব্যবহার প্রায় ৪ কিলোগ্রাম ছিল, যা বিশ্বের উন্নত দেশগুলোর তুলনায় ছিল সর্বনিম্ন। পৃথিবীর প্রতিটি সভ্য দেশে কাগজের ব্যবহার রয়েছে। কাগজ ছাড়া সভ্যতাকে কল্পনা করা যায় না। কিন্তু রফতানিমুখী শিল্পে ব্যবহারের নামে শুল্কমুক্ত সুবিধায় আমদানিকৃত কাগজ কালোবাজারে বিক্রি করে দিয়ে দেশীয় কাগজকলগুলোকে অসম প্রতিযোগিতার মুখে ঠেলে দেওয়া

হচ্ছে। তাই এ শিল্পকে বাঁচিয়ে রাখতে পারলে তা দেশীয় অর্থনীতিতে বড় ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবে। ভারতীয় কাগজশিল্পে বছরে ৮ শতাংশ হারে বৃদ্ধি হওয়ার ক্ষমতা রয়েছে। বর্তমান সময়ের প্রকাশিত তথ্য বলছে, ভারতে মাথাপিছু কাগজের ব্যবহার ৯ কিলোগ্রামের বেশি হওয়া সত্ত্বেও চিন দেশে ব্যবহৃত ৪২ কিলোগ্রাম বা উন্নত দেশগুলোতে ব্যবহৃত ৩৫০ কিলোগ্রামের তুলনায় ভারতের অবস্থান অনেক নীচে।

কাগজের বাজার হিসেবে ভারতই বিশ্বের অন্যতম দ্রুত বর্ধনশীল বাজার। কারণ, পৃথিবীতে ভারত দ্বিতীয় বৃহত্তম জনবহুল দেশ। প্রকাশিত তথ্য অনুযায়ী, ২০১৯-২০ সাল সময়ে ভারতে কাগজের ব্যবহার প্রতি বছরে প্রায় ২০ মিলিয়ন টন ছিল, যা ২০২৪-২৫ সাল নাগাদ ২৩.৫ মিলিয়ন টনে বৃদ্ধি হবে বলে ধারণা করা হচ্ছে। পরিসংখ্যাগত তথ্য অনুসারে বলা যেতে পারে, ২০১০-২০ সাল সময়ে কাগজের আমদানি ১১.৩৪ শতাংশ হারে যৌগিক বার্ষিক প্রবৃদ্ধির নিয়মে বেড়েছে। অর্থাৎ, টাকার অঙ্কে কাগজের আমদানি খরচের হিসেব বিশ্লেষণে দেখা যায়, ২০১০-১১ সালে ৩,৪১১ কোটি টাকা থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ২০১৯-২০ সালে ৮,৯৭২ কোটি টাকায় পৌঁছেছে। একই নিয়মে কাগজ উৎপাদনের পরিমাণের দিক থেকেও দেখা যায় ১৩.২৩ শতাংশ বৃদ্ধি হয়েছে। অর্থাৎ, ২০১০-১১ সালে ০.৫৪ মিলিয়ন টন থেকে বেড়ে ২০১৯-২০ সালে ১.৬৪ মিলিয়ন টন হয়েছে। ইন্ডিয়ান পেপার ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যাসোসিয়েশন ভারত সরকারকে একটি কাগজ আমদানি পর্যবেক্ষণ ব্যবস্থা স্থাপনের পাশাপাশি কাগজের আমদানি শুল্ককে ১০ শতাংশ থেকে বাড়িয়ে ২৫ শতাংশ করার জন্য অনুরোধ জানিয়েছে। তাছাড়া ভারতের সঙ্গে বাণিজ্যচুক্তি স্বাক্ষরকারী দেশগুলো অনিচ্ছাকৃতভাবে কাগজ এনে যাতে জমিয়ে না রাখতে পারে, সে ব্যাপারেও ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য সরকারের কাছে অনুরোধ রাখা হয়েছে।

ব্যবহারের দিক থেকে ভারত দ্রুত বর্ধিত একটি বাজার হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে। ভারতের বিভিন্ন জায়গার পাশাপাশি আসামের দক্ষিণ প্রান্তে অবস্থিত বরাক উপত্যকায় কাগজশিল্প গড়ে ওঠার পেছনেও যুক্তিসঙ্গত কারণ রয়েছে। ভারতে শিক্ষার বিস্তার দ্রুতহারে ঘটছে। অসংখ্য প্রকাশনা সংস্থা রয়েছে যেখানে দৈনিক লক্ষ লক্ষ পত্রিকা ছাপা হচ্ছে, ফলে কাগজের বিশাল অভ্যন্তরীণ বাজার রয়েছে। এছাড়া আন্তর্জাতিক বাজারেও রয়েছে ভারতীয় কাগজের চাহিদা। সে যা-ই হোক, নিবন্ধে এক সময় বরাক উপত্যকায় গড়ে ওঠা সর্ববৃহৎ শিল্প অর্থাৎ কাগজশিল্প নিয়েই আলোচনার চেষ্টা করা হবে।

১৯৭০ সালের ২৯ মে ভারতের মাটিতে হিন্দুস্থান পেপার কর্পোরেশন লিমিটেডের আত্মপ্রকাশ ঘটে এবং পরবর্তী সময়ে এই কর্পোরেশনের একটি ইউনিট হিসেবে ৩৫৭ কোটি টাকা বিনিয়োগের সঙ্গে নতুন প্রকল্প কাছাড় পেপার মিল যাত্রা শুরু করে। কাছাড় পেপার মিল হচ্ছে ভারত সরকারের মালিকানাধীন হিন্দুস্থান পেপার কর্পোরেশন লিমিটেডের একটি ইউনিট, যা আসামের সবচেয়ে পশ্চাৎপদ দক্ষিণাঞ্চল বরাক উপত্যকার হাইলাকান্দি জেলার পাঁচগ্রামে অবস্থিত। সব প্রতিবন্ধকতাকে দূরে সরিয়ে কাছাড় কাগজকল ১৯৮৬ সালের ৩১ ডিসেম্বর পরীক্ষামূলকভাবে উৎপাদন শুরু করে এবং বাণিজ্যিক উৎপাদন শুরু হয় ১৯৮৭-৮৮ সালে। প্রাথমিক পর্যায়ে কাঁচামাল সরবরাহের জন্য পর্যাপ্ত সংখ্যক সরবরাহকারী থাকায় মিলটিতে পর্যাপ্ত পরিমাণে কাঁচামাল মজুত থাকত এবং কখনও কাঁচামালের কোনও অভাব পরিলক্ষিত হয়নি। আসাম, মণিপুর, মিজোরাম, ত্রিপুরা এবং মেঘালয়কে আচ্ছাদন করে উত্তর-পূর্বের সবচেয়ে দূরবর্তী অংশে কাছাড় পেপার মিল স্থাপন করা হয়েছে, যার লক্ষ্য ছিল ভারতের সবচেয়ে শিল্পগতভাবে পিছিয়ে থাকা অঞ্চলে আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন এবং কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা। মিলটি সফলভাবে কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য অর্জন করার পাশাপাশি ব্যাপক কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করে দিতে সক্ষম হয়েছিল।

বরাক উপত্যকার অর্থনীতি সর্বকালেই রয়েছে সম্ভাবনাময়— শিল্প ও সেবা থেকে সবখাতেই সম্ভাবনা রয়েছে, রয়েছে সবুজ অর্থনীতিতে এগিয়ে যাওয়ার হাতছানিও। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়, রাজ্য সরকারের সদিচ্ছার অভাব এবং উপত্যকার প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণের জন্যই এ সম্ভাবনাকে কাজে লাগানোর প্রয়োজনীয় অভাবগুলো দিন দিন প্রকট হচ্ছে। উপত্যকার নেতৃবৃন্দও জনগণকে বাদ দিয়ে এবং উপত্যকার উন্নতির চিন্তাকে পাশে সরিয়ে রেখে নিজেদের স্বার্থের কথাই চিন্তা করে চলেছেন। উপত্যকায় এক সময়ে গড়ে ওঠা চিনিকল ধ্বংসের জন্যও উপত্যকার নেতৃবৃন্দকে দায়ী করেই খবর বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে প্রকাশ পেয়েছে। একইভাবে কাছাড় পেপার মিলটি শুরু থেকেই বিভিন্ন কোণ থেকে অযৌক্তিক পরিচালনা, অবাস্তব পরিকল্পনা, অনিয়ম, দুর্নীতি এবং ব্যবস্থাপনার ভুল পরিকল্পনার জন্যই অনেক প্রতিকূলতার সম্মুখীন হয়েছে। কিছু কিছু কর্মকর্তার উপরিউক্ত দুর্যোগ অনুশীলনের বিরুদ্ধে নিরলস আওয়াজ তোলা সত্ত্বেও সরকারপক্ষ থেকে এসব অন্যায্য চুক্তি রোধে কার্যকর পদক্ষেপ লক্ষ্য করা যায়নি।

২০১১-১২ অর্থবছরে হিন্দুস্থান পেপার কর্পোরেশনের (এইচপিসি) কর্মক্ষমতা অপর্যাপ্ত ফাইবার কাঁচামাল উপলভ্যতা সত্ত্বেও কাছাড় কাগজকলের জন্য পুরো ২০১১-১২ অর্থবছরে উৎপাদন অব্যাহত রয়েছে। এমনকী পূর্ববর্তী তিন বছর ধরে চলতে থাকা সক্ষমতা ব্যবহার আর আগের অর্থবছরে ৫২ শতাংশ সক্ষমতা ব্যবহারের বিপরীতে ৮০ শতাংশ সক্ষমতা ব্যবহার করা হয়েছিল। শিল্পগতভাবে পিছিয়ে পড়া এবং পরিকাঠামোগতভাবে ও ঘাটতি থাকা অঞ্চলের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের উদ্দেশ্য নিয়েই রাজ্যের জাগিরোডে ও পাঁচগ্রামে এইচপিসি মিল দুটো স্থাপন করা হয়েছিল। নানারকম স্থানীয় প্রতিকূলতাকে আগলে রেখেও কম খরচে ফাইবার কাঁচামাল সংগ্রহ করা সম্ভব হবে বলেই ধারণা করা হয়েছিল। স্বল্প খরচে ফাইবার কাঁচামালের সহজলভ্যতা বহু স্থানীয় প্রতিকূলতাকে উদ্বুদ্ধ করবে, এই চিন্তা করেই শিল্পগতভাবে পশ্চাৎপদ এবং পরিকাঠামোগতভাবে ঘাটতিযুক্ত অঞ্চলে মিল স্থাপনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল। দুর্দশাগুলোকে আরও বাড়ানোর জন্য, রাজ্য সরকার মিলগুলো দ্বারা সংগৃহীত বাঁশের ওপর কৃষি উপকর (Agricultural cess) এবং অন্যান্য কাঁচামাল-সহ কৃষি উপকরণের ওপর প্রবেশ কর আরোপ করল। সবধরনের প্রতিকূলতা সত্ত্বেও কিন্তু সংস্থা সব প্রত্যাহ্বান মোকাবিলা করতে কোনও প্রয়াস ছাড়েনি। এভাবেই ধীরে ধীরে রাজ্যের দুটো মিলই বিভাবরী সূর্যের আলো দেখতে শুরু করেছিল, যদিও কাগজ উৎপাদনে দুটো মিলের মধ্যে তুলনামূলকভাবে জাগিরোড মিলটি কিছুটা এগিয়ে থাকতে দেখা গেছে। ১৯৯৬-৯৭ থেকে ২০০৭-০৮ সময়কালের সংগৃহীত তথ্য থেকে জানা যায়, জাগিরোড কাগজকলের উৎপাদন ৮৫ হাজার ৪০১ টন থেকে শুরু করে ক্রমান্বয়ে বেড়ে ১ লক্ষ ১৫ হাজার ১২৫ টনে পৌঁছে। এই উৎপাদিত কাগজের ভর্তুকি দেওয়ার পরও যে মূল্য নির্ধারিত করা হয়েছিল ১৯৯৬-৯৭ সালে তার পরিমাণ ছিল ২৩৮ কোটি টাকা এবং মোট নগদ লাভের পরিমাণ ছিল ৩৪ কোটি টাকা। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যেক বছর উৎপাদনের পরিমাণ যেমন ক্রমান্বয়ে বেড়েছে, ঠিক একইভাবে বিক্রয়মূল্যও বেড়ে ৪৩১ কোটি এবং সে অনুসারে লাভের অঙ্কও বেড়ে ৯৯ কোটি টাকায় পৌঁছে ২০০৭-০৮ সালে।

বরাক উপত্যকার একমাত্র শিল্প পাঁচগ্রাম কাগজকলের ক্ষেত্রেও ১৯৯৬-২০০৮ সময়কালে উৎপাদনে অগ্রগতি লক্ষ্য করা যায়। ১৯৯৬-৯৭ অর্থবছরে উৎপাদনের পরিমাণ ছিল ৫৯ হাজার ৫৩২ টন, যার বাজারমূল্য ভর্তুকি দেওয়ার পরও নির্ধারিত হয়েছিল ১৬৭ কোটি টাকা এবং নগদ লাভের পরিমাণ ছিল ২ কোটি টাকা। পরবর্তী বছরে উৎপাদন ৫০ হাজার ৩২ টনে নেমে এলেও ১৯৯৮-৯৯ অর্থবছরে অবশ্য উৎপাদনের পরিমাণ বেড়ে ৬০ হাজার ৯ টনে পৌঁছয়। পরবর্তী বছরে ১৯৯৯-২০০০ সাল সময়ে

উৎপাদনের পরিমাণ প্রায় ৯.৬৯ শতাংশ বৃদ্ধি পায়। ২০০০-০১ সালে আগের বছরের তুলনায় বৃদ্ধি পায় ১৬.৫৬ শতাংশ। পরবর্তী তিনটি আর্থিক বছর অর্থাৎ ২০০১-০২, ২০০২-০৩ এবং ২০০৩-০৪ সালে পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় উৎপাদন বৃদ্ধির পরিমাণ ছিল যথাক্রমে প্রায় ২০ শতাংশ, ২.৮৭ শতাংশ এবং ২.৮২ শতাংশ। ২০০৪-০৫ অর্থবছরে উৎপাদন কমে গিয়ে দাঁড়ায় ৯১ হাজার ১২ টন, যেখানে ২০০৩-০৪ অর্থবছরে উৎপাদন ছিল ৯৭ হাজার ৩৭৬ টন। অবশ্য ২০০৫-০৬ সালে উৎপাদন ১ লক্ষ টন অতিক্রম করে। ২০০৬-০৭ সালে উৎপাদন বৃদ্ধির ধারা অব্যাহত রেখে পরিমাণ হয় ১ লক্ষ ৩ হাজার ১৫৫ টন। ২০০৭-০৮ সালের উৎপাদনে আবার ঘাটতি হওয়ায় সেটার পরিমাণ দাঁড়ায় ৯৬ হাজার ৬২১ টনে। ২০০৮-০৯ সালে উৎপাদনের পরিমাণ অনেকটা কমে যায়। ওই অর্থবছরে মোট উৎপাদন হয় ৬৫ হাজার ১২ টন।

১৯৯৭-৯৮ থেকে ২০০৯-১০ সাল পর্যন্ত প্রত্যেক বছর ভর্তুকি দেওয়ার পরও মোট উৎপাদনের ওপর যে বাজারমূল্য নির্ধারিত করা হয়েছিল, টাকার অঙ্কে সেগুলোর পরিমাণ যথাক্রমে ১৬৭ কোটি, ১৩৭ কোটি, ১৭১ কোটি, ১৮৬ কোটি, ২৪৬ কোটি, ২৯৪ কোটি, ৩২৮ কোটি, ৩২২ কোটি, ৩১৩ কোটি, ৩৯৬ কোটি, ৪০৯ কোটি এবং ৪০৭ কোটি। পাশাপাশি নগদ লাভের পরিমাণ প্রকাশিত তথ্য থেকে দেখা যায়, ১৯৯৭-৯৮ বছরে উৎপাদন কমলেও নগদ লাভের পরিমাণ আগের বছরের তুলনায় অনেকটাই বেড়ে গিয়ে ৭ কোটি টাকায় পৌঁছয়। এই আর্থিক বছরের পরবর্তী দু'টি বছরেই এক কোটি টাকা করে নগদ লাভ করতে সক্ষম হয়। তবে ২০০০-০১ সাল থেকে নগদ লাভের পরিমাণ টাকার অঙ্কে ছিল যথাক্রমে ১১ কোটি, ১৪ কোটি, ১৯ কোটি, ১৯ কোটি, ২১ কোটি, ৩৬ কোটি, ৫৯ কোটি এবং ৩৯ কোটি।

কাছাড় কাগজকলে উৎপাদিত বিভিন্ন কাগজের মূল্য ছিল প্রতি টনে ৪০ থেকে ৪৫ হাজার টাকা, যা বাজারের অন্যান্য কাগজের তুলনায় অনেক কম। এখানে কাগজকল উৎপাদক সংস্থারও একটা ভূমিকা ছিল। তদানীন্তন দুর্নীতিগ্রস্ত মুখ্য ব্যবস্থাপনা পরিচালকের (Chief Managing Director) ন্যক্কারজনক ভূমিকার ফলে কাঁচামালের ক্রয়মূল্য বাড়িয়ে দিয়ে কাঁচামাল বিক্রেতাদের অতিরিক্ত লাভ করার সুযোগ করে দিলেও উৎপাদিত কাগজের বিক্রয়মূল্য স্থির করে রাখায় মিলের উৎপাদিত কাগজের লাভের পরিমাণ অনেক কমে গিয়েছিল। ২০১৫ সালের অক্টোবর মাসে কাছাড় কাগজকলের উৎপাদন হঠাৎ করে বন্ধ করার সঙ্গে সঙ্গে বাজারে কাগজের মূল্য ঊর্ধ্বমুখী হয়ে যায়। ২০১৬ সালের ফেব্রুয়ারি মাস নাগাদ কাগজের মূল্য দ্বিগুণ বেড়ে গিয়ে প্রতি টনের মূল্য ৭০ থেকে ৮০ হাজার টাকা হয়ে যায়। অন্যদিকে, ২০১৭ সালের ১৩ মার্চ নগাঁও কাগজকলের উৎপাদন বন্ধ হয়ে যায়। ২০১৯ সালের ২ মে তারিখে অবসান (লিকুইডেশন) আদেশ জারি করা হয়। ২০২০ সালের অক্টোবর নাগাদ এই কাগজের মূল্য ১.১০ লক্ষ থেকে ১.২০ লক্ষ টাকার মধ্যে পৌঁছে যায়। আশ্চর্যজনকভাবে লক্ষণীয় যে, দেশীয় কাগজের উৎপাদন বন্ধ করে দিয়ে বিদেশ থেকে অনেক বেশি মূল্যে কাগজ আমদানির কাজ চলতে শুরু করে। উন্নতমানের কাগজ উৎপাদনে বিশেষ স্থানে অধিষ্ঠিত থাকা সত্ত্বেও এক অজানা রহস্যাবৃত কারণে মিল বন্ধের ঘোষণা দেওয়া হয়। উল্লেখ্য, কাগজকল কর্মীদের দেওয়া বয়ান অনুযায়ী কোনও লিখিত আদেশ ছাড়াই ২০১৫ সালের ২০ অক্টোবর কাছাড় কাগজকলের উৎপাদন বন্ধ করে দেওয়া হয়, যা এক অসম্ভব অবাস্তব ঘটনা মনে হলেও সত্য ঘটনা। একমাত্র দূরভাষযোগে মৌখিক বার্তালাপের ওপর ভিত্তি করেই কাছাড় কাগজকল কর্তৃপক্ষ মিলটির উৎপাদন বন্ধ করে দেয়। কাগজকল কর্মী ইউনিয়নের নেতৃবৃন্দ উৎপাদন বন্ধের কারণ জানতে চাইলে কর্তৃপক্ষ কোনও সদুত্তর দিতে পারেনি। এই অবস্থায় জাগিরোড কাগজকল কর্তৃপক্ষকে কাগজ সরবরাহ করার নতুন অর্ডার নেওয়া বন্ধ

রাখার আদেশ দেওয়া হয়। শুধুমাত্র পুরনো অর্ডারগুলোর সরবরাহ করার পরিপ্রক্ষিতে কাগজকলকে চালু রাখতে দেওয়া হয়। তবে পুরনো অর্ডারগুলোর সরবরাহ করার কাজ শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে জাগিরোড কাগজকলের ক্ষেত্রেও একই উপায়ে উৎপাদন বন্ধ করে দেওয়া হয়। তবে এটাও সত্য, কিছু দুর্নীতি অবশ্য জন্মলগ্ন থেকেই মোটামুটিভাবে চলেছে। উল্লেখ করা প্রয়োজন, অক্টোবর মাস নাগাদ মিলের সব উৎপাদন বন্ধ করে দেওয়ার বেশ কয়েক মাস পর দেখা যায়, মিলের ভেতর পর্যন্ত যাওয়ার জন্য নতুনভাবে ব্রডগেজ লাইনের কাজ করা হয়েছে। কাগজকল বন্ধ করে দেওয়ার পরেও মিলের ভেতরে মালগাড়ি ঢোকার জন্য ব্রডগেজ লাইনের কাজ করা হয়েছিল যাতে কাগজ উৎপাদনের জন্য কাঁচামাল নিয়ে যাওয়া এবং উৎপাদিত কাগজ নিয়ে আসা সম্ভব হয়। মিল বন্ধ ঘোষণার পর এই নতুন লাইনের কী প্রয়োজন ছিল, সেটার ব্যাখ্যা কাগজকল কর্তৃপক্ষও দিতে পারেনি। আরও আশ্চর্যের ব্যাপার, এই লাইনের উপর দিয়ে যে নতুন ইঞ্জিনটি এসেছিল, সেটি আজও পেপার মিল প্রাঙ্গণে সৃষ্ট জঙ্গলের ভেতর রয়ে গেছে এবং সাত বছর ধরে অব্যবহৃত অবস্থায় থাকার ফলে ঝড়বাদলের আঘাতে নষ্ট হয়েছে। এই লাইন তৈরির পেছনে একমাত্র উদ্দেশ্যই হচ্ছে কিছু টাকা হাতিয়ে নেওয়া। কারণ, মিল বন্ধ ঘোষণার পর তো নিয়ম অনুযায়ী ব্রডগেজ লাইনের কাজ করার প্রশ্নই আসতে পারে না। এছাড়াও মজুত থাকা কাঁচামাল ও উৎপাদিত কাগজ সব নষ্ট হয়েছে, যার বাজারমূল্য কয়েকশো কোটি টাকা হবে।

এ উপত্যকার উন্নতিকল্পে রাজ্য সরকারের বিভিন্ন বঞ্চনার পাশাপাশি উপত্যকার বেশ কিছু রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ কাগজকলের জন্মলগ্ন থেকেই বিভিন্নভাবে রক্ত চুষে খেয়েছেন। যাদের অনেকেই হয়তো পৃথিবী ছেড়ে চলে গেছেন, অনেকেই আবার শার্ট পাল্টে ধোয়া তুলসীপাতা সেজে দিব্যি আরামে দিন কাটাচ্ছেন। একইভাবে উপত্যকার চিনিকলেরও রক্ত চুষে ধ্বংস করা হয়েছিল। এরা বরাক উপত্যকার উন্নতি তথা উপত্যকার যুবসম্প্রদায়ের জীবন-জীবিকার কথা চিন্তা করার আগে নিজেদের পকেটের উন্নতির চিন্তা আগে করে থাকেন। কিন্তু আশ্চর্য হতে হয় যখন দেখা যায়, বঞ্চিত জনগণ এদেরই আবার নিমন্ত্রণ করে ডেকে এনে সাদরে জিন্দাবাদ ধ্বনি সহযোগে গলায় ফুলের মালা ঝুলিয়ে দিতে কার্পণ্য করেন না। যা-ই হোক, এই ক্ষুদ্র পরিসরে বিশদভাবে আলোচনা সম্ভব না হলেও উপত্যকার বেকার যুবসম্প্রদায়কে তাদের নিজের জীবনের জন্য সচেতন হওয়া খুবই জরুরি। আসামের দু'টি কাগজকলের বার্ষিক গড় উৎপাদনের পরিমাণ একসময় প্রায় ৬০০ টন ছিল, যা দেশের মানুষের চাহিদা পূরণ করার পরও দেশের বাইরে রফতানি করা সম্ভব হতো। কাগজের গুণমানও ছিল অনেক উন্নত। শুধুমাত্র নেতৃবৃন্দের পাশাপাশি কাগজকল কর্তৃপক্ষ নিজেদের পকেটে পয়সা ঢোকানোর পাশাপাশি কর্পোরেটকে খুশি করার জন্য লাভজনক কাগজকল দু'টিকে ইচ্ছাকৃতভাবে ধ্বংস করে দিয়েছে। মিল দু'টির উৎপাদন বন্ধ করে দিয়ে অনেক বেশি দামে চিন-সহ বিভিন্ন দেশ থেকে কাগজ কিনে আনা হচ্ছে।

প্রথমদিকে আর্থিক ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ থাকায় পাঁচগ্রাম কাগজকলে তেমন কোনও অসুবিধা হয়নি বা দুর্নীতি হওয়ার সুযোগও কম থাকত। কিন্তু দক্ষিণ ভারত থেকে আসা এক কর্মকর্তা মুখ্য ব্যবস্থাপনা পরিচালক (চিফ ম্যানেজমেন্ট ডিরেক্টর) হিসেবে যোগদানের পর আগের আর্থিক ক্ষমতার (Financial Power) বিকেন্দ্রীকরণ ব্যবস্থার (decentralized) পরিবর্তন করে কেন্দ্রীভূত (Centralised) করার পর থেকেই ওপর মহলে দুর্নীতি শুরু হতে থাকে। নতুন এই পরিচালকের অর্থের প্রতি বেশ দুর্বলতা রয়েছে বুঝতে পেরে সুযোগের সদ্ব্যবহার করে দু'-তিনজন ঠিকাদার তাদের বকেয়া হিসেব করে পুরোটাই আদায় করে নিয়েছেন। পাশাপাশি অন্যান্য কিছু কিছু ঠিকাদারকেও সব বকেয়া পাইয়ে দেওয়ার সুযোগ করে

দিয়েছেন। তবে বিনিময়ে তাদের অবশ্যই উপহারস্বরূপ কিছু দিতে হয়েছে যা সংগ্রহ করে মুখ্য পরিচালকের পকেট ভারী করার ব্যবস্থা করা হয়েছে। এখানে বলে নেওয়া ভাল, দেশে বড় বড় কাগজ উৎপাদনকারী সংস্থা, ভারতীয় কাগজ উৎপাদনকারী সংস্থা (Indian Paper Manufacturer Association) ২০১৫ সাল থেকে ভারত সরকারকে বাজেট তৈরির আগে থেকে অনবরত মনে করিয়ে দিয়েছে, যেহেতু বিদেশ থেকে প্রচুর কাগজ ভারতে আসছে তাই এই কাগজের ওপর রফতানিশুল্ক চাপানো হোক। কিন্তু আশ্চর্যজনকভাবে লক্ষ্য করা যায়, ভারত সরকারের সৌজন্যে ২০১৪ সাল থেকে ওই শুল্কের পরিমাণ কমতে শুরু করে এবং ২০১৯ সাল নাগাদ মোটামুটিভাবে শূন্যের কাছাকাছি চলে আসে।

এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ করা প্রয়োজন, মিলের ভেতরে থাকা অসহায় পরিবারগুলোর সঙ্গে আলোচনা করে জানা যায়, বৈদ্যুতিক সংযোগ-সহ পানীয়জলের জোগান সংক্রান্ত বিষয় ছাড়াও বিভিন্ন সমস্যায় জর্জরিত হয়ে খুবই করুণ পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। অনাহারে-অনিদ্রায় জর্জরিত হয়ে অনেকে আত্মহত্যার পথ বেছে নিয়েছেন। আবার, অর্থের অভাবে চিকিৎসা করার সুযোগ না পেয়েও অনেকে পৃথিবীর মায়া ত্যাগ করেছেন। স্টাফ কোয়ার্টারগুলোর যথাযথ রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থা না থাকায় খুবই বাজে অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। নিরাপত্তাহীনতাও বেড়েছে সবার মধ্যে,যাদের বাধ্য হয়ে থাকতে হচ্ছে অসুরক্ষিত অবস্থায়। সূর্য পশ্চিম প্রান্তে গিয়ে লুকিয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যুতের অভাবে চারদিকে নেমে আসে অন্ধকার। শুরু হয় চোরের আতঙ্ক, এমনকী ভয়াবহ ডাকাতির ভয়ও এদের গ্রাস করে। পরিত্যক্ত কোয়ার্টারগুলোতে দিনের আলোয় বানরের উৎপাত, সন্ধ্যার সঙ্গে সঙ্গে শেয়ালের চিৎকার ইত্যাদি মিলিয়ে তৈরি হয়েছে এক বীভৎস পরিবেশ। সব রকমের ঝুঁকি মাথায় নিয়ে বিপদ মোকাবিলার কথা চিন্তা করে বাধ্য হয়েই বেশ কিছু পরিবার পাশাপাশি থেকে রাত পার করছে। এই কাগজকলকে চালু করার পক্ষে গণতান্ত্রিক উপায়ে আবেদন, ধরনা, আন্দোলন, পত্রপত্রিকায় লেখালেখি প্রচুর হয়েছে। কিন্তু সরকার ভোটের আগে বারবার মিথ্যে প্রতিশ্রুতি দিয়ে ভোট সংগ্রহ করেছে আর ভোট শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সব প্রতিশ্রুতি বরাকের জলে ভাসিয়ে দিয়ে উল্টো সুরে গান গাইছে। আদালতের আদেশে এলয় অ্যান্ড মেটেলস কোম্পানির (Alloys and Metals Company) প্রাপ্য টাকা যেদিন মিল কর্তৃপক্ষ দিতে অপারগ হয়, তখনই মিলকে দেউলিয়া ঘোষণার ব্যবস্থা করা হয়। শেষপর্যন্ত অনেক কাঠখড় পুড়িয়ে ২০২২ সালের ২৮ মার্চ আসাম সরকার কাগজকল দু'টির মালিকানা গ্রহণ করে।

অন্যদিকে, কর্মচারীর এক অংশের সঙ্গে কথোপকথনের মাধ্যমে জানা গেল, এই কাগজকল ধ্বংসের পেছনে বর্তমান সরকারের এক বিরাট নেতিবাচক ভূমিকা কাজ করেছে। কারণ, মিলটি বন্ধ হওয়ার মূহূর্তে কয়েকশো কোটি টাকার কাঁচামাল ছাড়াও কয়েকশো কোটি টাকার উৎপাদিত কাগজ মজুত ছিল। এছাড়াও সেই বছর কাগজকলটি কিন্তু লোকসানের অঙ্ক থেকে কিছুটা বেরিয়ে আসতে সক্ষম হয়েছিল। ইদানীং অফিস পুরোপুরি বন্ধ থাকায় যারা অবসরে যাচ্ছেন তারা অবসর-পরবর্তী সময়ে বিভিন্ন খাতে জমিয়ে রাখা টাকাগুলো পাবার আশায় হা-হুতাশ করে যাচ্ছেন। তবে এই সরকারের প্রতি সামান্যতম আস্থাটুকু হারিয়ে ফেলেছেন কাগজকল কর্মীরা। জনসাধারণ লক্ষ্য করেছেন, এই সরকারের ইচ্ছাতেই মিল বন্ধ হয়েছে। কারণ, সরকার যেভাবেই ঘোষণা করুক না কেন , এটা সত্য, মিল বন্ধ হওয়ার ঘোষণাকালীন সময়ে মিল লাভবান অবস্থায় ছিল, যদিও সরকার উল্টোটাই প্রচার করে আসামের দুটো মিলই বন্ধ করে দিয়েছে।

১৯৮৫ সালে আসামের প্রথম কাগজকলটি জাগিরোডে সুন্দরভাবে যাত্রা শুরু করার তিন বছর পর এশিয়ার দ্বিতীয় বৃহত্তম কাগজকল হিসেবে ১৯৮৮ সালে পাঁচগ্রাম কাগজকলটি উৎপাদন শুরু করে। যদিও

১৯৮০-৮১ সাল থেকেই প্রাথমিকভাবে এই মিলের যাত্রা শুরু হয়েছিল। ১ লক্ষ টন উৎপাদন ক্ষমতার কাগজকলের উৎপাদন কয়েকবার লক্ষ্যমাত্রা পূরণ করতে সক্ষম হয়েছিল। তবে ২০০৯ সাল থেকে নানা সমস্যায় জড়িয়ে পড়েছে বরাক উপত্যকার একমাত্র ভারী শিল্পটি। প্রথমবার মিজোরামে বাঁশগাছে ফুল ফোটায় কাঁচামালের তীব্র সঙ্কট হওয়ার পরপরই মেঘালয়ের কয়লা উত্তোলনে সুপ্রিম কোর্টের নিষেধাজ্ঞার দরুন ভুগতে হয়। ফলস্বরূপ নানা সমস্যার কবলে পড়ে মিলের উৎপাদন মারাত্মকভাবে ব্যাহত হয়। তবে নমামি বরাক উৎসবের সময় রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সোনোয়াল বলেছিলেন, কাগজকলের সমস্যা তাঁর নিজস্ব সমস্যা এবং তিনি অবিলম্বেই ব্যবস্থা নেবেন যাতে কলটি পুনরুজ্জীবিত করা যায়। কিন্তু প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী কোনও পদক্ষেপ না নিয়ে প্রতিশ্রুতিরই খেলাপ করলেন, যদিও এই খেলাপের জন্য সরকারের একটুও লজ্জাবোধ হয়নি।

এরই মধ্যে শিলচর-লামডিং পাহাড়লাইনে মেগা ব্লকের কাজ শুরু হয়ে যাওয়ায় রেল যোগাযোগও বন্ধ করে দেওয়া হলো। আবার, পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণ বোর্ডের নির্দেশে কস্টিক কারখানাও বন্ধ করে দিতে হয়। এছাড়া প্রয়োজনীয় বাঁশ, কয়লা, চুন ইত্যাদি কাঁচামালের সিন্ডিকেটরাজ এবং মিলের দুর্বল পরিচালনার জন্যই কাগজকলটি লোকসানের মুখ দেখতে শুরু করল। এরপর সরকারের ভ্রান্ত নীতি ছাড়াও বাড়তে থাকে স্থানীয় কিছু প্রভাবশালী রাজনৈতিক নেতা এবং তাদের ছত্রচ্ছায়ায় থাকা মিলের কিছু কর্মকর্তা-সহ কিছু অসাধু ব্যবসায়ীর অবাধ ক্রিয়াকলাপ। ফলস্বরূপ ২০১১ থেকে প্রতিবছর প্রায় ৮০ কোটি টাকার বেশি লোকসানে পড়তে থাকে হিন্দুস্থান পেপার কর্পোরেশন। এই লোকসানের বিভিন্ন কারণের মধ্যে প্রধান কারণ হিসেবে জনগণ তদানীন্তন কতিপয় প্রভাবশালী রাজনৈতিক নেতাকেই বেশি দায়ী করেন। যা-ই হোক, উৎপাদন কিছুটা কমতে থাকলেও কাগজকলের চেয়ারম্যান ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক এম ভি ভি নরসিমা রাও সংবাদমাধ্যমে আত্মপ্রত্যয়ের সঙ্গে ঘোষণা করেছিলেন, তিনি ২০১২-১৩ সালে মুনাফা অর্জনে আত্মবিশ্বাসী। ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা সংক্রান্ত সংবাদমাধ্যমের এক প্রশ্নের উত্তরে ওই পরিচালক স্বীকারোক্তি করেছিলেন, কাঁচামাল সরবরাহ ও ব্যয় নিয়ন্ত্রণের উন্নতির মাধ্যমে উপরিউক্ত মুনাফা অর্জন করা সম্ভব হবে। অবশ্য এটাও সত্য, লোকসানের এত বড় ধাক্কা সত্ত্বেও যেহেতু কাজ চালানো লাভজনক (operating profit) অবস্থায় ছিল, তাই হঠাৎ করে ২০১৫ সালের সেপ্টেম্বরে কাছাড় কাগজকল বন্ধ করে দেওয়াটাই সবার কাছে স্বাভাবিকভাবে রহস্যজনক বলেই মনে হয়েছে।

এটা উল্লেখ করা প্রয়োজন, পাঁচগ্রাম কাগজকলের উৎপাদনের সুবর্ণ সময়ও ছিল। উদাহরণ হিসেবে ২০০১-০৯ সাল সময়ের উৎপাদনের পরিমাণ বিশ্লেষণ করলে সেই চিত্র পরিষ্কারভাবে ফুটে ওঠে। ২০০১-০২ অর্থবছরে উৎপাদনের পরিমাণ ছিল ৯২ হাজার ৬৫ মেট্রিক টন এবং পরবর্তী দুই অর্থবছরে উৎপাদনের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ৯৪ হাজার ৭০২ মেট্রিক টন এবং ৯৭ হাজার ৩৭৬ মেট্রিক টন। তবে ২০০৬-০৭ অর্থবছরে মিলটির সর্বোচ্চ বার্ষিক উৎপাদন ঘটে। যার পরিমাণ ছিল ১ লক্ষ ৩ হাজার ১৫৫ মেট্রিক টন। ২০০৪-০৫ অর্থবছরে উৎপাদনের পরিমাণ ছিল ৯১ হাজার ১২ মেট্রিক টন, যা পরবর্তী বছরে অর্থাৎ ২০০৫-০৬ সালে বেড়ে ১ লক্ষ ৬৩১ মেট্রিক টনে পৌঁছয়। আবার, ২০০৭-০৮ সালের উৎপাদন পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় সামান্য কমে গিয়ে ৯৬ হাজার ৬২১ মেট্রিক টনে দাঁড়ায়। তবে ২০০৮-০৯ সালে উৎপাদন অনেকটাই কমে গেলেও ৬৫ হাজার ১২ মেট্রিক টন উৎপাদন করতে সক্ষম হয়।

২০০০-০১ থেকে ২০১০-১১ অর্থবছর পর্যন্ত ১১ বছরের সংগৃহীত কাঁচামাল এবং উৎপাদিত পণ্যের পরিমাণের (মেট্রিক টন) পরিসংখ্যানগত তথ্য থেকে দেখা যায়, সংগৃহীত কাঁচামালের পরিমাণ ২০০০-০১

সালে ছিল ৩ লক্ষ ৩৯ হাজার ৪৮২ মেট্রিক টন এবং ২০০৪-০৫ সালে ছিল ৩ লক্ষ ৫৬ হাজার ৮০০ মেট্রিক টন। তবে ২০০৫-০৬ সালে সবচেয়ে বেশি ছিল এবং যার পরিমাণ ছিল ৪ লক্ষ ৪০ হাজার ২৪৩ মেট্রিক টন এবং এরপরেই ২০০২-০৩ সালে সংগ্রহের পরিমাণ ছিল ৪ লক্ষ ১৩ হাজার ৫৮২ মেট্রিক টন। ২০০৩-০৪ এবং ২০০১-০২ সালে পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ৩ লক্ষ ৯৪ হাজার ৩১৭ মেট্রিক টন এবং ৩ লক্ষ ৯১ হাজার ২৭৪ মেট্রিক টন। একইভাবে ২০১০-১১ সাল সময়ে সবচেয়ে কম সংগ্রহ করা হয়েছিল, যার পরিমাণ ছিল ১ লক্ষ ৬২ হাজার ৫৩৩ মেট্রিক টন। এর আগের তিন বছরের অবস্থানের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ২০০৮-০৯ সালে ১ লক্ষ ৬২ হাজার ৫৩৩ মেট্রিক টন, ২০০৯-১০ সালে ২ লক্ষ ৩২ হাজার ১৫৪ মেট্রিক টন, ২০০৭-০৮ সালে ২ লক্ষ ৮০ হাজার ৪৫৮ মেট্রিক টন। উল্লেখ্য, উৎপাদিত পণ্য সবচেয়ে বেশি পাওয়া গিয়েছে ২০০৬-০৭ সালে, যার পরিমাণ ছিল ১ লক্ষ ৩ হাজার ১৫৫ মেট্রিক টন, যখন সেই বছরে কাঁচামাল সংগৃহীত হয়েছিল ৩ লক্ষ ৭৪ হাজার ৯৬ মেট্রিক টন। উৎপাদনের পরিমাণের ক্ষেত্রে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ উৎপাদন হয়েছিল ২০০৫-০৬ সালে ১ লক্ষ ৬৩১ মেট্রিক টন, যা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। এখানে বলে রাখা ঠিক হবে যে, ২০০১-০২ থেকে ২০০৭-০৮ সাল পর্যন্ত সময়কাল কাছাড় কাগজকলের জন্য সুবর্ণযুগ বলা যেতে পারে। কারণ, ওই সময়কালে উৎপাদন ৯০ লক্ষ মেট্রিক টন অতিক্রম করেছে। এছাড়া ২০১১-১২ এবং ২০১৪-১৫ অর্থবছর দুটোতে উৎপাদনের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ৮০ হাজার ৬১ মেট্রিক টন এবং ৭৪ হাজার ৬৭০ মেট্রিক টন। এই দুই বছরে সংগৃহীত কাঁচামালের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ২ লক্ষ ৪৪ হাজার ৩০৭ মেট্রিক টন এবং ১ লক্ষ ৯৭ হাজার ৬৭৭ মেট্রিক টন।

উল্লেখ্য, ১৯৯৭-৯৮ থেকে ২০০৮-০৯ সময়কালের মধ্যে মিলের কর্মক্ষমতার ওপর রেটিং ছিল চমৎকার (এক্সেলেন্ট)। ২০০০-০১ এবং ২০০৩-০৪ সাল থেকে একটানা পাঁচ বছর অর্থাৎ ২০০৭-০৮ সাল পর্যন্ত। বাকি বছরগুলোতে রেটিং ছিল খুব ভাল (ভেরি গুড)। তবে এই সাফল্যের পেছনে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের যে রাজ্যগুলোকে কাঁচামাল ইত্যাদি সংগ্রহের জন্য প্রধান উৎস হিসেবে সাহায্যের হাত বাড়াতে হয়েছে, তার মধ্যে সর্বাগ্রে মিজোরামের কথা বলতে হয়। কারণ, মিজোরামের সাহায্যের পরিমাণ ছিল ৫০ থেকে ৬০ শতাংশ, ডিমা হাসাও স্বায়ত্তশাসিত পরিষদ থেকে ১০ শতাংশ এবং মণিপুর, ত্রিপুরা ইত্যাদি রাজ্য থেকে পাওয়া গেছে ১৫ শতাংশ। এছাড়াও বরাক উপত্যকার ইজারাবন এলাকা থেকে ১৫ শতাংশ এবং ১০ শতাংশ সাহায্য পাওয়া গেছে বরাক উপত্যকার নিজস্ব মাটিতে জন্মানো বাঁশ থেকে। আবার, এটাও জেনে রাখা উচিত, যে মিজোরাম ২০১১ সালের ২৮ মার্চ থেকে সব সরবরাহ স্থগিত রেখেছিল, যা স্বাভাবিকভাবেই কাগজ উৎপাদনকে কিছু প্রভাবিত করেছে।

এখানে গর্বের সঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে, হিন্দুস্থান পেপার কর্পোরেশন ২০০৫-০৬ এবং ২০০৭-০৮ আর্থিক বছরের জন্য প্রধানমন্ত্রীর কাছ থেকে যথাক্রমে ০৮-০৩-২০০৭ এবং ১৫-১০-২০০৯ তারিখে সমঝোতা স্মারক শ্রেষ্ঠত্ব পুরস্কার পেয়েছে। কর্পোরেশনের ঊর্ধ্বগামী কর্মক্ষমতা বিবেচনা করে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রক হিন্দুস্থান পেপার কর্পোরেশন লিমিটেডকে ২০০৭ সালের ৩ জানুয়ারি তারিখে 'এ' তালিকাভুক্ত শিল্প হিসেবে পুনরায় শ্রেণিবদ্ধ করেছে এবং একইসঙ্গে ভারতের শীর্ষ দশটি কেন্দ্রীয় পাবলিক সেক্টর এন্টারপ্রাইজের মধ্যে স্থান করে দিতে বাধ্য হয়েছে। তাছাড়া, ভারত সরকার হিন্দুস্থান পেপার কর্পোরেশন লিমিটেডকে ২০০৯ সালের ৯ জানুয়ারি মিনিরত্ন ক্যাটাগরি-I মর্যাদা হিসেবে তালিকাভুক্ত করেছে। ২০০৮-০৯ আর্থিক বছর পর্যন্ত হিন্দুস্থান পেপার কর্পোরেশন লিমিটেড রাষ্ট্রীয় কোষাগারে লভ্যাংশ প্রদান করতে সক্ষম হয়েছে। তবে দুর্ভাগ্যবশত ২০০৭ সাল নাগাদ উৎপাদনের ক্ষেত্রে বেশ কিছু

সমস্যার সৃষ্টি হয়। একদিকে, সমগ্র উত্তর-পূর্বাঞ্চলে মুলিবাঁশের সমন্বিত ফুলের জন্য বাঁশের জোগান ধরা কষ্ট হচ্ছিল। অন্যদিকে, ব্রডগেজ রেললাইন রূপান্তর ও মহাসড়ক প্রকল্পের বাস্তবায়ন যা ২০০৭ সালের মধ্যে সম্পন্ন হওয়ার কথা ছিল, তা অভ্যন্তরীণ কাঁচামাল এবং বহির্গামী পণ্য পরিবহনে গুরুতর প্রভাব ফেলেছিল। ফলে মিলের বিপুল পরিবহন ব্যয় বহন করতে হয়েছে। আগেকার সময়ের মিটারগেজ চালু থাকলে পরিবহন ব্যয়ের বিশালভার এড়ানো সম্ভব হতো। কিন্তু প্রকল্প বাস্তবায়নে বিলম্বের জন্য স্থানান্তর (ট্রান্সশিপমেন্ট) ব্যয়ের বিশাল বাড়তি বোঝার সৃষ্টি হয়েছে।

কাঁচামাল সংগ্রহের সময় কর্তৃপক্ষ ইচ্ছাকৃতভাবে গুণমান বজায় রাখা থেকে বিচ্যুত হয়ে নিজেদের নিজস্ব স্বার্থরক্ষার দিকে বেশি ব্যস্ত রাখার জন্য বাঁশ, কয়লা, চুন ইত্যাদির ব্যবহার কাগজের উৎপাদনে অস্বাভাবিকভাবে বৃদ্ধি ঘটেছে। ফলে উৎপাদন খরচও মারাত্মকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। স্বাভাবিকভাবেই দেখা যায়, বিভিন্ন দায়িত্বে থাকা কর্তৃপক্ষ-কর্মকর্তাদের বেশিরভাগই নিজেদের স্বার্থ পূরণের জন্য সরবরাহকারীদের নানাভাবে অনৈতিক সুবিধা প্রদানের ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। বাস্তবের চেয়ে অস্বাভাবিক উচ্চহারে কাঁচামাল সংগ্রহ করায় উৎপাদনের ওপর খরচের প্রভাব বিশ্লেষণ করতে অক্ষমতার প্রমাণ দিয়েছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে, ২০১১-১২ সালে উৎপাদনের পরিমাণ ছিল ৮০ হাজার মেট্রিক টন এবং উৎপাদনের পরিবর্তনশীল খরচ ছিল প্রতি মেট্রিক টনের জন্য প্রায় ৩৯ হাজার টাকা। কিন্তু ২০১০-১১ সালে উৎপাদন ছিল মাত্র ৫২ হাজার মেট্রিক টন এবং উৎপাদনের পরিবর্তনশীল খরচ ছিল প্রতি মেট্রিক টনের জন্য ২৯ হাজার টাকা, যা ২০১১-১২ সালের তুলনায় অনেক কম। যদিও ২০১০-১১ সালে উৎপাদন কম ছিল। উল্লেখ্য, সংশ্লিষ্ট মন্ত্রক সেই উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে যথাযথ পদক্ষেপ নেওয়ার কোনও চেষ্টাই করেনি, যাদের এক সময় দুর্নীতির অভিযোগে বরখাস্ত করা হয়েছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত নির্দোষ মেনে নিয়ে কোনও পদক্ষেপ ছাড়াই তাদের ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল।

অপ্রচলিত উৎস ব্যবহার করে প্রধানত পেপার মিলের বাজারের অংশীদারিত্ব অক্ষুণ্ণ রাখা নিশ্চিত করতে ধারণক্ষমতার ব্যবহার ২০১০-১১ অর্থবছরের ৫২ শতাংশ থেকে ২০১১-১২ সালে ৮০ শতাংশ পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছে। কাছাড় কাগজকলের কিছু লজিস্টিক্যাল সীমাবদ্ধতা থাকার জন্য ইনবাউন্ড এবং আউটবাউন্ড উভয় ক্ষেত্রেই প্রতি মেট্রিক টনে অতিরিক্ত প্রায় ৬ থেকে ৮ হাজার টাকা খরচ করতে হয়েছে। ২০১১ সালের মার্চ মাস থেকে ২০১৪-র জানুয়ারি পর্যন্ত মিজোরাম থেকে বাঁশ আহরণ নিষিদ্ধ থাকলেও এরপর থেকে ধীরে ধীরে বাঁশের সঙ্কট কাটিয়ে উঠতে সক্ষম হয়েছে। বরাক উপত্যকার নিজস্ব এলাকায় জন্মানো বাঁশ থেকে ৯০ হাজার মেট্রিক টন বাঁশ সরবরাহের দরপত্র চূড়ান্ত করা হয় এবং পেপার মিল এই উৎস থেকে ৬৫ হাজার ৯৫৩ মেট্রিক টন বাঁশ সংগ্রহ করেছে, ২০১২-১৩ সালেও সেই সরবরাহ অব্যাহত ছিল। বাঁশ সরবরাহের জন্য ২০১২ সালের ৪ অক্টোবর তারিখে ডিমা হাসাও স্বায়ত্তশাসিত পরিষদের সঙ্গে ২০ বছরের দীর্ঘমেয়াদি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় এবং চুক্তি অনুযায়ী ২০১২ সালের ৪ নভেম্বর থেকে সরবরাহ শুরু হয়েছিল। এরপর ২০১৪ সালের ১৯ মে তারিখের একটি আদেশে মেঘালয়ে কয়লা খনির ওপর জাতীয় গ্রিন ট্রাইব্যুনালের নিষেধাজ্ঞার জন্য ২০১৪-১৫ সালে কয়লা সঙ্কট শুরু হয়ে যায়। ২০১৫ সালের ২১ অক্টোবর থেকে মিলটি সম্পূর্ণভাবে বন্ধ হয়ে যাওয়ায় কর্মসংস্থানে নিয়োজিত শত শত শ্রমিক হঠাৎ করেই বেকার হয়ে যায়। উল্লেখ্য, ২০১৫ সালের ১ ডিসেম্বর পর্যন্ত স্থায়ী কর্মচারীর সংখ্যা ছিল ৮৬৩ জন এবং চুক্তিভিত্তিক কর্মীর সংখ্যা ছিল ১,১৭৬ জন। আবার, ২০১৫ থেকে ২০২০ সাল পর্যন্ত চাকরি থেকে অবসরপ্রাপ্ত ব্যক্তির মোট সংখ্যা ছিল ৩৬৩ জন। হিসেব অনুযায়ী দেখানো হয়েছে, ২০১৫ সালের ৩১ জুলাই

পর্যন্ত কাছাড় কাগজকলের দায়বদ্ধতার পরিমাণ প্রায় ১,১০০ কোটি টাকা। এছাড়া ২০১৫ সালের ৩০ নভেম্বরের হিসেব অনুযায়ী আসাম রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদের কাছে ১৯.৮০ কোটি টাকার দায়বদ্ধতা রয়েছে বলে জানা গিয়েছে। এই পরিস্থিতিতে কাগজ কলকে রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদের শিল্পশক্তি ব্যবহার করতে না দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল বলেও জানা গেছে।

কাছাড় কাগজকলের কর্মীদের মাধ্যমে বিভিন্ন গঠনমূলক সামাজিক কাজকর্ম করারও ইতিহাস রয়েছে। বিভিন্ন সামাজিক কল্যাণমূলক কার্যক্রম, খেলাধুলো, বন্যাদুর্গতদের জন্য ত্রাণ ইত্যাদিতে আর্থিক সাহায্য এগিয়ে দেওয়া, পানীয়জলের ব্যবস্থা, পার্শ্ববর্তী গ্রামে রাস্তা নির্মাণ, হাসপাতালের সুবিধা-সহ বিনামূল্যে চিকিৎসা শিবিরের ব্যবস্থা, কাছাকাছি গ্রামগুলোর দরিদ্র ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে বইখাতা বিতরণ, শিক্ষার বিস্তারের জন্য স্কুলভবন নির্মাণ করা, স্বচ্ছ ভারত অভিযানের অধীনে টয়লেট নির্মাণ, মিল প্রাঙ্গণে সফলভাবে স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবিরের আয়োজনের পাশাপাশি একটি স্বাস্থ্যকর পরিবেশ তৈরি করতে সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড সম্পাদন ইত্যাদি অবদানের কথা উল্লেখ রয়েছে বার্ষিক প্রতিবেদনে।

ভোটের দামামা বাজার সঙ্গে সঙ্গে বড় বড় নেতৃবৃন্দ মিথ্যা প্রতিশ্রুতির বন্যা বইয়ে দিলেন। কেন্দ্র এবং রাজ্য সরকার উভয়ের পক্ষ থেকেই আসামের দু'টি পেপার মিলকে অচিরেই পুনরুজ্জীবিত করার আশ্বাসও দেওয়া হলো। কিন্তু এরপর ব্রহ্মপুত্র ও বরাকের বুক চিরে প্রচুর জল বয়ে গেলেও বাস্তবে কাজের কাজ কিছুই হলো না। ২০১৭ সালের ১৩ মার্চ থেকে জাগিরোডেও উৎপাদন বন্ধ হয়ে গেল। পাঁচগ্রাম ও জাগিরোড কাগজকলে মোট স্থায়ী কর্মী প্রায় ২০০০, অস্থায়ী কর্মী ৫০০০ ছাড়াও ঠিকাদার, ঠিকাকর্মী, সকলের পরিবার মিলিয়ে কল বন্ধ থাকায় লক্ষাধিক মানুষ সহ দু'টি শহরের ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত অন্ধকারে তলিয়ে গেল। কিন্তু, জনগণ এটা খুবই উদ্বেগের সঙ্গে লক্ষ্য করেছেন, কিছু কর্মকর্তা তাদের নিজেদের স্বার্থরক্ষায় ইচ্ছাকৃতভাবে অভিজ্ঞতার বিভিন্ন শর্ত অন্তর্ভুক্ত করেছেন শুধুমাত্র সে-সব সরবরাহকারীর সঙ্গে চুক্তি করার জন্য, যাদের সঙ্গে তাদের সম্পর্ক রয়েছে। যেমন, কয়লা, বাঁশ ইত্যাদির মতো কাঁচামাল সরবরাহে ন্যায্য প্রতিযোগিতার সব বিকল্পকে নষ্ট করে দেওয়া হয়েছে। উল্লেখ্য, মিলটি সক্রিয় থাকাকালীন সময়ে লক্ষাধিক মানুষ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে মিলের স্বাভাবিক কার্যক্রমের ওপর নির্ভরশীল ছিল। হিন্দুস্থান পেপার কর্পোরেশনের একটি ইউনিট হিসেবে কাছাড় কাগজকল শুধুমাত্র ভারতের প্রত্যন্ত অঞ্চলে আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের জন্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেনি, উচ্চমানের লেখা এবং মুদ্রণ কাগজ তৈরি করে একটি লাভজনক ইউনিট হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয়েছে, যা বিভিন্ন তথ্য থেকেই প্রমাণ পাওয়া যায়।

শুধুমাত্র কৃষির ওপর নির্ভরশীল হয়ে অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্ভব নয়। কর্মসংস্থান বৃদ্ধি, উৎপাদন বৃদ্ধির পাশাপাশি বর্তমান বিশ্বায়নে বাজারে টিকে থাকতে হলে কৃষির সঙ্গে সঙ্গে শিল্পে উন্নত হওয়া ছাড়া কোনও বিকল্প পথ নেই। এ অবস্থায় উপত্যকার একমাত্র শিল্পকে ধ্বংস করে কোনওভাবেই অর্থনৈতিক উন্নতি সম্ভব নয়। উপত্যকায় যে পরিমাণ বেকার ছেলেমেয়ে রয়েছে, সে পরিমাণ কর্মসংস্থান নেই। এই বেকারত্ব দূর করতে হলে সর্বপ্রথম পর্যাপ্ত পরিমাণে কর্মসংস্থান সৃষ্টি করতে হবে, যার দায়িত্ব পুরোপুরি সরকারের। অর্থনৈতিক অংশগ্রহণের সুযোগ বৃদ্ধি করলেই সারাদেশে বেকারত্বের সংখ্যা হ্রাস পাওয়া সম্ভব। কিন্তু দেখা যাচ্ছে, বেকারত্ব দূর করার লক্ষ্যে সরকার মুখে যা-ই বলুক, বাস্তব চিত্র দেখিয়ে দিচ্ছে বিভিন্ন দুর্নীতি-সহ সরকারের নেতিবাচক ভূমিকা। উপত্যকার একমাত্র শিল্পপ্রতিষ্ঠানকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দেওয়ার পেছনে রয়েছে বিভিন্ন স্তরে নানা দুর্নীতি।

এক বিবৃতির মাধ্যমে কাগজকল কর্মীসংস্থার নেতাদের বক্তব্য অনুযায়ী জানা যায়, দু'টি কাগজকল বিক্রির জন্য ১ হাজার ১৩৯ কোটি টাকা ঠিক করা হয়ে থাকলেও লিকুইডেটর কুলদীপ ভার্মার জারি করা ২০২১ সালের ২৫ নভেম্বরের অন্য আরেক নির্দেশে বলা হয়, মিল দু'টিকে ৭৮৬ কোটি ১৮ লক্ষ টাকায় নিলাম করা যাবে, যা নীতিগতভাবে জাতীয় কোম্পানি আইন ট্রাইব্যুনালের নির্দেশের পরিপন্থী। এ ব্যাপারে কর্মীসংস্থার নেতাদের আপত্তির কারণ হচ্ছে, নতুন এই আদেশ কার্যকর করার অর্থ হচ্ছে জাতীয় কোম্পানি আইন ট্রাইব্যুনালের পুরনো নির্দেশকে অসম্মান করার পাশাপাশি ক্ষমতার অপব্যবহার করা। কারণ, দু'টি কাগজকলের ন্যূনতম মূল্য ১ হাজার ১৩৯ কোটি টাকা নির্ধারিত করেই নিলামের নির্দেশ দেওয়া হলেও পরবর্তী সময়ে আশ্চর্যজনকভাবে সম্পত্তির পরিমাণ কমিয়ে ৯৬৯ কোটি টাকা দেখানো হয়। উল্লেখ্য, ২০২১ সালের ১১ নভেম্বর রাজ্য সরকারের প্রস্তাব আসাম শিল্প উন্নয়ন নিগমের মাধ্যমে লিকুইডেটরকে চিঠি দিয়ে জানিয়ে দেওয়া হয়েছিল। বলে রাখা ভাল, ২০২১ সালের আগস্ট মাসের প্রথম ও তৃতীয় দিনের অনুষ্ঠিত সভায় আসামের মুখ্যমন্ত্রী কর্তৃক লিকুইডেটরের অধীনে হিন্দুস্থান পেপার কর্পোরেশন লিমিটেডের কর্মী ও কর্মচারীদের প্রস্তাবিত প্রস্তাবের পর্যালোচনা করা হয় এবং পরবর্তীতে একই বছরের ৬ সেপ্টেম্বর শিল্প ও বাণিজ্য বিভাগের মন্ত্রী এবং জলসম্পদ বিভাগের মন্ত্রীর আহ্বানে আরেকটি বৈঠকের ব্যবস্থা করা হয়। আসাম সরকার প্রদত্ত মোট ত্রাণ প্যাকেজ প্রস্তাবে হিন্দুস্থান পেপার কর্পোরেশনের সব শ্রমিক ইউনিয়ন এবং কর্মচারী সমিতির সদস্যরা উপায়হীন হয়ে সম্মতি জানাতে বাধ্য হন এবং আলোচনাক্রমে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী দু'টি কাগজকলের কর্মীদের বেতন-সহ অন্যান্য পাওনা বাবদ মাত্র ৫৭০ কোটি ব্যয় করতে রাজি হয়েছেন। আসাম সরকার হিন্দুস্থান পেপার কর্পোরেশন দ্বারা নিযুক্ত সমবায়ের চুক্তিভিত্তিক কর্মীদের সংশ্লিষ্ট ইউনিটের কার্যক্রম স্থগিত করার আগে লিকুইডেটরের সরবরাহ করা রেকর্ডের ভিত্তিতে মাত্র ১৮ মাসের বেতন ত্রাণ হিসেবে প্রদান করা হবে বলে জানানো হয়েছিল। এখানে জেনে নেওয়া ভাল, ২০১৫ সালে কাগজকল বন্ধ ঘোষণা হলেও কর্মীদের ২০১৬ সালের ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত বেতন দিয়ে দেওয়া হয়েছে। তাই রাজ্য সরকারের সঙ্গে হওয়া চুক্তি অনুযায়ী সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে, স্থায়ী কর্মচারীদের ক্ষেত্রে ২০১৭ সালের জানুয়ারি থেকে ২০১৯-র এপ্রিল পর্যন্ত ২৮ মাসের বেতন দেওয়া হবে। এছাড়া গ্র্যাচুইটি-সহ ২০১৫ সালের অক্টোবর থেকে ২০১৯-র এপ্রিল মাস পর্যন্ত অবদানকারী প্রদান তহবিলের টাকা ২০২২ সাল শুরু হওয়ার আগেই দিয়ে দেওয়া হবে বলে চুক্তিপত্রে স্বাক্ষরিত হয়েছে। ২০২১ সালের ডিসেম্বর মাসের মধ্যেই কর্মীদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে জমা হয়ে যাবে বলে মন্ত্রী সদর্পে ঘোষণা করেছিলেন।

রাজ্যের দু'টি কাগজকল বন্ধ হওয়ার ফলে বিপুল সংখ্যক শ্রমিক-কর্মচারী তাদের বকেয়া না পাওয়ায় এক অসহায় অবস্থার সৃষ্টি হয়। তবে বিভিন্ন মহলের আর্জি মেনে নিয়ে শেষ পর্যন্ত রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী সরকারিভাবে কাগজকল কর্মচারী ইউনিয়নের সঙ্গে মতবিনিময় করে ২০২১ সালের ২৮ সেপ্টেম্বর ৫৭০ কোটি টাকার রিলিফ প্যাকেজ নিয়ে এক চুক্তি সম্পাদিত হওয়ার কয়েক মাস পেরিয়ে গেলেও গাছের ফল সহজে পাকেনি। সাত মাসের বেশি সময় পার হয়ে যাওয়ার পর রাজ্য মন্ত্রিসভা গত ৩ মে কাছাড় এবং নগাঁও কাগজকলের বিপন্ন কর্মচারীদের সঙ্কট মোচনে রিলিফ প্যাকেজ হিসেবে ৩০৮.৭৫ কোটি টাকা মঞ্জুর করে। যদিও চুক্তি অনুযায়ী রিলিফ প্যাকজের পরিমাণ ছিল ৫৭০ কোটি টাকা। ফলস্বরূপ, এই মঞ্জুরিকৃত অর্থের পরিমাণ জানতে পেরে কাগজকল কর্মচারী ইউনিয়ন সন্তুষ্ট হতে পারেনি। এছাড়াও বলা হয়েছে, যাদের চাকরির বয়স রয়েছে তাদের মধ্যে ১০০ জনকে চাকরি দেওয়া হবে। কিন্তু এই চাকরি দিতে যে রকম শর্ত রাখা হয়েছে, তাতে অনেকেই চাকরি নিতে চাইছেন না। কাছাড় কাগজকলের বিএমএস সভাপতি উৎপল

দত্তচৌধুরীর বক্তব্য অনুযায়ী জানা যায়, রাজ্য সরকার মিল কেনার জন্য ২৭৫ কোটি টাকা এনসিএলটি-কে দিয়েছে, যদিও এই যুক্তি জাকরুর সভাপতি মানবেন্দ্র চক্রবর্তী মেনে নিতে পারেননি। যা-ই হোক, ইতিমধ্যে এনসিএলটি অবশ্য কর্মচারীদের ২৮ মাসের মধ্যে ১২ মাসের বেতন ছেড়ে দিয়েছে। রাজ্য সরকার কবে নাগাদ বাকি ১৬ মাসের বেতন ছাড়বে, সেই আশায় কর্মচারীদের তীর্থের কাকের মতো বসে থাকতে হয়েছে। ইতিমধ্যে আত্মহত্যা, বিনা চিকিৎসা ইত্যাদি বিভিন্ন কারণে ১১৭ জন কর্মচারীকে পৃথিবী থেকে চলে যেতে হয়েছে। যারা বেঁচে আছেন, তারাও নানা কষ্টের মধ্য দিয়ে দিন কাটাচ্ছেন। অথচ কাগজকল দু'টি পুনরুজ্জীবিত হলে প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে কয়েক হাজার বেকার যুবক-যুবতীর কর্মসংস্থানের পথ সুগম করা সম্ভব হতো। কিন্তু, এটাই বাস্তব সত্য, রাষ্ট্রায়ত্ত সব সংস্থাকে ধ্বংস করে দিতে বা বেসরকারীকরণে বর্তমান সরকার বদ্ধপরিকর।

শেষ পর্যন্ত ২০২২ সালের ৭ জুলাই গুয়াহাটির শ্রীমন্ত শংকরদেব কলাক্ষেত্রে এক জাঁকালো অনুষ্ঠান আয়োজন করে ২০০৩ জন স্থায়ী এবং ৭৪৮ জন অস্থায়ী কর্মচারী অর্থাৎ মোট ২৭৫১ জন কাগজকল কর্মীকে আর্থিক সাহায্য দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়। ৬৬ জনকে রাজ্য সরকারের বিভিন্ন বিভাগে নিযুক্তির কথা বললেও আরোপিত শর্তের জন্য অনেকেই যেতে রাজি হননি। উল্লেখ্য, সরকারের বক্তব্য অনুযায়ী, কাগজকল কর্মচারীদের তাদের বেতন, গ্র্যাচুইটি ইত্যাদি বকেয়া টাকা বিতরণের ব্যবস্থা করার কথা বলা হলেও কেউই পুরো টাকা পাননি। এমনকী পে স্লিপ সহ টাকার কোনও হিসেবও কর্মচারীদের দেওয়া হয়নি। রাজ্যের কাগজকল দু'টি অধিগ্রহণ করতে গিয়ে সরকারি প্রতিবেদন অনুযায়ী ৮১০ কোটি টাকা খরচ করতে হয়েছে। তবে যোগাযোগ ব্যবস্থা বন্ধ থাকায় অনেক চেষ্টা করেও ওই অনুষ্ঠানে কাছাড় কাগজকলের কর্মীরা যোগদান করতে পারেননি। অবশ্য কাছাড় কাগজকলের কর্মীদের গুয়াহাটি নিয়ে যাওয়ার ব্যাপারে সরকারি ব্যবস্থার মধ্যে প্রচুর অনিয়ম এবং বিশৃঙ্খলা-সহ আন্তরিকতার অভাব থাকলেও বিপন্ন কর্মীরা সেই মুহূর্তে মুখ বুজে মেনে নিতে বাধ্য হয়েছেন। উল্লেখ্য, প্রথম পর্যায়ে সরকারের পক্ষ থেকে ৮৬ কোটি ১২ লক্ষ ৫২ হাজার ৩১৮ টাকা কাছাড় কাগজকলের ৭৯৫ জন কর্মচারীর মধ্যে বিতরণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। সরকারের জেলা প্রশাসনের তরফে উল্লেখ করা হয়েছে, কাছাড় কাগজকলের ১৪০৯ জন বিভিন্ন স্তরের আধিকারিক ও কর্মচারীর মধ্যে ১৩৬৬ জনের নথিপত্র যাচাই করা হয়েছে। এর মধ্যে প্রথম পর্যায়ে ৭৯৫ জনের খাতায় বকেয়া টাকা প্রদানের ব্যবস্থা করা হয়েছে। কিন্তু এই রিলিফ কর্মচারীদের মনকে সন্তুষ্ট করতে না পারার পেছনে প্রচুর যুক্তিসঙ্গত কারণ রয়ে গেছে। এক হিসেব অনুযায়ী দেখা যায়, কাছাড় কাগজকলে মোট ৯০৭ জন স্থায়ী কর্মী এবং ৪৮৫ জন ঠিকাভিত্তিক কর্মচারী রয়েছেন। একইভাবে নগাঁও কাগজকলের কর্মীর সংখ্যা যথাক্রমে ৯৮৯ জন এবং ১৯৩ জন। অর্থাৎ, ঠিকাভিত্তিক মোট কর্মীর সংখ্যা ৬৭৮ জন। এছাড়া কলকাতার হিন্দুস্থান কাগজকলের কর্পোরেট অফিসে কর্মীর সংখ্যা হচ্ছে ১০৬ জন।

সরকার যে ৮১০ কোটি টাকার প্যাকেজের কথা বলেছে, সেটা কর্মচারী ইউনিয়নের কাছে স্পষ্ট নয় বলে ইউনিয়নের পক্ষ থেকে উল্লেখ করা হয়েছে। ইউনিয়নের সঙ্গে আলোচনাসাপেক্ষে রিলিফ প্যাকেজের কথা ঘোষণা করা হলেও সেটা মানা হয়নি। চুক্তি অনুযায়ী বকেয়া বেতন, প্রভিডেন্ট ফান্ড, গ্র্যাচুইটি, পেনশন দেওয়ার কথা উল্লেখ থাকলেও বাস্তবের সঙ্গে মিল পাওয়া যাচ্ছে না বলে উষ্মা প্রকাশ করেছেন চুক্তিতে স্বাক্ষর করা নেতৃবৃন্দ। তাঁদের বক্তব্য অনুযায়ী বোঝা যাচ্ছে, ৮১০ কোটি টাকার প্যাকেজ হলে তো কোনও টাকাই বকেয়া থাকত না। অবশ্য এই কর্মচারীদের রিলিফ দেওয়ার ব্যবস্থা করায় ইউনিয়নের পক্ষ থেকে বর্তমান সরকারকে ধন্যবাদ জানানো হয়েছে। তবে সময়মতো এই রিলিফের ব্যবস্থা করতে পারলে ১০৭ জন

কাগজকল কর্মীর অকাল মৃত্যুকে এড়ানো সম্ভব হতো। এই অকাল মৃত্যুগুলোর দায়ভার কিন্তু পূর্বতন রাজ্য সরকার এড়িয়ে যেতে পারে না। সাত বছর ধরে বন্ধ থাকার ফলে মিলের অনেক কর্মীর ছেলেমেয়ের পড়াশোনা নষ্ট হয়ে যাওয়ায় অনেকের ভবিষ্যৎ জীবনও নষ্ট হয়ে গেছে । এরকম পরিস্থিতি সৃষ্টির জন্য মিলের অসাধু কর্মকর্তা সহ নির্লজ্জ ও অকর্মণ্য সরকারকে পুরোপুরি দায়ী করা যেতে পারে ।

২০২১ সালের সেপ্টেম্বর মাস নাগাদ রাজ্য সরকার কর্তৃক ৭০০ কোটি টাকার আর্থিক প্যাকেজের অনুমোদন দেওয়া হয়। এই অনুমোদনের আট মাস পর চলতি বছরের মে মাসের ১১ তারিখ হিন্দুস্থান পেপার কর্পোরেশন লিমিটেডের অংশীদারদের সঙ্গে আলোচনক্রমে কর্মচারীদের গ্র্যাচুইটির টাকা দিতে রাজ্য সরকারকে আরও ১১০ কোটির অনুমোদন দিতে হয়। চুক্তি অনুযায়ী কর্মচারীদের ক্ষতিপূরণ দেওয়ার কথাও উল্লেখ রয়েছে। এছাড়াও চুক্তি অনুযায়ী বলা হয়েছে, ২৫ কোটি টাকা দিয়ে ট্রাস্ট শুরু করা হবে এবং জরুরি পরিস্থিতিতে প্রয়োজনভিত্তিক কর্মচারীদের সামান্য আর্থিক সাহায্য দেওয়ার ব্যবস্থা করা হতে পারে। জানিয়ে রাখা প্রয়োজন, রাজ্য সরকারের তরফে লিকুইডেটরকে দিতে হয়েছে ৩৫০ কোটি টাকা, যার মধ্যে ৫০ কোটি টাকা কর্মচারীদের দেওয়া হবে। মিল দু'টি রাজ্য সরকারের নামে রেজিস্ট্রেশন করার জন্য ১৫ কোটি টাকা দেওয়া হয়েছে। একইসঙ্গে সরকারের তরফে এটাও ঘোষণা করা হয়েছে, নগাঁও কাগজকলের জন্য ৮০.৭০ কোটি, কাছাড় কাগজকলের জন্য ৮৬.১২ কোটি এবং কলকাতার কর্মীদের জন্য ১২ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। তবে এতসব ঘটনার পরও জনসাধারণের মনে প্রশ্ন উত্থাপিত হয়েছে, যে সময়ে ব্যক্তিগত খণ্ডের কাগজকল লাভজনক অবস্থায় চলছে তখন রাজ্যের দু'টি কাগজকলের অপমৃত্যু ঘটানো অনেক অপ্রকাশিত কথার ইঙ্গিত বহন করে। কাগজকল দু'টির পরিচালকমণ্ডলীতে থাকা কর্মকর্তা-সহ স্থানীয় রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ নিজেদের লাভালাভের ব্যাপারকে অত্যধিক গুরুত্ব দিতে গিয়ে মিলকে ধ্বংস করে দিতে কুণ্ঠাবোধ করেননি।

আগামী দিনে বরাক উপত্যকার ভোটের কথা মাথায় রেখে সরকার তার বক্তব্যে কাছাড় কাগজকলকে পুনরুজ্জীবিত করার জন্য চেষ্টার কথা বলেছে। হয়তো বা রাষ্ট্রায়ত্ত না হয়ে বেসরকারি প্রতিষ্ঠান হিসেবেও এই ভারী শিল্পের নতুনভাবে জন্ম হতে পারে। তবে এটাও তো সত্য, উপত্যকার মানুষ সরকারের এরকম ফাঁপা আশ্বাস শুনতে শুনতে অভ্যস্ত হয়ে গেছেন। ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় মহাসড়কের কাজের অগ্রগতি থাকলেও বরাকে এসে মুখ থুবড়ে বসে থাকে। একইভাবে রেল যোগাযোগ, সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থা, নতুন মেডিক্যাল কলেজ স্থাপনের পাশাপাশি উন্নত চিকিৎসাব্যবস্থা, উপত্যকার বেকার সমস্যা সমাধান-সহ প্রতিটি ক্ষেত্রেই এই উপত্যকার প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ মানুষ লক্ষ্য করে আসছেন। ভোট প্রাক্কালে রাজনৈতিক নেতারা উপত্যকায় এসে জনগণের দুঃখ-দুর্দশা দেখে মানসিকভাবে খুব কষ্ট পেয়ে (!) কুমির ক্রন্দনের মাধ্যমে নানা আশ্বাস দিয়ে উপত্যকার প্রতি সহানুভূতি দেখানোর চেষ্টা করে থাকেন। উপত্যকার মানুষ বুক ভরা আশা নিয়ে বিভিন্ন স্বাদের নাটক উপভোগ করার সুযোগ পেয়ে যান। কিন্তু ভোটপর্ব শেষে সব আশ্বাসের বাণী বরাকের স্রোতে কোথায় চলে যায়, কেউ খবর রাখে না। তাই, 'রাজার বাড়ি মুখ না ধোওয়া পর্যন্ত কোনও বিশ্বাস নেই', প্রবাদবাক্যটি উপত্যকার ক্ষেত্রে পুরোপুরি সত্য।

বর্তমান ভারতের সবচেয়ে কঠিন সমস্যাগুলোর একটি হচ্ছে বেকারত্ব। মানুষের কর্মশক্তিকে বাস্তবায়িত করার মধ্যে নিহিত রয়েছে জীবনের সার্থকতা। সেই শক্তি যদি কাজের ক্ষেত্র না পায়, স্বাভাবিকভাবে সেই শক্তির অপচয় ঘটিয়ে নতুন শক্তির সৃষ্টি হবে, যা সমাজের জন্য হবে প্রচণ্ড ক্ষতিকারক। কোনও দেশের সমর্থ মানবসম্পদ যদি কর্মহীন থাকে, তবে জাতীয় মানব সম্পদের অপচয় যে ভয়াবহ

আকার নেয়, তা আমরা দেখতে পাই। যোগ্যতা অনুসারে চাকরি না পেলে তো এই কর্মহীন যুবক-যুবতীরা দেশের জন্য বোঝা হয়ে দাঁড়াবেই। এমনকী অনেক সময় দেশের জন্য ক্ষতিকরও হয়ে দাঁড়াবে এবং স্বাভাবিকভাবেই সৃষ্টি হবে এক কলুষিত সমাজ। এ বিষয়ে উপত্যকার সঠিক উন্নতিকল্পে বন্ধ হয়ে যাওয়া শিল্পগুলোকে চালু করতে তথা উপত্যকার বেকার ছেলেমেয়েদের আর্থিকভাবে শক্তিশালী করে তুলতে রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের বিজ্ঞানসম্মতভাবে চিন্তা করা অত্যন্ত প্রয়োজন। শিল্পের উন্নতি ছাড়া কোনও একটি অঞ্চলের উন্নতি অসম্ভব। একথাগুলো জানার পরও উপত্যকার একমাত্র শিল্পকে ধ্বংস করে পিছিয়ে থাকা এই অঞ্চলকে আরও অন্ধকারের দিকে ঠেলে দেওয়া হলো। ফলস্বরূপ উপত্যকায় বেকারের সংখ্যা কয়েকগুণ বাড়িয়ে দেওয়া হলো। এটা ভুলে গেলে চলবে না, ভোট-বৈতরণী পার করতে গিয়ে যুবসম্প্রদায়কেই তাদের অর্থনৈতিক দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে যথেচ্ছভাবে ব্যবহার করা হয়ে থাকে। ভোটপর্বে কর্মসংস্থানের আশ্বাস সহ নানা প্রলোভন দেখিয়ে এই যুবসম্প্রদায়কেই কাজে লাগানো হয়ে থাকে। বেকারত্বের জন্যই দেশে রাজনৈতিক দোলাচলের সৃষ্টি হয় এবং পাশাপাশি সামাজিক অস্থিতাবস্থা সহ নানা অসামাজিক ক্রিয়াকলাপ বৃদ্ধি পায়। অর্থনৈতিক মুক্তির জন্য বেকার সমস্যার সমাধান খুবই প্রয়োজন। শিল্পকে ধ্বংস করে একটি অঞ্চলের, রাজ্যের বা দেশের অর্থনৈতিক উন্নতি সম্ভব নয়। তাছাড়া অনুন্নত শিল্প বা শিল্পের আধুনিকীকরণের অভাবের জন্য ভারতে বেকারত্ব বেড়েই চলেছে।

অর্থনৈতিক উন্নয়ন পর্ষদ : মুক্তির ইস্তাহার

দীপক সেনগুপ্ত

বরাক উপত্যকা বঙ্গ সাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্মেলনের কেন্দ্রীয় সমিতি ২০০৪-০৫ সালকে 'অর্থনৈতিক অনুসন্ধান বর্ষ' হিসেবে পালনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। এই ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত একটি মৌলিক প্রশ্নের জন্ম দিয়েছিল। সাহিত্য এবং সংস্কৃতি চর্চার উদ্দেশ্যে গঠিত কোনও সংগঠন হঠাৎ অর্থনীতি বিষয়ে এত আগ্রহ দেখাতে শুরু করেছিল কেন? উত্তর খুঁজতে গিয়ে স্বামী বিবেকানন্দের একটা উক্তির কথা মনে হল, উক্তিটি হচ্ছে 'খালি পেটে ধর্ম হয় না।' এই কথার সূত্র ধরেই বলা যায়, খালি পেটে সাহিত্য-সংস্কৃতি চর্চাও হয় না। অর্থনীতির সঙ্গে সাহিত্য এবং সংস্কৃতির প্রত্যক্ষ সম্পর্ক রয়েছে। অর্থনীতি হচ্ছে ভিত্তি বা কাঠামো, যার ওপর সাহিত্য-সংস্কৃতির পরিকাঠামো তৈরি হয়। সামন্তবাদী উৎপাদন ব্যবস্থা যে সামাজিক মূল্যবোধের জন্ম দিয়েছিল, পুঁজিবাদী উৎপাদন ব্যবস্থার প্রবর্তনে তার আমূল পরিবর্তন হয়েছিল। পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক ব্যবস্থার বিকাশের যুগে ইউরোপে যেমন রেনেসাঁ আন্দোলনের সূচনা হয়েছিল, ভারতে দেরিতে হলেও অষ্টাদশ উনবিংশ শতকে বঙ্গদেশে নবজাগরণ আন্দোলনের জন্ম হয়েছিল। নবজাগরণ আন্দোলনের সুবাদে উন্নত সাহিত্য-সংস্কৃতির চর্চা শুরু হয়েছিল। সেই উন্নত সাহিত্য-সংস্কৃতির গৌরবময় ঐতিহ্যের শ্লাঘাবোধে বরাক উপত্যকা বঙ্গ সাহিত্য সংস্কৃতির জন্ম এবং পথচলা। ১৯৭৭ সালের শুরুতেই (৮ এবং ৯ জানুয়ারি) যে সংগঠনের জন্ম, আড়াই দশক কাল অতিক্রম করে সেই সংগঠনের কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রশ্নে মনোনিবেশ করেছিল।

উল্লিখিত আড়াই দশক সময়কালে বিদেশি বিতাড়ন আন্দোলন থেকে শুরু করে '৮৬ সালের ভাষা আন্দোলন সহ নানাবিধ সামাজিক অস্থিরতা যে বিপন্নতাকে আবাহন করেছিল, তার পথ ধরেই এই উপত্যকার অর্থনীতি অবনমনের অতলে ডুবে যাচ্ছিল। এই সন্ধিক্ষণে বরাক উপত্যকা বঙ্গ সাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্মেলনের ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত গাঢ়তর অন্ধকারে প্রজ্বলিত প্রদীপের আলো হয়ে এক নূতন রাস্তার সন্ধান দিল। রাজস্ব বৃদ্ধির প্রয়োজনে আসামের সঙ্গে বরাক উপত্যকার সংযুক্তিকরণ প্রমাণ করে, তৎকালীন সুরমা উপত্যকার সম্প্রসারিত এই অঞ্চল যা পরবর্তী সময়ে কাছাড় এবং অধুনা বরাক উপত্যকা নামে পরিচিত, সেই অঞ্চলের অর্থনৈতিক বুনিয়াদ কত ছিল। কিন্তু সময়ের কালবেলায় দাঁড়িয়ে যে অর্থনৈতিক চালচিত্র পরিলক্ষিত হয়েছিল, তা ছিল অত্যন্ত হতাশাব্যঞ্জক। একমাত্রিক উগ্র প্রাদেশিকতাবাদ যে বৈষম্যের জন্ম দিয়েছিল, তাতে বরাক উপত্যকা ও ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার মধ্যে প্রশস্ত বিভাজনরেখা এঁকে দিয়েছিল, যার ব্যাপ্তি ও গভীরতা সময়ের স্রোতে এতটাই বেড়েছিল যে, সংবেদনশীল মনে যথেষ্ট ক্ষোভ ও বেদনার জন্ম হয়েছিল। এই ক্ষোভ ও বেদনার ভেতর থেকেই ফিনিক্স পাখির মতো স্বশাসিত অর্থনৈতিক উন্নয়ন পর্ষদের সিদ্ধান্তটি ডানা মেলে দিল।

বরাক উপত্যকার অর্থনীতি মূলত চা-শিল্পকে কেন্দ্র করেই। এর বাইরে কোনও সংগঠিত শিল্প নেই। কোনও এক সময় সমগ্র দেশের সঙ্গে এই উপত্যকায় সমবায় আন্দোলন অনেক ছোট-বড় কুটিরশিল্প সহ কৃষিপণ্যের এক বিস্তৃত বাজার তৈরি করেছিল। বরাক উপত্যকার চিনিকল এবং কাগজকল এখন ইতিহাসের পাতায় স্থান নিয়েছে। বহুজাতিক তেল কোম্পানি এই উপত্যকায় এসেও চলে গেল। শিল্পের অভাবে এই উপত্যকা যেমন অর্থনৈতিক স্বনির্ভরতা অর্জনে ব্যর্থ, অন্যদিকে এই উপত্যকার নিজস্ব কোনও রাজনৈতিক প্রতিনিধিত্ব তৈরি হয়নি। ভারতের বিভিন্ন রাজ্যের স্থানীয় শিল্পপতি গোষ্ঠীরা জাতীয় পুঁজিপতি শ্রেণিদের সঙ্গে দরাদরির সুবিধার্থে এবং নিজের রাজ্যে অর্থনৈতিক উন্নয়নে বিনিয়োগ-সহ পরিকাঠামো উন্নয়নে ঠিকাদারি কাজে নিজেদের আধিপত্য বজায় রাখতে নিজেদের পছন্দের আঞ্চলিক দলগুলোর পেছনে দাঁড়িয়ে আর্থিক অনুদানের মাধ্যমে দলগুলোকে বাঁচিয়ে রাখে এবং এই দলগুলো আঞ্চলিক পর্যায়ের বিভিন্ন গণদাবিকে রাজনৈতিক আন্দোলনে রূপান্তরিত করে। দুর্ভাগ্যের বিষয়, বরাক উপত্যকার নিজস্ব কোনও রাজনৈতিক দল নেই। যে দলগুলো আছে, হয় সেগুলো জাতীয় পর্যায়ের বা রাজ্যস্তরের। জাতীয় বা রাজ্যস্তরের কোনও দল কোনও কালেই বরাকের দাবিকে যথাযোগ্য গুরুত্ব দিতে পারেনি। বরাক উপত্যকা ও ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার অদৃশ্য টানাপোড়েনে আবর্তিত আসামের রাজ্য রাজনীতিতে দুই পরস্পরবিরোধী স্বার্থের সমীকরণে ক্ষমতার অলিন্দে বিচরণকারী দলগুলো ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার দিকেই নতজানু হয়। এই বাস্তব বরাক উপত্যকায় কোনও দিনই পৃথক রাজ্যের দাবিতে হাওয়া দেয়নি। বরাককে কেন্দ্রশাসিত রাজ্য করার পক্ষে সত্তরের দশকে যে দাবি উঠেছিল, কার্যত সেই দাবিকে রাজনৈতিক দাবি করার মতো কোনও রাজনৈতিক দল না থাকায় কেন্দ্রশাসিত রাজ্য হয়েও হয়নি। সুযোগ এসেছিল। সুযোগকে কাজে লাগানো গেল না শুধু রাজনৈতিক দলগুলোর দৃঢ়তার অভাবে। আর কেন্দ্রশাসিত রাজ্যই বা হবে কেন, পূর্ণ রাজ্যই বা নয় কেন? আসাম ভেঙে একাধিক পূর্ণ রাজ্যের জন্ম হলেও কাছাড় বা বরাক উপত্যকার ভাগ্যে শিকে ছিঁড়েনি। পরবর্তী সময়ে জনবিন্যাসের জুজুর ভয় এই উপত্যকার রাজনীতিতে অনেক আগেই এক অদ্ভুত মেরুকরণ ঘটিয়েছিল। পরবর্তী পর্যায়ে যা তীব্র থেকে তীব্রতর হয়েছে এবং অসাম্প্রদায়িক বাঙালি জাতীয় সত্তাকে প্রত্যাহ্বান জানিয়েছে। এই প্রেক্ষিতে স্বশাসিত অর্থনৈতিক উন্নয়ন পর্ষদের দাবি এক বিকল্প পথের সন্ধান দিল, যা বরাক উপত্যকার আত্মমর্যাদাকে ক্ষুণ্ণ না করেও আসামের সঙ্গে নিজেকে যুক্ত রাখতে সক্ষম হবে এবং নিজেদের উন্নয়নসাধনে বিভিন্ন প্রকল্প তৈরি করতে পারবে।

রাষ্ট্র এবং সমাজ এই দুই প্রতিষ্ঠানের দ্বিরালাপ এবং দ্বৈরথে আমরা সুশাসিত বা শোষিত হই। মুক্ত অর্থনীতির পথে হেঁটে যাওয়া ভারতের একচেটিয়া পুঁজি যখন আগ্রাসী সাম্রাজ্যবাদী চেহারা নিতে উদ্যত, তখন খুব স্বাভাবিকভাবেই রাষ্ট্রে সব ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত হচ্ছে। কেন্দ্রীভূত ক্ষমতা রাষ্ট্র নিজেকে দুর্বল থেকে দুর্বলতর হয়ে যাওয়া সমাজ থেকে ক্রমশ বিচ্ছিন্ন করছে। এই পর্যায়ে সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানগুলো একদিকে যেমন প্রাণহীন হচ্ছে, অন্যদিকে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ বিপন্ন থেকে বিপন্নতর হচ্ছে। এই সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে বরাক উপত্যকা বঙ্গ সাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্মেলনের ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত এক নূতন যুগের ইস্তাহার। নব্বইয়ের দশকের মুক্ত অর্থনীতির বিশ্বায়নের বিপ্রতীপে ষাট-সত্তরের দশকের সমাজ বিপ্লবের ইস্তাহার। যদিও বিভিন্ন সম্প্রদায়ভিত্তিক অর্থনৈতিক উন্নয়ন পর্ষদ তৈরি নির্বাচনী পাটিগণিতের লাভ-লোকসানের হিসেব আগে করা হয়েছে, এতে সার্বিক কোনও উন্নয়নের প্রকল্প তৈরি হয়নি। কেননা, ভাষাভিত্তিক বা ধর্মভিত্তিক বিভাজন যখন সমাজে বিরোধাত্মক দ্বন্দ্বের মাধ্যমে একের কাছে অন্য প্রতিপক্ষ হয়ে উঠছে, তখন মিলনের মহামন্ত্র-সম প্রস্তাবিত এই ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত সব বিভাজনকে মুছে দিয়ে দক্ষিণ আসামের এই সমতল ভূমিতে বহু

বর্ণময়তার ঐতিহ্যকে মেনে নিয়ে বহুভাষিক সমন্বয় সমিতি গঠনের মাধ্যমে স্বশাসিত উন্নয়ন পর্ষদ গঠনের লক্ষ্যে জনমত তৈরি এবং সামাজিক আন্দোলনের দিকে পা বাড়িয়েছিল।

স্বশাসিত উন্নয়ন পর্ষদ গঠনের উদ্দেশ্যে আয়োজিত এক গণ-অভিবর্তনের আয়োজন করা হয়েছিল ২০০৫ সালের ১৮ ডিসেম্বর। সীমান্ত শহর করিমগঞ্জের ঐতিহ্যবাহী করিমগঞ্জ কলেজের সভাগৃহে উপচে পরা ভিড়ে আনুষ্ঠানিক প্রস্তাব পেশ করা হয়েছিল। বিভিন্ন ভাষিক জনগোষ্ঠীর উপস্থিতিতে এবং মতবিনিময়ের মধ্য দিয়ে এক যৌথ ঘোষণাপত্রকে তুলে ধরা হয়েছিল। আটটি কর্মসূচির সম্মিলিত ঘোষণাপত্রের অন্যতম মুখ্য ঘোষণা ছিল এক বহুভাষিক সমন্বয় সমিতি গঠন। যখন আসাম সহ সমগ্র দেশ এমনকী আন্তর্জাতিক পরিসরে বিচ্ছিন্নতাবাদ মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছিল, তখন মহামিলনের মন্ত্র উচ্চারণের এক ব্যতিক্রমী প্রয়াস বরাক উপত্যকা বঙ্গ সাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্মেলনের পক্ষ থেকে নেওয়া হয়েছিল। ঘোষণাপত্রের প্রস্তাবনায় ছিল 'বরাক উপত্যকার অর্থনৈতিক বিকাশকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচনা করে আজকের অভিবর্তন দৃঢ়ভাবে এই অভিমত পোষণ করে যে, সকল ভাষাগোষ্ঠীর ভাষা ও সংস্কৃতির বিকাশ বরাক উপত্যকার অর্থনৈতিক বিকাশের সঙ্গে সম্পর্কান্বিত এবং সজীব অর্থনীতিই সাংস্কৃতিক সজীবতা সৃষ্টি করতে সক্ষম। বরাক উপত্যকার অর্থনৈতিক উন্নয়নের ব্যাপারে উপত্যকার সকল ভাষাগোষ্ঠীর সমন্বিত ও সংহত উদ্যোগ গ্রহণের আবশ্যকতা রয়েছে।' প্রস্তাব গ্রহণের পর এর বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে বরাক উপত্যকা বঙ্গ সাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্মেলনের সব দায়িত্বশীল সদস্য নিজেদের মধ্যে দায়িত্ব ভাগাভাগি করে এককভাবে বিভিন্ন ভাষিকগোষ্ঠীর সঙ্গে মতবিনিময় করে প্রত্যেক গোষ্ঠী থেকে তাদের নিজস্ব চিন্তা, ভাবনা, ক্ষোভ, বেদনা ও পরিকল্পনাকে বুঝতে চেষ্টা করলেন। দায়িত্বপ্রাপ্ত সদস্যরা অত্যন্ত আন্তরিকভাবে ধৈর্য ধরে প্রত্যেকের বক্তব্য শুনেছিলেন। বৃহৎ ভাষিকগোষ্ঠীর সদস্য হিসেবে অভিভাবকসম দায়িত্বকে স্বেচ্ছায় মাথায় তুলে নিয়ে বরাকবঙ্গের সদস্যদের এই কাজে অভিভূত সব ভাষিক জনগোষ্ঠী এক ছাতার নীচে এসে জন্ম দিয়েছিল এক গৌরবময় অধ্যায়ের। কাজটি যদিও খুব সহজ ছিল না, কেননা, দূর-দূরান্তে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর সঙ্গে যোগাযোগ ও তাদের টেনে নিয়ে আসা।

১১ জুন ২০০৬ তারিখে কাছাড় জেলার শিলচর শহরের দীননাথ নবকিশোর বালিকা বিদ্যালয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে 'বরাক উপত্যকা বহুভাষিক সমন্বয় সমিতি'। এখানে একটা কথা বলা প্রয়োজন, প্রদীপ জ্বালানোর আগে সলতে পাকানোর কাজ থাকে। ২০০৫ সালের ১৮ ডিসেম্বরের উল্লিখিত গণঅভিবর্তনে স্বশাসিত অর্থনৈতিক উন্নয়ন পর্ষদ গঠন এবং বহুভাষিক সমন্বয় সমিতির প্রস্তাব কোনও প্রস্তুতি ছাড়া আচমকা করা হয়নি, সলতে পাকানোর কাজটি হয়েছিল ২০০৫ সালের ২০ নভেম্বর। ওইদিন শিলচর নবকিশোর বালিকা বিদ্যালয়ে একটা মতবিনিময় সভার আয়োজন করা হয়েছিল। ওই সভায় মণিপুরি সাহিত্য সভা, বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরি সাহিত্য সভা, বরাক হিন্দি সাহিত্য সমিতি, ডিমাসা সাহিত্য সভা, চরই ভাষা গোষ্ঠী, গুর্খা নিবারক সমিতি, রংমাই সাহিত্য সভার প্রতিনিধিরা ছিলেন। সভায় সভাপতিত্ব করেছিলেন বরাক উপত্যকা বঙ্গ সাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্মেলনের কেন্দ্রীয় সমিতির তৎকালীন সভাপতি শ্যামলেন্দু চক্রবর্তী। সভাপতি অত্যন্ত আবেগিক গলায় বলেছিলেন, 'আমরা যারা এ উপত্যকায় বসবাস করছি, তারা এতকাল এককভাবে আপন আপন জাতিগোষ্ঠীর উন্নয়ন ও বিকাশের দাবিতে সোচ্চার রয়েছি কিন্তু সে প্রচেষ্টা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কিছু সংখ্যক ব্যক্তিবিশেষের স্বার্থবাদী চিন্তাধায় সফল হতে পারেনি। এর সঙ্গে রাজনীতিকদের কূটচাল ও স্বার্থ যুক্ত থাকায় বিভিন্ন ধরনের প্রচ্ছন্ন বিরোধিতার ক্ষেত্রটিও তৈরি করা হয়েছে।' সেদিনের সভায় সভাপতির বক্তব্যে স্বশাসিত অর্থনৈতিক উন্নয়ন পর্ষদের কথা উঠে আসে। 'স্বাভাবিক কারণেই প্রশ্ন তোলা

হয়েছে, সাহিত্য ও সংস্কৃতি চর্চার জন্য যে সংগঠন তারা এধরনের অর্থনৈতিক বিষয় নিয়ে অগ্রসর হতে চাইছে কেন, যখন এ ব্যাপারে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল রয়েছে। সাহিত্য-সংস্কৃতি সমাজ-জীবনবহির্ভূত কোনও বিষয় নয়। বরং সমাজ-জীবনের বিবর্তন ও অগ্রগতির ফসল সাহিত্য ও সংস্কৃতি। আর সমাজ-জীবনের সঙ্গে অর্থনীতি শুধু অঙ্গাঙ্গী জড়িয়েই নেই। বরং সমগ্র সমাজ-জীবনকেই আবর্তিত ও গতিশীল রাখছে তার অর্থনৈতিক ব্যবস্থা। অর্থনৈতিক সুস্থির ব্যবস্থা ছাড়া মানব-জীবনের অগ্রগমন অসম্ভব বলেই আমরা সাহিত্য-সংস্কৃতি সংগঠন হিসেবে মান্য করি, আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থা সম্পর্কে দৃষ্টি দেওয়া আমাদের অবশ্য কর্তব্যের মধ্যে পড়ে, বিশেষ করে যখন আমাদের বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর অর্থনৈতিক দুর্বিপাকে সুষ্ঠুভাবে জীবনযাপন ও বিকাশসাধন বাধাগ্রস্ত হয়ে উঠেছে। সমাজ-জীবনের বিকাশ ও উন্নয়ন সুষ্ঠু অর্থনৈতিক ব্যবস্থার মাধ্যমেই গড়ে ওঠে এবং সমাজের মানুষ উন্নততর জীবনধারায় প্রবাহিত উন্নতমানের মননের ফসল হিসেবে সাহিত্য ও সংস্কৃতির সৃষ্টি হয়। সুতরাং, সাহিত্য-সংস্কৃতির সংরক্ষক ধারক ও বাহক হিসেবে আমরা বিশ্বাস করি, আর্থ-সামাজিক বিষয়ে অনুসন্ধান, পর্যালোচনা ও দিক নির্ণয় করাটি আমাদের নৈতিক ও আবশ্যিক কর্তব্য ও দায়িত্ব।'

শুধু প্রস্তাব নিয়ে বসে থাকলেই কি হবে? প্রস্তাব বাস্তবায়নের আন্দোলনের বিস্তৃত কর্মসূচি নেওয়া প্রয়োজন। আন্দোলনের প্রথম কর্মসূচি হিসেবে ২০০৬ সালের ১৪ আগস্ট তারিখে বরাক উপত্যকার তিন জেলার জেলাশাসকের মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রীর উদ্দেশে স্মারকপত্র প্রদান করে 'অর্থনৈতিক উন্নয়ন পর্ষদ' দাবির সপক্ষে আন্দোলনের সূত্রপাত করা হয়। স্মারকপত্রে বহুভাষিক সমন্বয় সমিতির সব সদস্যের স্বাক্ষর ছিল। পরবর্তী সময়ে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী, ভারী শিল্পমন্ত্রী এবং ডোনার মন্ত্রীর কাছে স্মারকলিপি পাঠানো হয়। বহুভাষিক সমন্বয় সমিতির পক্ষ থেকে 'অর্থনৈতিক উন্নয়ন পর্ষদ'-র বিস্তারিত রূপরেখা তৈরির উদ্দেশ্যে গ্রাম-শহরের মানুষের সঙ্গে যোগাযোগ করে মতামত সংগ্রহ করা হয়েছিল।

জেলাস্তরের রাজনৈতিক দলগুলোর সমর্থন চাওয়া হয়। সমন্বয় সমিতির পক্ষ থেকে প্রচারপত্র ছাপিয়ে জনসাধারণের মধ্যে বিলি করা হয়েছিল। বরাক উপত্যকার অর্থনৈতিক সম্ভাবনা খতিয়ে দেখার উদ্দেশ্যে আসাম (শিলচর) বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের অধ্যাপক ড. নিরঞ্জন রায়ের নেতৃত্বে এক বিশেষজ্ঞ কমিটি তৈরি করা হয়েছিল।

বরাক উপত্যকার সুসন্তান জেএনইউ-র প্রাক্তন উপাচার্য প্রয়াত অর্থনীতিবিদ বারিদবরণ ভট্টাচার্য হাইলাকান্দিতে এসে বরাক উপত্যকা বঙ্গ সাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্মেলনের কেন্দ্রীয় সমিতি আয়োজিত 'বিপিনচন্দ্র পাল স্মারক বক্তৃতা' দিতে গিয়ে আশা ব্যক্ত করেন যে, আন্তর্জাতিক সীমানা হওয়ার সুবাদে এই উপত্যকার অর্থনৈতিক উন্নতির সম্ভাবনা প্রবল। বিশ্বায়নের যুগে যখন যখন প্রত্যেক দেশ আন্তর্জাতিক বাজারে নিজের পণ্যকে সাজিয়ে তুলতে আগ্রহী, তখন এই সুযোগ হেলায় নষ্ট করার কোনও মানেই নেই। তিনি এতটাই আশা ব্যক্ত করেন যে, ঠিকমতো সুযোগের ব্যবহার করা গেলে বরাক উপত্যকা দক্ষিণ এশিয়ার অন্যতম উল্লেখযোগ্য অঞ্চল হবে।

২০০৫ সালের পর থেকে ঘটে যাওয়া নানাবিধ ঘটনার সাল-তারিখ উল্লেখ করে এই নিবন্ধকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছি বটে, কিন্তু আরও একটি ইতিহাস অনালোচিত থেকে যাচ্ছে। এই পরিসরে যে কথা উল্লেখ করা প্রয়োজন, বরাক উপত্যকা বঙ্গ সাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্মেলন শুধুমাত্র একটি বিশুদ্ধ সাহিত্য বা বিনোদনমূলক সংস্কৃতির সংগঠন কোনও কালেই ছিল না। সংগঠনের কাছাড় জেলা সমিতির উদ্যোগে ১৯৯৩ সালে 'অস্তিত্বের সন্ধানে বরাক উপত্যকার বাঙালি : পঞ্চদশ শতকে উত্তরণ, পথ নির্ণয়ের সমস্যা ও আশু

কর্তব্যসূচি’ বিষয়ক একটি তিনদিনের অরাজনৈতিক সংসদের অর্থনীতি বিষয়ক অধিবেশনে প্রয়াত বিশিষ্ট সাংবাদিক রবিজিৎ চৌধুরীর সভাপতিত্বে মূল প্রস্তাব পেশ করেন অধ্যাপক ড. অপূর্বানন্দ মজুমদার। এই অধিবেশনে অনেকেই নিজেদের লিখিত সন্দর্ভ বা বক্তব্যে মতামত বিনিময় করেন। অধিবেশনে সক্রিয় অংশগ্রহণ করে যাঁরা উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছিলেন তাঁদের মধ্যে ড. বাণীপ্রসন্ন মিশ্র, ড. সুজিত চৌধুরী, ড. সৌরীন্দ্রকুমার ভট্টাচার্য, ড. শান্তনু দত্ত, ড. চন্দন দে এবং দীপক চক্রবর্তীর কথা স্মরণীয়। এই অধিবেশনে যে কথা উঠে এসেছিল —

১। প্রাক্-ব্রিটিশ যুগে এই অঞ্চলের স্বনির্ভর অর্থনীতি ছিল যা মূলত কৃষিনির্ভর এবং কুটির শিল্পজাত সামগ্রীর বিশেষ করে তাঁতশিল্পের বর্ধিত উৎপাদন।

২। ব্রিটিশ ভারতে চা-শিল্পের প্রচলন এবং বিদেশি পণ্য বাজারজাত হওয়ায় আধুনিকীকরণ যেমন হয়েছে, অন্যদিকে স্বনির্ভরতা ভেঙে গিয়েছিল এবং সমস্যার শুরু সেখান থেকেই।

৩। দেশভাগজনিত সমস্যা একদিকে যেমন ছিন্নমূল শরণার্থীর বোঝা বাড়িয়েছে, অন্যদিকে যোগাযোগ ব্যবস্থাকে সংকুচিত করে অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছে।

৪। স্বাধীনতা-পরবর্তী যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোয় রাজ্যে উগ্র প্রাদেশিকতাবাদ এবং ভাষাভিত্তিক রাজনীতির মেরুকরণ।

৫। ভূমি সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা। কেননা, এখানে প্রান্তিক চাষির সংখ্যাই বেশি।

৬। নদীর বাঁধ প্রকল্পে সরকারি বিভাগের আন্তরিকতা। উল্লেখ্য, অধ্যাপক বাণীপ্রসন্ন মিশ্রের লেখা POLITICS OF FLOOD CONTROL বইটি আলোচনায় স্থান পেয়েছিল।

৭। অনাবাদী জমিকে আবাদী এবং এক ফসলিকে দুই ফসলি জমিতে রূপান্তর করা। তিন ফসলি জমি নিয়ে চিন্তাভাবনার কোনও অবকাশই নেই। কেননা, বেশিরভাগ জমিই এক ফসলি।

৮। পুঁজির বিনিয়োগ।

৯। সমবায় আন্দোলনের ব্যর্থতা।

১০। নদীপথের উন্নয়ন।

কেন্দ্র সরকার যতই LOOK EAST অথবা ACT EAST প্রকল্প গ্রহণ করুক না কেন, বৈষম্যের রাজনীতি যতদিন চলবে ততদিন শব্দগুলো অলঙ্কার হয়ে শ্রীবৃদ্ধি করবে কিন্তু কাজের কাজ কিছুই হবে না। কেননা, পুঁজিবাদী অর্থনীতি বিকাশের যুগ অতিক্রম করে অবক্ষয়ের যুগে পৌঁছেছে এবং এই সময়ে বৈষম্যকে কেন্দ্র করেই পুঁজিবাদী ব্যবস্থা বেঁচে থাকতে চাইবে। সর্বত্র হয় ধর্মীয় মেরুকরণ, নয় ভাষিক সাম্প্রদায়িকতা অথবা বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর লড়াই, এই করেই পুঁজিবাদী উৎপাদন ব্যবস্থা বেঁচে থাকতে চাইছে।

প্রকৃতি নিজেকে উজাড় করে দক্ষিণ আসামের এই সমতল ভূমিকে সাজিয়েছে। ভূগর্ভস্থ তেল, খনিজ সম্পদ, বনজ সম্পদ, বিশাল জলভূমি, অনুকূল আবহাওয়া কোনও কিছুরই অভাব নেই, অভাব শুধু সদিচ্ছার।

বরাক উপত্যকা বঙ্গ সাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্মেলন ব্রডগেজ আন্দোলনের সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করেনি, যদিও নেপথ্যে আন্দোলনকে সমর্থন করে প্রেস বিবৃতি দিয়েছে এবং সদস্যরা ব্যক্তিগতভাবে যুক্ত হলে তাঁদের উৎসাহিত করা হয়েছে। ব্রডগেজ এসে যাওয়ার পর যোগাযোগের যে সুবন্দোবস্ত হয়েছে, তাতে যে অর্থনৈতিক উন্নয়ন আশা করা গিয়েছিল বাস্তবে তার কিছুই হয়নি। অথচ আনারস, কমলা-সহ এই অঞ্চলের ফলকে জাতীয় বা আন্তর্জাতিক বাজারে নিয়ে যাওয়ার মতো সরকারি সংস্থা নেই। নিজস্ব উদ্যোগে ক্ষুদ্র এবং প্রান্তিক চাষিরা সরাসরি বাজারে এসে অথবা দালালদের মাধ্যমে ফল বাজারজাত করে। ফলের রস

প্রক্রিয়াকরণের জন্য আধুনিক প্রযুক্তিকে কাজে লাগিয়ে বাতাবি লেবু, বেল সহ অনেক সস্তার স্থানীয় ফলের রস জাতীয় বাজারে আদৃত করে রাজস্ব আদায়ের বন্দোবস্ত করা যেতে পারে। সরকারি নিয়ন্ত্রণবিহীন এধরনের বাণিজ্যে যেমন রাজস্ব আদায় হচ্ছে না, অন্যদিকে চাষিরাও ন্যায্য দাম পাচ্ছে না। গুজরাটের আমুল দুগ্ধ প্রকল্পের অনুসরণে কাছাড়ে কোনও এক সময় সমবায় বিভাগ এবং গ্রামোন্নয়ন বিভাগের যৌথ উদ্যোগে কামুল প্রকল্প শুরু হলেও অদৃশ্য কারণেই তা বন্ধ হয়ে যায়। এই উপত্যকায় তাপবিদ্যুতের ছোট ছোট প্রকল্প করা যেতেই পারে। তুষ জ্বালিয়ে বিদ্যুৎ উৎপাদনের প্রকল্প বন্ধ হয়ে গেল, অথচ বিদ্যুৎ উৎপাদনের এই বিকল্প পন্থা বরাক উপত্যকায় বিক্ষিপ্তভাবে এক-দুই জায়গায় দেখা গেলেও খুব বেশি পরিমাণে করা যায়নি। চুনাপাথরের প্রাচুর্য আসাম-মেঘালয়ে সিমেন্ট শিল্পে বিপ্লব আনতে পারত। পর্যটনশিল্পের আধুনিকীকরণ নিয়ে সরকার ভাবছে না। অন্যথায় এই অঞ্চলের ঐতিসাহিক স্থানগুলো উন্নতমানের পর্যটন কেন্দ্র হতে পারত। চিনিকল এবং কাগজকলকে কার্যত মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিয়ে কোনও কোনও মহল আত্মপ্রসাদ অনুভব করেছিল। যে আত্মঘাতী উন্নাসিকতাকে বরাক উপত্যকার জনসাধারণ ভবিতব্য বা নিয়তি বলে যখন মেনে নিতে বাধ্য হয়েছে, একদিকে জনবিন্যাসের জুজুর ভয়, অন্যদিকে ঔপনিবেশিক শাসনের জাঁতাকলের কাছে স্বশাসিত অর্থনৈতিক উন্নয়ন পর্ষদের ধারণা অনেকের কাছেই অভিনব এবং গ্রহণযোগ্য মনে হয়েছে। একমাত্রিক জাতীয়বাদ বা প্রাদেশিকতাবাদের দর্শনে বিশ্বাসী দলগুলো মনের কথাকে মুখের কথা করতে পারেনি অর্থাৎ মন থেকে সমর্থন করলেও প্রকাশ্যে সমর্থন জানায়নি। এআইইউডিএফ দলটি ব্যতিক্রম। বহুভাষিক সমন্বয় সমিতির আহ্বানে গণসমাবেশ ও স্বশাসিত অর্থনৈতিক উন্নয়ন পর্ষদের সমর্থনে প্রচারের কাজে সক্রিয় সমর্থন ছাড়াও আসাম বিধানসভার অধিবেশনে দাঁড়িয়ে কাছাড় জেলার কাটিগড়ার বিধায়ক মওলানা আতাউর রহমান মাঝারভূইয়া স্বশাসিত অর্থনৈতিক পর্ষদের পক্ষে বক্তব্য রেখেছিলেন। আসাম বিধানসভার সদস্যরা কোনও নির্ণায়ক ভূমিকা নিতে পারতেন না, কেননা বিষয়টির নিষ্পত্তি ভারতের সংসদেই হওয়ার। স্বশাসিত উন্নয়ন পর্ষদ গঠনের জন্য সংবিধান সংশোধনের প্রয়োজন। সংবিধান সংশোধনের জন্য লোকসভা ও রাজ্যসভার সংখ্যা গরিষ্ঠের সমর্থন প্রয়োজন। বিহার, উত্তরপ্রদেশ, উত্তরাখণ্ড সহ একাধিক রাজ্য মাত্র কয়েক বছরের ব্যবধানেই জন্ম নিল খুব বড় ধরনের আন্দোলনেরও প্রয়োজন হয়নি, মহারাষ্ট্রের বিদর্ভে অর্থনৈতিক উন্নয়ন পর্ষদ গঠিত হলেও বরাক উপত্যকার খুশি হওয়ার কোনও সুযোগ নেই। কেননা, বরাক উপত্যকার গর্ব ও আত্মপরিচয়ের অহঙ্কার '৬১-র ভাষা আন্দোলন এখনও 'আঞ্চলিক দেশপ্রেমের গণ্ডি অতিক্রম করেনি'।

জেলা পরিষদ এবং বিধানসভা থাকা সত্ত্বেও হঠাৎ কেন স্বশাসিত অর্থনৈতিক উন্নয়ন পর্ষদের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিল? এই প্রশ্নকে সামনে রেখে আমরা উত্তর খোঁজার চেষ্টা করি। নিবন্ধের শুরুতেই রাষ্ট্রের সঙ্গে সমাজের সম্পর্কের কথা উল্লিখিত আছে। সেই সূত্র ধরেই বলা যায়, স্বশাসিত অর্থনৈতিক পর্ষদ এক যৌথ মঞ্চ, যেখানে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি ও সুশীল সমাজের সমন্বয় দেখা যাবে। নব্বইয়ের দশক থেকে কেন্দ্র এতটাই শক্তিশালী হয়েছে যে, যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোকে দুর্বল করে দিয়েছে। কেন্দ্রের টাকা অনেক ক্ষেত্রে সরাসরি পঞ্চায়েতের হাতে চলে যায়। পঞ্চায়েত প্রতিনিধিদের পছন্দের লোকেরাই কেন্দ্রের পাঠানো টাকা অনুদান বা ভর্তুকি হিসেবে পেয়ে থাকেন। বিভিন্ন প্রচারমাধ্যমে পঞ্চায়েত প্রতিনিধিদের দুর্নীতি এবং স্বজনপোষণের খবর প্রকাশিত হয়। একই কথা বিধায়কদের এবং সাংসদদের ক্ষেত্রেও শোনা যায়। আমাদের দেশের সংসদীয় গণতন্ত্রে জনপ্রতিনিধিরা জনসাধারণের একাংশের (অনেক ক্ষেত্রে ত্রিশ শতাংশের ভোট পেয়ে) ভোট পেয়ে নির্বাচিত হয়ে যান। নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের অনেকের গ্রহণযোগ্যতা যেমন নেই,

তাদের সব স্তরের জনগণের প্রতি আবেগ-ভালবাসা এমনকী দায়বদ্ধতাও থাকে না এবং জনগণের ভোটে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের ওপর নির্বাচনের পর জনসাধারণের কোনও নিয়ন্ত্রণ থাকে না। এই সঙ্কট সংসদীয় গণতন্ত্রের সবচেয়ে বড় সঙ্কট। এই সঙ্কট অবসানে স্বশাসিত অর্থনৈতিক পরিষদের একটা কাঠামো তৈরি সময়ের দাবি। এই দাবিকে মান্যতা দিয়েই বরাক উপত্যকা বঙ্গ সাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্মেলন এবং বহুভাষিক সমন্বয়ের পক্ষ থেকে নিম্নলিখিত কাঠামোকে রূপ দেওয়া হয়। ২০০৬ সালের পর ২০১২ অর্থাৎ ছয় বছরের আলাপ-আলোচনা এবং মতবিনিময় এই কাঠামোকে তৈরি করেছে। এই কাঠামোকে সামনে রেখেই ২০১২ সালের প্রথমার্ধে তিন জেলায় বহুভাষিক সমন্বয় সমিতি আহূত গণঅভিবর্তন আয়োজন করা হয়। তখন বঙ্গভবনে নিজস্ব প্রেক্ষাগৃহ ছিল না, শিলচরের উইমেন্স কলেজের মিলনায়তনে কাছাড় জেলাভিত্তিক গণঅভিবর্তন ২০১২ সালের ১১ সেপ্টেম্বর আয়োজিত হয়। তিন জেলার অভিবর্তনের পর ৩০ সেপ্টেম্বর ২০১২ সালে কেন্দ্রীয় অভিবর্তন করিমগঞ্জ শহরে আয়োজিত হয়। তৃণমূল স্তর থেকে কেন্দ্রীয় পর্যায়ের অভিবর্তনে গৃহীত রূপরেখা ২০১৩ সালের ২৫ এপ্রিল তারিখে আসামের তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী তরুণ গগৈর হাতে তুলে দেওয়া হয়েছিল।

প্রস্তাবিত স্বশাসিত অর্থনৈতিক উন্নয়ন পর্ষদের রূপরেখা উন্নয়ন পর্ষদের সাধারণ সদস্যের একটি মণ্ডলী থাকবে, সেই মণ্ডলীর একজন সভাপতি এবং একজন সহ-সভাপতি থাকবেন। কার্যনির্বাহী সমিতি থাকবে এবং কার্যনির্বাহী সদস্যের একজন অধ্যক্ষ ও একজন উপাধ্যক্ষ থাকবেন। সাধারণ সদস্যদের মণ্ডলীর সভ্যবৃন্দ—

১। দুই সাংসদ,

২। পনেরোজন বিধায়ক,

৩। জেলা পরিষদের সভাপতি,

৪। কর্পোরেশন, পুরসভা, টাউন কমিটির সভাপতি।

সাধারণ সদস্যরা সাধারণ সমিতির জন্য একজন সভাপতি এবং একজন সহ-সভাপতি নির্বাচিত করবেন।

সাধারণ সমিতির নিয়ন্ত্রণে থাকা বিভাগের আইএএস (কেন্দ্র সরকারের নিয়োগপ্রাপ্ত) পদমর্যাদার সেক্রেটারি থাকবেন, যার অধীনে অন্যান্য আধিকারিক বা কর্মচারী থাকবেন। সাধারণ সমিতির অধীনে থাকবে পরিকল্পনা বিভাগ (planning cell)। সাধারণ সদস্যদের মধ্য থেকেই কার্যনির্বাহী সমিতি তৈরি হবে। কার্যকরী সমিতির সভা পরিচালনা করবেন অধ্যক্ষ এবং তাঁর অনুপস্থিতিতে উপাধ্যক্ষ। নর্থ-ইস্টার্ন কাউন্সিলকে অনুসরণ করেই বরাক উপত্যকার জন্য স্বশাসিত অর্থনৈতিক উন্নয়ন পর্ষদ গড়ে তুলতে হবে।

GENERAL COUNCIL এবং EXECUTIVE COUNCIL-র সদস্যরা নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি এবং আমলা। তাঁরা সরকার বা রাষ্ট্রের প্রতিনিধি। এই দুই কমিটির কার্যকলাপকে পর্যবেক্ষণ করতে এবং পরিকল্পনা বিভাগের কাজকর্মে সক্রিয় পরিপূরক ভূমিকা নিতে একটি উপদেষ্টা মণ্ডলী থাকবে। উপদেষ্টা মণ্ডলীতে থাকবেন তিন জেলার জেলাশাসক সহ আসাম বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন প্রতিনিধি এবং বহুভাষিক সমন্বয় সমিতির সদস্য সব ভাষিকগোষ্ঠীর একজন করে প্রতিনিধি। উপদেষ্টা মণ্ডলীর সভাপতি এবং সহ-সভাপতির পদ বহুভাষিক সমন্বয় সমিতির সদস্যদের মধ্য থেকেই দু'জনকে নির্বাচিত করা হবে।

সংবিধান সংশোধনীর মাধ্যমে স্বশাসিত অর্থনৈতিক উন্নয়ন পর্ষদ গঠনের লক্ষ্যে সাংসদদের সমর্থন প্রয়োজন। সংবিধানের ২৪৪(২) এবং ২৭৫(১)-কে সম্প্রসারিত করা প্রয়োজন। ১৯৬৯ সালে ২২তম

সংবিধান সংশোধনীর মাধ্যমে ২৪৪ এবং ২৭৫ ধারাকে সম্প্রসারিত করা হয়েছিল। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বাধীন কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা সংবিধানের ষষ্ঠ ও ২৮০ অনুচ্ছেদে অনুমোদন জানিয়েছে। এই সংশোধনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো, এই সংশোধন উত্তর-পূর্বাঞ্চলের স্বশাসিত জেলা পর্ষদগুলোর আর্থিক ও প্রশাসনিক ক্ষমতা বৃদ্ধি করবে। উপজাতি অঞ্চলের জন্য সংবিধানের সুনির্দিষ্ট ধারা যদিও আছে কিন্তু সমতল বরাকের জন্য সংবিধানের ষষ্ঠ অনুচ্ছেদ প্রযোজ্য নয় অথচ বরাকের জনবিন্যাসে উপজাতিদের সংখ্যা উল্লেখযোগ্য। অন্যদিকে, চা জনজাতিদেরও উল্লেখযোগ্য সংখ্যা বরাকের জনবিন্যাসকে বর্ণময় করেছে। আর সংখ্যাগরিষ্ঠ বাঙালির বেশিরভাগই দেশভাগের বলি হয়ে এখানে এসে সমস্ত প্রতিকূলতার সঙ্গে লড়ে যাচ্ছেন। বরাক উপত্যকার জনসাধারণ এক বিশেষ অর্থনৈতিক সামাজিক এবং রাজনৈতিক অবস্থায় বসবাস করছেন। ১০৭তম সংবিধান সংশোধনের মাধ্যমে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের সীমানা অতিক্রম করে উত্তরবঙ্গে সম্প্রসারিত হয়েছে। অন্যদিকে, মহারাষ্ট্রের বিদর্ভ অঞ্চলেও এক ব্যতিক্রমী প্রয়াস বরাক উপত্যকা স্বশাসিত অর্থনৈতিক উন্নয়ন পর্ষদের দাবিকে সমৃদ্ধ করে। ‘VED (VIDARBHA ECONOMIC COUNCIL) IS A NON-POLITICAL ORGANISATION WITH THE ECONOMIC DEVELOPMENT OF VIDARBHA AS ITS CENTRAL THEME. SIGNIFICANTLY IT WORKS AS A MISSION TO SURVEY IDENTIFY STUDY AND THEN PERSUE VARIOUS THRUST AREAS LIKE TOURISM, MINING, LOGISTICS, HANDLOOM, SEZ OPPORTUNITIES ETC. সংবিধান সংশোধন করে স্বশাসিত অর্থনৈতিক উন্নয়ন পর্ষদ স্থাপনের মাধ্যমে বরাক উপত্যকার সঙ্গে ঘটে যাওয়া সব অন্যায়, অত্যাচার ও বৈষম্যের প্রায়শ্চিত্যে এক নূতন যুগের সূচনা হোক।

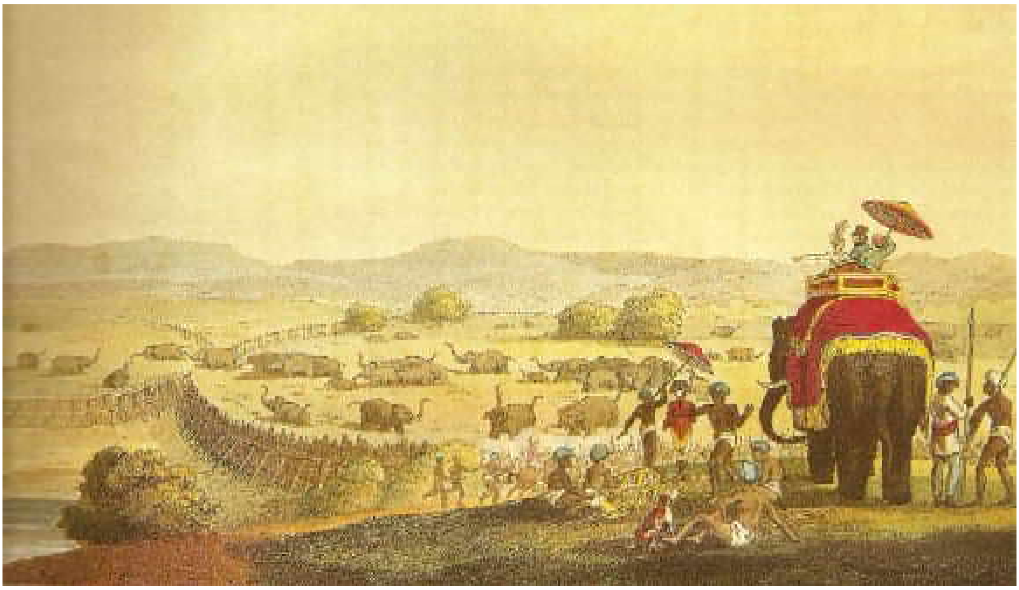

তাঁর খেদার দল হাতি ধরছে, সপরিবারে উপস্থিত এক সাহেব। শিল্পী স্যামুয়েল হাওইট

বিভাজন-পূর্ব সিলেট : বিস্মৃত বিদ্যা ও শিল্পের আখ্যান

জয়িতা দাস

সিলেট শহরজুড়ে সাজ সাজ রব। সেই উত্তেজনা থেকে মুক্ত নন খোদ লাটম্যান জনসন সাহেবও। খুব বেশিদিন হয়নি এই শহরে তিনি জেলাশাসক হয়ে এসেছেন। শহরের শিক্ষিত মহলের উৎসাহ দেখে কৌতূহল জাগছে তাঁরও। জাগছে আগ্রহ। অতএব এখানকার নিস্তরঙ্গ জীবনে যে বিশাল ঢেউ আছড়ে পড়তে চলেছে, সেই ঢেউয়ে গা ভাসিয়ে দিতে মানসিকভাবে প্রস্তুত রইলেন তিনিও।

সে ১২৮৬ বঙ্গাব্দের কথা (ইংরেজি ১৮৭৯ অথবা ১৮৮০)। সিলেট শহরের কোতোয়ালির পাশে চাঁদনিঘাটে এসে নামলেন রমাবাই ও তাঁর অগ্রজ শ্রীনিবাস শাস্ত্রী। শহরবাসী এতদিন এই দিনটির জন্যই অপেক্ষা করছিল। রমাবাই ও শ্রীনিবাস শাস্ত্রীকে একবার চোখের দেখা দেখার জন্য চাঁদনিঘাটে সেদিন শহরের ছেলেবুড়োদের ভিড় উপচে পড়ছে। রমাবাইর কলকাতা বিজয়, 'পণ্ডিতা' উপাধি লাভ— সব খবরই ততদিনে পৌঁছে গিয়েছে সিলেট শহরে। আধুনিককালে এর আগে এমন করে আর কোনও মহিলা তাঁর পাণ্ডিত্যের জন্য, নিয়ম ভাঙার জন্য চর্চিত হননি। ফলে কৌতূহল ছিল। আগ্রহ ছিল। ছিল উন্মাদনা। সুতরাং, সেদিন চাঁদনি ঘাট থেকে রমাবাই ও শ্রীনিবাস যখন বেরোলেন, তখন আমজনতাও তাঁদের অনুগামী হয়েছিল। বিশাল মিছিল করে তারা তাঁদের পৌঁছে দেয় শহরের খাজাঞ্চিবাড়ির পাশেই এক বাড়িতে। রমাবাই ও শ্রীনিবাসকে যাঁরা আমন্ত্রণ করে নিয়ে এসেছিলেন, তাঁরা সেখানেই তাঁদের থাকার ব্যবস্থা করেছিলেন।

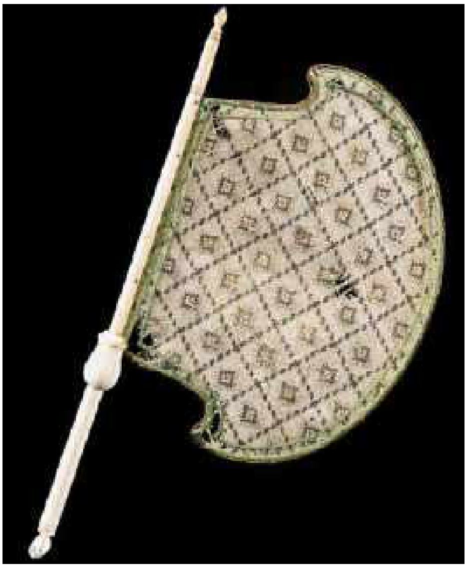

উনিশ শতকে সিলেটের গজদন্ত শিল্পীরা রুপোর তার ও হাতির দাঁত দিয়ে তৈরি করেছিল এই পাখা

সেবার সেই কমিটির উদ্যোগে শহরের মণিপুরি রাজবাড়ির বিশাল নাট-মণ্ডপে সভা করে বরণ করা হয়েছিল রমাবাই ও শ্রীনিবাসকে। ব্যবস্থাপনার দায়িত্বে ছিলেন কমিটির সভাপতি বিপিনবিহারী দাস। ভবিষ্যতে যাঁর সঙ্গে বিয়ে হবে রমাবাইর। তা সেই সভায় রমাবাইকে বরণ করে হাতে তুলে দেওয়া হয়েছিল একটি হাতির দাঁতের পাখা। সেসঙ্গে একটি সোনার আংটিও। হাতির দাঁতের পাখাটি তৈরি করাতে সেই আমলে নাকি খরচ পড়েছিল পঁচিশ টাকা।[১] সোনা-রুপোর তারের কারুকাজ করা সে এক আশ্চর্যসুন্দর পাখা! এর দু'বছর আগেকার এক রিপোর্ট বলছে, এধরণের পাখার দাম নাকি তখন সাঁইত্রিশ টাকার মতো ছিল। বোঝাই যাচ্ছে, কতটা সোনা-রুপো আর হাতির দাঁত লেগেছে— সেই বুঝে দাম ওঠানামা করত।

তা সাঁইত্রিশই হোক কিংবা পঁচিশ— দেড়শো বছর আগে এই টাকার মূল্য নেহাত কম ছিল না। সম্ভবত অনেক ভাবনাচিন্তা করেই কমিটির সদস্যরা সেদিন উপহার হিসেবে হাতির দাঁতের পাখা বেছে নিয়েছিলেন। হাতির দাঁত দিয়ে তৈরি পাটি আর পাখা নিয়ে তখন সিলেটবাসীর খুব গর্ব। কারণ, শুধু সিলেটের শিল্পীরাই জানত এই কাজ। দেশে-বিদেশেও তখন খুব কদর এর। ভারতের অন্য অন্য জায়গায় যখন গজদন্ত শিল্পীরা সব সৌখিন জিনিসপত্র, অলঙ্কার আর মন্দির-প্রাসাদের অলঙ্করণে ব্যস্ত, সিলেটের শিল্পীরা তখন হাতির দাঁত দিয়ে পাখা আর পাটি তৈরি করে চমকে দিয়েছিল গোটা ভারতকে। সেসঙ্গে ইউরোপকেও। ঐতিহ্যের সঙ্গে জড়ানো যা, উপহার হিসেবে সেই জিনিসটি অতিথিদের হাতে তুলে দিতে পারলে মন তৃপ্ত তো হবেই। সেদিন তৃপ্ত হয়েছিল সিলেটের বিদ্বৎসমাজও রমাবাইর হাতে গজদন্তের পাখা তুলে দিয়ে।

এখানে মনে এমন একটা প্রশ্ন জাগতেই পারে, কেন ভারতের অন্যান্য অঞ্চলের গজদন্ত-শিল্পীরা এমন এক অনন্য জিনিস তৈরি করতে যায়নি কখনও? কেন এই শিল্প শুধু সিলেটেই আটকে রইলো? এর কারণ হয়তো এই যে, যে-সব অঞ্চল হাতির দাঁতের কাজের জন্য বিখ্যাত ছিল, সে-সব অঞ্চলে পাটি তৈরির তেমন চল ছিল না। অপরদিকে, সিলেট বরাবরই শীতলপাটির জন্য বিখ্যাত। বলা ভালো, সিলেটের অন্যতম

শতাব্দীপ্রাচীন শিল্প হচ্ছে পাটি বোনা। আসলে কাঁচামালের জোগানই ঠিক করে, কোথায় কোন্ শিল্প গড়ে উঠবে? মুর্তা বেত-- যা দিয়ে কিনা তৈরি হয় শীতলপাটি, তা একমাত্র সিলেটেই পাওয়া যায়। এই মুর্তা বেত স্বভাবগুণেই শীতল এবং চিকন, মসৃণ আর চকচকে। এহেন শীতলপাটির সঙ্গে প্রতিযোগিতায় সাধারণ বেত দিয়ে তৈরি পাটি কি আর টিকতে পারে! ফলে সেই প্রাচীন যুগ থেকেই সিলেটের শীতলপাটিতে মজেছিল সবাই। দেশী-বিদেশি নির্বিশেষে। ইউরোপীয়রা তো এর প্রশংসায় পঞ্চমুখ। স্যার উইলিয়াম উইলসন হান্টার এমনই একজন। শীতলপাটির বর্ণনা দিতে গিয়ে তিনি লিখছেন, “A superior sort of mat, known as sitalpati, is manufactured in Sylhet District, which is much appreciated for its coolness and smooth, glazed texture.”[২] স্কটিশ এই সাহেব ছিলেন ব্রিটিশ ভারতের এক সিভিলিয়ান এবং ঐতিহাসিকও। তাঁর দেওয়া তথ্য বলছে, ১৮৭৬-১৮৭৭ সালে শুধু শীতলপাটি রফতানি করেই নাকি সিলেটের আয় হয়েছিল ৩৯২৭ পাউন্ড। আজকের টাকার হিসেবে যা প্রায় চার লক্ষ টাকার সামিল। আর হ্যাঁ, এ কিন্তু নিবন্ধীকৃত হিসেব। ‘নিবন্ধীকৃত’ শব্দটি ব্যবহার করে হান্টার যেন এই ইঙ্গিতই দেওয়ার চেষ্টা করলেন যে, এর বাইরেও গোপনে শুল্ক ফাঁকি দিয়ে শীতলপাটি রফতানি হত প্রচুর।

বোঝা গেলো নিশ্চয়ই, কেমন ছিল শীতল পাটির চাহিদা। দেশে তো বটেই, বিদেশের বাজারেও তখন এই শীতলপাটির মস্ত রমরমা। তা চাহিদা যেমন ছিল, তেমনি জোগানও ছিল। এতে বেড়েছে কারিগরদের দক্ষতা। এদিকে সিলেটে তখন হাতির দাঁতও বেশ সহজলভ্য। ফলে এই অঞ্চলে শীতলপাটির মতোই গজদন্ত শিল্পেরও রমরমা তখন। এমনও হতে পারে শীতলপাটির বাড়বাড়ন্তের প্রভাব পড়েছিল এই অঞ্চলের গজদন্ত শিল্পে। অবশ্য এ অনুমান মাত্র। বিকল্প যুক্তির সন্ধান না পাওয়া অবধি এই যুক্তিকে অস্বীকার করার তেমন জোরালো কারণ থাকতে পারে কি?

তা যা বলছিলাম, মাধ্যম পাল্টে এই যে নতুন এক রাজকীয় জিনিস তৈরি হল— তা নজর কেড়ে নিয়েছিল সবারই। নবাব-বাদশাদের তো বটেই। এর যা দাম, যে সে লোক কি আর এমন অমূল্য জিনিসের খরিদ্দার হতে পারে? এসব জিনিস শোভা বাড়াতো শুধু রাজারাজড়াদের প্রাসাদেই। সে হাতির দাঁতের পাটিই হোক কিংবা গজদন্তের অন্য কোনও সৌখিন জিনিসপত্র। শুধু রাজন্যবর্গ বললে অবশ্য ভুল হবে, সমাজের কেউকেটাদের ঘরেও সেই আমলে এমন জিনিস কমবেশি থাকত। নুন আনতে যাদের পান্তা ফুরোয়, তাদের সাধ্য কি এসব জিনিস কিনতে যায়! তবে হ্যাঁ, কখনও কখনও শখ করে সেকালের মধ্যবিত্তরাও হাতির দাঁতের জিনিস সংগ্রহ করত বইকি, তবে সেগুলো ছিল নিতান্তই সাদামাটা। চুড়ি, আংটি, চিরুনি, দোয়াত-কলম, ছোট বাক্স, কাগজ কাটার ছুরি, হুঁকোর নলের মুখ কিংবা খড়মের খুঁটিতেই তাদের কেনাকাটা সীমাবদ্ধ। খুব বেশি সৌখিন হলে দাবা কিংবা পাশাখেলার ঘুঁটি, ব্যস এই অবধিই তাদের রেস্তের জোর।

শখ মেটাতে সাধ্যের ভেতরে কেনা। কারুকাজের বাহাদুরি মধ্যবিত্তের সেই শখের জিনিসে ছিল না, যেমন থাকত রাজারাজড়াদের জন্য তৈরি জিনিসগুলিতে। আজকাল সোনার গয়নার দাম যেমন সোনার পরিমাণ আর নকশার মজুরির ওপর নির্ভর করে, তেমনই হাতির দাঁতের জিনিসের দামও কিন্তু হাতির দাঁত কতটা ব্যবহার হচ্ছে এবং এর ওপর কতটা কারুকাজ রয়েছে, এর ওপর নির্ভর করত। এসব তথ্য দিয়ে গেছেন ঐতিহাসিকরাই। এঁদেরই একজন, জেমস ডোনাল্ড। গোলাঘাটের অ্যাসিস্টান্ট কমিশনার ছিলেন। আসামের গজদন্ত শিল্পের ওপর একটা রিপোর্ট রয়েছে তাঁর। শিলং থেকে ১৯০০ সালে ‘মনোগ্রাফ অন আইভরি কার্ভিং ইন আসাম’ নামে তা প্রকাশিতও হয়েছিল। প্রকাশক, ব্রিটিশ শাসনাধীন আসাম সরকারের নিজস্ব প্রেস। সেখানে, ডোনাল্ড সাহেব লিখছেন, “The demand in the past must have almost

entirely been supplied by the rajas. The demand was, however, sufficient to occupy under one raja the full time of some forty men. Outside demand may not have been large.”[৩]

রাজারাজড়াদের শখ বলে কথা! অতএব সব রাজদরবারেই গজদন্ত-শিল্পীদের খুব কদর তখন। স্বর্ণকার, মণিকারদের মতোই খণ্ডিকররাও তখন দরবারি শিল্পী। দরবারের অন্নে পুষ্ট। দরবারের বেতনভোগী। রাজা-বাদশাদের শখ-আহ্লাদ মেটাত তাদের বিদ্যা। আর এই শ্রমের বিনিময়ে তারা পেত নিষ্কর ভূমি। মোগল রাজদরবারেও ছিল এমনই একদল গজদন্ত-শিল্পী। জাহাঙ্গির নিজে লিখে গিয়েছেন সে-কথা। তাঁর আত্মজীবনীতে। আহোম রাজাদেরও তা-ই। এই প্রসঙ্গে এক ইতিহাসবিদ লিখছেন, “In those past times the industry throve, the workers, patronized by the rajas and leading men of the court, received, as a return for their work, free grants of land and labour. In consideration for these privileges, a special class of workers, knowns as Khanikars, worked solely for the Rajas… Under the rajas the work was not altogether an optional one. There was a compulsory element. Care was taken to see that each man was kept busy at his trade, while at the same time the means of livelihood was certain.”[৪]

‘খনিকর’ নয়, আসলে শব্দটি ‘খণ্ডিকর’। অর্থ, হাতির দাঁতের কারিগর। সাহেবের উচ্চারণে গিয়ে দাঁড়িয়েছে খনিকর। যা বলছিলাম, সিলেটের প্রাচীন ইতিহাস ঘাঁটলেও দেখবো, এখানেও এর ব্যতিক্রম হয়নি। রাজ-আনুকূল্য এখানেও পেয়েছে এই শিল্প। ফিরে যাওয়া যাক, শুরুর সেই গল্পে। রমাবাই-শ্রীনিবাসের সিলেট ভ্রমণ দিয়ে যার শুরু, সেই গল্পের নটে গাছটি কিন্তু এখনও মোড়ায়নি। তাঁদের এই সিলেট-ভ্রমণ সেবার শতাব্দীপ্রাচীন এক ইতিহাসকেও উন্মোচিত করেছিল। গোড়া থেকেই বলা যাক। সিলেট জেলার মৌলভিবাজার মহকুমার এক গ্রাম, নাম ভাটেরা। সেই ভাটেরা বাজারের কয়েক কিলোমিটার দূরে দক্ষিণ-পশ্চিমে ‘ইটের টিলা’ নামে এক টিলা রয়েছে। কবে, কখন টিলার এমন নামকরণ হয়, সে অজ্ঞাত। পরম্পরাগত এই নাম সে কোন্ প্রাচীনকাল থেকেই চলে এসেছে। তা সেই গ্রামের জমিদার দেবচৌধুরীর অনুমতি নিয়ে শেখ কটাই নামে কোনও এক ব্যক্তি নিজের প্রয়োজনে মাটি খোঁড়াখুঁড়ি করলে প্রাচীন এক মন্দিরের ভিত বেরিয়ে আসে। সেসঙ্গে আট ফুট মাটির তলা থেকে বেরিয়ে আসে দুটি তাম্রপত্রও।

সে ১২৭৯ বঙ্গাব্দের কথা। জমিদার দেবচৌধুরী সেই তাম্রলিপিগুলো জমা দিয়ে এসেছিলেন জেলাশাসকের অফিসে। তা সেগুলো বেশ কয়েক বছর সেখানে অনাদরেই পড়ে রইলো। এর কয়েক বছর পর সিলেট এলেন রমাবাই আর শ্রীনিবাস। জেলাশাসক যে তখন লাটম্যান জনসন, সে আগেই বলেছি। এই দুই ভাইবোনের সঙ্গে তাঁর পরিচয় তখনই। সিলেটে রমাবাই-শ্রীনিবাসের প্রায় প্রতিটি সভাতেই সেই সময় জনসন উপস্থিত। সে-সব সভার সভাপতিও তিনি। এতে দু’পক্ষের মধ্যে একটা বোঝাপড়া, হৃদ্যতার সম্পর্ক তৈরি হয়। ভাইবোনের পাণ্ডিত্যে মুগ্ধ জনসন তখন ভাটেরা লিপিগুলো পড়তে দিলেন শ্রীনিবাস শাস্ত্রীকে। সেই প্রথম এগুলোর পাঠোদ্ধার। ব্যস, এই একটি পাঠেই আধুনিক সমাজে সিলেটের প্রাচীনত্ব স্বীকৃতি পেয়ে গেল।

সিলেটবাসীর কাছে খবরটি ছিল গৌরবের, অহঙ্কারের। যখন শ্রীনিবাস শাস্ত্রী সেই লিপি পাঠ করে জানালেন, শ্রীহট্ট-রাজ কেশবদেব আর তাঁর তৃতীয় পুত্র ঈশানদেবের কথা লেখা আছে এতে। এই লিপিগুলো তাঁদেরই করা ভূমি-দানপত্র। ভট্টপাটক অঞ্চলে বটেশ্বর মহাদেবের এক মন্দির প্রতিষ্ঠা করেছিলেন শ্রীহট্ট-রাজ কেশবদেব। সেই মন্দিরের ইষ্টদেবতার জন্য দেবোত্তর সম্পত্তি হিসেবে তিনি ৩৭৫ ভূহল জমি আর ২৯৬টি বাড়ি বা গৃহভূমি দান করেছিলেন। প্রথম শাসনটির বক্তব্য বিষয় হচ্ছে এই। আর

এখানেই, এই প্রথম তাম্রশাসনেই পাচ্ছি আমরা একটি নাম--‘দন্তকার বজরি’। মন্দির অলঙ্করণের জন্য যে গজদন্ত শিল্পীদের এখানে নিয়োগ করা হয়েছিল, ‘বজরি’ এদেরই একজন। ভূমিদান করা হয়েছিল তাকেও।[৫] এখানে অপ্রাসঙ্গিক হলেও বলে রাখি, গবেষকদের অনুমান, এই ভাটেরা নামটি আসলে ভট্টপাটকের অপভ্রংশ।

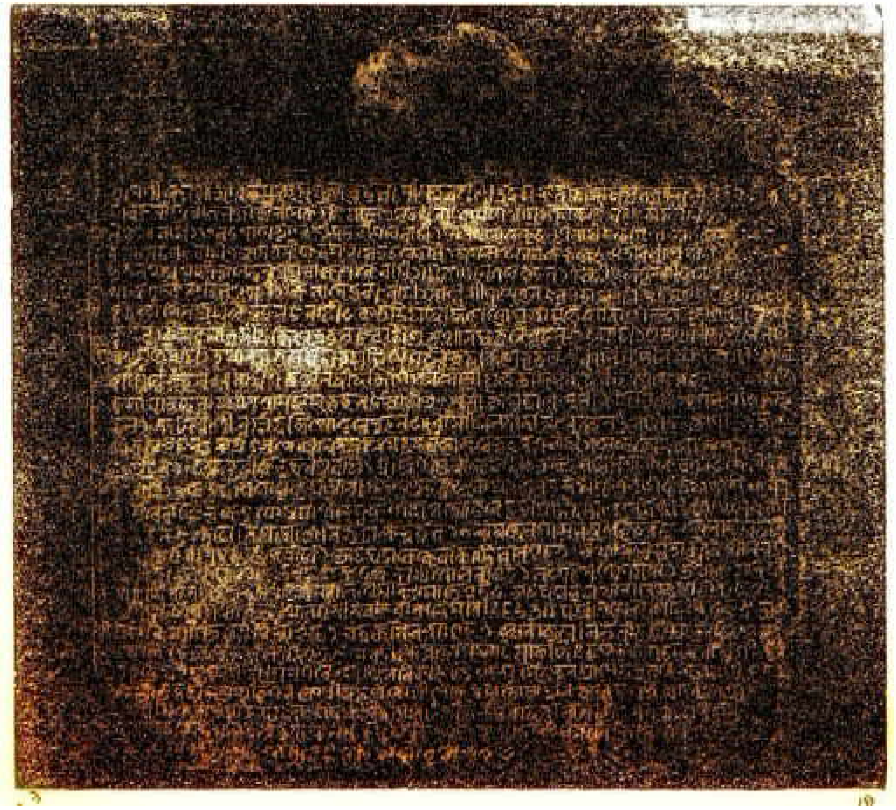

ভাটেরার তাম্রশাসন ১, সিলেটের গজদন্ত-শিল্পের সর্বপ্রথম উল্লেখ রয়েছে এই লিপিতেই

যা বলছিলাম, এরপরও কি আর সন্দেহ থাকে যে, সিলেট অঞ্চলেও রাজ-পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেছিল এই শিল্প! সেই প্রাচীনকাল থেকেই। এখন প্রশ্ন হল, কতটা প্রাচীন এই তাম্রপত্রগুলো? এ নিয়ে নানা মুনির নানা মত। শ্রীনিবাস শাস্ত্রীর পরামর্শে জনসন এই লিপিগুলোর প্রতিচিত্র পাঠিয়ে দিয়েছিলেন কলকাতায়। সেখানে ভারততাত্ত্বিক রাজেন্দ্রলাল মিত্র এর পাঠোদ্ধার করে যে সময়কাল নির্দেশ করেছেন, এর সঙ্গে আবার শ্রীনিবাস শাস্ত্রীর মত মিলছে না। এদিকে, পরবর্তীতে অচ্যুতচরণ চৌধুরী তত্ত্বনিধি, পদ্মনাথ ভট্টাচার্য বিদ্যাবিনোদ, রাজমোহন নাথ— এঁরাও একে-অপরের থেকে ভিন্ন মতামত পোষণ করেছেন। বর্তমানে সর্বজনগ্রাহ্য মতামতটি হচ্ছে এই যে, লিপিগুলি একাদশ শতকের।

হ্যাঁ, এতটাই প্রাচীন। অচ্যুতচরণ তত্ত্বনিধি লিখছেন, 'শ্রীহট্টের প্রাচীনত্বের একটি ঐতিহাসিক নিদর্শন ভাটেরার তাম্রফলক।'[৬] সিলেটের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সত্যিই প্রাচীন। প্রাচীন এই অঞ্চলের শিল্পও। হাতির দাঁতের কাজও সিলেটের এমনই এক প্রাচীন শিল্প। ভাটেরার লিপিতে দেবোত্তর সম্পত্তির যে বর্ণনা রয়েছে, এতে স্পষ্ট ভূমিদানে কোনও কার্পণ্য করেননি মহারাজ। তা দেবোত্তর সম্পত্তির পরিমাণই যদি এতটা হয়, তবে মন্দির তৈরিতে তিনি কতটা খরচ করেছিলেন, তা নিশ্চয়ই অনুমেয়। এত টাকা খরচ করে যে মন্দির তৈরি হচ্ছে, সেই মন্দিরের অলঙ্করণের ভার দক্ষ শিল্পীদের হাতে তুলে না দেওয়া অবধি কি আর নিশ্চিত হতে পারেন তিনি?

তা দক্ষ ছিলেন শিল্পীরা সব। ছিল তাদের উদ্ভাবনী শক্তিও। আর ছিল বলেই আমরা পেয়েছি হাতির দাঁতের পাটি। সে এক অদ্ভুত জিনিস। মুগ্ধ হয়ে দেখার মতো। প্রথমে তা নরম করার জন্য কারিগররা তা বেশ কিছুক্ষণ ভিজিয়ে রাখত জলে। পরে তা থেকে চিকন বেতের মতো পাত বের করে তা দিয়ে বুনত পাটি। এর সঙ্গে জুড়ে দিত সোনা-রূপার ফুল আর লতা পাতা। এমন একটি পাটি ঢাকার জাদুঘরে রয়েছে আজও। সিলেটের কারিগরদের হাতেই তৈরি। বরাত দিয়েছিলেন ঢাকার নবাব খাজা আহসানুল্লাহ (১৮৯৬-১৯০১)। এখন পর্যন্ত যতগুলো হাতের দাঁতের পাটি পাওয়া গেছে, এর মধ্যে এই পাটিটিই সব থেকে বড়। লম্বায় তা প্রায় আড়াই মিটার আর বহরে দেড় মিটার। এর চারপাশে সোনার পাতের ওপর অপূর্ব সব কারুকাজ। ব্রিটিশ মিউজিয়ামেও সিলেটের হাতির দাঁতের পাটি রয়েছে কয়েকটি। তবে নবাব বংশের পাটির তুলনায় আড়েবহরে অনেকটাই ছোট।

আর হাতির দাঁতের পাখা! সে-ও সিলেটের নিজস্ব উদ্ভাবন। অচ্যুতচরণের বক্তব্য অনুযায়ী, তাঁর সময়কালে কলকাতা মিউজিয়ামেও নাকি সিলেটে তৈরি এমন একটি হাতির দাঁতের পাখা ছিল। ষোড়শ শতকে ইউরোপীয় মেমসাহেব মহলে হাত পাখার ফ্যাশন ছিল খুব। ঐতিহাসিকরা বলছেন, ভারত, মিশর আর চিন থেকে নাকি এই ফ্যাশন পাড়ি দিয়েছিল ইউরোপে। তা মেমসাহেবদের এই জাপানিশৈলীর হাত পাখাও অনেক সময় হাতির দাঁত দিয়ে তৈরি হত। প্রশ্ন হল, সিলেটের খণ্ডিকররাও কি এমন শৈলীর পাখা তৈরি করত? মনে হয় না। অবশ্য ব্রিটিশ আমলে সাহেবদের কাছ থেকে এই অঞ্চলের খণ্ডিকররা এমন বরাত কখনও পেয়ে থাকলে আশ্চর্যের কিছু নেই। এমনিতে তাদের দক্ষতা ছিল নিখাদ এ দেশীয় স্টাইলের পাখা তৈরিতেই। আর এক্ষেত্রেও সেই পাটি বোনার স্টাইলটিকেই নকল করা হত। এককালে সিলেটের এই গজদন্তের পাখা আর পাটির কদর ছিল মোগল দরবারেও। মোগল দরবারের নিজস্ব বেতনভোগী গজদন্ত-শিল্পীরা তো আর হাতির দাঁতের পাটি বুনতে জানত না! আর জানত না বলেই সিলেট থেকে গজদন্তের পাটি আর পাখা যেত মোগল হারেমে। নবাবদের মন পেতে সিলেট ও এর আশপাশের আর দশটি জেলার রাজা উপাধিধারী জমিদাররাও হাতির দাঁতের পাটি ভেট পাঠাতেন দরবারে। সেইসঙ্গে শীতলপাটিও। সে মোগল দরবার থেকে ঢাকার দরবার, সবখানেই। 'ময়মনসিংহ গীতিকা'র 'রূপবতী' পালা অন্তত সেই কথাই বলছে--

> ''হাত্তির দাঁতের পাটি লইল গজমতি মালা।
> ভেট দিতে নবাবের করিল যে মেলা।।
> ... ...
> শীতলপাটি পাইয়া তবে শিতল হইল মন।

পাইল ভেটের দ্রব্য যত আয়োজন।।
দশ হাজার তঙ্কা পাইয়া খুশী হইল মিঞা।
রাজচন্দ্রে দিলা ঘর বাছাই করিয়া।।”

ঢাকার জাদুঘরে রক্ষিত সিলেটে তৈরি নবাব আহাসানুল্লাহের গজদন্তের পাটি

এ তো গেল পাখা আর পাটির কথা। তবে এই জাদু-আখ্যান কিন্তু এখানেই ফুরোয় না। আছে আরও। সেই আমলের সিলেটের খণ্ডিকররা সত্যিই জাদু জানত। বলছেন ঐতিহাসিকরাই। তারা যাই তৈরি করুক, মোগল দরবার হুমড়ি খেয়ে পড়ত সে-সবের ওপর। সংগ্রহ করত তারা। সে-সব মনকাড়া জিনিস। যোদ্ধা মোগলদের মধ্যে খুব কদর ছিল সে-সবের। সেপাই থেকে সিপাহশালার-- সবার হাতেই তখন শোভা পেত সিলেটের কারিগরদের হাতে তৈরি অস্ত্র।

হ্যাঁ, অস্ত্র। হাতির চামড়া আর হাড় দিয়ে তৈরি হত সে-সব। তৈরি হত অন্য শিল্পকর্মও। সিলেটে তখন মানুষের সহবাস হাতির সঙ্গেই। অতএব অফুরন্ত কাঁচামাল। পড়শি রাজ্য থেকেও কাঁচামালের জোগান ছিল প্রচুর। বলছি, মিজোরামের কথা। হাতিদের অবাধ বিচরণভূমি ছিল মিজোরামও। বলতে গেলে মিথুনের পর হাতিরই প্রাচুর্য সেখানে। শিকারি মিজোদের সংগ্রহে তখন অঢেল হাতির দাঁত। সমতলের লোকদের কাছ থেকে তারা চাল-নুন কিনত এর বিনিময়েই। সিলেটের ব্যবসায়ীদের তখন সোনায় সোহাগা। পুরনো দলিল-দস্তাবেজে রয়েছে সে-সব কথা— “...in the primitive Mizo economy, forest products (Mithun and elephant teeth) were the medium of exchange. The forests of Lushai (Mizo) Hills were the abode of elephants. Elephant hide was used to manufacture shields for infantry and cavalry of Mughals and native princes. The bones of Elephants were used to make butts of sword and to prepare fancy goods for nobility. Elephant tusks were in great demand for manufacturing luxury articles and ornaments. The Sylhet and chittagong merchants collected elephant teeth from Mizo Hills.”[৭]

নিজেদের ঘরে কাঁচামাল তো ছিলই, জোগান এসেছে পড়শি রাজ্য থেকেও। ফলে এই শিল্পের রমরমা ছিল খুব। তবে যা হয়, কালের নিয়মেই একটা সময় সিলেট থেকে হারিয়ে গেলো এই শিল্প। এর কারণ অনেক। অন্যতম প্রধান কারণ অবশ্যই মোগল দরবারের রমরমা ফুরিয়ে যাওয়া। সিলেটের গজদন্ত শিল্পের জাঁক তো এই দরবারের জন্যই। আসলে রাজা-বাদশারাই এই শিল্পের প্রধান পৃষ্ঠপোষক। সেই রাজদরবারের

আনুকূল্যেই যদি খণ্ডিকরদের মাথার ওপর না থাকে, তাহলে বিকল্প জীবিকার কথা ভাবতে হয় বইকি! খণ্ডিকররাও ভেবেছিল। সাগরপারের সাহেবদের লেখালেখিতে এর আভাস পাওয়া যাবে। যেমন জেমস ডোনাল্ড। তিনি লিখছেন, "With the disappearance, however, of the rajas these influences ceased. The carvers, who had land and cattle, settled down principally to a life of agriculture—a life involving little labour on their part, yet ensuring a comfortable living. Not pressed by want, or compelled by force, to earn his livelihood, the ivory carver took no steps to push his industry, or to create a demand. An occasional order for an article in ivory would be executed generally at a profit so considerable that the worker could afford to lay aside his tools for some time before undertaking another commission."[৮]

তবে তখন তখনই যে হাতির দাঁতের শিল্প এ দেশ থেকে পুরোপুরি উবে গিয়েছিল, এমন নয়। এরপরও বেশ কিছুদিন এই শিল্প টিমটিম করে বেঁচেবর্তে ছিল। কেন এই টিমটিম করে বেঁচে থাকা? কারণ, রাজা-বাদশাদের মতো ব্রিটিশরা কখনও এর পৃষ্ঠপোষক হয়ে উঠতে পারেনি। "the work is spasmodic, and entirely dependent on occasional orders received—generally from Europeans—which orders they do not always take the trouble to execute."[৯] বক্তা সেই ডোনাল্ড সাহেবই।

সমস্যাটি কোথায়? কেন ব্রিটিশরা শিল্পকলার পৃষ্ঠপোষকতায় রাজা-বাদশাদের জায়গাটি নিতে পারেনি, সে আমরা অনুমান করতে পারি। শাসক হলেও ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি দিয়ে যাদের যাত্রা শুরু, বেনিয়ার মনোভাব কাটিয়ে ওঠা তাদের পক্ষে কঠিন বইকি! তাদের লক্ষ্য ছিল একটাই— মুনাফা। শিল্প সেখানে গৌণ। ফলে কারিগরদের সুযোগ-সুবিধে দেওয়ার বদলে ব্যবসায়িক লাভের কথাই বেশি ভাবা হয়েছে। ঢাকার তাঁতি আর সিলেটের খণ্ডিকর— উভয় দলই ছিল শোষণের শিকার। যথাযথ পারিশ্রমিক তারা এই ভিনদেশী শাসকদের কাছ থেকে পায়নি। ফলে কারিগর-পক্ষে উৎসাহের অভাব ছিল। সাহেবরাও এনিয়ে মাথা ঘামায়নি বা তাদের উৎসাহিত করার কথা ভাবেনি। করার প্রয়োজনও পড়েনি। কারণ, এতে যে তাদের তেমন ক্ষতি হয়েছে, এমন নয়। বরং গজদন্ত-শিল্পীদের মজুরি বাদ যাওয়ায় লাভের অঙ্ক বেড়েছে। ইউরোপের বাজারে বরাবরই হাতির দাঁতের মস্ত চাহিদা। তারা তাই সরাসরি কাঁচামাল, অর্থাৎ শিল্পকর্মের বদলে অধিকাংশ সময় হাতির দাঁতই রফতানি করেছে। আর তা বিক্রি হত ওজনে। সে মারমার কাটকাট ব্যবসা। উইলিয়াম ম্যাকপিস থ্যাকারের কথাই ধরি না কেন! 'The elephant-hunter of Sylhet' বললেই সবাই যাঁকে একডাকে চিনত। সেই থ্যাকারেকে নিয়ে ইউরোপীয় সমাজে একটি কথা চালু ছিল যে, "Thackeray lost no opportunity to mint ivory into sterling."[১০] শুধু কি আর থ্যাকারে? আরও আছেন। জর্জ টেম্পলার, হেনরি র‍্যামুস, রবার্ট লিন্ডসে— এমন আরও কত কত সাহেব। থ্যাকারের মতোই এ দেশে র‍্যামুসেরও এক নতুন নাম জুটেছিল-- 'the Great Nimrod of Bengal'[১১] তবে হাতির দাঁতের ব্যবসাও খুব বেশিদিন চলেনি। ১৮৯৭-১৮৯৮ সনে যেখানে ১৭ মণ হাতির দাঁত রফতানি হয়েছে আসাম থেকে, সেখানে ১৮৯৮-১৮৯৯ সনে এসে তা মাত্র এক মণে ঠেকেছে।[১২] এর কারণ অবশ্যই হাতি শিকার নিষিদ্ধ হয়ে যাওয়া।

'খণ্ডিকর'দের সংখ্যা কমে যাওয়ার এটাও একটা কারণ। ডোনাল্ড সাহেবের দেওয়া তথ্য মতে, সিলেটে তখন মাত্র একজন 'খণ্ডিকর'। সেটা সম্ভবত ১৮৯৮-৯৯ সালের কথা। কারণ তাঁর রিপোর্ট প্রকাশিত হয়েছিল ১৯০০ সালে। ডোনাল্ড আরও জানিয়েছেন, এই খণ্ডিকর ছিল হাতির দাঁতের পাখা তৈরিতে ওস্তাদ।

তবে কি রমাবাইকে যে পাখা উপহার দেওয়া হয়েছিল, তা এই কারিগরের হাতেই তৈরি?

অসম্ভব নয়। সিলেট সহ পুরো ভারতেই তখন এই শিল্প অবলুপ্তির পথে। উনিশ শতকের শেষভাগে এই অঞ্চলে হাতির দাঁতের শিল্প যে নিশ্চিহ্ন হতে চলেছে, এর উল্লেখ রয়েছে সমকালীন সিলেটের এক জেলাশাসক, অ্যালেন সাহেবের রিপোর্টেও। সাহেব লিখছেন, "Carving in Ivory used also at one time to be a speciality of Sylhet town, but the art has unfortunately become extinct."[১৩] সে ১৮৯১ সালের কথা। ডোনাল্ড সাহেবের রিপোর্টে যে খণ্ডিকরের উল্লেখ রয়েছে, সেই কারিগর তখন বাধ্য হয়ে বিকল্প জীবিকা হিসেবে স্বর্ণকারের কাজকে বেছে নিতে বাধ্য হয়েছিল। ডোনাল্ডই দিয়ে গেছেন এই তথ্য, "The Ivory Carver in Sylhet (his principal occupation is that of "goldsmith"), whose specialty is fans, has received but one order for fans during the last ten years. No other order has he received either from Europeans or Natives."[১৪]

শুধু এই খণ্ডিকরের কথাই বা বলি কেন, আসামের অন্যত্রও হাতির দাঁতের কারিগররা তখন বাধ্য হয়েছে বিকল্প কাজে জড়িয়ে পড়তে। ডোনাল্ডের লেখা থেকে জানতে পারি, সেই সময় সেন্সাস রিপোর্টে মাত্র একজন ব্যক্তি নিজেকে খণ্ডিকর হিসেবে পরিচয় দিয়েছে। তবে আরও অনেকেই তখন ছিল, যারা পেশা পাল্টালেও আদত পেশার দক্ষতা ভুলে যায়নি, "We have found but one man whose occupation can be described as "Ivory carver," but there are others who, while dependent for their living on other occupations, still possess a knowledge of the art."[১৫]

অচ্যুতচরণের বক্তব্যও এর কাছাকাছি। জেমস ডোনাল্ডের রিপোর্টটি প্রকাশিত হয়েছিল ১৯০০-তে। আর এর ঠিক দশ বছর পর প্রকাশিত হয় অচ্যুতচরণ চৌধুরীর 'শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত'-র প্রথম খণ্ড (১৯১০)। সেখানে তিনি লিখছেন, সিলেট সদর ও পাথারিয়া পরগণায় ছিল হাতির দাঁতের কারিগরদের বাস। এবং তিনি যখন বইটি লিখছেন, তখনও দু'-এক ঘর খণ্ডিকরের বসবাস ছিল ওই অঞ্চলে। হ্যাঁ, করিমগঞ্জ জেলার পাথারিয়া ব্লকের কথাই বলা হচ্ছে। এক সময় হাতি কেনাবেচা ও হাতির দাঁতের শিল্পকর্মের রমরমা ছিল এই করিমগঞ্জ জেলায়ও। এই কাজে এখানকার কারিগরদের দক্ষতা ছিল প্রবাদপ্রতিম। আসলে প্রতাপগড়, লঙ্গাই, সিংলার জঙ্গল মহালে হাতির প্রাচুর্য তাদের এই শিল্পীসত্তাকে গড়েপিঠে তুলেছিল। সে প্রসঙ্গে পরে আসা যাবে।

অচ্যুতচরণ এ-ও জানিয়েছেন, বিশ শতকের শুরুর দিকে হাতির দাঁত দিয়ে তৈরি এক একটি পাটির দাম ছিল তিনশো থেকে ছ'শো টাকা। আর উনিশ শতকের মাঝামাঝি? সেক্ষেত্রে হান্টার সাহেবের দেওয়া তথ্যের ওপর নির্ভর করতে হয়। হাতির দাঁতের পাটির গুণকীর্তন করে তিনি যেমন এর দামের উল্লেখ করেছেন, তেমনই হাতির দাঁত দিয়ে তৈরি পাখা ও অন্যান্য জিনিসের দামের একটি তালিকাও দিয়ে গেছেন। হান্টার লিখছেন, "Another speciality of Sylhet manufacture is ivory ware, the carvers of which are characterised by much ingenuity and taste. Their work consists of ivory mats, which are sold at from £ 20 to £ 60 each…"[১৬]

এক পাউন্ড এখন ভারতীয় টাকায় একশো এক টাকার মতো। সেই হিসেবে একটি পাটির দাম দাঁড়াচ্ছে প্রায় দুই থেকে ছ' হাজার টাকা। মনে রাখতে হবে, টাকার মূল্যমান এখন অনেক নীচে নেমে গেলেও তুলনামূলকভাবে পাউন্ডের মূল্যের কিন্তু খুব একটা পরিবর্তন হয়নি। শুধু পাটিই নয়, পাটির পাশাপাশি সিলেটে তৈরি হত এমন আরও অনেক জিনিসেরই দামের উল্লেখ করে গেছেন হান্টার। যেমন, পাখা। দাম,

এক পাউন্ড বারো স্টার্লিং থেকে দুই পাউন্ড দশ স্টার্লিং, স্টিক (সম্ভবত পিঠ-চুলকানোর স্টিকই বুঝিয়েছেন) এক পাউন্ড বারো স্টার্লিং থেকে দুই পাউন্ড, দাবার ঘুঁটির সেট তিন থেকে পাঁচ পাউন্ড, ডাইসের সেট তিন থেকে ছয় পাউন্ড, কাঠের খড়মের খুঁটির (বুড়ো আঙুল ও বাকি চার আঙুলের মাঝখানে যে উঁচু নব থাকে) জোড়া দুই থেকে পাঁচ পাউন্ড।

হান্টার সাহেবের বইটি প্রকাশের প্রায় একুশ বছর পর ডোনাল্ড সাহেবের রিপোর্ট প্রকাশিত হয়। সেই রিপোর্টেও আসামে হাতির দাঁত দিয়ে তৈরি জিনিসপত্রের দামের একটি তালিকা রয়েছে। হান্টারের উল্লিখিত মূল্যের সঙ্গে তুলনা করলে সামান্য হেরফের হয়তো চোখে পড়বে। সেই তালিকা অনুযায়ী উনিশ শতকের শেষ দু'-এক বছরে হাতির দাঁত দিয়ে তৈরি জিনিসগুলোর দাম ছিল এরকম :

১। চিরুনি : পাঁচ থেকে দশ টাকা
২। পিঠ-চুলকানোর স্টিক : বিশ থেকে পঞ্চাশ টাকা
৩। কান-চুলকানোর কাঠি : ছ'আনা থেকে এক টাকা
৪। চামচ-কাঁটা চামচ : ত্রিশ টাকা থেকে পঞ্চাশ টাকা
৫। খেলনা হাতি : ত্রিশ থেকে পঁয়ত্রিশ টাকা
৬। খেলনা ঘোড়া : আট থেকে দশ টাকা
৭। খেলনা মাছ : এক টাকা আট পয়সা থেকে পাঁচ টাকা
৮। গাড়ি : পঞ্চাশ থেকে ষাট টাকা
৯। কাঁকই (লম্বা চুল আঁচড়ানোর জন্য বাঁশের তৈরি চিরুনি) : পাঁচ টাকা থেকে ছ'টাকা
১০। ব্রেসলেট : আট থেকে দশ টাকা
১১। কাগজ কাটার ছুরি : আট থেকে আঠারো টাকা
১২। ডাইস : বিশ থেকে পঁচিশ টাকা
১৩। দাবার ঘুঁটি : মোটামুটি একশো টাকা
১৪। ছুরির বাঁট : তিন থেকে আট টাকা
১৫। নব : দুই থেকে চার টাকা
১৬। টেমা (ছোট বাক্স) : চার থেকে দশ টাকা
১৭। আংটি : চার থেকে ছয় টাকা
১৮। পাখা : সাঁইত্রিশ টাকা[১৭]

পরবর্তীতে দাম বেড়েছে কিছুটা। সেই হিসেব পাওয়া যাবে অচ্যুতচরণ তত্ত্বনিধির 'শ্রীহট্টের ইতিবৃত্তে'। অচ্যুতচরণ যেখানে হাতির দাঁতের পাটির দাম তিনশো থেকে ছ'শো বলে উল্লেখ করেছেন, সেখানে তাঁর পূর্ববর্তী এক ঐতিহাসিক, মৌলভি মোহাম্মদ আহমদ বলছেন তাঁর সময়কালে হাতির দাঁতের একটি পাটির দাম ছিল দুই থেকে আড়াই হাজার টাকা। কেন এই পার্থক্য? আহমদ সাহেবের মন্তব্য পাঠে এই নিয়ে ধোঁয়াশা কাটবে। তিনি লিখছেন, "এই স্থানের হস্তী দন্তের পাটি, পাখা ও চুড়ি, ঘড়ির চেইন, প্রভৃতি অতি প্রসিদ্ধ। হস্তীর দন্তকে চুলের ন্যায় সূক্ষ্ম করিয়া পাটি প্রভৃতি প্রস্তুত করিতে শ্রীহট্টের কারিগররাই কেবল পারে। হস্তী দন্তের একটি পাটি প্রস্তুত করাইতে ২০০০/২৫০০ হাজার টাকা ব্যয় হয়। দীর্ঘ এবং প্রস্থে এক হাত পরিমিত একটি পাটি ৮৫ টাকায় প্রস্তুত হয়... হস্তী, গজদন্ত, পাটি... এখান হইতে ভিন্ন ভিন্ন দেশে বিক্রয়ার্থে রফতানি হয়।"[১৮] আহমদ সাহেব যে পাটির দাম পঁচাশি টাকা বলে উল্লেখ করেছেন, অচ্যুতচরণের সময়কালে সেই

পাটিই সম্ভবত তিনশো থেকে ছ'শো টাকায় বিক্রি হত। আহমদ সাহেব ও অচ্যুতচরণের মধ্যে বয়সের ফারাক দু'-দশকেরও বেশি হবে। ১২৯৩ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত হয়েছিল আহমদ সাহেবের 'শ্রীহট্ট দর্পণ।' সিলেটের প্রথম ইতিহাস লেখক এই আহমদ সাহেব। এই ইতিহাস অবশ্য পূর্ণাঙ্গ নয়। এর প্রায় দেড় দশক পর, ১৯১০ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হবে অচ্যুতচরণের 'শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত'-র পূর্বাংশ। দেড় দশকে দামের এতটা পরিবর্তন সম্ভব কিনা, এই নিয়ে একটা সন্দেহ মনে থেকেই যায়।

এবার দেশ বিভাজন-পরবর্তী সিলেটের যে অঞ্চল ভারতের সঙ্গে জুড়ে যায়, এবং বরাক উপত্যকার অংশ হয়ে ওঠে, সেই অঞ্চলে এই শিল্পের হালহকিকত কেমন ছিল, এই নিয়ে আলোচনা করা যাক। সিলেটের অংশ হিসেবে করিমগঞ্জ জেলা তো বটেই, এমনকী কাছাড় জেলায়ও যে হাতির দাঁতের বেশ রমরমা ছিল, ঐতিহাসিকদের দেওয়া তথ্য সেই কথাই বলে। আসলে কোথায় কোন্ শিল্প শেকড় ছড়াবে, সে বরাবরই কাঁচামালের জোগানের ওপর নির্ভর করে। ভালো জাতের হাতির জন্য করিমগঞ্জের লঙ্গাই আর সিংলার খ্যাতি তখন তুঙ্গে। ফলে এই অঞ্চলে গজদন্ত শিল্পের শ্রীবৃদ্ধি ঘটেছিল বেশ। পাশাপাশি কাছাড় আর হাইলাকান্দিতেও। হাতির প্রাচুর্যের জন্যই। শুধু কি আর গজদন্ত শিল্প, হাতি কেনাবেচারও বিশাল বাজার ছিল এখানে। "...forests of Sylhet, Cachar and Chittagong, which abound in wild elephants, render it a comparatively easy matter for the captives to be brought to a firstéôéclass market."[১৯] উনিশ শতকের শেষ পর্বে লিখছেন এক আমেরিকান প্রকৃতিবিদ। নাম তাঁর চার্লস ফ্রেডেরিক হোল্ডার। বিহারের সোনপুর আর উত্তরবঙ্গ-বাংলাদেশের সীমান্ত অঞ্চল তেঁতুলিয়াতেও এমনি হাতি কেনাবেচার বাজার ছিল। স্থানীয় লোকেরা এই বাজারগুলিকে বলত হাতি মেলা। ১৮৬২ সাল অবধি এই বাজারগুলিই ছিল 'the secondary source of supply.'[২০]

হান্টার সাহেবও বলছেন একই কথা। সিলেটের প্রধান বাজারগুলির তালিকা তৈরি করেছিলেন তিনি। সেই তলিকায় রয়েছে করিমগঞ্জের নাম। রয়েছে সেকালে সিলেট থেকে রফতানি হওয়া সমস্ত জিনিসের নাম। আর সেই তালিকার শুরুতেই পাচ্ছি আমরা হাতির দাঁতের উল্লেখ।[২১] পড়শি রাজ্য মিজোরাম যে মোগল আমল থেকেই হাতির দাঁত জোগান দিয়ে এসেছে, এর উল্লেখ করা হয়েছে। শুধু সিলেটই নয়, ত্রিপুরা, কাছাড়, এমনকী মণিপুরের রাজারাও তখন হাতির দাঁত সংগ্রহ করতেন মিজোদের কাছ থেকে। তারা জলের দামে বিক্রি করত বলেই।

ইংরেজ আমলেও পরিস্থিতি খুব একটা পাল্টায়নি : "The Mizo chiefs supplied ivory to the traders of Sylhet, Cachar and Chittagong even during the British rule."[২২] ব্রিটিশ সরকারের তহবিলে মিজোরা তখনও 'নজরানা' হিসেবে জমা দিচ্ছে হাতির দাঁত। কাছাড়ের জেলাশাসক মেজর স্টুয়ার্ট থেকে শুরু করে সুপারিন্টেনডেন্ট সাহেব ক্যাপ্টেন ভার্নার এবং আরও অনেকেই নজরানা হিসেবে তখনও মিজোদের কাছ থেকে গজদন্তই পেয়েছেন। কাছাড়-করিমগঞ্জের ব্যবসায়ীরাও মিজোদের কাছ থেকে খুব অল্প দামে হাতির দাঁত সংগ্রহ করত। উনিশ শতকের মাঝামাঝি মোটামুটি প্রমাণ সাইজের একটি হাতির দাঁত মিজোরা বিক্রি করত কুড়ি টাকায়। ১৮৮২ সালে, আকালের কালে সেই দাম গিয়ে দাঁড়ায় পঁচিশ থেকে ত্রিশ টাকা।

এতে লাভ হয়েছিল সিলেট-কাছাড়ের ব্যবসায়ীদের। মিজো-সর্দাররা এই ব্যবসায়ীদের বেশ সমঝেই চলত এবং নানারকম সুযোগ-সুবিধেও দিত। দিত নিরাপত্তাও : "The Mizo Chiefs welcomed the traders as friends by providing security… Traders from Cachar and Chittagong became a source of permanent income by way of rent, preferably in kind, for security provided to them by the Mizo Chiefs."[২৩] গন্ধক, লবণ, বন্দুক, কাঁচ, কাপড়, তামাক আর চালের বিনিময়ে এই ব্যবসায়ীরা তখন মিজোদের কাছ থেকে সংগ্রহ করে নিচ্ছে হাতির দাঁত।

সিলেট-মিজোরাম সীমান্ত অঞ্চলের বাজারগুলিতে তখন মিজোদের ভিড়। শীত পড়তেই পসরা নিয়ে হাজির তারা। হাজির হত হাইলাকান্দি আর কাছাড় জেলার বাজারেও। বড় বড় মাছ, জুমের শাক-সব্জি, রাবার আর বনজ সামগ্রীর সঙ্গে হাতির চামড়া, হাড় আর দাঁত নিয়ে তারা নামত পাহাড় থেকে। উনিশ শতকের ছয়ের দশকে কাছাড়ের জেলাশাসক হয়ে এসেছিলেন জন এডগার। তাঁর আমলেই সম্ভবত মিজোরামে প্রথম নিয়মিত বাজার বসতে শুরু করে। আর সেই বাজারে হাইলাকান্দি এবং কাছাড়ের বাঙালি ব্যবসায়ীদের প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করতে কলকাতা অফিসে প্রচুর লেখালেখিও করেছেন এডগার। শিলচরে প্রথম বাণিজ্য মেলা হয় এই এডগারের উদ্যোগেই। সে প্রায় দেড়শো বছর আগেকার কথা। সালটা ছিল ১৮৬৯। মিজোদের ব্যবসায়িক আদানপ্রদানে উৎসাহিত করতেই এই মেলার আয়োজন। মিজোদের আগ্রহ বাড়ানোর জন্য মেলায় তিনি নাচ-গান আর ম্যাজিক শোয়েরও ব্যবস্থা করেছিলেন।[২৪]

অনেক গবেষকের বক্তব্য, মোগল দরবার বা অন্যান্য অঞ্চলে সিলেট থেকে হাতির দাঁতের যে-সব জিনিস রফতানি হত, সে-সবের "raw material"-র জন্য নাকি সিলেটের কারিগররা মিজোরামের ওপর নির্ভরশীল ছিল-- "The Mughal rulers of Delhi and the aristrocracy of Bengal purchased ivory, from the craftsmen of Sylhet who were dependent upon the Mizos for the raw materials.[২৫]

সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতকে মিজোরা আদৌ সমতলে নেমে এসে সিলেট ও কাছাড়ের কারিগরদের কাছে হাতির দাঁত বিক্রি করত কিনা, এই নিয়ে সন্দেহের অবকাশ থেকেই যায়। যতদূর মনে হয়, এই ব্যবসায়িক সম্পর্ক তৈরি হয়েছিল ইংরেজ আমলে। তখন সত্যিই জলের দামে এখানকার ব্যবসায়ীরা তাদের কাছ থেকে কাঁচামাল সংগ্রহ করেছে। বিশেষ করে সমতলে হাতি শিকার নিষিদ্ধ ঘোষণা হওয়ার পর। সে ১৮৬৫ সালের ৩০ নভেম্বরের কথা। অর্ডার নম্বর ছিল ১৩৬০।[২৬] ফলে সিলেটে তখন হাতির দাঁত আর সহজলভ্য রইলো না। এদিকে পাহাড়ি বসতিগুলো তখনও এই নিয়মের বাইরে। এরপর কেটে গেছে প্রায় চোদ্দ বছর। ২৮ এপ্রিল, ১৮৭৯। চালু হয় এলিফ্যান্ট প্রিজার্ভেশন অ্যাক্ট। এই অ্যাক্টের ফলে পাহাড়েও তখন হাতি শিকার নিষিদ্ধ। এরপরও চোরাগোপ্তা শিকার চলত বইকি! সে অন্য প্রসঙ্গ। তবে মোগল আমলে সিলেট ও কাছাড় যে কাঁচামালের জন্য মিজোরামের ওপর নির্ভরশীল ছিল না, সেটা নিশ্চিত। লুটপাটের কথা বাদ দিলে পারতপক্ষে পাহাড়ের অধিবাসীরা তখন সমতলের লোকদের ছায়া মাড়াত না। লিন্ডসের লেখা পড়লে এই সম্পর্কে ধারণা স্পষ্ট হবে। হাঙ্গামা বাঁধার ভয়ে সমতলের লোকরাও তাদের এড়িয়ে যাওয়া পছন্দ করত। সমকালীন ইতিহাস এর সাক্ষ্য দেবে। পরবর্তীতেও হাতি খেদা নিয়ে এদের সঙ্গে ঝামেলা বাঁধত প্রায়ই। খেদার জন্য এদের জুম খেত নষ্ট হত, ঝামেলা এই নিয়েই। তাছাড়া সিলেটে তখন হাতির দাঁতের অভাব কি! ইতিহাসবিদরা কি আর এমনি এমনি বলছেন যে, এককালে হাতি ছিল সিলেটের 'সবথেকে অর্থকরী সম্পদ।'[২৭]

আর সে মোগল আমল থেকেই। এমনকী মোগল বাদশারা হাতি খেদা আর হাতির খোরাকি বাবদ মহালও নির্দিষ্ট করে দিয়েছিলেন। ঔরঙ্গজেবের আমলে তো বছরে আঠারো হাজারেরও বেশি আয় হত এমন জায়গির এই বাবদ বন্দোবস্ত করে দেওয়া হয়েছিল। সপ্তদশ শতকের প্রথম পর্বে এই অঙ্কের পরিমাণ নেহাত

কম ছিল না! এর মধ্যে হাতি খেদার জন্য পনেরোটি, এবং হাতির খোরাকির জন্য ত্রিশটি পরগনা নির্দিষ্ট ছিল। এর মধ্যে ছিল এগারোশতি পরগনাও। হ্যাঁ, করিমগঞ্জ জেলার এগারোশতির কথাই বলা হচ্ছে। আর কাছাড়ের জন্য যে জায়গির নির্দিষ্ট হয়েছিল, এর বার্ষিক আয় ছিল বছরে প্রায় পাঁচ হাজার টাকা। অপ্রাসঙ্গিক হলেও এখানে আরও একটি কথা বলে রাখি, সিলেটের মুগা-তসর, শীতলপাটি, এমনকী যুদ্ধে ব্যবহৃত কোষ নৌকা— যা তৈরিতে সিলেটের সুখ্যাতি ছিল খুব, এই সব কিছুর জন্যও মোগল বাদশারা প্রচুর মহাল নির্দিষ্ট করে দিয়েছিলেন।

সে যা-ই হোক, সেই মোল আমল থেকেই কিন্তু সিলেট এবং কাছাড়ের লোকেরা হাতি খেদায় ওস্তাদ। ব্রিটিশরা তো তাদের এই গুণের প্রশংসায় পঞ্চমুখ। ব্রিটিশ ভারতের এক সিভিলিয়ান এবং কূটনীতিক, এবং লেখক হিসেবেও যাঁর সুখ্যাতি খুব, সেই ব্র্যাডলি বার্ট সিলেটের কালেক্টর উইলিয়াম ম্যাকপিস থ্যাকারেকে নিয়ে একটি বই লিখেছিলেন। বইটির নাম, 'সিলেট থ্যাকারে'। তিনিই সেই বিখ্যাত থ্যাকারে, 'The elephant-hunter of Sylhet' নামে লোকে চিনত যাঁকে। সিলেটের প্রথম ইংরেজ ডেপুটি কালেক্টর। ১৭৭২ থেকে ১৭৭৫— মাত্র তিন বছর তাঁর সিলেট-বাস। এই তিন বছরেই তাঁর নামের সঙ্গে জুড়ে যায় সিলেটের নাম। কীভাবে জুড়ল সেই নাম, তা জানার আগে ব্রাডলি বার্টের কাছ থেকে গৌরচন্দ্রিকা হিসেবে হাতিকে কেন্দ্র করে সিলেটবাসীর দুর্দশার কথা বরং শুনে নিই আগে।

আর হ্যাঁ, 'সিলেট থ্যাকারে' পরিচিতি লাভের কিস্‌সাও কিন্তু শুরু হয় স্থানীয়দের এই দুর্দশার গল্প দিয়েই। এই প্রসঙ্গে আসবে হাতি ব্যবসার কথা। খেদার কথা। আসবে কোন্ পরিস্থিতিতে, কীভাবে এই অঞ্চলের মানুষ হাতি খেদায় দক্ষ হয়ে উঠেছিল, সে-সবও। এই দক্ষতাই একটা সময় তাদের পরিচিতি হয়ে উঠেছিল। সেই পরিচিতি অবশ্যই গর্বের, অহঙ্কারের। গর্বের, কারণ দুর্দশার বারোমাস্যা থেকে এই পরিচিতির জন্ম। বার্ট শুনিয়েছেন সেই দুর্দশার গল্প। যে গল্প জানা না থাকলে তাদের কীর্তির কথা হয়তো জানা যায়, কিন্তু এর পেছনকার লড়াইর কথা জানা যায় না। ব্র্যাডলি বার্ট সাগরপারের মানুষ। বিদেশি। কিন্তু এই সাহেবরা ছিলেন অদ্ভুত। এমনভাবে তাঁরা স্থানীয় সমস্যার বর্ণনা দিয়ে গেছেন যে, পড়লে মনে হবে এঁরা এখানকার জল-হাওয়াতেই মানুষ। স্থানীয়দের দুর্দশার যে বর্ণনা দিয়েছেন তিনি, এতে এই বিশ্বাস আরও গাঢ় হবে। আর এই দুর্দশার কারণ সেই হাতিই : "In enormous herds the wild elephants swept down from the dense jungles of the uplands, laying waste the whole countryside for miles, levelling smiling homesteads as if a tornado had swept by, trampling and uprooting the crops, and leaving death and destruction in their wake. Village after village was laid low in their mad impetuous onset. To many a peaceful cultivator busy garnering in his harvest there came the far-off sound of heavy trampling feet like distant thunder, and at that sound the reaper dropped his sickle and the gleaner let fall what she had gathered to rush madly in search of the shelter that both knew they could not find. There was no escape. It was only a matter of chance whether the elephants swept straight upon their village or passed it by unnoticed in their ill-directed flight. Terror-struck, fleeing helplessly from place to place, the villagers were entirely at their mercy."[২৮]

বিস্তৃত বর্ণনার অংশবিশেষমাত্র তাঁর বই থেকে উদ্ধৃত করা হল। এই বর্ণনা থেকে একথা স্পষ্ট যে বেঁচে থাকার জন্য হাতির সঙ্গে লড়াই করতে করতেই এক সময় স্থানীয়রা এই হাতি খেদার কাজে দক্ষ হয়ে ওঠে। থ্যাকারে সিলেটে ছিলেন অষ্টাদশ শতকের আটের দশকে। আর বার্টের বইটি প্রকাশিত হয় বিশ শতকের

শুরুর দিকে, ১৯১১ সালে। তা বার্ট সাহেব স্থানীয়দের হাতি সংক্রান্ত যে দুর্দশার বর্ণনা দিয়েছেন, তা কি থ্যাকারের সময়কার, নাকি তিনি নিজেও তাঁর সময়কালে এর কিছুটা প্রত্যক্ষ করেছেন? এই প্রশ্নটা মনে থেকেই যায়। কারণ তাঁর বর্ণনার ধরনটাই এমন যে, পড়তে পড়তে মনে হয় চোখের সামনে যা ঘটতে দেখেছেন, তা-ই লিপিবদ্ধ করে গেছেন। সে যা-ই হোক, শুধু বার্ট সাহেবই নন, হাতি খেদায় সিলেটিদের দক্ষতার কথা শুনিয়ে গেছেন আরও অনেক সাহেবই। ব্রিটিশ অফিসার মেজর স্টুয়ার্ট যেমন। শুধু বর্ণনাই নয়, স্টুয়ার্ট সাহেব আবার ছবি এঁকেও বিষয়টি বোঝানোর চেষ্টা করেছেন। অচ্যুতচরণ তত্ত্বনিধির ‘শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত-তেও রয়েছে হাতি খেদার ছবি। এবং বর্ণনাও।

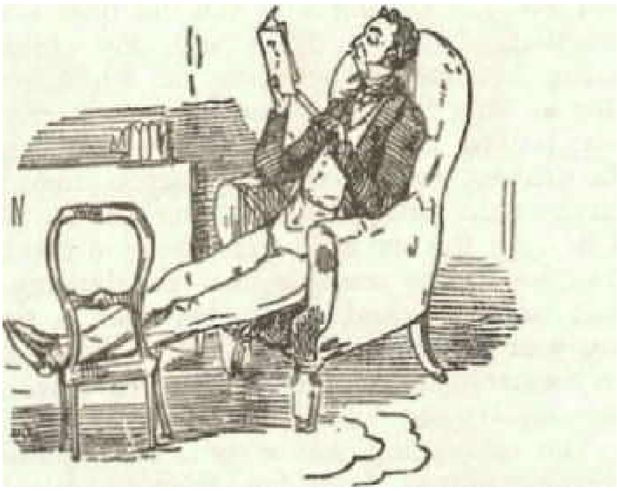

উইলিয়াম ম্যাকপিস থ্যাকারে, ‘দ্য এলিফ্যান্ট হান্টার অব সিলেট’[২৯]

প্রথমেই খেদা সম্পর্কে ধারণা স্পষ্ট করা নেওয়া যাক। হাতিদের তাড়িয়ে নিয়ে ফাঁদে ফেলাই হচ্ছে হাতি খেদা। তবে খেদা ছাড়া অন্য উপায়েও হাতি ধরা যেত বইকি! হাতি ধরা যেত ফাঁস দিয়ে। পরতালা দিয়ে। ফাঁস কিংবা পরতালা সম্পর্কে জানার আগে কুনকি, গুণ্ডা আর মাকনা হাতি কাদের বলে সেটাও জেনে নেওয়া জরুরি। কুনকি মাত্রই মেয়ে হাতি। দাঁতালরা সব গুণ্ডা। আর যে হাতির দাঁত নেই, তারা মাকনা। কোনও কারণে দল থেকে পিছিয়ে বা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়া একাকী কুনকি হাতিকে পোষা কুনকি হাতি দিয়ে ভুলিয়ে গলায় ফাঁস পরিয়ে বন্দি করা হলে একে বলা হয় ফাঁস। সিলেটে খেদা আর ফাঁস— দুয়েরই চল ছিল। তবে পরতালার চল ছিল না। দলপতি গুণ্ডার সঙ্গে দলের দখল নিয়ে লড়াই করে যখন কোনও গুণ্ডা বা মাকনা হেরে যায়, তখন জান বাঁচাতে তাদের দল ছেড়ে পালাতে হয়। এমন দলছুট হাতিদের নিয়েই তৈরি হয় গুণ্ডার দল। খুব খতরনাক হয় এই দলছুটরা। এদের বন্দি করা সহজ কাজ নয় মোটেই। কিন্তু কিছু মানুষের অভিধানে আবার অসম্ভব শব্দটি নেই। অবশ্য জান বাঁচাতে, পেটের টানেও অনেক সময় এমন দুঃসাহসী হয়ে উঠতে বাধ্য হয় এরা। পোষা কুনকিদের দিয়ে ঠিক বশ করে ফেলে গুণ্ডার দলকে। আর শুধু মাহুতরাই নয়, তাদের পোষা কুনকিরাও এদের বশ করতে এগোয় জান বাজি রেখেই। দলভ্রষ্ট গুণ্ডার মুখোমুখি হতে আসলে কুনকিদেরও বুক কাঁপে। সেই দলছুট গুণ্ডার সামনে তারা দাঁড়ায় যখন, তখন সবসময় পেছন ফিরেই দাঁড়ায়।

আর একা নয়, কম করে চার-পাঁচটি কুনকি একসঙ্গে যায় মদমত্ত গুণ্ডা কিংবা মাকনাকে বশ করতে। তাকে ঘিরে থাকে তারা। তাকে মদহোশ করে রাখে। আর সেই ফাঁকে মাহুত হাতিটির পায়ে পরিয়ে দেয় শক্ত ফাঁস। এই হচ্ছে পরতালা। মুশকিল হচ্ছে ফাঁস কিংবা পরতালায় এক সঙ্গে একাধিক হাতি ধরা সম্ভব নয় মোটেই।

এদিকে, যেখানে প্রচণ্ড হাতির উপদ্রব, সেখানে কি আর এক-দুটি হাতি বন্দি করে জান বাঁচানো সম্ভব! তাই যে-সব অঞ্চলে হাতির উৎপাত বেশি সেখানে হাতি খেদাই জনপ্রিয় ছিল। দলের প্রায় প্রতিটি হাতিকেই একসঙ্গে ধরা সম্ভব হত কিনা, তাই। এতে কিছুদিনের জন্য অন্তত নিশ্চিন্ত। ফসলও বাঁচত, বাড়তি রোজগারও হত। বলা হয়নি, হাতিকে ফাঁদে ফেলার জায়গাগুলিকে বলা হত রম্‌না। সিলেটে, সেই সময়কার বিখ্যাত ছয়টি রমনা হচ্ছে, সিংলা, লঙ্গাই, লাউড়, ভানুগাছ, মূলাগোল আর তারাপুর।

লাতুর আশপাশের জঙ্গলেও তখন প্রচুর হাতি। তবে হাতি খেদার জন্য বিখ্যাত ছিল সিংলা আর লঙ্গাই। খানদানি হাতির জায়গা। আর ধরাও পড়ত এক সঙ্গে প্রচুর। অন্যান্য জায়গায় ফাঁস দিয়েই ধরা হত বেশি। কেন? কারণটা ঐতিহাসিকদের মুখেই শোনা যাক। সেসঙ্গে হাতির জন্য বিখ্যাত সিলেটের আরও কিছু অরণ্যভূমির নামও জেনে নেওয়া যাক : “In Sylhet elephants have been caught in Pergunnah Chapghat of Zillah Latu, in Pergunah Bhanugarh, in the Raghunandun Hills, and in Pergunnahs Chamtolla and Mahram, to the north-west of the District, but only in small members at one time. The great elephant ground is the hilly tract to the south-east of the District, watered by the Singla and Langai streams, where from 50 to 100 might be captured every year, though not without considerable expense and trouble, as it would probably be necessary to make two (or more) kheddas.

In this part of the District the elephants have always been captured in herds by forming regular kheddars; but in other parts single elephants are probably killed or captured occasionally.”[৩০]

সিংলা, লঙ্গাই, চাপঘাট — এই নামগুলো আমাদের অচেনা নয়। স্বাধীনতার পর সাবেক সিলেটের এই অঞ্চলগুলো এখন করিমগঞ্জ জেলারই অংশ। এককালে এসব জায়গার লোকেরা ছিল খেদার কাজে দক্ষ। অচ্যুতচরণ জানিয়েছেন, প্রতাপগড়ের মুসলমানদের খুব নামডাক তখন হাতি খেদার জন্য। খেদার দলের কাজকর্ম নিয়ে দু’-একটি কথা না বললেই নয়। এই বর্ণনা থেকে বোঝা যাবে, মাহুতরা কতটা দক্ষতা অর্জন করেছিল তাদের কাছে। উঠে আসবে, হস্তীবিদ্যায় তাদের পারদর্শিতার স্পষ্ট ছবিও।

শুরু করা যাক ‘পাঞ্জালি’কে দিয়েই। খেদা দলের প্রধান হোতা এই পাঞ্জালিই। প্রতাপগড় পরগনায় এমন প্রচুর গ্রাম, তালুক রয়েছে, যার নামকরণ হয়েছে খেদার দলের পাঞ্জালিদের নামে। বোঝাই যাচ্ছে, এই পাঞ্জালিগিরির দৌলতে বেশ দু’-পয়সা আয় হত ওদের। নইলে কি আর গ্রাম, তালুকের নামকরণ হয় তাদের নামে! লুইস সাহেব, এক ব্রিটিশ সিভিলিয়ান ঢাকা আর এর আশপাশের জেলাগুলোর ইতিহাস ও খুঁটিনাটি বর্ণনা দিয়ে একটি বই লিখেছিলেন। প্রকাশকাল ১৯৬৮ সাল। সেই বইয়ে পাওয়া যাবে হাতি-খেদার বিস্তৃত বিবরণ।

সেই বর্ণনা বলছে শীত পড়তেই খেদার দলের সবাই জঙ্গলমুখী। হাতি ধরার জন্য। মোটামুটি নভেম্বর মাসেই শুরু হয়ে যেত যাত্রা। প্রথমে যেত পাঞ্জালিরা। হাতির সন্ধানে। খুঁজে পেলে পায়ের ছাপ দেখেই তারা ঠিক বুঝে যেত দলটি কোন্‌দিকে যাচ্ছে। গুণ্ডা-মাকনা-কুনকি-শিশু মিলিয়ে কতটি হাতি রয়েছে, পায়ের ছাপ

দেখে সে-সব বুঝে নেওয়াও তাদের বাঁ-হাতের খেল। আর একবার এই ব্যাপারে নিশ্চিত হতে পারলেই চোখ বুজে খেদার প্ল্যান কষে ফেলা হত। এরপর ডাক পড়ত ‘গড়ওয়া’দের। গড়ওয়ারাদের কাজ হাতির দলটিকে ঘিরে ফেলা। সেসঙ্গে চেঁচামেচি জুড়ে ভয় দেখানো। আর ভয় পেলেই এক জায়গায় স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকত হাতিরা। সেই অবসরে পাঞ্জালি তার দলের অন্যদের দিয়ে ঘেরের পেছনে কয়েক হাত পর পর গাছের ডাল-খড়কুটো জড়ো করে সেখানে আগুন ধরিয়ে দিত। যেখানে হাতিদের ঘেরাও করে আগুন জ্বালিয়ে ঘিরে রাখা হত, এর নাম ‘পাতবেড়’। এই পাতবেড়ে হাতির দলকে আটকে রেখে সামনে বড় বড় গাছের গুঁড়ি দিয়ে তৈরি করে ফেলা হত এক গড়। এই গড়ের ভেতর থাকত পাহাড়ি ছড়া, যাতে আটক থাকা অবস্থায় হাতিদের জলের কোনও অসুবিধে না হয়! পাতবেড়ের পেছন দিকে, হাতির দলকে যেখানে ঘেরাও করে রাখা হয়েছে, সেদিকে থাকত গড়ের মুখ। সেই মুখ থেকে দু’দিকে ছড়ানো দুই বাহু। মনে করা যাক, মুখোমুখি গা-ঘেঁষে রয়েছে দু’টি বৃত্ত। প্রথম বৃত্তটি গড়। প্রথম বৃত্তের গায়ে লাগানো দ্বিতীয় বৃত্তের নীচের অংশ মুছে দিলে সেটি দেখতে ছড়ানো দু’টি বাহুর মতো লাগবে। এই অর্ধবৃত্ত অংশের নাম ‘পইরালা’। পইরালা আর গড়ের মুখে শুকনো খড়কুটো জড়ো করে রাখা হত। গড়ের ভেতর গোল করে পরিখাও কেটে রাখা হত, যাতে হাতিরা গড়ের দেয়াল ভেঙে ফেলতে না পারে। তা এই গড় বাঁধার কাজ শেষ হলেই পাতবেড়ের পেছন দিক থেকে গড়ওয়া-রা এমন চিৎকার-চেঁচামেচি জুড়ে দিত যে ভয় পেয়ে হাতিরা সামনের দিকটা নিরাপদ ভেবে সেদিকেই ছুটত। ঢাক বাজিয়ে, বন্দুকের শব্দ করে তুমুল হট্টগোল বাঁধিয়ে ফেলা হত তখন। হাতিরা ছুটতে ছুটতে যখনই পইরালার সীমানায় পৌঁছে যেত, তখনই পইরালা ও গড়ের মুখে জড়ো করে রাখা শুকনো খড়কুটোয় আগুন ধরিয়ে দেওয়া হত। হাতিরা তখন বাধ্য গড়ের ভেতর ঢুকতে। আর একবার ঢুকলেই সঙ্গে সঙ্গে গাছের গুঁড়ি দিয়ে তৈরি গেট কৌশলে সামনে না গিয়েই বন্ধ করে দেওয়া হত।

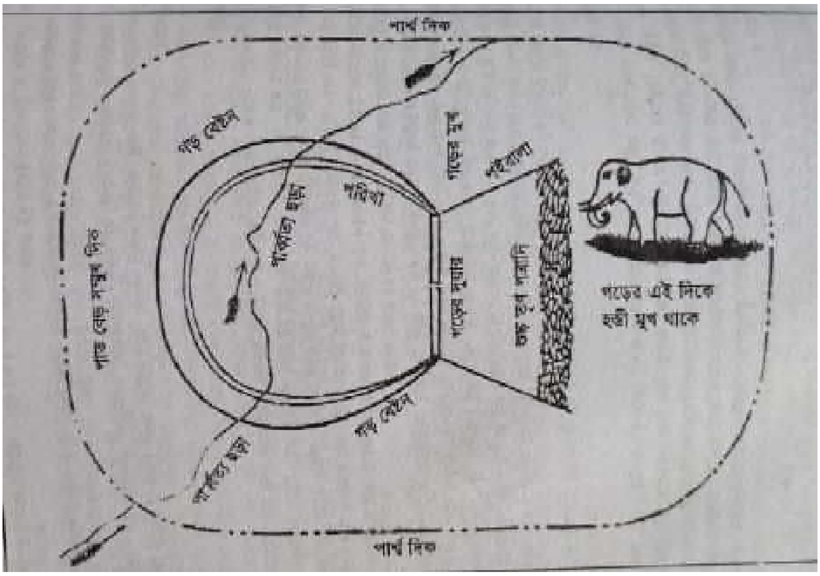

অচ্যুতচরণ হাতি খেদার যে ছবি এঁকেছেন

তবু কি আর দাঁতাল-মাকনারা সহজে হার মানে! গড় ভাঙার জোর চেষ্টা চালাতো তারা। তখন বল্লম খুঁচিয়ে নিরস্ত করার চেষ্টা। এর নাম 'গড়দাখিল'। খেদার পক্ষে এই সময়টাই আসল। আর বিপজ্জনকও। একটু এদিক-ওদিক হলেই তখন পুরো খেদা-দলের প্রাণ নিয়ে টানাটানি! গড়ের মুখ বন্ধ করা থেকে আগুন জ্বালানো— সমস্ত কাজ নিমেষে শেষ করা চাই। নইলেই বিপত্তি। মরণ। এসব নির্বিঘ্নে শেষ হলেই কিন্তু খেদার কাজ ফুরোয় না। এরপরের কাজটির জন্য চাই দক্ষতা। সে এক অদ্ভুত বিদ্যা। ওস্তাদ মাহুতরাই শুধু জানে এর প্রয়োগ। তারা একটি-দু'টি করে পোষা কুনকিকে ঢুকিয়ে দিতে শুরু করে গড়ের ভেতর। না, একা কুনকি নয়, সঙ্গী হয় তাদের মাহুতরাও। প্রাণ হাতে করে। খুব সাবধানে নিজেদের হাতির পেছনে লুকিয়ে রাখে তারা। বন্দি হাতিদের মুখোমুখি হলেই সব শেষ। কিন্তু ওই যে বললাম, জাদু জানে তারা। ঠিক মন্ত্রবলে কাজ হাসিল করে নেয়। কুনকিরা যখন হাতিদের ভুলিয়ে রাখে, তখন অদ্ভুত ক্ষিপ্রতায় জংলি হাতিদের পায়ে পরিয়ে দেয় ফাঁস। যার একটা দিক বাঁধা থাকে গাছের সঙ্গে। তা যতই জাদু জানুক, তবু কি আর দু'-একজনের প্রাণ যেত না! ঠিক যেত। তবু জঙ্গলে যেতে হয়। খেদায় অংশ নিতে হয়। ফসল বাঁচাতে। হাতির হানা থেকে বাঁচতে। পেটের তাগিদে।

বোঝা গেল হাতি খেদার রকমসকম? 'গড়ওয়া' নামকরণের রহস্যটিও নিশ্চয়ই এতক্ষণে পরিষ্কার? তাড়া করে হাতিকে গড়ের ভেতর দাখিল করে যারা, তারাই গড়ওয়া। এক-একটি হাতি খেদার দলে কম করেও ষোলোজন পাঞ্জালি আর তিনশোজন গড়ওয়া থাকা চাই-ই চাই। হাতি ধরার জন্য এই যে বিশাল যজ্ঞের আয়োজন, এর প্রভাব শিল্পে, সংস্কৃতিতে পড়বে না-- তা কি হয়? হাতির সঙ্গে লড়াই করেই তারা দক্ষ মাহুত হয়েছে, শিখেছে হাতি-ধরা বিদ্যা, আবার শিল্পীও হয়েছে। হয়েছে খণ্ডিকর। সেই খণ্ডিকরদের বসবাস ছিল পাথারিয়ায়। অচ্যুতচরণের জীবিতকালে। তথ্যদাতা তিনিই।

তা খেদাই হোক কিংবা ফাঁস, পরতাল-- পোষা কুনকি হাতি না থাকলে সব আয়োজনই নষ্ট। স্টুয়ার্ট এবং লুইস, দুই সাহেবই এই নিয়ে অনেককথাই লিখে গেছেন। খেদা পরবর্তী কুনকির ভূমিকা, পারিশ্রমিক প্রসঙ্গে লুইস সাহেব লিখছেন, "The trained female (kunkis) are then taken into the stockade, and the newly caught elephants are secured by trying them to trees. From the stockade, they are brought out by the Kunkis, and taken to three places in succession, in each of which they are measured, and 1/10 is given for the service of the kunkis up to this time. The hire of kunkis retained to take the the elephants to the auction (by which they are usually sold) is Rupees per diem."[৩১]

এবার হাতির দামের প্রসঙ্গে আসা যাক। এক্ষেত্রে প্রথমেই দেখা হত হাতির উচ্চতা আর জাত। যার খানদান যত উঁচু, তার তত বেশি দাম। দেখা হত বয়সও। কুমিরার কথাই ধরি না কেন! উঁচু খানদান তার। অতএব হাটেবাজারে চড়া দামে বিকোত। কতটা চড়া? যেমন, সাত ফুট উচ্চতা হলে উনিশ শতকের মাঝামাঝি একটি পূর্ণবয়স্ক কুমিরা জাতের হাতি বিক্রি হত এগারোশো টাকায়। উচ্চতা বাড়লে ফুট প্রতি দুশো টাকা বেশি। কুলীন কুমিরার পাশে মির্জার বংশগৌরব ম্লান। অতএব, তার দামও কম। সাত ফুট উচ্চতার এক মির্জা হাতে ন'শো টাকা থাকলেই সেই আমলে খরিদ করা যেত। আর মির্জা-কুমিরার দোআঁশলা হলে? উচ্চতা যদি ওই একই হয় তবে দাম হাজার টাকা।

আর খেদার খরচ? লুইস দিয়েছেন এর নির্ভুল হিসেব। মেজর স্টুয়ার্টের বর্ণনা অনুযায়ী এক-একটি খেদার দলে কম করেও চার-পাঁচশো লোক থাকত। তা তিনশোই হোক কিংবা পাঁচশো— খেদার সঙ্গে

জড়িয়ে তখন প্রচুর লোকের অন্নসংস্থান। এতগুলো লোক খাটবে, আর খরচ হবে না? অতএব, ব্যয় হত। বিশাল অঙ্কের টাকাই। নির্বিঘ্নে ব্যাপারটা মিটে গেলে অবশ্য খেদা থেকে লাভও হত প্রচুর। আর তা না হলে! সে পথে বসার মতো অবস্থা! লুইসের বইটি কবে প্রকাশিত হয়েছিল, সে বলেছি আগেই। এর তিন বছর আগে, অর্থাৎ ১৮৬৫ সাল নাগাদ এক-একটি খেদার জন্য নাকি ব্যয় হত চার থেকে ছ'-হাজার টাকা। আর তাঁর বই প্রকাশকালীন সময়ে এজন্য লাগত পাঁচ থেকে সাত হাজার টাকা। লুইসই জানিয়েছেন। উনিশ শতকের মধ্য ভাগে এই টাকার অঙ্ক বিশাল। সাধে মোগল বাদশারা খেদার খরচের জন্য মহালের বন্দোবস্ত করে দিয়েছিলেন! এক সঙ্গে প্রচুর হাতি ধরা পড়ার সম্ভাবনা না থাকলে তাই খেদাকে এড়িয়ে যাওয়া হত। সিংলা বা লঙ্গাইর জঙ্গল মহালে প্রচুর হাতি একসঙ্গে ধরা পড়ত বলেই এই অঞ্চলে খেদার চল ছিল। কাছাড়ে আবার ফাঁসের চল ছিল বেশি। স্টুয়ার্ট জানিয়েছেন। তাঁর কাছ থেকে এ-ও জানতে পারি যে, নেশার জিনিস খাইয়েও নাকি হাতি ধরা হত সেকালে।

কাছাড় প্রসঙ্গে বলি, এখানকার অর্থনীতিতেও হাতির ব্যবসা প্রভাব ফেলেছিল বেশ। কাছাড়ের হাতির বর্ণনা দিয়ে লুইস সাহেব লিখছেন, "There are two perfectly distinct varieties or castes of elephants caught in the jungle of Cachar. The first in value is called Koomeerah, and is distinguished by its stout make, small head and low action, which renders its pace quick and even; the second and inferior caste is called Meergia, and is marked by its large head, slender body and legs, and high action, which renders its pace slow and heavy. A cross between the two varieties is called Doasala or Nussub."[৩২]

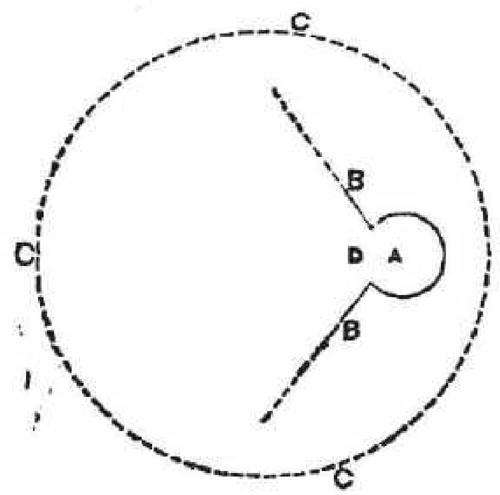

মেজর স্টুয়ার্টের আঁকা হাতি খেদার ছবি

সাহেবদের লেখালেখিতে রয়েছে হাতি সংক্রান্ত আরও কতকিছুর খুঁটিনাটি বর্ণনা! আর সে হওয়ার কথাই। মোগল আমলের কথা না হয় বাদই দিলাম, ইংরেজ আমলেও যে এই অঞ্চলের প্রধান আরণ্যক পশু হাতিই। কোম্পানির সাহেবসুবো কর্মকর্তা থেকে এ দেশীয় ইতিহাসবিদ, প্রত্যেকেই বারবার স্মরণ করিয়ে

দিয়েছেন একথা। হাতির সঙ্গে লড়াই করে স্থানীয়দের টিকে থাকার কথা ব্র্যাডলি সাহেবের বর্ণনায়ও পড়েছি আমরা। শুধু কি আর আমজনতা! অষ্টাদশ শতকের শেষ পর্বে এমনকী কোম্পানি-কর্মচারীদেরও বাঘ, বাইসন, বুনো মহিষ আর অবশ্যই হাতির সঙ্গে লড়াই করে দিন গুজরান করতে হয়েছে। এমনকী, কোম্পানির সদর দফতরের চৌহদ্দিও তখন বুনো পশুদের এক্তিয়ারে। ফলে কোম্পানি-কর্মচারীরা দু'দিনেই দক্ষ শিকারি। শুধু শখের খাতিরে নয় অবশ্য, ব্র্যাডলি বার্টের মন্তব্য থেকে মনে হয় সেকালে হাতি-শিকারটা কোম্পানি কর্মচারীদের কর্তব্যের মধ্যেই পড়ত। সাহেব জানিয়েছেন, "Besides being a most attractive form of sport, elephant-hunting was also a duty of the Companyós Servants until the year 1770."[৩৩]

কেন ১৭৭০ অবধি? কারণ, সেই বছরই কোম্পানির আদেশে সরকারি খরচে হাতি খেদা বন্ধ হয়ে যায়। এর আগে জেলায় জেলায় কোম্পানি খেদা-সুপারিন্টেডেন্ট নিয়োগ করেছে। এদের তত্ত্বাবধানেই তখন হাতি ধরা হত। হঠাৎ কোম্পানির মনে হল, এতে বড্ড বেশি খরচ হয়ে যাচ্ছে। ব্যস, এই অজুহাতে বন্ধ করে দেওয়া হল খেদা। প্রাপ্ত নথিপত্র বলছে, মোগল আমল থেকে এই অঞ্চলে খেদার খরচ বহন করে আসছে রাজকোষাগার। যদিও আমরা জানি, সেই কোন্ প্রাচীনকাল থেকেই খেদার সাহায্যে হাতি ধরা হয়েছে এখানে। সাধারণের সাধ্য কি খেদার খরচ জোগায়! খরচ জুগিয়েছেন রাজা-বাদশারাই। লোকপুরাণেও রয়েছে এখানকার হাতির উল্লেখ। ভগদত্তের প্রসঙ্গও এক্ষেত্রে টেনে আনা যায়। প্রাগজ্যোতিষপুরের রাজা। সম্পর্কে দুর্যোধনের শ্বশুর। যোগ দিয়েছিলেন কুরুক্ষেত্র যুদ্ধেও। দীনেশচন্দ্র সেন থেকে অচ্যুতচরণ তত্ত্বনিধি, প্রত্যেকের বক্তব্য নরকাসুর-পুত্র এই ভগদত্তের উপরাজধানী ছিল সিলেটের লাউড়। বছরের কিছুটা সময় নাকি তাঁর কাটত এখানেই। এখানকার খাল-বিল-হ্রদে নৌকায় ঘুরে বেড়াতেন তিনি। জলকেলির জন্য। সিলেট তখন কামরূপের অংশ। জনশ্রুতি, লাউড়ের একটি পাহাড়ে ছিল তাঁর আবাস। লোকে তা চিহ্নিত করত ভগদত্তের টিলা বলে। পরবর্তীতে ভগদত্ত বংশজরাও সেখানে রাজত্ব করে গেছেন। তা এই ভগদত্তের উল্লেখমাত্রই যখন কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের হাতির কথা মনে পড়ে যায়, তখন কি আর এই ভাবনা মনে জাগে না যে সিলেটের লাউড় তাঁর উপরাজধানী হলে সেখান থেকেও নিশ্চয়ই বছরে কিছু হাতি সংগ্রহ করতেন তিনি! আর সেটাই তো স্বাভাবিক। এই অঞ্চলের হাতির সুনাম যে সেই প্রাচীনকাল থেকেই চলে আসছে।

লোকপুরাণের কথা ছেড়ে এবার ইতিহাসের কথায় আসা যাক। নরনারায়ণের সময়কার কথা। চিলারায়ের সঙ্গে যুদ্ধে মারা গেলেন সিলেটের এক আমিল। আমিল, অর্থাৎ ফৌজদার। আসলে শাসক। নবাবের সমতুল্য ছিল এই পদের সম্মান। পদটি তৈরি হয়েছিল আকবরের আমলে। এর আগে অবধি কানুনগোরাই ছিলেন শাসনকর্তা। আমিল পদ তৈরি হলে কানুনগোরা হলেন দেওয়ান। সে যা-ই-হোক, চিলারায়ের সঙ্গে যুদ্ধে তখনকার এক আমিলের মৃত্যু হয়েছিল, আর তাঁর ভাই হলেন বন্দি। তখন দু'শোটি ঘোড়া, নগদ তিন লক্ষ টাকা, দশ হাজার মোহর আর একশোটি হাতি কর হিসেবে দেবেন, এই কড়ারে তাঁকে মুক্তি দেওয়া হয়।

উদ্ধৃত করার মতো এমন ঘটনা রয়েছে প্রচুর। সে-সব ঘটনায় শত শত হাতির উল্লেখ। খেদার মাধ্যমে হাতি না ধরলে হাতির এত প্রাচুর্য থাকা কি সম্ভব! এদিকে, রাজা-বাদশারা ছাড়া অন্য কারও সাধ্যি কি যে হাতি খেদার খরচ চালায়! দেশীয় রাজারাজড়াদেরও তখন যুদ্ধবিগ্রহের প্রয়োজন ফুরিয়েছে। সব রাজ্যই করদ। সুতরাং, কোম্পানি ছাড়া একসঙ্গে প্রচুর হাতি কেনারও প্রয়োজন পড়ত না কারও। ফলস্বরূপ শাসকপক্ষ নিজের উদ্যোগে আর কখনও খেদার আয়োজন করবে না শুনে হাহাকার উঠেছিল। হওয়ার কথাই। খেদার

সঙ্গে যে জড়িয়ে ছিল কিছু মানুষের ভাত-কাপড়ের গল্পও। তাছাড়া স্থানীয়দের টিকে থাকার জন্যও খেদা জরুরি ছিল। বলছেন কোম্পানি কর্মকর্তারাই, “Company had overlooked the fact that beyond providing themselves with the elephants they required, it was absolutely essential that they should be caught or killed in order to protect the unfortunate cultivator from their ravages.”[৩৪]

দেয়ালে পিঠ ঠেকে গেলে যা হয়, ঘুরে দাঁড়ানোর চেষ্টা শুরু হয়েছিল। শুরু হয় নিজেদের মূলধন দিয়ে হাতি খেদার দল তৈরির চেষ্টা। জীবিকার প্রয়োজনে, আত্মরক্ষার প্রয়োজনে এবং সরকারের ঘরে রাজস্ব জমা দেওয়ার তাগিদও কাজ করছিল : “…when the Company, on the score of economy, ordered that no more elephants should be caught at its expense, the farmers of Sylhet were forced to become elephantéôéhunters on their own account if the revenue was to be maintained.”[৩৫] কোম্পানির এই কাজে রায়তদের পারিশ্রমিক মিলত সামান্যই। নিজেদের উদ্যোগে যখন তারা কাজে নামলো, তখন কিছুটা হলেও লাভের মুখ তারা দেখেছিল বইকি! তবে এক্ষেত্রে একটা ভয়ও ছিল। যদি কোম্পানির প্রয়োজন না পড়ে, তাহলে এতগুলো হাতির খোরাক জোটাবে কে! এই ভয়ে খুব বেশি হাতি নিজেদের হাতে রাখত না তারা।

তবে চাহিদা যে একেবারেই ছিল না, এমন নয়। খরচ কমাতে সরকারিভাবে খেদা বন্ধ করা হলেও শাসকপক্ষের নিজেদেরই তখন প্রচুর হাতির প্রয়োজন। শাসনকার্য পরিচালনার জন্য। সেনাবাহিনীর জন্য। মাল পরিবহনের জন্য। যাতায়াতের জন্য। চাহিদার তুলনায় জোগান কম। কখন প্রয়োজন পড়বে সে কি আর আগে থেকে আন্দাজ করা যায়! এদিকে, হাতি শিকারিরাও খুব বেশি হাতি নিজেদের কাছে রাখত না। সুতরাং, মাঝে মাঝেই সঙ্কটে পড়তে হত শাসকপক্ষকে। তেমন অবস্থার সৃষ্টি হলে ব্যক্তিগত মালিকানাধীন হাতিদের তুলে নিয়ে যাওয়া হত সরকারি কাজে ব্যবহার করার জন্য। তবে সেক্ষেত্রেও কিছু অসুবিধে ছিল। গবেষকরাই দিচ্ছেন এসব তথ্য : “In cases of emergency, elephants might be requisitioned from private owners although this was not considered desirable because the health and quality could not be regulated.”[৩৬]

সাধারণত এক্ষেত্রে জমিদারদের কাছ থেকেই হাতি সংগ্রহ করা হত। তবে তাদেরও হাতে গোনা হাতি। পেশাদার শিকারিদের কাছ থেকে কেনা। খেদার খরচ সামাল দেওয়ার সাধ্য ছিল না তাদেরও। বলছেন তাঁরাই, যাঁরা হাতি খেদার প্রত্যক্ষদর্শী। এমনই একজন লিখছেন, “In Sylhet there were large herbs of wild elephants, but few were available for purchase from local zemindars and professional sikaries, who were unable to bear the great expense incident to their capture on a large scale.”[৩৭] তা শিকারিদের কাছ থেকে কেনা জমিদারদের হাতি তেমন প্রয়োজনে শাসকপক্ষ কিনেও নিত। আবার রাজস্ব হিসেবেও সেই সময় সরকারি তোষাখানায় হাতি জমা দেওয়ার চল ছিল। জমিদার-শাসকপক্ষের মধ্যে অনেক সময় বিনিময়ের মাধ্যমও হয়ে উঠত হাতি। এমনকী হাতি বাঁধা রেখে টাকা ধার নেওয়ারও চল ছিল। আর সাহেবসুবোদের খুশি রাখতেও যে হাতি উপহার দেওয়া হত, সে কি আর বলে দিতে হয়!

এদিকে, কোম্পানি যখন খেদা বন্ধ করে দিল, তখন কোম্পানির কর্মকর্তারা এগিয়ে এলেন এই ব্যবসায়। আর এ ব্যাপারে পথিকৃৎ এক এবং অদ্বিতীয়ম উইলিয়াম ম্যাকপিস থ্যাকারে। মোগল আমলে দিল্লি দরবারের ঘনিষ্ঠরা ছিলেন সিলেটের ‘আমিল’ বা শাসক। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির আমলে ঢাকায় ‘রেভিনিউ

বোর্ড' সিলেটের প্রথম রেসিডেন্ট হিসেবে নিয়োগ করেছিল এই থ্যাকারে সাহেবকে। সে ১৭৭২ সালের কথা। থ্যাকারে এই অঞ্চলে ছিলেন মাত্র তিন বছর। প্রশাসনিক বিধি-ব্যবস্থা করতেই সেই সময়টা কেটে যায় তাঁর। সাধে কি আর তাঁকে 'A collector of revenue, a maker of roads and builder of bridges, a shikari or hunter, a magistrate, judge, policeman and doctor in one'[৩৮]— বলা হয়েছে! থ্যাকারে একা হাতে দশ দিক সামাল দিয়েছেন, আবার ব্যবসাও করেছেন চুটিয়ে। থ্যাকারের পরবর্তী সময়ে, ১৭৭৯ সালে ঢাকার রেসিডেন্ট হয়ে এসেছিলেন রবার্ট লিন্ডসে সাহেব। তাঁর সরল স্বীকারোক্তি, 'রেসিডেন্টরূপে আমার বার্ষিক বেতন পাঁচ হাজারের বেশি ছিল না। সুতরাং টাকা রোজগারের অন্য উপায় বেছে নিতে হয়েছিল।' অন্য উপায় বলতে ব্যবসা। মূলত হাতির ব্যবসা। হাতির দাঁতের ব্যবসা। 'এলিফ্যান্ট হান্টার অব সিলেট' নামটি তো আর থ্যাকারের এমনি এমনি জোটেনি! স্থানীয় লোকদের নিয়ে তিনি তৈরি করেছিলেন এক খেদার দল। বাকিটা ইতিহাস। গবেষকরা জানিয়েছেন, কলকাতার চৌরঙ্গী থেকে লন্ডনের ওয়েস্টমিনিস্টার-- থ্যাকারের হাতি পৌঁছে গেছে সর্বত্র।[৩৯]

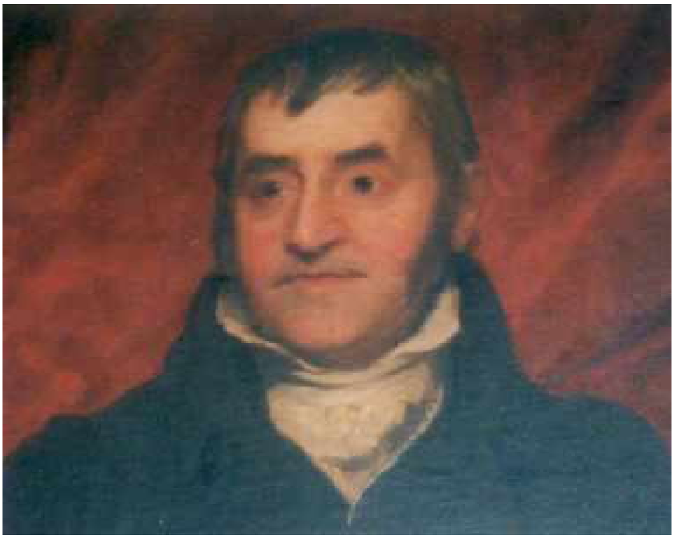

উইলিয়াম ম্যাকপিস থ্যাকারে

সিলেটের সঙ্গে থ্যাকারের নাম জুড়ে গিয়েছিল আরও একটি কারণে। এর পেছনে রয়েছে এক বিখ্যাত মামলা। থ্যাকারের হিরো হয়ে ওঠার পেছনে এই মামলারও একটি ভূমিকা ছিল বইকি! সেই কারনামার কিস্‌সা এখানে সংক্ষেপে না বললেই নয়। সে ১৯৭৪ সালের কথা। কোম্পানির তখন সেনাবাহিনীর জন্য হাতির প্রয়োজন পড়েছে। পাঠানো হবে পাটনায়। বরাত দেওয়া হল থ্যাকারে সাহেবকে। কোম্পানির এজেন্ট গেল তাঁর কাছে। ছেষট্টিটি হাতি তখন থ্যাকারের হাতেই ছিল। তিনি এদের সম্পর্কে যাবতীয় তথ্য তুলে দিলেন সেই এজেন্টের হাতে। এই যেমন উচ্চতা, বয়স, দাঁতের মাপ এসব। এমনকী সেই তালিকায় সাতটি হাতির নামও উল্লেখ করা হয়েছিল। এর মধ্যে একটি হাতির নাম ছিল জেলাবক্স। দলের সব থেকে প্রাচীন হাতি। তখনই তার বয়স আশি। আর দলের সবচেয়ে অল্পবয়সি হাতিটির বয়স ছিল সাত।

কোম্পানি সব ক'টা হাতিই কিনতে রাজি হয়েছিল। চুক্তি হয়, থ্যাকারে নিজের খরচে এদের পৌঁছে দেবেন পাটনায়। কোম্পানি অবশ্য কিছু সেপাইও দিয়েছিল সঙ্গে। পাহারার জন্য। অর্ধেক টাকাও দিয়েছিল অগ্রিম। মুশকিল হল মাঝপথে অধিকাংশ হাতি মরে যাওয়ায়। কোম্পানি তখন বাকি অর্ধেক টাকা দিতে অস্বীকার করে। থ্যাকারে মামলা করেছিলেন। কোম্পানি বনাম থ্যাকারের মামলাটি সেকালের এক বিখ্যাত মামলা। জিত হয়েছিল থ্যাকারেরই। ব্যস, সিলেটের হাতির সঙ্গে জুড়ে গেল থ্যাকারের নাম।

থ্যাকারের গ্ল্যামার, তাঁর রমরমা দেখেই সম্ভবত তাঁর সমসাময়িক আর এক সাহেব, জর্জ টেম্পলারও হাতির ব্যবসা শুরু করেছিলেন। থ্যাকারের মতোই তাঁরও ছিল খেদার দল। বন্দি হাতিদের ট্রেনিঙের ব্যবস্থাও করতেন তিনি। আবার, কোম্পানির হাতিদের খাবার জোগানোর কন্ট্র্যাক্টও ছিল টেম্পলারের। সম্ভবত বন্ধু ওয়ারেন হেস্টিংসের দৌলতেই এই কন্ট্র্যাক্ট হাসিল হয় তাঁর। হেস্টিংস তাঁর খেদার দলের কন্ট্র্যাক্টের মেয়াদ বাড়িয়ে দিয়েছিলেন পাঁচ বছর। পরে অবশ্য ‘excessively expensive’ এই অজুহাতে কোম্পানি তাঁর কন্ট্র্যাক্ট ক্যানসেল করে দেয়। টেম্পলারের জায়গা নিলেন তখন হেনরি র‍্যামুস। সে ১৭৮২ সালের কথা। শোনা যায়, এই র‍্যামুস একাই ৩৬০টি বাঘ শিকার করেছিলেন। এই তিনজনকে দেখে একে-একে অনেকেই তখন হাতির ব্যবসা শুরু করেছিলেন। একটা সময় এমন হয়েছিল যে, কোম্পানির প্রায় প্রত্যেক কর্মকর্তারই একটি করে খেদার দল থাকত। কোম্পানির কাছ থেকে হাতি ধরার কন্ট্র্যাক্ট নিতেন এঁরা। সেই দলে ছিলেন সিলেটের রেসিডেন্ট লিন্ডসেও। রেসিডেন্ট পরিচিতির সঙ্গে সঙ্গে যাঁর আরও একটি পরিচিতি জুটেছিল-- ‘Elephant Contractor’।[৪০]

এই লিন্ডসে সাহেবের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, গড়ে প্রতি বছরই পাঁচশো হাতি ধরা হত সিলেটের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে। এর মধ্যে তাঁর নিজের খেদার দলই ধরত দেড়শো থেকে দু'শো হাতি। কোম্পানি প্রয়োজনে এই কন্ট্র্যাক্টরদের কাছ থেকেই হাতি কিনত। আবার প্রয়োজনে ভাড়াও নিত। যদিও কোম্পানির কাছে হাতি বিক্রি করতে খুব একটা উৎসাহী ছিল না এই হাতি ব্যবসায়ীর দল। লিন্ডসের অকপট স্বীকারোক্তি, সরকারের কাছে হাতি বিক্রি করে তাঁর লাভ হয়নি তেমন, যতটা লাভ হয়েছে খোলা বাজারে বিক্রি করে।

কোম্পানির উদ্যোগে খেদা অবশ্য চালু হয়েছিল আবার। বলা ভালো চালু করতে বাধ্য হয়েছিল, কারণ, ‘the elephants were so hard on agriculture that they were driving away people.’ সে ১৭৯১ সালের কথা। শুরু হয়েছিল ঢাকা থেকে, পরে সিলেটেও। এর অনেক পরে, খেদা ব্রাঞ্চ খোলা হয় কাছাড়েও। সালটা ছিল ১৮৪৭। এর মাত্র সতেরো বছর আগে ইংরেজরা দখল নিয়েছিল এই রাজ্যের। ১৮৬৬ সালে আলাদা করে খেদা ব্রাঞ্চ খোলা হয় মিলিটারি ডিপার্টমেন্টও। এতে প্রতিযোগিতা বেড়ে যায়। হাতি ব্যবসায়ীদের একাধিপত্যে ধস নামে। এর কিছুদিনের মধ্যেই জারি হয় আইন। ঘোষণা করা হয়, সাধারণের জন্য হাতি ধরা নিষিদ্ধ। সে ১৮৬৫ সালের কথা। ব্যবসায় লাগাম টানতে সেই সময় চাপিয়ে দেওয়া হয়েছিল নানারকম করের বোঝাও। ব্যক্তিগত উদ্যোগে হাতি খেদা বন্ধ হতে তাই সময় লাগেনি। আর একটা সময় হাতি সংক্রান্ত সবকিছুর দায়িত্ব নেয় বনবিভাগ। সে ১৯০৪ সালের কথা।

রূপকথা ফুরায় না, আবার ফুরায়ও। সব রূপকথা কি আর লোকমুখে বেঁচে থাকে! থ্যাকারের কথাই ধরি না কেন! দেশে-বিদেশে মিথ হয়ে যাওয়া এই সাহেবের কারনামা এখন বইবন্দি। অবিভক্ত আধুনিক সিলেটের প্রথম রূপকারের নাম শুধু গবেষক আর ইতিহাসবিদদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। তাঁর সেই বিখ্যাত হাতির মামলার কথা লোকে ভুলে গেছে কবেই। তবু কিছু মিথ থেকেই যায়। সেই মিথ প্রসঙ্গে ঘুরেফিরে আসে সিলেটের হাতির কথা, আসে এখানকার মাহুতদের কথা, হাতি খেদায় তারা কতটা দক্ষ

ছিল— ঘুরেফিরে আসে সে-সব কথাও। তবে সেই গল্পও আজ প্রাচীনদের মুখেই সীমাবদ্ধ। সংস্কৃতির পরাকাষ্ঠা দেখিয়েছিল যে রাজদরবার, সেই মোগল দরবার সিলেটের শিল্পীদের যে কতটা কদর করত, নতুন প্রজন্ম জানে না সে-কথা। সিলেটের গজদন্ত শিল্পের ঐতিহ্যের কথাও জানা নেই তাদের। জানে না তারা হাতির দাঁতের পাটি কিংবা পাখার কথাও। জানে না এখানকার কারিগররা হাতির হাড় আর চামড়া দিয়ে কেমন সুন্দর অস্ত্রশস্ত্র আর মনোহারি জিনিস তৈরি করত! সিলেটের অংশ হিসেবে এককালে করিমগঞ্জ জেলায়ও যে এই শিল্পের চূড়ান্ত বিকাশ ঘটেছিল, একথাই বা ক'জন জানেন! পরবর্তীকালে, মুর্শিদাবাদে যে গজদন্ত শিল্পের জোয়ার দেখা দেয়, এর পেছনেও সিলেটের গজদন্ত-শিল্পীদের একটা ভূমিকা রয়েছে বলে অনেকে মনে করেন। তাঁদের বক্তব্য, সেসময় সিলেটের অনেক শিল্পীই আশ্রয় নিয়েছিল ঢাকা আর মুর্শিদাবাদের দরবারে। রাজ-অনুগ্রহের বাসনাতেই।

দিন ফুরায়। ইতিহাসের পাতায় বিস্মৃতির ধুলো জমে। ঐতিহ্যের আখ্যান পায় না স্পর্শসুখ। তবু ইতিহাস অপেক্ষায় থাকে। যদি কোনও ভুলোমন পথিক তাকে নেড়েচেড়ে দেখে একবার...

তথ্যসূত্র :

১। হেমেন্দ্রনাথ দাস, পণ্ডিতা রমাবাই ও শ্রীহট্ট, কমল চৌধুরী সংগৃহীত ও সম্পাদিত সিলেটের ইতিহাস, দে'জ পাবলিশিং, ২০১২, পৃ. ৩৯০

২। W. W. Hunter, A Statistical Account of Assam, Vol. II, Trubner & Co., London, 1879– p. 304

৩। James Donald, Monograph on Ivory Carving in Assam, Assam Secretariat Printing, 1900, Shillong, p. 1

৪। Ibid, p. 1

৫। Kamalakanta Gupta, Copper-Plates of Sylhet, Vol. I, (7th-11th Century A.D), Lipika Enterprises Ltd. Sylhet, p. 202

৬। শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত, পূর্বাংশ, অচ্যুতচরণ চৌধুরী তত্ত্বনিধি, লেখক সমবায়, ঢাকা, ১৯০৬, পৃ. ১৩৮

৭। K. C. Kabra, Economic Growth of Mizoram, Role of Business & Industries, Concept Publishing Company, New Delhi, 2008, p. 17

৮। James Donald, Monograph on Ivory Carving in Assam, Assam Secretariat Printing, 1900, Shillong, p. 2

৯। Ibid, p.3

১০। Arup K. Chatterjee, Indians in London- From the Birth of the East India Company to Independent India, Bloomsbury Publishing, 2021, p. 153

১১। Pius Malekandathil Edited, The Indian Ocean in the Making of Early Modern Indian, Taylor & Francis, 2016, p. 464

১২। James Donald, Monograph on Ivory Carving in Assam, Assam Secretariat Printing, 1900, Shillong, p. 2

১৩। B. C. Allen, Assam District Gazetteers, Vol. II, Sylhet, Caledonian Steam Printing Works, Calcutta, 1905, p.157

১৪। James Donald, Monograph on Ivory Carving in Assam, Assam Secretariat Printing, 1900, Shillong, p. 3

১৫। Ibid, p.3

১৬। W. W. Hunter, A Statistical Account of Assam, Vol. II, Trubner & Co., London, 1879, p. 304

১৭। James Donald, Monograph on Ivory Carving in Assam, Assam Secretariat Printing, 1900– Shillong, p. 6

১৮। কমল চৌধুরী মৌলোভী মাহাম্মদ আহমদ, শ্রীহট্ট দর্পণ : শ্রীহট্টের সংক্ষিপ্ত ভূগোল ও ইতিহাস, কমল চৌধুরী সংগৃহীত ও সম্পাদিত সিলেটের ইতিহাস, দে'জ পাবলিশিং, ২০১২, পৃ. ৭৬

১৯। Charles Frederick Hoilder, The Ivory King- A Popular History of The Elephant & its Allies, Charles Scribnerós Sons, New York, 1902, p. 92

২০। Pius Malekandathil Edited, The Indian Ocean in the Making of Early Modern Indian, Taylor & Francis, 2016, p. 463

২১। W. W. Hunter, A Statistical Account of Assam, Vol. II, Trubner & Co., London, 1879, p. 305

২২। H. G. Joshi, Mizoram Past & Present, Mittal Publications, New Delhi, 2005, p. 97

২৩। K. C. Kabra, Economic Growth of Mizoram, Role of Business & Industries, Concept Publishing Company, New Delhi, 2008, p. 18

২৪। Ibid, p. 18

২৫। H. G. Joshi, Mizoram Past & Present, Mittal Publications, New Delhi, 2005, p. 97

২৬। E. M. Lewis, Principal Heads of the History & Statistics of the Dacca Division, Calcutta Central Press Company, 1868, p. 97

২৭। কমল চৌধুরী মৌলোভী মাহাম্মদ আহমদ, শ্রীহট্ট দর্পণ : শ্রীহট্টের সংক্ষিপ্ত ভূগোল ও ইতিহাস, কমল চৌধুরী সংগৃহীত ও সম্পাদিত সিলেটের ইতিহাস, দে'জ পাবলিশিং, ২০১২, পৃ. ৬০

২৮। Bradley Birt, 'Sylhet' Thackery, Smith, Elder & Co., London, 1911, p. 178-179

২৯। Courtsey, Coldnoon, International Journal of Travel Writing and Travelling Cultures, New Delhi

৩০। E. M. Lewis, Principal Heads of the History & Statistics of the Dacca Division, Calcutta Central Press Company, New Delhi, 2008, p. 300

৩১। Ibid, p. 301

৩২। Ibid, p.372

৩৩। Pius Malekandathil Edited, The Indian Ocean in the Making of Early Modern Indian, Taylor & Francis, 2016, p. 463

৩৪। Bradley Birt, 'Sylhet' Thackery, Smith, Elder & Co., London, 1911, p.179

৩৫। Ibid, p.180

৩৬। Pius Malekandathil Edited, The Indian Ocean in the Making of Early Modern Indian, Taylor & Francis, 2016, p. 463

৩৭। Bradley Birt, 'Sylhet' Thackery, Smith, Elder & Co., London, 1911, p. 178

৩৮। Arup K. Chatterjee, Indians in London- From the Birth of the East India Company to Independent India, Bloomsbury Publishing, 2021, p. 153

৩৯। Ibid, p.153

৪০। Pius Malekandathil Edited, The Indian Ocean in the Making of Early Modern Indian, Taylor & Francis, 2016, p. 464

মানবিক বিকাশ : হাইলাকান্দি জেলার চিত্র

গোলাবচন্দ্র নন্দী

১. ভূমিকা :

মানবিক দক্ষতা ব্যক্তি এবং সামাজিক উভয় মূল্যায়নের ক্ষেত্রে গুরুত্ব রাখে। এটি সত্য, উন্নত শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও পুষ্টির মাধ্যমে মানব সক্ষমতা বাড়ানোর নির্ধারিত প্রচেষ্টা বিশেষত পশ্চাৎপদ অঞ্চলে অর্থনৈতিক প্রসারের সম্ভাবনাগুলোকে রূপান্তরিত করবে। উন্নয়নের উদ্দেশ্যটি হওয়া উচিত মানুষের দীর্ঘ, স্বাস্থ্যকর এবং সৃজনশীল জীবন উপভোগ করার জন্য একটি সক্ষম পরিবেশ তৈরি করা। সুতরাং, উন্নয়নকে কেবল অর্থনৈতিক কোণ থেকে দেখা উচিত নয়, বরং এটি মানবিক কোণ থেকে দেখা উচিত। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পুষ্টি, লিঙ্গসমতা, স্বাস্থ্যবিধি এবং পানীয়জলের প্রাপ্যতা এবং আর্থ-সামাজিক দুর্বল জনগোষ্ঠীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের মতো সামাজিক পরিকাঠামোর সম্প্রসারণকে এখন উন্নয়নের গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসেবে বিবেচনা করা হয়। স্পষ্টতই, কোনও ব্যক্তি যদি প্রাথমিক শিক্ষা, স্বাস্থ্য পরিষেবা, পুষ্টিকর খাবার, সঠিক স্বাস্থ্যব্যবস্থা, পরিষ্কার পানীয়জলের সুবিধা ইত্যাদির অধিকারী হয়, তবে সে উন্নতমানের জীবনযাপন করতে পারবে। মানব উন্নয়ন পদ্ধতি, মানুষের বিকাশের স্তরের ওপর সঠিক আলোকপাত করে এবং বিশেষত একটি পশ্চাৎপদ অঞ্চলে উন্নয়নের লক্ষ্য অর্জনে নীতিনির্ধারণে সহায়তা করে। এসব বিষয়কে সামনে রেখে প্রদত্ত অধ্যয়নটি আসামের অন্যতম প্রত্যন্ত অঞ্চল হাইলাকান্দি জেলার উন্নয়নের দৃষ্টিভঙ্গি অন্বেষণের চেষ্টা করেছে।

২. আসামের অন্য অংশের সঙ্গে হাইলাকান্দি জেলার মানব উন্নয়ন অর্জনের তুলনামূলক পরিস্থিতি:

মানব উন্নয়ন সূচক (Human Development Index) জনগণের দ্বারা উপভোগের গড় স্তরের ভিত্তিতে দেশ এবং সমাজকে স্থান দেয়। মানব উন্নয়ন সূচকের তিনটি উপাদান রয়েছে— স্বাস্থ্য, শিক্ষা এবং জীবনধারণের স্বীকৃতি এবং এই তিনটিই মৌলিক সক্ষমতা বোঝায়। উপরিউক্ত তিনটি উপাদানের মধ্যে উপলব্ধির স্তরগুলোর বেশিরভাগ সূচক দ্বারা পরিমাপ করা হয়।

স্পষ্টতই, কোনও ব্যক্তি যদি প্রাথমিক শিক্ষা, স্বাস্থ্য পরিষেবা, পুষ্টিকর খাবার ইত্যাদির অধিকারী হয় তবেই সে উন্নতমানের জীবনযাপন করতে পারবে। তবে, সত্যিকারের স্বাধীনতা এবং অধিকারের বিষয়গুলোর মধ্যেই মানব বিকাশের মূল্যায়ন করতে হবে। এই অর্থে মানব ক্ষমতার বিস্তৃতি বিকাশের প্রক্রিয়াটির কেন্দ্রীয় বৈশিষ্ট্য হিসেবে দেখা যেতে পারে। ‘বুনিয়াদি’ ক্ষমতাগুলো নির্দিষ্ট কিছু কার্য সম্পাদন করার ক্ষমতা বোঝায়, যা শিক্ষিত, দীর্ঘ ও স্বাস্থ্যকর জীবনযাপন এবং জীবনের স্বল্পতম শালীন মান উপভোগ করার জন্য। এই মৌলিক ক্রিয়াকলাপগুলোর উপলব্ধি স্তর একটি কৃতিত্বের স্তরকে এবং তাৎক্ষণিকভাবে উন্নয়নকে সংজ্ঞায়িত করে। এই তিনটি কার্যক্রমে কৃতিত্বের স্তরের দ্বারা প্রদত্ত কল্যাণের স্তরটি সামর্থের

প্রতিফলনযোগ্য। সামর্থ অনুযায়ী, সুতরাং, এই তিনটি মৌলিক কার্যকারিতা অর্জনের উপলব্ধি স্তরের ওপর ভিত্তি করে একটি সূচক দ্বারা মূল্যায়ন করা যেতে পারে। এখানে মানব উন্নয়ন সূচক (HDI) একই ক্রিয়া সম্পাদন করে ।

২.১ হাইলাকান্দি জেলা ও আসামের অন্যান্য জেলায় মানব উন্নয়ন সূচক এবং তার উপাদানগুলো :

২.১.১ স্বাস্থ্যের সূচক হিসেবে জন্মের সময় আয়ু (Life Expectancy at Birth) :

জনসংখ্যার বয়স-নির্দিষ্ট মৃত্যুর হার বিবেচনা করে, জন্মের সময়কালীন আয়ু (Life Expectancy at Birth) বাচ্চা জন্মের সময় কতটা বাঁচতে পারে বলে বোঝায়। এই সূচকটি স্বাস্থ্যের দীর্ঘমেয়াদি উন্নতি বোঝায়। প্রকাশিত নমুনা নিবন্ধন পদ্ধতি মতো (SRS) তথ্য (২০০৬-১০) এটি অনুমান করে যে, আসামে পুরুষের জন্মকালীন আয়ু ৬২ বছর এবং মহিলার ৬১ বছর। আসাম মানব বিকাশ প্রতিবেদন ২০১৪ (Assam Human Development Report 2014) তথ্যের ভিত্তিতে, রাজ্যে জন্মের সময়কালীন আয়ু ৫৪ বছর। জেলা স্তরের অনুমান অনুসারে আসামের জেলাগুলোতে আয়ু বৃদ্ধিতে বড়ধরনের পার্থক্য রয়েছে। সর্বোচ্চ আয়ু কামরূপে (৭১.৮৮) এবং সর্বনিম্ন কাছাড়ে (৪০.৭৬) পাওয়া যায়। তুলনামূলকভাবে উচ্চতর জন্মের সময়কালীন আয়ু বরপেটা, চিরাং, ডিমা হাসাও, কার্বি আংলং, গোয়ালপাড়া এবং মরিগাঁও জেলায় দেখা যায়। একইভাবে, বাক্সা, করিমগঞ্জ, হাইলাকান্দি, তিনসুকিয়া এবং শোণিতপুর জেলায় তুলনামূলকভাবে নিম্ন জীবনের প্রত্যাশা পাওয়া যায়। লক্ষণীয়, এই স্বাস্থ্য সূচকে হাইলাকান্দি-সহ বরাক উপত্যকার অন্যান্য জেলাও সর্বনিম্ন অবস্থান অর্জন করেছে (২৪তম অবস্থান)। তাই নিঃসন্দেহে বলা যায়, স্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে হাইলাকান্দি জেলা একাকী ও তুলনামূলকভাবে পিছিয়ে রয়েছে।

২.১.২ শিক্ষার ক্ষেত্রে অর্জন (Attainment in the field of Education)

শিক্ষামূলক ক্ষেত্রেও হাইলাকান্দি জেলার অবস্থান নিম্নমানের। আসাম মানব উন্নয়ন প্রতিবেদন ২০১৪ মতে, শিক্ষাগত সাফল্যকে মাপার জন্য ব্যবহৃত দু'টি সূচক হলো, বিদ্যালয়ে শিক্ষার্জনের গড় বছর (Mean Years of Schooling) এবং বিদ্যালয়ে শিক্ষার্জনের প্রত্যাশিত বছর (Expected Years of Schooling)। বিদ্যালয়ে শিক্ষার্জনের গড় বছর আসামের জন্য ৬.১৭ গণনা করা হয়েছে। ১৫ বছরের আদর্শিক লক্ষ্য প্রদত্ত যা বিদ্যালয়ের মাধ্যমিক স্তরের নিশ্চয়তা দেয়, রাজ্যে বর্তমান শিক্ষাগত অর্জন লক্ষ্যমাত্রার মাত্র ৪০ শতাংশ অর্জন করতে সফল হয়েছে। এক্ষেত্রে হাইলাকান্দি আসামের জেলাগুলোর মধ্যে ১৮তম স্থান অর্জন করেছে। হাইলাকান্দি বরাক উপত্যকার অন্যান্য দু'টি জেলা, কাছাড় এবং করিমগঞ্জের চেয়ে আরও কম সফলতা অর্জন করতে পেরেছে।

বিদ্যালয়ে শিক্ষার্জনের প্রত্যাশিত বছরের উচ্চতর মান উচ্চতর সঞ্চিত জ্ঞানকে বোঝায় বলে বিশ্বাস করা হয়। আসামের মানব উন্নয়ন প্রতিবেদন অনুসারে রাজ্যের বিদ্যালয়ে শিক্ষার্জনের প্রত্যাশিত বছর ১০.৯৮ থেকে ১২.৫৭-র মধ্যে রয়েছে। সর্বনিম্ন বিদ্যালয়ে শিক্ষার্জনের প্রত্যাশিত বছর হাইলাকান্দিতে পাওয়া গেছে (১০.৯৮) এবং সর্বাধিক পাওয়া গেছে চিরাং (১২.৫৭)। তাই, শিক্ষাগত অর্জনের দিক থেকে হাইলাকান্দি আসামের মধ্যে সর্বাধিক বঞ্চিত জেলা হিসেবে দেখা যায়।

২.১.৩ মাথাপিছু আয় (Per Capita Income) :

মাথাপিছু মোট দেশীয় আয় (Per Capita Gross Domestic Income) মানব বিকাশের আয়ের মাত্রাকে উপস্থাপনের জন্য একটি সূচক হিসেবে ব্যাপকভাবে গৃহীত হয়। জেলাভিত্তিক, সর্বোচ্চ মাথাপিছু মোট দেশীয় আয় (ভারতীয় টাকা ৬৩,৪৪৪) পাওয়া গেছে কামরূপে (মেট্রো)। এরপর যোরহাট (ভারতীয় টাকা ৩৮,৬৬৪)। ধুবড়ির পর সর্বনিম্ন মাথাপিছু মোট দেশীয় আয় (ভারতীয় টাকা ১৬,৬৩২) - প্রাপ্ত হয় হাইলাকান্দিতে। মাথাপিছু আয় বিকাশের সর্বাধিক বিশিষ্ট সূচক হিসেবে বিবেচিত হয়েছে। কারণ, এটি উভয় ক্ষেত্রেই, ফলাফল এবং উন্নয়নের উপায় হিসেবে কাজ করে। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে হাইলাকান্দি আয় সূচকের ক্ষেত্রেও খুব কম অর্জন করতে পেরেছে।

২.১.৪ মানব উন্নয়ন সূচক (Human Development Index) এবং হাইলাকান্দি জেলা :

মানব উন্নয়ন সূচক (Human Development Index) বা এইচডিআই একটি জাতির বিকাশের সম্ভাবনা এবং তার উপাদান জনসংখ্যার অর্জিত সার্থকতার স্তরের দিকে নজর রাখে।

এইচডিআই হলো স্বাস্থ্য, শিক্ষা এবং আয়ের ক্ষেত্রে মাত্রিক সাফল্যের ভিত্তিতে প্রাপ্ত একটি যৌগিক সূচক। সূচিটি জেলাগুলোতে মানব বিকাশের অবস্থা উপস্থাপন করে। জেলায় তাৎপর্যপূর্ণ সাফল্যের ধরন এবং সক্ষমতা বিস্তারের আদর্শিক লক্ষ্যকে সামনে রেখে মানুষ সামগ্রিক মানব বিকাশে কতটা অগ্রগতি লাভ করেছে, এইচডিআই-র মানগুলো তারই বর্ণনা করেছে। ০ থেকে ১-র মধ্যে মানব উন্নয়ন সূচকের পরিসীমাটির মান- যেখানে '০' অগ্রগতি বোঝায় না এবং '১' মূল্যায়নের উদ্দেশ্যে নির্ধারিত আদর্শিক লক্ষ্য সম্পর্কে সম্পূর্ণ কৃতিত্বের পরিচয় দেয়—

সারণি ১: জেলাগুলোর মাত্রিক এবং মানব বিকাশ সূচক :

জেলা	স্বাস্থ্য সূচক	শিক্ষা সূচক	জীবনযাত্রার মানের সূচক	এইচডিআই
বাক্সা	০.৩৪০	০.৬০৬	০.৪০৪	০.৪৩৭*
বরপেটা	০.৭৬৮	০.৬৮৪	০.৪৬২	০.৬২৪
বঙ্গাইগাঁও	০.৫৩০	০.৬৬৭	০.৫০৭	০.৫৬৪
কাছাড়	০.৩১৯	০.৬৪৭	০.৪৭৯	০.৪৬৩
চিরাং	০.৭৪৬	০.৬৭৭	০.৪৫৭	০.৬১৪
দরং	০.৬২০	০.৫৬৬	০.৩৯৯*	০.৫১৯
ধেমাজি	০.৪৮১	০.৬৮৮	০.৩৯৩*	০.৫০৭
ধুবড়ি	০.৫১০	০.৫৭৯	০.৩৮০*	০.৪৮২*
ডিব্রুগড়	০.৫১৮	০.৭০০	০.৪৮৩	০.৫৬০
ডিমা হাসাও	০.৭৪৮	০.৬৬২	০.৫২৫	০.৬৩৮
গোয়ালপাড়া	০.৭১৮	০.৬১২	০.৪৭০	০.৫৯১
গোলাঘাট	০.৫৪৩	০.৬৮৪	০.৪৩১	০.৫৪৩
হাইলাকান্দি	০.৩৬৬	০.৬০৫	০.৩৭৬*	০.৪৩৭*

যোরহাট	০.৫৮৭	০.৭৪৪	০.৬৩৪	০.৬৫৫
কামরূপ	০.৭৯৮	০.৬৪৮	০.৪৮৩	০.৬৩০
কামরূপ (এম)	০.৫৫৪	০.৭৮৩	০.৮০০	০.৭০৩
কার্বি আংলং	০.৭৪৩	০.৬৪৫	০.৪৮০	০.৬১২
করিমগঞ্জ	০.৩৬০	০.৬২৭	০.৪২০	০.৪৫৬*
কোকরাঝাড়	০.৫৩৯	০.৬৪৫	০.৪০২	০.৫১৯
লখিমপুর	০.৬১২	০.৬৯৩	০.৪৬৮	০.৫৮৩
মরিগাঁও	০.৭৩০	০.৬৭৮	০.৩৮৬*	০.৫৭৬
নগাঁও	০.৫৮৮	০.৬৮৪	০.৫১৬	০.৫৯২
নলবাড়ি	০.৪৯৬	০.৭২১	০.৫৩৫	০.৫৭৬
শিবসাগর	০.৫২১	০.৭৫৮	০.৬৩০	০.৬২৯
শোণিতপুর	০.৪৪৪	০.৬১৫	০.৫৩২	০.৫২৬
তিনসুকিয়া	০.৪২৫	০.৬২৫	০.৪৮৩	০.৫০৫
ওদালগুড়ি	০.৫৩৮	০.৬০২	০.৪৪১	০.৫২৩
আসাম	০.৫২৩	০.৬৬১	০.৫০১	০.৫৫৭

সূত্র: আসাম মানব উন্নয়ন প্রতিবেদন ২০১৪

আসাম মানব বিকাশ প্রতিবেদন ২০১৪ সামগ্রিকভাবে আসাম রাজ্যের এইচডিআই-র মান ০.৫৫৭ বলে অনুমান করে। এটি আমাদের জানায় যে, কাঙ্ক্ষিত আদর্শিক লক্ষ্যকে কেন্দ্র করে, রাজ্যের সার্বিক মানব বিকাশের বর্তমান স্তরটি ৫০ শতাংশ অতিক্রম করে সামান্য কিছুটা দূরে। সর্বোচ্চ অর্জন কামরূপ (মেট্রো) এবং সর্বনিম্ন হাইলাকান্দিতে লক্ষ্য করা যায়। ২৭টি জেলার মধ্যে ১৫টিতে, মানুষের বিকাশে গড় অর্জনের স্তরটি রাষ্ট্রের গড়ের চেয়ে বেশি পাওয়া যায়। চিত্রটি দেখায়, কেবলমাত্র চারটি জেলা ০.৫০০-র চেয়ে কম এইচডিআই মান অর্জন করেছে এবং হাইলাকান্দি এখন পর্যন্ত আসামের জেলাগুলোর মধ্যে সর্বনিম্ন অর্জনকারী হিসেবে দেখা গেছে।

২.১.৫ বহুমাত্রিক দারিদ্র্য সূচক (Multi-dimensional Povert Index) এবং হাইলাকান্দি জেলা :

বহুমাত্রিক দারিদ্র্য সূচক (Multi-dimensional Povert Index) বা এমপিআই সূচকগুলো ক্ষমতা বঞ্চনার দিকে আলোকপাত করে। এমপিআই, এইচডিআই-র মতো, একই তিনটি মাত্রাজুড়ে বঞ্চনাগুলো সনাক্ত করে এবং এতে তীব্র বঞ্চনা রয়েছে যা প্রতিটি ব্যক্তি একইসঙ্গে শিক্ষা, স্বাস্থ্য এবং জীবনযাপনের শালীন মান সম্পর্কে প্রকাশিত হয়। এমপিআই অনুমান করতে ব্যবহৃত সূচকগুলো হলো—

১। স্বাস্থ্য, (ক) পুষ্টি, (খ) শিশুমৃত্যু,

২। শিক্ষা, (ক) বিদ্যালয়ে শিক্ষার্জনের মোট বছর, (খ) শিশুদের বিদ্যালয়ে ভর্তির সংখ্যা,

৩। জীবনযাত্রার মান, (ক) রান্না জ্বালানি, (খ) টয়লেট, (গ) নিরাপদ জল, (ঘ) বিদ্যুৎ, (ঙ) মেঝ, (চ) সম্পদ।

সারণি ২: এইচডিআই এবং এমপিআই র‍্যাঙ্কিং অনুযায়ী হাইলাকান্দি জেলার অবস্থান:

জেলা	র‍্যাঙ্কিং এইচডিআই	র‍্যাঙ্কিং এমপিআই
কাছাড়	২৪	৬
হাইলাকান্দি	২৭	৪
করিমগঞ্জ	২৫	৩

সূত্র: আসাম মানব উন্নয়ন প্রতিবেদন ২০১৪

সারণি ২ থেকে দেখা যায়, হাইলাকান্দি জেলায় মানব বিকাশের ক্ষেত্রে অর্জনের স্তর রাজ্যের গড়ের তুলনায় ধারাবাহিকভাবে কম। ওই সারণি অসম রাজ্যে অমসৃণ উন্নয়নের সুস্পষ্ট চিত্র দেখায়। মানব উন্নয়নের ক্ষেত্রে বরাক উপত্যকাটি ভারসাম্যহীন উন্নয়ন অর্জন করতে দেখা যায়। রাজ্যের ২৭টি জেলার মধ্যে মানব উন্নয়নে কাছাড় ও করিমগঞ্জ যথাক্রমে ২৪ এবং ২৫তম অবস্থান নিয়েছে। আরও গুরুত্বপূর্ণ, হাইলাকান্দি জেলা সর্বোচ্চ বঞ্চনার ঘটনাটি প্রকাশ করে, এইচডিআই র‍্যাঙ্কিংয়ে সর্বশেষ অবস্থান অর্জন করেছে।

দারিদ্র্যকে কেবল পর্যাপ্ত আয়ের অভাব হিসেবে নয়, আর্থ-সামাজিক এবং রাজনৈতিক বঞ্চনার দিক হিসেবেও দেখা হয়। এক্ষেত্রে বরাক উপত্যকা এবং বিশেষভাবে হাইলাকান্দি জেলা সর্বাধিক বঞ্চনার সাক্ষী রাখে। এমপিআই র‍্যাঙ্কিংয়ে করিমগঞ্জ, হাইলাকান্দি এবং কাছাড় যথাক্রমে তৃতীয়, চতুর্থ এবং ষষ্ঠ স্থান অর্জন করেছে। সুতরাং, এটি প্রকাশ করে যে, এই উপত্যকার দারিদ্র্য এবং সম্পর্কিত বঞ্চনাগুলো সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক কারণগুলোর সম্মিলিত প্রভাবের ফলাফল।

মৌলিক সুযোগ-সুবিধার অভাবে সৃষ্টি হওয়া মানবিক অক্ষমতা, জনস্বার্থের নামে রাজ্যের দ্বারা পরিচালিত সংস্থাগুলোর অদক্ষতার প্রতিফলন করে।

হাইলাকান্দি জেলায় মানব বিকাশের বিশাল ঘাটতি সরকারের নীতিগুলোকে নতুনভাবে রূপান্তরিত করার আমন্ত্রণ জানায়, যা এই অঞ্চলে মানব বিকাশ এবং হতাশাকে হ্রাস করতে জনগণের সক্ষমতা প্রত্যক্ষভাবে প্রভাবিত করবে।

৩. উপসংহার:

উপরিউক্ত আলোচনার সূত্র ধরে বলা যেতে পারে, সামগ্রিকভাবে রাজ্যের অন্যান্য জেলার তুলনায় হাইলাকান্দিতে মানব উন্নয়ন কম রয়েছে। জেলাটি কেবল অর্থনৈতিক ফ্রন্টেই নয়, সামাজিক ফ্রন্টেও পিছিয়ে রয়েছে। আয়, শিক্ষা এবং স্বাস্থ্য উন্নতি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ নীতি উদ্বেগ হিসেবে উত্থিত। লাভজনক কর্মসংস্থানের বিভিন্ন উপায় বিশেষত গ্রামীণ কর্মসংস্থান জেলার মানব বিকাশের কৌশলগুলোর মূল স্থান হতে পারে। নীতি ও কর্মসূচিগুলো এমনভাবে প্রণয়ন করা দরকার, যাতে অর্থনৈতিক সম্প্রসারণ মানুষের সক্ষমতা বৃদ্ধি জোরদার করতে পারে যা এই অঞ্চলে উন্নয়নের স্তরকে ব্যাপকভাবে নির্ধারণ করবে। এ অঞ্চলের মানুষের সক্ষমতা বাড়াতে যে কোনও প্রচেষ্টা কেবল অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেই নয়, একইসঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ যে বিভিন্ন সামাজিক খাতেও বিনিয়োগ করা উচিত। সমীক্ষায় সুপারিশ করা হয়েছে, সামাজিক পরিষেবা ও

পল্লী উন্নয়নের ব্যয়ের পাশাপাশি সুশাসন এবং সুষ্ঠু পরিকল্পনা ও তহবিলের ব্যবহার জেলায় মানব উন্নয়নের স্তর নির্ধারণে গুরুত্বপূর্ণ কারণ হবে।

সংক্ষেপে বলা যায়, জেলার জীবনযাত্রার অবস্থার উন্নতি করার জন্য জরুরি প্রয়োজনীয় সর্বাত্মক প্রচেষ্টাগুলো এই রূপরেখায় করা যেতে পারে —

(ক) গ্রামীণ খাতগুলোতে দারিদ্র্য বিমোচন প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য আন্তরিক প্রচেষ্টা করা উচিত।

(খ) গ্রামীণ অঞ্চলে কিছু বিশেষ কর্মসংস্থান সৃষ্টিকারী কার্যক্রম কার্যকরভাবে বাস্তবায়নের উদ্যোগ নেওয়া উচিত।

(গ) শিক্ষা, বিশেষত পেশাগত শিক্ষা এবং মহিলা শিক্ষার প্রসারের জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

(ঘ) সমাজের দুর্বল জনগণের জন্য স্বাস্থ্যসেবা সুবিধা উপলব্ধ করতে হবে।

(ঙ) জনগণের মধ্যে ‘আরও ভালভাবে বেঁচে থাকার ইচ্ছে’ সচেতনতা বাড়ানোর জন্য পঞ্চায়েতরাজ ব্যবস্থা সঠিকভাবে সংগঠিত করা উচিত।

(চ) কৃষিক্ষেত্রের বিকাশ এবং কৃষিভিত্তিক কুটির এবং ক্ষুদ্র শিল্প প্রতিষ্ঠা আয় ও কর্মসংস্থান এবং দারিদ্র্যের প্রভাব হ্রাস করতে সহায়তা হবে।

(ছ) তাছাড়াও, দরিদ্রদের উপকৃত পর্যাপ্ত সুরক্ষা জালগুলোর বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে।

তথ্যসূত্র :

১. আসাম মানব বিকাশ প্রতিবেদন ২০১৪।
২. জেলা আদমসুমারির বই হাইলাকান্দি, ২০১১।
৩. ভারতের আদমসুমারি, ২০১১।
৪. আসাম জেলা ফ্যাক্টবুক হাইলাকান্দি জেলা।

করিমগঞ্জ কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক : পর্যবেক্ষণ

বিবেকানন্দ মোহন্ত

প্রস্তাবনা :

জাতীয় স্তরে ভারতীয় উপমহাদেশের বুকে সমবায় আন্দোলনের সূচনা হয়েছিল ১৯০৪ সালে। আইন পরিষদের সদস্য ব্রিটিশ সিভিলিয়ান স্যার দেবজিল আইবেটসনের (Devzil Ibbetson) মস্তিষ্কপ্রসূত হয়ে পরীক্ষামূলকভাবে আত্মপ্রকাশ করা 'দ্য কো-অপারেটিভ ক্রেডিট সোসাইটিজ অ্যাক্ট, ১৯০৪ (X অব ১৯০৪)-ই হলো আধুনিক ভারতের সমবায় আন্দোলনের প্রথম মাইলফলক।[১] কিন্তু রাজপৃষ্ঠপোষকতায় শুরু হওয়া এই আন্দোলনের প্রায় বছর ত্রিশেক আগে যৌথ কিংবা একক প্রচেষ্টায় একাধিক কৃষিভিত্তিক দেশীয় শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছিল সুরমা-বরাক উপত্যকায়। বহুজাতিক সংস্থার সমান্তরালে এই উপত্যকায় বাঙালির যৌথ কর্মসংস্কৃতির প্রথম নিদর্শন হিসেবে ১৮৭৬ সালের ৩১ আগস্ট আত্মপ্রকাশ করে 'কাছাড় নেটিভ জয়েন্ট স্টক কোম্পানি লিমিটেড' (রেজিস্ট্রেশন নং -৩ অব ১৮৭৬)। ম্যানেজিং ডিরেক্টর দীননাথ দত্ত এবং সেক্রেটারি বৈকুণ্ঠচন্দ্র দত্ত প্রতিষ্ঠিত প্রতিষ্ঠানটি সার্ধশতবর্ষের দোরগোড়ায় পৌঁছে আজও মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে সগৌরবে এবং স্বমহিমায়।[২] সমসাময়িককালে এই কোম্পানির সহায়তার প্রয়োজনে গড়ে উঠেছিল 'ভারত লোন কোম্পানি' নামে এক বেসরকারি আর্থিক প্রতিষ্ঠান।

শিলচরভিত্তিক এই প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠার পরবর্তীতে সিলেটকে কেন্দ্র করে আত্মপ্রকাশ করে 'ভারত সমিতি লিমিটেড' (১৮৮০), 'ইন্দেশ্বর টি অ্যান্ড ট্রেডিং কোম্পানি লিমিটেড' (১৮৯৯), এবং 'অল ইন্ডিয়া টি অ্যান্ড ট্রেডিং কোম্পানি লিমিটেড' (১৯১১) প্রভৃতি। এছাড়াও একক মালিকানাধীন হয়ে তদানীন্তন করিমগঞ্জ মহকুমা অন্তর্গত চরগোলা ভ্যালিতে গড়ে ওঠে রাজা গিরিশচন্দ্র রায়ের বিদ্যানগর ও চান্দনিঘাট চা-বাগান। দেশভাগের ফলে সিলেটকেন্দ্রিক যৌথ মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানগুলোর অধিকাংশই পূর্ব-পাকিস্তানের এলাকাভুক্ত হয়ে গেলেও সে-সবের ছন্দপতন হয়নি।[৩]

এসব প্রতিষ্ঠানের পাশাপাশি একক প্রচেষ্টায় শিল্পোদ্যোগ গড়ে ওঠার দৃষ্টান্ত বিরল ছিল না এই উপত্যকায়। এ ব্যাপারে অগ্রণী ভূমিকায় ছিলেন হাইলাকান্দির জমিদার ও ব্যাঙ্কার প্রতাপচন্দ্র রায়। আসাম স্টেট আর্কাইভে রক্ষিত ১৯১৬ সালের রাজ্য কৃষি দফতরের এক নথি থেকে জানা যায়, ১৯০৬ সালে প্রতাপ রায় কাটলিছড়া অঞ্চলে সুগার ক্রাশিং মিল গড়ে তুলেছিলেন, যেটির বার্ষিক উৎপাদন ক্ষমতা ছিল ২০,০০০ মণ অর্থাৎ ৮,০০০ কুইন্টাল। সে-সময় ওই মিল থেকে বছরে এক লক্ষ টাকার গুড় বিক্রি করা হত। তাঁর ইচ্ছে ছিল কাটলিছড়া অঞ্চলে বৃহত্তর সুগার মিল গড়ে তোলার। কিন্তু ব্রিটিশ সরকারের পক্ষ থেকে কোনও সহযোগিতা পাননি। অধ্যাপিকা সুদেষ্ণা পুরকায়স্থ লিখছেন— "The policy of the Govt. towards native enterprise was reflected in the attitude towards Pratap Roy"।[৪]

যা-ই হোক, এসব শিল্পোদ্যোগ ক্ষেত্রের পাশাপাশি স্বদেশী পর্বে সুরমা-বরাকে আরও ক'টি শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছিল। এগুলোর মধ্যে রয়েছে Surma valley Weaving and Trading Company, Sylhet (1907), Sylhet Sugar Works Ltd., Karimganj (1921), Surma valley Rice Mills Ltd., Karimganj (1920), Sylhet Tea & Industries Ltd. (1915), Karimganj Bricks & Tiles Works Ltd., Karimganj, National Lac. Timber & Agriculture Company Ltd. (1921) প্রভৃতি।[৫]

উনিশ শতকের শেষার্ধ থেকে কুড়ি শতকের প্রথম পর্ব সময়সীমার মধ্যে বরাক উপত্যকায় এসব দেশীয় শিল্পকেন্দ্র গড়ে ওঠার এই গৌরবোজ্জ্বল পটভূমিতে আর্থিক সহায়তা করতে গিয়ে অনেক সমবায় ব্যাঙ্কিং প্রতিষ্ঠানও গড়ে উঠেছিল। ওই সময় করিমগঞ্জকে কেন্দ্র করে যে-সব আর্থিক প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছিল, সেগুলো নিয়ে এক সংক্ষিপ্ত আলোচনার উদ্দেশ্যে এই নিবন্ধের অবতারণা।

এক :

বঙ্গবঙ্গ-বিরোধী ও স্বদেশী আন্দোলনসঞ্জাত জাতীয়তাবাদী ভাবধারায় পরিচালিত দ্য করিমগঞ্জ কো-অপারেটিভ টাউন ব্যাঙ্ক লিমিটেড :

The Co-operative Credit Societies Act (X of 1904) অনুসারে এই সমবায় ব্যাঙ্কটি [Vide DCJP (C.Cr.S) No. 2343-2500-17-2-10] গড়ে উঠেছিল জাতীয়তাবাদী নেতা তথা সিলেট ন্যাশনাল স্কুলের প্রাক্তন অধ্যক্ষ শ্রীশচন্দ্র দত্ত'র (১৮৮৩-১৯৬১) প্রচেষ্টায় এবং এটি উদ্বোধন করেছিলেন কো-অপারেটিভ সোসাইটির রেজিস্ট্রার কনকলাল বরুয়া। উল্লেখ্য, বঙ্গভঙ্গ ও স্বদেশী আন্দোলন পর্বে National Council of Education (NCE) সরকারি অনুমোদন লাভ করেছিল ১ জুন ১৯০৬ সালে এবং ওই বছরেই সিলেট ও হবিগঞ্জ শহরে গড়ে উঠেছিল দু'-দুটি ন্যাশনাল স্কুল। কিন্তু ব্রিটিশের রোষানলে পড়ে স্কুল দু'টি বন্ধ হয়ে পড়ে ১৯১৩ সালে। ফলে শ্রীশচন্দ্র চলে আসেন করিমগঞ্জ শহরে এবং ন্যাশনাল স্কুলের প্রাক্তন ছাত্রদের নিয়ে এখানে গড়ে তোলেন 'করিমগঞ্জ চা-শিল্প সংস্থা' (Karimganj Tea Association)। তাঁদের হাত ধরেই তখন একে একে গড়ে ওঠে— 1) The Sylhet Tea & Industry Ltd., 2) The Karimganj Tea Company Ltd., 3) The Hindustan Tea & Fishery Ltd., 4) Hasanpur Tea Company Ltd. এবং 5) প্রাথমিকভাবে সাধক কবি শরচ্চন্দ্র চৌধুরীর প্রতিষ্ঠা করা The Kalishasan Tea Company Ltd. প্রভৃতি।[৬]

ওইসব শিল্প-প্রতিষ্ঠানের আর্থিক সহায়তার প্রয়োজনে ১৯১৭ সালে গড়ে উঠেছিল The Karimganj Co-operative Town Bank Ltd. এবং সহযোগী সংগঠন The Karimganj Banking & Trading Company Ltd.। বিভিন্ন সময়ে এসব প্রতিষ্ঠানের পরিচালক ও সঞ্চালক হিসেবে ছিলেন শ্রীশচন্দ্র দত্ত, রাজচন্দ্র দাস, ইন্দ্রকুমার দত্ত, অশ্বিনীকুমার দত্ত, রমণীমোহন রায়, নৃপেন্দ্রচন্দ্র চৌধুরী (১৮৮৭-১৯৭৬), রবীন্দ্রনাথ আদিত্য সহ অন্যান্য ব্যক্তি।

কিন্তু পরিতাপের বিষয়, এঁদের প্রায় সবাই ষাট/সত্তরের দশকে পরপারে পাড়ি দিয়েছেন এবং উত্তর-প্রজন্মের বেশিরভাগই আজ বহির্রাজ্যে বসবাস করছেন। যে দু'-এক পরিবার করিমগঞ্জে রয়েছে, তাদের কাছ থেকে প্রায় ৬০ বছর আগের বন্ধ হয়ে পড়া টাউন ব্যাঙ্কের বিষয়ে তেমন কোনও নির্ভরযোগ্য তথ্যসূত্র পাওয়া যায়নি। অগত্যা লোকস্মৃতি/লোকশ্রুতি জাতীয় মৌখিক ইতিহাস (Oral History)-র শরণাপন্ন হওয়া ছাড়া তেমন কোনও বিকল্প ছিল না আমাদের কাছে। সুতরাং, এই উদ্দেশ্যে শহরের প্রবীণ ব্যক্তিদের দুয়ারে দুয়ারে

ঘুরতে হয়েছিল এই প্রতিবেদককে। দেখা যায়, যাঁদের কাছে নির্ভরযোগ্য তথ্য পাওয়ার সম্ভাবনা ছিল, সে-সব নবতিপর শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি আজ স্মৃতি হারিয়ে ন্যুব্জ হয়ে বেঁচে আছেন, কারও বা স্মৃতিশক্তি অল্পবিস্তর থাকলেও শ্রবণশক্তি প্রায় তলানিতেই এসে ঠেকেছে। অশীতিপর দু'-একজনের সঙ্গে আলাপ করে জানা গেল, তাঁরা ছাত্রাবস্থায় ব্যাঙ্কটিকে চালু অবস্থায় পেয়েছিলেন, বড় বড় সভা-সমিতি হতো এই ব্যাঙ্ক প্রাঙ্গণে।

অপরদিকে, ১৯১৭ সালে প্রতিষ্ঠিত টাউন ব্যাঙ্ক বিষয়ক কোনও প্রতিবেদন কিংবা এটির অধীন গ্রাহকসংখ্যা, লাভ-লোকসান-লেনদেনের কোনও হিসেবপত্র অথবা Assets & Liabilities-র কোনও খতিয়ান আমরা পাইনি স্থানীয় সংশ্লিষ্ট সরকারি দফতর থেকে। এ প্রসঙ্গে বলা যায়, পূর্বতন সিলেট জেলার অধীন মহকুমা স্তরের এই কার্যালয়টি বারকয়েক স্থান পরিবর্তন করেছিল শহরের বিভিন্ন জায়গায়। ফলে কীটদ্দষ্ট হয়ে পড়া বহু পুরনো কাগজপত্র নষ্ট হয়েছিল, যে-সবের কোনও হাল-হদিস রাখাটা সম্ভবপর হয়ে ওঠেনি। তাছাড়া দেশভাগের প্রভাব এই আর্থিক প্রতিষ্ঠানটিকে ক্রমান্বয়ে দেউলিয়া হয়ে পড়ার পেছনে মুখ্য ভূমিকা নিয়েছিল। এই বিভাজনের ফলে Karimganj Tea Association-র অধীন একাধিক চা-ক্ষেত্রের বৃহত্তর অংশ, কোথাও বা পুরোপুরি অংশই পূর্ব-পাকিস্তানের এলাকাভুক্ত হয়েছিল। এ অবস্থায় সময়ের স্রোতে টাউন ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠানটির ছন্দপতন শুরু হয়েছিল দেশভাগ-পরবর্তী পর্বের প্রথম দিকেই।

পক্ষান্তরে, ১৪ মার্চ ১৯০৫ সালে রেজিস্ট্রেশনপ্রাপ্ত এবং ১৪ জন প্রারম্ভিক সদস্য নিয়ে আত্মপ্রকাশ করা The Silchar Co-operative Town Bank Ltd-কে এরূপ শোচনীয় অবস্থার সম্মুখীন হতে হয়নি দেশভাগের ফলে, যতটুকু হয়েছিল করিমগঞ্জের ক্ষেত্রে। তবে, একেবারেই যে পড়েনি, তা নয়। শিলচর টাউন ব্যাঙ্ককে হারাতে হয়েছিল আমানতের এক বিশাল অঙ্ক, যে ধনরাশি সিলেট সেন্ট্রাল ব্যাঙ্কে জমাকৃত ছিল। ফলস্বরূপ ১৯৫০-র দশকে এই ব্যাঙ্কটির আর্থিক অবস্থার অবনমন ঘটেছিল। তবে, একেবারে অচলাবস্থার পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছেনি সময়োচিত পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য। তাই রাষ্ট্রনৈতিক পর্ব-পর্বান্তরের প্রতিকূলতা কাটিয়ে উঠতে তেমন বেগ পেতেও হয়নি। পরবর্তীকালে সময়াসময়ের রাজনৈতিক চাপানউতোরের মুখোমুখি দাঁড়িয়েও পূর্বতন শিলচর কো-অপারেটিভ টাউন ব্যাঙ্কটি ১৯৭৭-৭৮ সালে 'শিলচর আরবান কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক ' নাম নিয়ে আজও টিকে আছে বিশাল অঙ্কের অনাদায়ী ঋণের বোঝা মাথায় নিয়ে।[৭]

অনুমান করা যায়, শিলচর টাউন ব্যাঙ্কের মত সিলেট জেলার মহকুমা শহর করিমগঞ্জ টাউন ব্যাঙ্কের আমানতও নিশ্চয় সিলেট সেন্ট্রাল ব্যাঙ্কে জমা রাখতে হতো, যেটি হয়তো ফিরে পাওয়া যায়নি দেশভাগের পরবর্তীতে।

বহুদিন আগে লুপ্ত হয়ে যাওয়া ওই ব্যাঙ্কের প্রত্নসমীক্ষায় বেরিয়ে এই শহরের পুরনো দু'টি পরিবারের বর্তমান প্রজন্মের দ্বারস্থ হয়েছিলাম। তাঁদের মধ্যে রয়েছেন কৈলাসহরের কালীশাসন চা-বাগান ও সিলেট টি অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজের একসময়ের ডিরেক্টর নৃপেন্দ্রচন্দ্র চৌধুরীর পরিবার এবং বরদলৈ মন্ত্রিসভার সমবায় ও শিল্পদফতরের মন্ত্রী খানবাহাদুর মাহমুদ আলি সাহেবের (১৮৯৮-১৯৬৮) পরিবারের। খানসাহেব ১৯৪০ সালে United Common Provident Insurance Ltd., Chittagong-র সম্মানিত ডিরেক্টরও ছিলেন (Ref.No. 40/3710, Dt. 5th Sept. 1940)

যা-ই হোক, এই সমীক্ষা পর্বে নৃপেন্দ্রচন্দ্র চৌধুরীর পৌত্র কৃষ্ণপদ চৌধুরী ও শ্যামাপদ চৌধুরীর সৌজন্যে বহু পুরনো এবং জংধরা একটি তোরঙ্গ ঘাঁটাঘাঁটির সুযোগ পেয়েছিলাম। সেদিন তোরঙ্গটি নামিয়ে এনে উঠোনে বসে এর ভেতর থেকে শতচ্ছিন্ন ও বহু পুরনো কাগজের স্তূপ নাড়াচাড়া করে পেয়েছিলাম

বিভিন্ন দলিল-দস্তাবেজ। এসবের মধ্যে রয়েছে Sylhet Industrial Bank, Karimganj Branch-র একটি পাসবুক। রয়েছে হবিগঞ্জ পোস্ট অফিসের কিছু কাগজপত্র। এছাড়াও আছে আরও দু'-একটি কাগজ। তোরঙ্গ ঘেঁটে পেয়েছিলাম ছেঁড়া একটি খাম (খালি), উপরে নৃপেন্দ্রবাবুর স্বহস্তে লেখা রয়েছে "Share Certificate of Karimganj Town Bank Ltd." ইত্যাদি। 'চরগোলা এক্সোডাস ১৯২১' প্রবন্ধ লিখতে গিয়ে ওই পরিবারের পুরনো কাগজপত্রের মধ্য থেকে পেয়েছিলাম The Karimganj Co-operative Town Bank Ltd.-র ১০ টাকা মূল্যের একটি শেয়ার সার্টিফিকেট (Sl. No.-75, Dt. 10th Nov, 1917), যেটি সেক্রেটারি শ্রীশচন্দ্র দত্ত এবং ডিরেক্টর রাজচন্দ্র দাসের স্বাক্ষর সংবলিত)।

অপরদিকে, মাইজডিহি, করিমগঞ্জের মাহমুদ আলি সাহেবের পৌত্র আব্দুল বাছিত চৌধুরী এবং অনুজ উবাইদুল্লা সইদ খানের সৌজন্যে মন্ত্রীমশায়ের রেখে যাওয়া পুরনো কাগজপত্র ঘেঁটে টাউন ব্যাঙ্ক সংক্রান্ত দু'-একটি চিঠি সহ বিভিন্ন লগ্নিকারক সংস্থার ইস্যু করা শেয়ার সার্টিফিকেট দেখার সুযোগ পেয়েছিলাম। পরবর্তী সময়ে করিমগঞ্জ সমবায় দফতরের সৌজন্যে বহু পুরনো এবং জরাজীর্ণ রেজিস্ট্রি খাতা থেকে Karimganj Town Bank-টির Registration Cancellation-র তথ্য পেয়েছিলাম। এসব উপাদান এবং সঙ্গে শহরের প্রবীণ ব্যক্তিদের কাছ থেকে পাওয়া স্মৃতিচারণমূলক আলাপচারিতার ওপর ভিত্তি করে ষাট-পঁয়ষট্টি বছর আগের অস্তাচলের পথিক করিমগঞ্জ টাউন ব্যাঙ্কের এক আনুমানিক ও আবছা অবয়বমাত্র দাঁড় করানো যেতে পারে।

আমরা দেখতে পাই, করিমগঞ্জ টাউন ব্যাঙ্কটি গড়ে উঠেছিল শহরের মেইন রোডে, বর্তমান কালের Agricultural Office Compound-এ। ব্যাঙ্কটির কার্যালয় ভবন সহ উন্মুক্ত প্রাঙ্গণ নিয়ে মোট জমির পরিমাণ ছিল অন্যূন সোয়া বিঘা। এখানে টাউন ব্যাঙ্ক ছাড়াও The Sylhet Banking & Trading Company Ltd., Karimganj Tea Association এবং The Sylhet Tea & Industries Ltd. প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানেরও সদর কার্যালয় ছিল। ১৯১৭ সালে গড়ে ওঠা টাউন ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠানটি অনেক ঝড়ঝঞ্ঝা অতিক্রম করেও ১৯৪৭ সাল অবধি চলছিল স্বাভাবিক ছন্দে। কিন্তু দেশভাগের পর থেকে এটি ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে পড়ে। ফলস্বরূপ শিলংস্থিত সোসাইটির সদর দফতর থেকে টাউন ব্যাঙ্কটির রেজিস্ট্রেশন বাতিল করে দেওয়া হয়েছিল (Vide Letter No.CF.15 / 48 /38 Dt.15/04/1952)। করিমগঞ্জ সমবায় দফতরের খাতায় Remarks column-এ বাতিল সংক্রান্ত মন্তব্যে লেখা রয়েছে 'The Charges of the Bank was not handed over to the Liquidator as the Members filed an appeal to the Registrar of Co-operative Societies for consideration of the cancellation of Registration'। এই মন্তব্য থেকে অনুমিত হয়, ব্যাঙ্ক মেম্বারদের তরফ থেকে দাখিল করা আবেদনপত্রটি অমীমাংসিত রেখেই রেজিস্ট্রেশন বাতিলের নোটিশ জারি করা হয়েছিল। ধারণা করা যায়, পরবর্তী সময়ে ব্যাঙ্ক পরিচালন সমিতি বিষয়টি নিয়ে হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিল। ওই সময় ব্যাঙ্কের ডিরেক্টর ছিলেন সর্বশ্রী অশ্বিনী দত্ত, রমণীমোহন রায়, রবীন্দ্রনাথ আদিত্য, খানবাহাদুর মাহমুদ আলি এমএলএ প্রমুখ গণ্যমান্য ব্যক্তি। এই তথ্যের স্বাক্ষ্য পাওয়া যায় ব্যাঙ্ক পরিচালন সমিতির সেক্রেটারির তরফ থেকে ডিরেক্টরদের উদ্দেশে পাঠানো এক বিজ্ঞপ্তি থেকে (Ref. No.- Nil, Dt. 20th Sept. 1956)। ওই বিজ্ঞপ্তি থেকে জানা যায়, ২৩ সেপ্টেম্বর ১৯৫৬ তারিখে টাউন ব্যাঙ্কে পরিচালন সমিতির সভায় যে-সব বিষয় নিয়ে কোম্পানি পরিচালকরা আলোচনায় বসছেন, তার মধ্যে ৩ নং বিষয়টি ছিল ব্যাঙ্ক সংক্রান্ত অচলাবস্থা নিরসনের জন্য হাইকোর্টের দ্বারস্থ হওয়ার ব্যাপারটি রয়েছে। অনুমান করা যায়, ১৯৫৬ সাল অবধি বিষয়টি অমীমাংসিত অবস্থায়ই ছিল এবং Liquidator-র হাতে

তখনও হস্তান্তর করা হয়নি।

স্বাধীনতা সংগ্রামী তথা জাতীয়তাবাদী ভাবধারায় অনুপ্রাণিত স্বদেশব্রতীদের হাত ধরে গড়ে ওঠা টাউন ব্যাঙ্ক প্রাঙ্গণটি ছিল করিমগঞ্জ শহরের জনসভার অন্যতম প্রধান কেন্দ্রস্থল। ১৯৬০-৬১ সালের ভাষা আন্দোলনের যাবতীয় জনসমাবেশ, সভা-সমিতি এই প্রাঙ্গণেই অনুষ্ঠিত হয়েছিল। এবং এখান থেকেই মাতৃভাষা আন্দোলনের রূপরেখাও নিরূপিত হয়েছিল। বিধুভূষণ চৌধুরীর যুগশক্তি পত্রিকায় ভাষা আন্দোলন বিষয়ক একাধিক সংবাদ/প্রতিবেদনে টাউন ব্যাঙ্ক প্রাঙ্গণের কথাটি উল্লেখ রয়েছে। সুতরাং, অনুমিত হয়, ১৯৬১ সাল অবধি এই ব্যাঙ্ক ও তার প্রশস্ত প্রাঙ্গণটি তখন পর্যন্ত হস্তান্তরিত হয়নি, বরং এটি Liquidation প্রক্রিয়ার মধ্যেই ছিল।

এই ব্যাঙ্ক ও তার প্রাঙ্গণটি কবে থেকে কৃষি বিভাগের মালিকানাধীন হয়েছিল এবং কীভাবে হয়েছিল, সে বিষয়ে কোনও তথ্য পাওয়া যায়নি সংশ্লিষ্ট দফতর থেকে। অগত্যা কৃষি বিভাগের প্রাক্তন কর্মী, শহরের থানা রোডে বসবাসরত অশীতিপর মিলন দত্তের (হিমাংশু দত্ত) শরণাপন্ন হয়েছিলাম। জানতে পারলাম, মইনুল হক চৌধুরী কৃষিমন্ত্রী থাকাকালীন সময়ে করিমগঞ্জের তৎকালীন মহকুমাশাসক প্রফুল্লকুমার দেব টাউন ব্যাঙ্ক ও প্রাঙ্গণটি নিয়ে নিলাম ডেকেছিলেন ১৯৬৩-৬৪ সালে। এই বিজ্ঞাপিত নিলামে আনুমানিক ১৭/১৮ হাজার টাকায় এটি ক্রয় করেছিল রাজ্য কৃষি বিভাগ। দত্ত তখন এলডি অ্যাসিস্টান্ট হিসেবে কৃষি বিভাগের চাকরিতে জয়েন করেছিলেন এবং এই কার্যালয় থেকে ইউডি অ্যাসিস্টান্ট হয়ে অবসর নিয়েছিলেন আজ থেকে বছর কুড়ি আগে। অনুমান করা যায়, নিলামে প্রাপ্ত ধনরাশি থেকে দেউলিয়া হয়ে পড়া টাউন ব্যাঙ্কের দেনা-পাওনার বিষয়টি তখন নিষ্পত্তি হয়েছিল। হয়তো সে-সময়ে ব্যাঙ্কের গ্রাহক, শেয়ারহোল্ডার তথা হবিগঞ্জ জাতীয় বিদ্যালয় প্রাক্তনী ও প্ল্যান্টার নৃপেন্দ্রচন্দ্র চৌধুরীর ‘খামের ভিতরে থাকা’ শেয়ার সার্টিফিকেটের হিসেব-নিকেশেরও নিষ্পত্তি হয়েছিল সে-সময়ে।

বঙ্গভঙ্গ ও স্বদেশী আন্দোলনসঞ্জাত জাতীয়তাবোধের প্রতীক এই শহরের ঐতিহ্যবাহী আর্থিক প্রতিষ্ঠানটি সময়ের স্রোতে আজ লোকচক্ষুর আড়ালে বিলীন হয়ে গেলেও বেঁচে রয়েছে প্রবীণ জনমননে। আজও একষট্টির ভাষা আন্দোলন নিয়ে ভাবনাচিন্তা করতে গেলে প্রাসঙ্গিকভাবেই উঠে আসে ‘করিমগঞ্জ টাউন ব্যাঙ্ক ও প্রাঙ্গণ’ শব্দবন্ধটি। এবং এটি আজও বেঁচে রয়েছে করিমগঞ্জ অ্যাপেক্স ব্যাঙ্কের ফি-বছরের সালতামামিতেও (S.B.Account No.- 104202000000071, Balance amount Rs.1842.26 as on April 2022)।

দুই :

স্মৃতি-বিস্মৃতির আধারে ‘দ্য করিমগঞ্জ সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্কিং ইউনিয়ন’ :

তদানীন্তন সিলেট জেলার মহকুমা শহর করিমগঞ্জের কালীবাড়ি রোডে ২৭,১৮০ বর্গফুট (১.৮৯ বিঘা) ভূমির উপর প্রতিষ্ঠিত এই সমবায় ব্যাঙ্কটি কবে গড়ে উঠেছিল, এ বিষয়ে স্থানীয় সরকারি দফতর থেকে তাদের সদিচ্ছা থাকা সত্ত্বে তেমন কোনও নির্ভরযোগ্য তথ্য পাওয়া যায়নি। সেটা হয়তো তৎকালীন জেলা সদর সিলেটের ফাইলেই রয়ে গিয়েছিল। সুতরাং, শহরের প্রবীণ ব্যক্তিদের শরণাপন্ন হওয়া ছাড়া আর কোনও উপায় ছিল না। এই উদ্দেশ্য নিয়ে একসময় অধ্যাপক নিশীথরঞ্জন দাসের বাড়িতে গিয়েছিলাম। বয়সের ভারে ন্যুব্জ তথা শ্রবণশক্তি ও স্মরণশক্তির টানাপোড়নের আবহে থাকা সত্ত্বেও আলাপচারিতায় জানতে পারলাম, ব্যাঙ্কটি বিগত ত্রিশের দশকে গড়ে উঠেছিল। তাঁর মাতামহ, কালীগঞ্জ বাগবাড়ি অঞ্চলের ভূস্বামী ও ধনাঢ্য ব্যক্তি বসন্ত পুরকায়স্থ (মৃত্যু ১৯৫৩) এই ব্যাঙ্কের একজন পরিচালক ছিলেন। সচরাচর

ঘোড়ায় চড়ে গ্রামের বাড়ি থেকে এখানে আসতেন। ব্যাঙ্কের ঘাটতি চলাকালীন সময়েও বাগবাড়ি গ্রামের জমিজমার অংশবিশেষ বন্ধক রেখে অর্থের সংস্থান করে দিয়েছিলেন। জানতে পারলাম, লাতু জমিদার বাড়ির ননীগোপাল স্বামীও একসময় ওই ব্যাঙ্কের একজন অন্যতম পরিচালক ছিলেন।

মূলত কৃষিভিত্তিক এই প্রতিষ্ঠানটির অধিকাংশ পরিচালক এবং গ্রাহকরা ছিলেন এপার-ওপার দুইপারের জমিদার, ভূস্বামী এবং প্রজাসাধারণ। তাছাড়া গ্রাহকদের এক বড় অংশই ছিলেন কুশিয়ারার ডান তীরবর্তী অঞ্চলের, যে এলাকা পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল। স্থানীয় সমবায় দফতরের শতচ্ছিন্ন এক Asset/ Liability খতিয়ানের সাক্ষ্য অনুসারে অন্তত এটুকু অনুমান করা যেতে পারে। আমরা দেখতে পাই, সেই ছিন্নপৃষ্ঠায় যথারীতি পাকিস্তানেরও কলাম রয়েছে। সুতরাং, সাতচল্লিশের দেশভাগ অবধারিতভাবেই এই ব্যাঙ্কের চলার গতিকে যে মন্থর করে দিতে পারে, সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ কম।

রাজ্য সরকারের সচিব পর্যায়ের একজন আমলা ছিলেন চিত্তরঞ্জন সমাদ্দার (আইএএস)। তাঁর লিখিত 'Co-operative Movement in Assam' গ্রন্থের সূত্র থেকে আমরা জানতে পারি, ১৯৩১-৩২ থেকে ১৯৪১-৪২ সালের অন্তর্বর্তীকালীন সময়ে করিমগঞ্জ সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। ওই সময়সীমায় সুরমাভ্যালিতে যে ক'টি সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক ছিল, সেগুলো হলো— 1) The Sylhet Co-operative Central Bank Ltd., 2) The Habiganj Central Co-operative Bank Ltd., 3) The Moulavibazar Co-operative Central Bank Ltd., 4) The Cachar Co-operative Central Bank Ltd. and 5) The Karimganj Central Co-operative Banking Union Ltd. ।[৮]

নিম্নোক্ত সারণির মাধ্যমে ১৯৩১-৩২ থেকে ১৯৪১-৪২ সালের মধ্যে সেন্ট্রাল ব্যাঙ্কের এক চিত্র পাওয়া যেতে পারে—

সারণি - ১

আর্থিক বর্ষ	সমিতি সংখ্যা	সদস্য সংখ্যা	চালু মূলধন (টাকা)	সংরক্ষিত/মজুত তহবিল (টাকা)	মন্তব্য
১৯৩১-৩২	১৭	১৭৭৮	২১,৫৩,৩১০.০০	১,৩১,১২৯.০০	
১৯৩২-৩৩	১৭	১৭৬৭	২১,৯৬,৮০৬.০০	১,৫৫,৬৯৩.০০	
১৯৩৩-৩৫	১৭	১৮৩৫	২২,৮৭,৬৯৫.০০	১,৭৫,০২৬.০০	
১৯৩৪-৩৫	১৮	১৮৮১	২৩,৬১,২০০.০০	১,৯০,০৫৫.০০	
১৯৩৫-৩৬	১৮	১৮৬৬	২৩,৮০,০২০.০০	২,১৫,৭৩৩.০০	*
১৯৩৬-৩৭	১৮	১৮৬১	২৩,৪৭,১০৭.০০	২,৫৭,০০৯.০০	
১৯৩৭-৩৮	১৮	১৮৬৫	২৩,৫৬,৭৪৫.০০	২,৮১,৪৫০.০০	
১৯৩৮-৩৯	১৮	১৮৭৭	২৩,০৭,৩৫৫.০০	২,৭৬,৭২৫.০০	
১৯৩৯-৪০	১৮	১৮৫৮	২১,৮১,৭৬৬.০০	৩,১৮,৮৩৪.০০	
১৯৪০-৪১	১৮	১৭৯৬	২০,৯৯,২৯০.০০	৩,৩৭,৮৮৭.০০	
১৯৪১-৪২	১৮	১৭৩৩	২০,৩২,৪৬৪.০০	৩,৮৬,৫৬৬.০০	[৯]

* সম্ভবত ওই আর্থিক বর্ষেই 'দ্য করিমগঞ্জ সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্কিং ইউনিয়নটি লিমিটেড' প্রতিষ্ঠিত

হয়েছিল, এই তথ্যটি পাওয়া যায় সোসাইটি তরফে Karimganj PWD (Building) Sub-division-র Asstt Executive Engineer-কে পাঠানো পত্র থেকে। পত্র নং— DRK/P.3/84/32 Dt. 28/02/1987 (in respect of Valuation of the Building of the Dissolved Central Banking Union at Karimganj. ওই চিঠিতে ব্যাঙ্ক ভবন নির্মাণের সময়কাল হিসেবে বলা হয়েছে ১৯৩৫ থেকে ১৯৩৭ ইংরেজির মধ্যে। উল্লেখ্য, এই সময়ের আগে করিমগঞ্জ সেন্ট্রাল ব্যাঙ্কের উপস্থিতির কোনও তথ্য আমরা পাইনি।

উপরিউক্ত পরিসংখ্যান থেকে আমরা দেখতে পাই, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগে ১৯৩৪-৩৫ থেকে ১৯৩৮-৩৯ পর্যন্ত সেন্ট্রাল ব্যাঙ্কগুলোর সার্বিক অগ্রগতি ছিল ঊর্ধ্বমুখী। তারপর সেটি নিম্নগামী হয়ে কিছুটা উন্নতি করেছিল ১৯৪৫-৪৬ সাল অবধি। দেশভাগের ফলে সেই অগ্রগতি নেমে এসেছিল তলানিতে। নিম্নোক্ত সারণি থেকে এর কিছুটা আভাস পাওয়া যেতে পারে—

সারণি - ২

আর্থিক বর্ষ	সমিতি সংখ্যা	সদস্য সংখ্যা	চালু মূলধন (টাকা)	সংরক্ষিত/মজুত তহবিল (টাকা)	মন্তব্য
১৯৪২-৪৩	১৮				
১৯৪৩-৪৪	১৮	১৬৪৪	১৬,৭১,০১৮.০০	১,৬৯,৩২৯.০০	
১৯৪৪-৪৫	১৮	১৬২৬	১৪,৬২,০২৬.০০	১,৯৬,৮৩৮.০০	
১৯৪৫-৪৬	১৮	১৬৫৬	১৪,০৮,৪২৯.০০	১,৬৩,০৩৩.০০	
১৯৪৬-৪৭	১৫	১২৪২	৯,৮৩,৯৯০.০০	১,৩৪,৬২৭.০০	
১৯৪৭-৪৮	১৫	১২৩৯	৯,৫৪,৪৩৩.০০	১,৩৪,৪৬২.০০	
১৯৪৮-৪৯	১৫	১২৩৮	১০,০০,৭৮৬.০০	১,৪৪,৮৯১.০০	
১৯৪৯-৫০	১৫	১২৩৮	৯,৯৪,০৪৬.০০	১,৪৪,৮৯১.০০	
১৯৫০-৫১	১৫	১২১১	৯,৫৭,৮৮৪.০০	১,৪৮,৪৯৫.০০	

[১০]

এই পরিসংখান থেকে আমরা দেখতে পাই, সমগ্র আসামে সমিতির সংখ্যা ১৮ থেকে নেমে এসেছে ১৫-তে। ওই সময় সিলেট, হবিগঞ্জ এবং মৌলভিবাজার পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল। এছাড়াও প্রভূত ক্ষতির সম্মুখীন হতে হয়েছিল করিমগঞ্জ সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ককে। ওই ব্যাঙ্কের অধিকাংশ গ্রাহকেরই বসতবাড়ি সহ জমিজমা পূর্ব-পাকিস্তানের এলাকায় চলে গিয়েছিল। তাছাড়া করিমগঞ্জের একাধিক জমিদার-ভূস্বামী, যাঁদের জমিদারি বিস্তৃত ছিল এপার-ওপার জুড়েই, তাঁদেরও বিস্তর ক্ষতির সম্মুখীন হতে হয়েছিল। গোদের উপর বিষফোঁড়া হিসেবে জমিদারি স্বত্ববিলোপ আইন প্রণয়নের দাক্ষিণ্যে হারাতে হয়েছিল তাঁদের একচ্ছত্র মালিকানা স্বত্বও। এসবের প্রভাব পড়েছিল ইন্দো-বাংলা সীমান্ত শহর করিমগঞ্জের ব্যাঙ্কিং পরিষেবায়ও, যে ট্রমা থেকে বেরিয়ে আসাটা ছিল সুদূরপরাহত।

পরবর্তীকালের প্রথম কিংবা দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাকালীন সময়েও এই চিত্রের তেমন কোনও হেরফের হয়েছিল বলে মনে হয় না। বরং সেন্ট্রাল ব্যাঙ্কের সংখ্যা পূর্বতন ১৫ থেকে ধাপে ধাপে নেমে এসে সংখ্যা ৯-এ এসে ঠেকেছিল। দেখা যায়, দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকীর মধ্যভাগে পৌঁছে করিমগঞ্জ ব্যাঙ্কটি ১৯৫৮ সালে লিকুইডেশনে চলে গিয়েছিল। এমর্মে Deputy Registrar of Co-operative Societies, Karimganj থেকে The Registrar of Co-operative Societies-র দফতরে পাঠানো পত্রটি প্রণিধানযোগ্য। ওই পত্র থেকে জানা যায়, এই ব্যাঙ্কভবন সহ বিস্তৃত প্রাঙ্গণটির নিষ্পত্তি হওয়ার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছিল তখন থেকেই। (সূত্র :- Letter No.- CCKPD.2 /63 /564 Dt. 4th Dec.1985 :- Correspondence regarding "Disposal of Land and Building of Karimganj Central Co-operative Banking Union now under Liquidation")। ওই পত্র থেকে আরও জানা যায়, ১৯৮৫ সালে ব্যাঙ্কটির মোট দেনা/দায় রয়েছিল ৭৫ হাজার টাকা। এই সমস্যা নিরসনের উপায়ও বাতলে দেওয়া হয়েছিল পত্রে। চিঠির বয়ান অনুসারে, ----The Banking Union has a liability near about Rs. 75,000.00 in the shape of Member deposit, share money etc. and this can easily be met with after disposal of the said land and building.

প্রসঙ্গত, কালীবাড়ি রোডের উপর দাঁড়িয়ে থাকা এই সেন্ট্রাল ব্যাঙ্কটির মোট জমির পরিমাণ ছিল ০.৬৪ একর (১.৮৯ বিঘা/৩৭.৭৫ কাঠা)। সেটেলমেন্ট রেকর্ড অনুযায়ী জমির দাগ নং ৩৪৮৪ ও ৩৪৮৬, খতিয়ান নং ৪৩৭। দেউলিয়া হয়ে পড়া এই ব্যাঙ্কের জমি ক্রয় করতে আগ্রহ প্রকাশ করেছিল করিমগঞ্জ হোলসেল কো-অপারেটিভ স্টোর্স লিমিটেড (রেজি: নং K-31 of 1974)। সে অনুযায়ী মোট জমি থেকে ব্যাঙ্ক ভবন (মিউনিসিপালিটি হোল্ডিং নং- ১৪০ (পুরনো নং-১২০/১২১) সহ ১৭,১৮০ বর্গফুট (অর্থাৎ ১.১৯৩ বিঘা/ ২৩.৪৬১ কাঠা) পরিমাণ ক্ষেত্র ১৭ মার্চ ১৯৯৭ তারিখে ২,৬৫,৯৬৮.০০ টাকায় বিক্রি করা হয়েছিল করিমগঞ্জ হোলসেল কো-অপারেটিভ স্টোর্সের কাছে। (Vide Cheque No. 368846 Dt. 14.03.1997, drawn on Assam Co-operative Apex Bank Ltd., Karimganj)। ওই জমি বেচা-কেনার সময় বিক্রেতার পক্ষ থেকে লিকুইডেটর হিসেবে ছিলেন পরিমল নাথ এবং ক্রেতার পক্ষে ছিলেন কো-অপারেটিভ স্টোর্সের চেয়ারম্যান বিষ্ণুপদ চৌধুরী। জমি ক্রয়-বিক্রয় বিষয়ক তথ্য আহরণ করতে গিয়ে অকুণ্ঠ সহযোগিতা পেয়েছি সোসাইটির সেক্রেটারি দেবরাজ দাসের কাছ থেকে।

অবশিষ্ট ১০ হাজার বর্গফুট পরিমাণের জমি সমবায় দফতরের হাতে রয়েছিল। ওই জমির অংশবিশেষের উপর আজ দাঁড়িয়ে রয়েছে সমবায় দফরের বিভাগীয় কার্যালয়।

তিন :

করিমগঞ্জ শহরে লুপ্ত হয়ে পড়া অন্যান্য সরকারি-বেসরকারি আর্থিক প্রতিষ্ঠানের রূপরেখা :

ঔপনিবেশিক পর্বে সমবায় ব্যাঙ্কের সমান্তরালে একাধিক সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠার সংবাদ পাওয়া যায়। এই জাতীয় লগ্নিকারক সংস্থার দু'-একটি তথ্য পেয়েছিলাম। সেগুলো নিয়ে এখানে কিঞ্চিৎ রেখাপাত করাটা বোধহয় অপ্রাসঙ্গিক হবে না।

ক) নৌপরিবহন এবং রেল যোগাযোগের সুবিধা নিয়ে উনিশ শতকের শেষ পর্ব থেকে নবগঠিত করিমগঞ্জ মহকুমা শহরটি উপত্যকার প্রধান বাণিজ্যকেন্দ্র হয়ে উঠেছিল। ক্রমান্বয়ে কুশিয়ারা তীরবর্তী দাসপট্টি, পূর্ববাজার, চরবাজার এবং পুরাতন স্টেশন রোড প্রভৃতি অঞ্চল একসময় পাইকারি ব্যবসার প্রধান

কেন্দ্রস্থল হয়ে ওঠে। এ জাতীয় ব্যবসার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে থাকে ব্যাঙ্ক তথা অন্যান্য লগ্নিকারক আর্থিক প্রতিষ্ঠান। ক্রমে এই শহর আকৃষ্ট করে রাজন্যশাসিত ত্রিপুর দরবারকেও। আমরা দেখতে পাই, বিগত শতকের ত্রিশের দশকে মহারাজ বীরবিক্রমের খ্যাতনামা ব্যাঙ্কিং প্রতিষ্ঠান The Tripura Modern Bank Ltd. -র একটি শাখা গড়ে উঠছে করিমগঞ্জ বাজারকে কেন্দ্র করে। ব্যাঙ্কটির পৃষ্ঠপোষক ছিলেন মহারাজা বীরবিক্রমকিশোর মাণিক্য KCSI, চেয়ারম্যান রানা বোধজং বাহাদুর FRGS, ডিরেক্টর মহারাজকুমার দুর্জয়কিশোর দেববর্মা এবং ম্যানেজিং ডিরেক্টর মিঃ হরিদাস ভট্টাচার্য। নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর আশিসধন্য (38/2 Elgin Road, Calcutta, 5th April 1940 তারিখের শুভেচ্ছাবাণী) এই ব্যাঙ্কটির শাখা বিস্তৃত ছিল বৃহত্তর বাংলা সহ সুরমা-বরাক-ব্রহ্মপুত্রে। (সূত্র : The Janamat, Special Issue, 10th Dec.1940, Comilla, Bengal)

খ) করিমগঞ্জ বাজারকে কেন্দ্র করে Modern Bank প্রতিষ্ঠার সমসাময়িককালে The Sylhet Industrial Bank Ltd. (রেজিস্টার্ড অফিস- নয়াসড়ক, সিলেট)-র একটি শাখা গড়ে উঠেছিল করিমগঞ্জে। সংস্থার Deposit Pass Book-র (Ledger Folio No. 97-III) সাক্ষ্য অনুসারে আমরা দেখতে পাই, টি প্ল্যান্টার নৃপেন্দ্রচন্দ্র চৌধুরী ষাণ্মাসিক ৩.৫০ শতাংশ সুদের হারে ৩০০ টাকা জমা রাখতেন ওই ব্যাঙ্কে (তারিখ- ৯/১২/১৯৪৫)। অনুরূপভাবে, বরদলৈ মন্ত্রিসভার সদস্য খানবাহাদুর মাহমুদ আলিও ১০ টাকা মূল্যের ৫০টি শেয়ার ক্রয় করেছিলেন, যার লভ্যাংশ তিনি পাচ্ছেন ১৩/১/১৯৪০ তারিখের সার্টিফিকেট মতে। (Divident warrant No. 650 for the year ending 14th April 1939)। ওই আর্থিক প্রতিষ্ঠান ছাড়াও The Standard Bank Ltd. নামীয় সিলেটকেন্দ্রিক আরও একটি ব্যাঙ্কের শাখা ১৯৪০-৪১ সালে গড়ে উঠেছিল করিমগঞ্জ বাজারে ।

গ) কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্কের বিষয়ে কোনও তথ্য পাওয়া যায় কিনা, এই উদ্দেশ্যে ১৭ মার্চ ২০২২ সালে গিয়ে হাজির হয়েছিলাম প্রাক্তন শিক্ষিকা পদ্মাবতী মজুমদারের নীলমণি রোডের বাড়িতে। আলাপচারিতায় জানতে পারলাম, পূর্বতন কুমিল্লা ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশনের একজন এগজিকিউটিভ স্টাফ ছিলেন তাঁর পরিবারের সম্পর্কিত দাদু সন্তোষ মজুমদার, বিএ। তাঁদের বাড়ি ছিল ধর্মঘর, হবিগঞ্জ, জেলা সিলেট। সন্তোষ মজুমদারের কর্মস্থল ছিল কুমিল্লায়। ১৮ ডিসেম্বর ১৯৫০ সালে ওই ব্যাঙ্কটি যখন যোগ দিয়েছিল (Merge) ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়ার সঙ্গে, তখন তিনি করিমগঞ্জ ইউবিআই শাখায় এসে জয়েন করেছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসের সাধন-দর্শনে অনুরক্ত সন্তোষ মজুমদার পরবর্তীকালে ব্যাঙ্কের চাকরি ছেড়ে স্থানীয় রামকৃষ্ণ মিশনের সন্ন্যাসী হয়েছিলেন। তিনিই সুপরিচিত এবং সর্বজনশ্রদ্ধেয় স্বামী উদ্‌গীথানন্দ মহারাজ।

শেষকথা :

করিমগঞ্জ শহরের কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্কিং পরিষেবা নিয়ে নিবন্ধ লিখতে গিয়ে নির্ভরযোগ্য তথ্যসূত্রের অভাব প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়িয়েছিল, যে সমস্যা এড়িয়ে যাওয়া মোটেই সম্ভব হয়নি। এই দুষ্প্রাপ্যতার পেছনে একাধিক অনিবার্য কারণও ছিল। প্রথমত, তদানীন্তন সিলেট জেলার অন্তর্গত করিমগঞ্জ শহরে সমবায় দফতরের মহকুমা স্তরের কার্যালয় ছিল। সম্ভবত, সে কারণে গুরুত্বপূর্ণ নথিপত্রগুলো জেলাসদর কার্যালয়েই থাকত এবং দেশভাগ-পরবর্তী পর্বে হয়তো সে-সব হস্তান্তরিত হয়নি। দ্বিতীয়ত, দেশভাগ-পরবর্তী পর্বে স্থানীয় কার্যালয়টি বেশ করে ক'বার স্থান পরিবর্তন করায় পুরনো কাগজপত্র নষ্ট

হওয়া কিংবা হারিয়ে যাওয়া মোটেই অমূলক নয়। এসব প্রতিকূল অবস্থার কারণে বিগত শতকের ঔপনিবেশিক পর্বের তথ্যসূত্র/কাগজপত্র যেমন দুর্লভ হয়ে দেখা দিয়েছিল, তেমনই সঙ্গত কারণে দেশভাগ-পরবর্তী পর্বের তিন-চার দশকের অবস্থাও ছিল তথৈবচ! ওইসব সমবায় ব্যাঙ্কিং প্রতিষ্ঠানের যাঁরা পরিচালক ও কাণ্ডারি ছিলেন, তাঁরাও লোকান্তরিত হয়ে গেছেন আজ থেকে বছর পঞ্চাশেক আগেই। সুতরাং, ষাট-পঁয়ষট্টি বছর আগে বন্ধ হয়ে পড়া ব্যাঙ্কিং প্রতিষ্ঠানগুলোর সার্বিক চিত্র আমাদের কাছে যে অধরা হয়ে থাকবে, সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ কম। অপরদিকে, এ উপত্যকার ইতিহাস ও ঐতিহ্য অনুসন্ধানমূলক যে-সব নিরলস এবং আয়াসসাধ্য প্রবন্ধ-নিবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে, তার প্রায় সিংহভাগই সাহিত্য-সংস্কৃতি ও সামাজিক ইতিহাস বিষয়ক রচনা। এছাড়া সময়ের দাবি নিয়ে ভাষিক ও আত্মপরিচয় অনুসন্ধানমূলক সুগভীর রচনাও আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন এ উপত্যকার ধীমান পণ্ডিত, গবেষকরা। কিন্তু এই অঞ্চলকে কেন্দ্র করে অর্থনৈতিক ইতিহাস, বিশেষত সমবায় ব্যাঙ্কিং পরিষেবামূলক লুপ্ত ইতিবৃত্ত পুনরুদ্ধারের প্রয়াসটি তেমন পরিলক্ষিত হয়নি।

এসব প্রতিবন্ধকতার কারণে এই প্রতিবেদকের পক্ষে তথ্যভিত্তিক এবং গ্রহণযোগ্য প্রতিবেদন তুলে ধরা সম্ভবপর হয়ে ওঠেনি। তাই, লোকস্মৃতি/লোকশ্রুতিনির্ভর রচনাটি তদানীন্তন করিমগঞ্জের সমবায় ব্যাঙ্কিং পরিষেবার অনুমানভিত্তিক এক আবছা অবয়ব মাত্র দাঁড় করাতে পেরেছি বললে বোধহয় অত্যুক্তি হবে না। তবে আশা করি, ভবিষ্যতে এই অনালোচিত কিংবা স্বল্পালোচিত বিষয়টি নিয়ে সদর্থক এবং যথোপযুক্ত ভাবনাচিন্তার প্রয়াস জারি রাখার চেষ্টা করব ।

তথ্যসূত্র ও সহায়ক গ্রন্থ :

১) Co-operative Movement in Assam by Chitta Ranjan Samaddar– Page -51-52.
২) ‘কাছাড় নেটিভ জয়েন্ট স্টক কোম্পানি লিমিটেড— বাঙালি যৌথ কর্মসংস্কৃতির প্রথম নিদর্শন’, — শর্মিলা দত্ত, নাইনথ কলাম, নভেম্বর ২০০৮, ‘বিষয় : শতবর্ষের প্রতিষ্ঠান’ অন্তর্গত প্রবন্ধ, সম্পাদনায় প্রসূন বর্মন।
৩) ‘বৃহত্তর সিলেট ও কাছাড়ে চা-শিল্পে মালিকানা ও নিয়ন্ত্রণ : ঔপনিবেশিক আমল’, —শিবশঙ্কর মুখোপাধ্যায়, ‘সিলেট - ইতিহাস ও ঐতিহ্য’ অন্তর্গত প্রবন্ধ। সম্পাদনায়- শরীফ উদ্দিন আহমেদ, বাংলাদেশ ইতিহাস সমিতি, পৃষ্ঠা - ৩৪৪।
৪) ‘Records As The Source of Economic History of Barak Valley, by Sudeshna Purkayastha, Seminar Paper, Rabindra Sadan Girls’ College, Karimganj, March-1997, Page -64-65.
৫) Source- Do - page-65.
৬) ‘চরগোলা এক্সোডাস ১৯২১’, বিবেকানন্দ মোহন্ত, প্রকাশনায় - সৃজন গ্রাফিক্স অ্যান্ড পাবলিশিং হাউস, শিলচর-৭৮৮০০১, পৃষ্ঠা -৮০।
৭) ‘দ্য শিলচর কো-অপারেটিভ আরবান ব্যাঙ্ক লিমিটেড : বিশ্রুত ইতিহাসের বিস্মৃতি-কথা’, জয়দীপ বিশ্বাস, ‘নাইনথ কলাম, নভেম্বর ২০০৮, ‘বিষয় : শতবর্ষের প্রতিষ্ঠান’ অন্তর্গত প্রবন্ধ।
৮) Co-operative movement in Assam, Chitta Ranjan Samaddar– page -143.
৯) Source - Do, page -146.
১০) Source - Do, page -187.

এসব ছাড়াও অন্যান্য সহায়ক গ্রন্থ :

১) শ্রীহট্ট পরিচয়, রণেন্দ্রনাথ দেব

২) বাংলাদেশের চা-শিল্প ও শ্রম, অধ্যাপক রসময় মোহন্ত

৩) করিমগঞ্জ কলেজের প্রাক্তন অধ্যাপক ড. সুধাংশুশেখর দত্ত-র পিএইচডি থিসিস (১৯৯২ সালের) : "Institutional Finance to Agriculture - A Case Study of undivided Cachar District of Assam.

(কৃতজ্ঞতা স্বীকার করছি যাঁদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনায় উপকৃত হয়েছিলাম, তাঁরা হলেন— প্রাক্তন অধ্যাপক নিশীথরঞ্জন দাস, অধ্যাপক সুধাংশুশেখর দত্ত, অধ্যাপক শান্তনু দত্ত, প্রাক্তন শিক্ষিকা পদ্মাবতী মজুমদার, শিক্ষাবিদ চন্দ্রজ্যোতি ভট্টাচার্য, রঞ্জিত ভট্টাচার্য, দীপক বিশ্বাস, হিমাংশু দত্ত, প্রাক্তন মন্ত্রী আব্দুল মুক্তাদির চৌধুরী, গোপালচন্দ্র আচার্য, দীপেন্দ্র চৌধুরী, হারাধন দাস, কৃষ্ণপদ চৌধুরী, শ্যামাপদ চৌধুরী, আব্দুল বাছিত চৌধুরী, উবাইদুল্লা সইদ খান, সমবায় দফতরের সিনিয়র অ্যাসিস্টান্ট আব্দুল মুক্তাদির চৌধুরী এবং আরও অনেক।)

গ্রাম পদ্মারপার : ১৯৫০ থেকে ২০২২

বিনোদলাল চক্রবর্তী

গ্রামের নাম পদ্মারপার। না, গ্রামটি মোটেই বিখ্যাত পদ্মানদীর তীরে নয়। এ পদ্মারপার হলো পূর্বতন করিমগঞ্জ থানার অন্তর্গত একটি তফসিলি সম্প্রদায়ভুক্ত নমশূদ্র ও পাটনি সম্প্রদায়ের বাসভূমি। মূলত এই গ্রামের মানুষ কৃষিজীবী ও মৎস্য উপজীবী। নমশূদ্র সম্প্রদায়ের কৃষকরা মুলি ও ডলু বাঁশের বেত দিয়ে চাটাই বুনে বিক্রি করতেন ও পাটনি সম্প্রদায়ের কৃষকরা অবসর সময়ে শনের সুতো দিয়ে মাছ ধরার জাল বুনতেন ও শুঁটকি বিক্রি করতেন। ১৯৫০-৫১ সালে গ্রামের জনসংখ্যা ছিল প্রায় ৫০০। এর মধ্যে নমশূদ্রের জনসংখ্যা ছিল প্রায় ৬০ শতাংশ ও তিন ব্রাহ্মণ পরিবারের জনসংখ্যা ১ শতাংশের বেশি নয়।

এ গ্রামের মানচিত্র অঙ্কন করা খুবই সহজ। গ্রামের মাঝখানে প্রায় আড়াই হাল অর্থাৎ ৩০ কেদার (কম-বেশি ৩০ বিঘা) ভূমি নিয়ে বিরাট একটি দিঘি। তার চারপাশে দিঘির পারেই বসতি। এছাড়া দিঘির পূর্বপারের সমান্তরালভাবে আরও দুই পাড়া।

যাতায়াতের জন্য নিকটবর্তী রেলস্টেশন সুপ্রাকান্দি ও পূর্ত বিভাগের সড়ক প্রায় দুই কিলোমিটার দূরে। গত শতাব্দীর পঞ্চাশ বা ষাটের দশকে পদ্মারপার থেকে রেলস্টেশন বা পূর্ত সড়কে পৌঁছনোর কোনও গ্রামীণ সড়ক ছিল না। তাই হেমন্তে পায়ে হেঁটে ও বর্ষায় নৌকাযোগে রেলস্টেশন বা সড়কপথ ধরে নিকটবর্তী মহকুমা শহর করিমগঞ্জের সঙ্গে যোগাযোগ ব্যবস্থা।

গ্রামের পূর্বদিকে ধানক্ষেত ও গো-চারণ ভূমি, পশ্চিমে ধানক্ষেত, উত্তর-দক্ষিণেও ধানক্ষেত এবং গো-চারণ ভূমি। উত্তর, দক্ষিণ ও পূর্বপ্রান্তে তিনটি রাখালভিটি। হেমন্তে গরু-মহিষ চরাতে রাখাল বালকরা রাখালভিটিতে বসে গবাদি পশুর দিকে নজর রাখত। রাখালভিটিতে বটগাছ ও বিভিন্ন জাতের ছায়াতরু ছিল। সঙ্গে ছোট মন্দির। সেই মন্দিরে শিবের ত্রিশূল, শিবলিঙ্গ ও সঙ্গে কালীমূর্তিও ছিল, যা আজও আছে। রাখালরা বৃক্ষ ছায়াতলে বসে গল্পগুজব করত, কেউ কেউ গান গাইত, আবার কেউ গল্প বলত। এদের মধ্যে আবার এক-দু'জন প্রৌঢ় ব্যক্তিও রাখালদের সঙ্গ দিতেন এবং এসব প্রবীণ ব্যক্তিই হাস্যরসের গল্পে রাখালদের আনন্দে মাতোয়ারা থাকায় মদত জোগাতেন। এসব রাখালভিটি পতিত জমি থেকে মাটি কেটে এনে তৈরি করতে গ্রামের লোকেরাই শ্রমদান করতেন। বৃক্ষাদি রোপণ করতেন। গবাদি পশু রক্ষা ও তাদের খাবারে যাতে ত্রুটি না হয়, সেদিকে নজর রাখা হতো। কারণ, গবাদিপশু ছাড়া কৃষিকাজ ও শস্য উৎপাদন অসম্ভব। আবার, বর্ষার সময়ে গরু-মহিষকে গোয়ালঘরেই আবদ্ধ রাখতে হতো। তাই তাদের খাদ্যের জন্য খড় ও ধানের ভুসি মজুত করতে হতো। সেসঙ্গে কচুরিপানা ও জলজ ঘাসও জোগান দিতে হতো।

পদ্মারপারের প্রত্যেক পরিবারেরই ধান চাষের পর্যাপ্ত জমি ছিল। ৬ কেদার থেকে ৩ হাল (১২ কেদারে এক হাল, আর এক কেদার সমান প্রায় ১ বিঘা) বেশিরভাগই জমিই এক ফসলা। অধিকাংশ জমিতে আছরা (আমন ধান) ধানের চাষ হতো। কারণ, বেশিরভাগ জমিতে বর্ষাকালে প্রচুর জল থাকত এবং সেই বর্ষার

বাড়ন্ত জলের সঙ্গে টেক্কা দিয়ে আছরা ধানের গাছ বাড়তে সক্ষম। অপেক্ষাকৃত উঁচু জমিতে আউস ও মুরালি ধানের চাষ করা হতো । আউস বা মুরালি ধান আষাঢ় মাসের মধ্যে তোলা যায়। কিন্তু প্রবলভাবে বর্ষা হলে সে ফসল নষ্ট হয়ে যায়। তাই এ জাতীয় ধানের ফসল অনিশ্চিত ছিল। আর যদি আবহাওয়া অনুকূল থাকে, তা হলে এই ফসল কৃষকের কাছে ছিল বাড়তি লাভ।

সে যা-ই হোক, পদ্মারপারের কৃষকের ঘরে প্রতিটি পরিবারের চাহিদামতো সারা বছর খাবারের ধান মজুত থাকত। কৃষকদের সচ্ছলতার মাপকাঠি ছিল যার পরিবারে সারা বছর খাবার ধানের অভাব নেই, সে-ই সচ্ছল কৃষক। প্রায় কৃষকই খাবার ধান মজুত রেখে বাড়তি ধান বাজারে বিক্রি করে চাষাবাদের খরচ ও নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিস ক্রয় করতেন। খাদ্যশস্য উৎপাদন ছাড়া বাড়তি রোজগারের সুযোগ ছিল সীমিত। নমশূদ্র সম্প্রদায়ের মানুষের বাড়তি রোজগারের মধ্যে বাঁশের চাটাই তৈরি করে বিক্রি ও বর্ষাকালে মৎস্য শিকার। পাটনি সম্প্রদায়ের মানুষদের জাল বুনে ও শুঁটকি বিক্রি করে খুব বেশি আয় হতো না। সাধারণভাবে দিন গুজরান হতো। কিন্তু ক্ষুধা নিবৃত্তি ছাড়াও সংসারে আরও অনেক চাহিদা থাকে, যেমন জন্ম, মৃত্যু ও বিবাহে অর্থের প্রয়োজন, পরিধানের বস্ত্র ও মারাত্মক অসুখ হলে চিকিৎসা ও ওষুধের ব্যবস্থা করতে বাড়তি অর্থের প্রয়োজন। এসব চাহিদা মেটাতে বিত্তবানদের কাছ থেকে চড়াসুদে ঋণ নিতে হতো। সেই ঋণ পরিশোধ করতে অনেক কৃষককেই ফসলের মরসুমে অর্থাৎ অগ্রহায়ণ ও পৌষ মাসে উৎপাদিত ফসলের (ধানের) এক বড় অংশ মহাজনের হাতে তুলে দিতে হতো। ফলে সারা বছরের জন্য ধান মজুত রাখা তাদের পক্ষে সম্ভব হতো না। এভাবে খাদ্যভাণ্ডারে ঘাটতি দেখা দিত। সেই ঘাটতি পূরণে নিরুপায় হয়ে ধানের জমি বিক্রি করতে হতো। তাছাড়া প্রাকৃতিক বিপর্যয়, যেমন বন্যা বা খরায় ফসল বিনষ্ট হলেও সংসার সংকুলানে বিপত্তি সৃষ্টি হতো। তারপরও অনেক সময় হালের বলদ বা মহিষের মৃত্যু হলে, নতুনভাবে গরু বা মহিষ ক্রয় করতেও মোটা অঙ্কের অর্থের প্রয়োজনও মেটাতে হতো, যা সীমিত আয়ের টাকায় মেটানো সম্ভবপর ছিল না। ফলে অগতির গতি হলো, জমি বিক্রি করে প্রয়োজনীয় চাহিদা পূরণ করা ছাড়া গত্যন্তর নেই। তাছাড়া সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়েও মা ষষ্ঠীর কৃপায় প্রতি পরিবারে ৪-৫ বা ততোধিক নতুন সদস্যের আবির্ভাব। নতুন সদস্যদের অন্ন জোগান ও ভরণ-পোষণের ব্যয় ক্রমবর্ধমান। ফলে উত্তরোত্তর প্রতিটি পরিবারে খাদ্যঘাটতি। পদ্মারপার শিক্ষার ক্ষেত্রে ছিল অত্যন্ত পিছিয়ে পড়া। ১৯৬০-র আগে একজন ব্যক্তিও ম্যাট্রিকুলেট ছিলেন না, তাই সরকারি চাকরিও ছিল অধরা। সে-সময় গ্রামের প্রবীণদের মধ্যে কেবল ৫-৬ জন ব্যক্তিই ছিলেন প্রাথমিক উত্তীর্ণ। বাদবাকিদের মধ্যে অনেকে প্রাথমিক স্কুলের গণ্ডি পার হতে পারেননি।

১৯৫১-য় প্রথম করিমগঞ্জ শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের সহায়তায় একটি প্রাথমিক স্কুল স্থাপিত হয়। গ্রামেরই এক যুবক বারীন্দ্র মল্লিক, যিনি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের গণ্ডি পেরিয়ে কিছুদিন মধ্য ইংরেজি বিদ্যালয়ে পড়াশুনো করেছিলেন, তাঁকে সেই স্কুলের শিক্ষক হিসেবে নিযুক্তি দেওয়া হয়। তিনি নিয়মিত কৃষিকাজ করে স্কুলে যত্ন সহকারে পাঠদান করতেন। আজও সেই পাঠশালা (রামকৃষ্ণ বিদ্যাপীঠ নামে নামাঙ্কিত) রাজ্য সরকারের পরিচালনায় চলছে। ১৯৫৭-৫৮'তে এই নিবন্ধকারের তৎপরতায় এবং কয়েকজন কিশোরের সহযোগিতায় 'পল্লী উন্নয়ন সংঘ' নামে একটি ক্লাব গঠন করা হয়। ওই ক্লাব নিরক্ষরতা দূরীকরণ, খেলাধুলো, ক্ষুদ্র সঞ্চয়, যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন, সামাজিক উন্নয়ন, অধিক ফসল উৎপাদন ও পাঠাগার প্রতিষ্ঠার কর্মসূচি হাতে নেয়। অনেক ক্ষেত্রেই সফলতা আসে। কিন্তু তখনও যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতিসাধন হয়নি।

যা-ই হোক, এই ক্লাবের মধ্যে যারা সক্রিয় ভূমিকায় ছিলেন, তাদের মধ্যে সুবলচন্দ্র দাস, ভূপেন্দ্রমোহন দাস, অনিল দাস, সুনীল দাস, সুনীল নমশূদ্র সহ এই নিবন্ধকারের অনুপ্রেরণায় এবং সবার নিষ্ঠায় যে-সব

কিশোর ও যুবক ম্যাট্রিক পাস করেন, তাদের মধ্যে অন্তত দু'জন কলেজ থেকে ডিগ্রি হাসিল করেন। এসব যুবক পরবর্তীতে শিক্ষকতায় যোগ দেন এবং সুনামের সঙ্গে শিক্ষকতা থেকে অবসর গ্রহণ করেন। সুবল দাস, ভূপেন্দ্রমোহন দাস, অনিল দাস আজ ইহধামে নেই।

বাস্তবে ১৯৬৮ থেকে এই নিবন্ধকারের পদ্মারপারের সঙ্গে স্থায়ী সম্পর্ক তেমনভাবে টিকে থাকেনি। জীবিকানির্বাহের প্রয়োজনে পদ্মারপার ত্যাগ করতে হয়। এবং ১৯৭৬-৭৭'এ স্থায়ীভাবে স্থান ত্যাগ করতে বাধ্য হই। তারপরও পদ্মারপারের সঙ্গে সংযোগ বজায় আছে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, শিক্ষাক্ষেত্রে গ্রামের ছেলেমেয়েরা আজও অনগ্রসর। সরকারি বা বেসরকারি চাকরিতে এই গ্রামের ছেলেমেয়েদের যোগদান নগণ্য। বর্তমানে শিক্ষার অনগ্রসরতার প্রধান কারণ হলো দারিদ্র্য। অনেক ছেলেমেয়ে গ্রামের পাঠশালার পাঠ শেষ করে দুই মাইল দূরবর্তী সুপ্রাকান্দির পল্লীমঙ্গল মধ্য ইংরেজি ও হাইস্কুলে ভর্তি হয়ে ফাইনাল পরীক্ষায় অনেক কম ছাত্রই বসে বা উত্তীর্ণ হয়।

১৯৫১ থেকে যদি একলাফে ২০২১-এ আসি, তা হলে দেখতে পাব, ৮০ ভাগ গ্রামবাসীর পরিবারে ফসলি জমি নেই। অনেক পরিবারের জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে বসতভিটের অভাব। তাই বাড়তি বসতবাড়ির জন্য ধানের জমির মাটি ভরাট করে আবাসগৃহ তৈরি করছেন, যা বহমান। এছাড়া জমিদারি প্রথা বিলোপের সময় জমিদার ও তাদের নায়েব-মুহুরিরা পতিত গো-চারণ ভূমি ও পরিত্যক্ত জলাধার অর্থের বিনিময়ে বিত্তবান ব্যক্তিদের নামভুক্ত করেছিলেন। ফলে গোচারণ ভূমি বলতে আর কোনও ভূমি বর্তমানে নেই। ফলে হালের গরু ও দুধের গাভী পালন করাও এখন মুশকিল। যাদের বাড়িতে দুগ্ধবতী গাভী ছিল, যারা দুধ বিক্রি করেও কিছু অর্থ উপার্জন করতেন, কিন্তু আজ সে সুযোগও বন্ধ। তাই পদ্মারপারের ১০-১২টি পরিবার গ্রাম থেকে প্রায় ৩০ থেকে ৪০ কিলোমিটার দূরে নিভিয়া বা চেরাগি রিজার্ভ ফরেস্টের জমি আবাদ করে বসতবাড়ি ও চাষাবাদের উপযুক্ত করে বন কেটে বসত সৃষ্টি করেছে। কিন্তু এই ভিটেমাটির (রিজার্ভ ফরেস্টের আওতাধীন ভূমি) স্থায়িত্বের কোনও গ্যারান্টি নেই।

আবার, পদ্মারপার গ্রামে যারা বসবাস করছেন, তাদের জমিজমা তেমন আর নেই। ব্যতিক্রম মাত্র কয়েকটি পরিবার। বাকি সব কৃষক আজ শহরের মুখাপেক্ষী। কেউ রাজমিস্ত্রি, কেউ কাঠমিস্ত্রি ও তাদের জোগালি। আবার, কেউ কেউ দিনমজুরির কাজ করে কায়ক্লেশে পরিবার পরিপালন করছেন। কেবলমাত্র কয়েকটি পরিবারে হাল চাষের গরু আছে, আছে হাতে গোনা কয়েকটি দুগ্ধবতী গাভী। যাদের ২ বা ৩ কেদার ধানের জমি আছে অথচ হালের গরু নেই, তারা ভাড়ায় কলের লাঙল দিয়ে চাষাবাদ করেন। আজ হালচাষে গরু-মহিষের পরিবর্তে কলের লাঙলের ব্যবহারই বেশি। ফলে চাষাবাদে অর্থব্যয়ও ক্রমবর্ধমান।

অথচ আজ থেকে ৬০-৭০ বছর আগে পদ্মারপার গ্রামে কৃষকদের এমন করুণ অবস্থা ছিল না। সে-সময় বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ মাসে হালচাষ করে আমন ধানের বীজ জমিতে বোনা হতো। বর্ষার জল বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে তাল মিলিয়ে ধান গাছও একই বৃন্ত থেকে শাখা-প্রশাখা বিস্তার করে জলের উপর মাথা রেখে মৃদুমন্দ বাতাসের সঙ্গে খেলা করত। মাঠে সবুজের ছড়াছড়ি। এরূপ মনোরম দৃশ্য আজ প্রায় অদৃশ্য।

বর্ষায় গ্রামের কৃষকদের চাষাবাদের পালা শেষ। কেউ হয়তো মাছের জাল বুনছেন, আবার কোনও পরিবারের প্রায় সব সাবালক ব্যক্তি বাঁশের চাটাই বোনা ও মাছশিকারে ব্যস্ত। আর অনেক প্রৌঢ় ব্যক্তি, যারা অল্প লেখাপড়া করেছেন, তারা বাড়ির উঠানে রামায়ণ, মহাভারত ও শ্রীমদ্ভাগবত ইত্যাদি ধর্মগ্রন্থ সুর ধরে পাঠ করতেন। এমন পাঠকদের ঘিরে অনেক ছেলে-বুড়ো মনোযোগ দিয়ে পাঠ শুনতে বসতেন। সঙ্গে তামাক, বিড়ি, ধূমপানও করতেন। ধর্মগ্রন্থ পাঠকদের মধ্যে নদীয়া মাস্টার (নদীয়াচাঁদ নমশূদ্র), রাইচরণ

নমশূদ্র, তরীন্দ্র মাস্টার, যতীন্দ্র দাস এদের নাম উল্লেখযোগ্য। পুজো-পার্বণে বিশেষ করে মনসা পুজোর দিনে মনসামঙ্গল গান, কালী পুজোয় সংকীর্তন, বিয়েতে ধামাইল ও শ্রাদ্ধে ঠাঁটের কীর্তন — এসব সারা বছরই লেগে থাকত।

গ্রামে কোনও সংক্রামক রোগের প্রাদুর্ভাব ঘটলে নগর সংকীর্তনের মাধ্যমে (বিশেষ করে বসন্ত ঋতুতে) গ্রামের চতুঃসীমা পরিভ্রমণ ও সঙ্গে লাল কাগজের পতাকা মাটিতে পুঁতে রাখা অর্থাৎ রোগের প্রবেশপথ বন্ধ করে গ্রামবাসীকে রোগ সংক্রমণ থেকে রক্ষা করা। তা আজও বহমান। যেহেতু গ্রামে বা নিকটবর্তী বাজারে চিকিৎসার জন্য কোনও প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র নেই, তাই ঈশ্বরের কৃপালাভে এমন নগর কীর্তন প্রাচীনকাল থেকেই চলে আসছে।

এছাড়া মাঘ মাসে ভাঁড়ারে ধান তোলার পর বিয়ের মরসুম। মাঘ থেকে ফাল্গুন মাসের শেষ সপ্তাহ পর্যন্ত পাত্র-পাত্রী দেখার পালা। ফাল্গুনের শেষ সপ্তাহে পঞ্জিকামতে বিয়ের শুভদিন না থাকলেও আপত্তি নেই। গোধূলি লগ্ন তো আছেই। গোধূলি লগ্ন বলতে সূর্যাস্তের সময় মাঠ থেকে রাখাল বালকরা গরুর দল নিয়ে ঘরমুখো হন, সে-সময় গরুর পায়ের চাপে চলার পথে যে ধুলো বাতাসে ছড়ায়, সেই ধুলো খুব পবিত্র। তাই সেই সূর্যাস্তের সন্ধিক্ষণে বিয়ে হতে আপত্তি নেই।

এমন এক বিয়ের সাক্ষী এই নিবন্ধকার। ফাল্গুন মাস শেষ হতে আর মাত্র দু'দিন বাকি। গ্রামের মেয়ে বাসন্তীর (নাম পরিবর্তিত) বিয়ের প্রস্তাব এসেছে পাঁচ জায়গা থেকে। পাত্রীপক্ষের পছন্দের পাত্র সবাই। কিন্তু বাসন্তী তো দ্বাপরের দ্রৌপদী নয় যে, পাঁচ বরের সঙ্গেই তার বিয়ে হবে। এদিকে, পাঁচ পাত্রের অভিভাবক যারা বিয়ের আলাপ নিয়ে এসেছেন, তারাও নাছোড়। আজই বিয়ের ব্যাপারে হ্যাঁ বা না জানিয়ে দিতে হবে। কারণ, হাতে মাত্র দু'দিন, তাই এখানে বিয়ে পাকা না হলে অন্যত্র তারা পাত্রী খুঁজতে যাবেন।

উপায়ান্তর বা সমাধান খুঁজে পেতে গ্রামের মাতব্বরদের ডাকা হলো। ছাওয়াল মুরব্বি হিসেবে ডাক পেয়ে আমিও বাসন্তীর বাড়িতে উপস্থিত হয়েছিলাম। গ্রামের মাতব্বররা এক সমাধানসূত্র দিলেন, সেই সমাধানসূত্রে পাত্রপক্ষ ও পাত্রীপক্ষ সম্মত হয়। সমাধানসূত্র হলো, পাঁচ টুকরো কাগজে পাঁচ প্রস্তাবিত পাত্রের নাম আলাদাভাবে লেখা হবে এবং সেই নাম লেখা প্রতিটি কাগজের টুকরো পাঁচটি নরম মাটির ঢেলায় ভরে গোল করে করে বাড়ির তুলসীতলায় রেখে সে স্থানে ধূপধুনো ও প্রদীপ প্রজ্বলন করে ভক্তিভরে রাখতে হবে। পাত্রী স্নান করে এসে পবিত্রভাবে তুলসীতলায় প্রণাম করে নিজের ইচ্ছেমতো একটি মাটির ঢেলা হাতে তুলবে এবং সেই মাটির ঢেলা ভেঙে তাতে পাত্রের নাম লেখা কাগজের টুকরোটি মাতব্বরদের সামনে রাখবেন। মাতব্বরদের মধ্যে একজন তা দেখে পাত্রের নাম ঘোষণা করবেন। তা-ই হলো। বাসন্তীর বর সাব্যস্ত হলো। পরদিনই গোধূলি লগ্নে বাসন্তীর বিয়ে হয়। যতদূর জানতাম, বাসন্তী স্বামীগৃহে সুখেই ছিল। এখনও বেঁচে আছে কিনা তা জানি না। এটা হলো ১৯৬৪-র ঘটনা। এসব ছিল তফসিলি অধ্যুষিত গ্রামে প্রচলিত রীতিনীতি। সে-সময় গ্রামীণ মানুষদের মধ্যে জীবনযাত্রা সহজ ও সরল ছিল। একে-অপরের সুখ ও দুঃখের অংশীদার হতেন।

১৯৬২ পর্যন্ত দেখেছি, বিধানসভা ও সংসদীয় নির্বাচনে কোন্ দলের প্রার্থীকে গ্রামবাসী ভোট দেবেন, সেজন্য নির্বাচনের আগে গ্রামের মানুষ এক সভায় মিলিত হতেন। ওই সভায় কোনও রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধি বা নির্বাচন প্রার্থীর প্রবেশ নিষিদ্ধ ছিল। গ্রামের মানুষ যাকে ভোট দেওয়ার পক্ষে সহমত হতেন, সেই প্রার্থীকেই সবাই দিতেন। এখানে মধ্যভোগী দালাল বা টাকা-পয়সা দেওয়া-নেওয়ার কোনও প্রচলন ছিল না। আজ আর সেদিন নেই।

১৯৭৭-এ আমি সপরিবারে পদ্মারপার থেকে বাস্তুভিটে বিক্রি করে পার্শ্ববর্তী গ্রামে চলে আসি। যে স্বপ্ন নিয়ে পদ্মারপারের সার্বিক উন্নয়নে ছাত্রাবস্থায়ই ঝাঁপিয়ে পড়েছিলাম, তখনকার সময়ে নিরক্ষরতা দূরীকরণ, শিক্ষার উন্নতি, অধিক ফসল উৎপাদন, খেলাধুলো, ক্ষুদ্র সঞ্চয় ইত্যাদি বহু বিষয়ে আশাতীত সাফল্য পেয়েছিলাম। যাদের সঙ্গে নিয়ে এসব জনহিতকর কাজে হাত দিয়েছিলাম, তাদের প্রায় কেউই আজ বেঁচে নেই। আমিও মহাপ্রস্থানে যাওয়ার অপেক্ষায়। দুঃখের বিষয়, ১৯৫৬-৫৭ থেকে আমার সহযোগী সুবল দাস, ভূপেন্দ্রমোহন দাস, অনিল দাস, নগেন্দ্র নমশূদ্র এরা আজ জীবিত নেই। তাদের পর এবং আমার অবর্তমানে সেই নিঃস্বার্থ সমাজসেবার ধ্বজা বহন করতে বর্তমান প্রজন্মের যুবক-যুবতীরা আর এগিয়ে আসেনি।

আজ পদ্মারপারে ৮ নং জাতীয় সড়ক ও সুপ্রাকান্দি রেলস্টেশনের সঙ্গে গ্রামীণ সড়ক তৈরি হয়েছে, অনেক বাড়িতে বিদ্যুৎ পৌঁছেছে। কিন্তু শিক্ষা ও অর্থনৈতিক দিক থেকে গ্রাম আজও অনেক পিছিয়ে। অনেকের বাড়িতে অগ্রহায়ণ মাসে ফসল তোলার মতো জমি নেই। তাই বেশিরভাগ মানুষ আজ দিনমজুর। অনেকে আবার সরকারি প্রকল্প— গরিব অন্ন যোজনা, বার্ধক্য ভাতা, অরুণোদয় ও প্রধানমন্ত্রীর আবাস যোজনার সুযোগ পেতে স্থানে স্থানে ধরনা দিচ্ছেন। কিন্তু এসব প্রকল্পের সুবিধা পেতে অনেক কাঠখড় পোড়াতে হয়। তবে একটা বিষয়ে গ্রাম বেশ উন্নত হয়েছে, তা হলো, ছেলে-বুড়ো সবার হাতে কথা বলা ও গান শোনার জন্য মোবাইল ফোন লক্ষণীয়ভাবে দৃশ্যমান। ধনী-গরিব সবাই সমান। এখানে গ্রামীণ রোজগার যোজনার অধীনে ইচ্ছুক শ্রমিকদের একশো দিনের কর্মসংস্থান দেওয়ার নিশ্চয়তা প্রদান হলো কেন্দ্র সরকারের একটি বিশেষ কর্মসংস্থানের পরিকল্পনা, কিন্তু এই প্রকল্প আশনুরূপভাবে রূপায়িত হয়নি। সেজন্য এ প্রকল্প নিয়ে দীর্ঘ আলোচনার অবকাশ আছে। তাই আপাতত তা বাদ দিলাম।

সবশেষে উল্লেখ করছি, গ্রামের নাম সৃষ্টির প্রেক্ষাপট। আগেই উল্লেখ করেছি, পদ্মারপার গ্রামের কেন্দ্রস্থলে একটা বিরাট দিঘি। সেই দিঘির চারপাশে গ্রাম থাকায় পদ্মারপার বলা হয় বলে অনুমান। হয়তো এক সময় সেই দিঘিতে পদ্মফুল ফুটত, তাই পদ্মারপার।

দক্ষিণ করিমগঞ্জ এলাকায় এরূপ অনেক বড় বড় দিঘি আছে। যেমন, চূড়াদিঘিরপার, দুর্লভপুরের দিঘি, মীরাদিঘিরপার, কাউদিঘিরপার, কামারদিঘিরপার, চান্দরদিঘি, বামনটিকি। এসব দিঘি নির্মাণ করা হয়েছিল, নবাব, সুবেদার বা ইংরেজ আমলে অনাবাদি জমিতে আবাদ করে ফসল ফলানোর জন্য। আর জমি আবাদ করে ফসল উৎপাদন হলে প্রজাদের কাছ থেকে খাজনা বা রাজস্ব আদায় করে শাসকদের আয় বৃদ্ধির পথ সুগম করা। কিন্তু অনাবাদি জমিতে প্রজার পত্তন গড়তে উঁচু ভিটের প্রয়োজন। সেই ভিটে নির্মাণে মাটির প্রয়োজন আর সেই চহিদামতো মাটি বড় দিঘি খনন করেই সম্ভব। এতে দিঘির পারে বসতবাড়ি নির্মাণ, পানীয়জলের সুবিধা ও মৎস্য শিকার সব কাজই সম্পন্ন করা হতো । আজও পদ্মারপার দিঘি বছর মেয়াদে লিজে রাজ্য সরকার (পঞ্চায়েত বিভাগ) প্রতিবছর প্রায় লক্ষাধিক টাকা রাজস্ব আদায় করে। যদি ওই দিঘিকে পদ্মারপারের মানুষের কল্যাণে মৎস্য সমবায় সমিতি করা যেত, তা হলে দিঘিতে মৎস্য চাষ করে গ্রামের মানুষের কিছু পরিমাণে আর্থিক লাভ হতো। ১৯৬২-৬৩ সালে এই নিবন্ধকারের উদ্যোগে একটি মৎস্য সমবায় সমিতি গঠিত হয়েছিল। মূলত ওই পদ্মার দিঘিকে কেন্দ্র করে। কিন্তু সরকারি তরফে দিঘিকে মৎস্য সমবায়ের আওতায় আনা সম্ভব হয়নি। ফলে সেই মৎস্য সমবায় সমিতি লিকুইডিশনে যায়। এ বিষয়ে আমি যথেষ্ট মর্মাহত হয়েছিলাম। সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে অনেক কিছুরই পরিবর্তন হয়। আশা রাখি ভবিষ্যতে আবার পদ্মারপার গ্রামের মানুষেরা সুখে-শান্তিতে বেঁচে থাকার সুযোগ পাবেন।

লেখক পরিচিতি

ড° বিভাসরঞ্জন চৌধুরী : অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক, অর্থনীতি বিভাগ, গুরুচরণ কলেজ, শিলচর, প্রাক্তন সঞ্চালক, কলেজ উন্নয়ন পর্ষদ, আসাম বিশ্ববিদ্যালয়, শিলচর।

ড° অলক সেন : ডিন, এমজি স্কুল অব ইকোনমিক্স অ্যান্ড কমার্স, বিভাগীয় প্রধান, অর্থনীতি, আসাম বিশ্ববিদ্যালয়, শিলচর।

ড° গুরুদাস দাস : অধ্যাপক, মানবিক ও সমাজবিজ্ঞান বিভাগ, জাতীয় কারিগরী শিক্ষণ প্রতিষ্ঠান, শিলচর।

বীরেশ্বর মুখোপাধ্যায় : অবসরপ্রাপ্ত তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, পূর্ত বিভাগ, আসাম সরকার, গুয়াহাটি।

গৌতমপ্রসাদ দত্ত : অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক, নরসিং উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়, শিলচর, সাংবাদিক, লেখক ও সমাজকর্মী।

আশিস চৌধুরী : অবসরপ্রাপ্ত ব্যাঙ্ক আধিকারিক, এলাহাবাদ ব্যাঙ্ক, শিলচর।

আবিদ রাজা মজুমদার : অবসরপ্রাপ্ত ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ, নেহরু কলেজ, পয়লাপুল, লেখক ও গবেষক।

সুদীপ্ত দেবরায় : অবসরপ্রাপ্ত জেলা কৃষি আধিকারিক, হাইলাকান্দি।

সঞ্জীব দেবলস্কর : অবসরপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ, ময়ীনূল হক চৌধুরী উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়, সোনাবাড়িঘাট, লেখক ও গবেষক।

সুভাষ ভট্টাচার্য : ভারত সরকারের ডোনার মন্ত্রকের অধীনস্থ্ নর্থ ইস্টার্ন রিজিওন্যাল এগ্রিকালচারেল মার্কেটিং কর্পোরেশন লিমিটেডের প্রাক্তন অধিকর্তা, গুয়াহাটি।

তমাল সেন : অবসরপ্রাপ্ত আধিকারিক, কুম্ভা চা বাগান, কুম্ভীরগ্রাম।

পার্থপ্রতিম দাস : লেখক ও সমাজকর্মী, শিলচর।

ড° সঞ্জীব ভট্টাচার্য : সহযোগী অধ্যাপক, বাণিজ্য বিভাগ, গুরুচরণ কলেজ, শিলচর।

ড° মানবেন্দ্র দত্তচৌধুরী : অধ্যাপক জৈবতথ্য প্রযুক্তিবিদ্যা বিভাগ ও ডিন, স্কুল অব লাইফ সায়েন্সেস, আসাম বিশ্ববিদ্যালয়, শিলচর।

ড° সব্যসাচী রায় : সহযোগী অধ্যাপক, পদার্থবিদ্যা বিভাগ, করিমগঞ্জ কলেজ, করিমগঞ্জ, লেখক ও গবেষক।

অরিজিৎ চৌধুরী : অবসরপ্রাপ্ত জনসংযোগ আধিকারিক আসাম সরকার, লেখক ও গল্পকার, কলকাতা।

ড° পরিতোষচন্দ্র দত্ত : অবসরপ্রাপ্ত সহযোগী অধ্যাপক, পরিসংখ্যান বিভাগ, শ্রীকিষাণ সারদা কলেজ, হাইলাকান্দি, লেখক ও সমাজকর্মী।

দীপক সেনগুপ্ত : শিক্ষক, অধরচাঁদ উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়, শিলচর, লেখক ও সমাজকর্মী।

ড° জয়িতা দাস : সহযোগী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিশ্ববিদ্যালয়, হোজাই।

ড° গোলাপচন্দ্র নন্দী : সহকারি অধ্যাপক, অর্থনীতি বিভাগ, শ্রীকিষাণ সারদা কলেজ, হাইলাকান্দি।

বিবেকানন্দ মোহন্ত : অবসরপ্রাপ্ত প্রকৌশলী, জনস্বাস্থ্য কারিগরী বিভাগ, আসাম সরকার, লেখক ও গবেষক, করিমগঞ্জ।

বিনোদলালল চক্রবর্তী : আইনজীবী, করিমগঞ্জ জেলা আদালত ও লেখক, সমাজকর্মী।

• ক্রোড়পত্র •

আসামের বরাক উপত্যকার আর্থিক বিকাশের উজ্জ্বল সম্ভাবনা থাকলেও স্বাধীনতার এত বছর পরও তার বাস্তব ছবি কোনও উদ্দীপনা জাগায় না। এই ক্রোড়পত্রে তার কিছু খণ্ডচিত্র তুলে ধরা হল।

ক্রোড়পত্র : ১

এক নজরে বরাক উপত্যকা

জনসংখ্যা

কাছাড় — ১৭,৩৬,৬১৭
করিমগঞ্জ — ১২,২৮,৬৮৬
হাইলাকান্দি — ৬,৫৯,২৯৬

(২০১১ সালের আদমসুমারী অনুসারে)

এলাকা

কাছাড় — ৩৭৮৬ বর্গ কিলোমিটার
করিমগঞ্জ — ১৮০৯ ,,
হাইলাকান্দি — ১৩২৯ ,,

গ্রাম

কাছাড় — ১০৪০
করিমগঞ্জ — ৯৩৬
হাইলাকান্দি — ৩৩১

শহর

কাছাড় — ১৯
করিমগঞ্জ — ০৭
হাইলাকান্দি — ০৩

সাক্ষরতার হার

কাছাড় — ৭৯.৩৪
করিমগঞ্জ — ৭৮.২২
হাইলাকান্দি — ৭৪.৩৩

(২০১১ সালের আদমসুমারী অনুসারে)

২০১১ সালের পর আদমসুমারীর কাজ আর হয়নি। সরকারী নথিপত্রে ২০১১ সালের হিসেব ধরেই এখনও কাজকর্ম চলছে।

(তথ্যসূত্র : স্ট্যাটিস্টিক্যাল হ্যান্ডবুক অব আসাম, ২০২২)

ক্রোড়পত্র : ২

The Memorandum on Economic Development Council

Date: 1 August, 2014

To

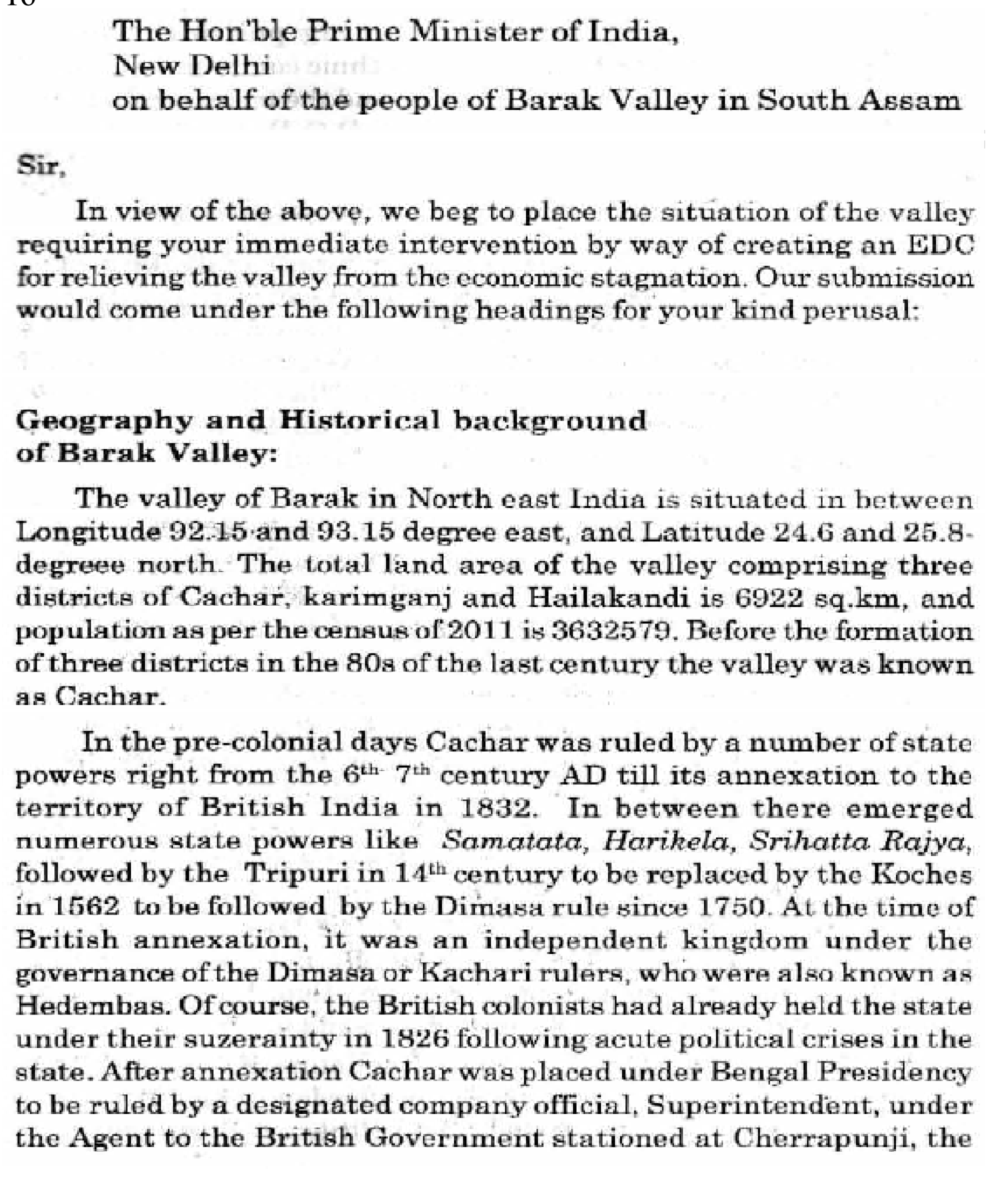

The Hon'ble Prime Minister of India,
New Delhi
on behalf of the people of Barak Valley in South Assam

Sir,

In view of the above, we beg to place the situation of the valley requiring your immediate intervention by way of creating an EDC for relieving the valley from the economic stagnation. Our submission would come under the following headings for your kind perusal:

Geography and Historical background of Barak Valley:

The valley of Barak in North east India is situated in between Longitude 92.15 and 93.15 degree east, and Latitude 24.6 and 25.8 degreee north. The total land area of the valley comprising three districts of Cachar, karimganj and Hailakandi is 6922 sq.km, and population as per the census of 2011 is 3632579. Before the formation of three districts in the 80s of the last century the valley was known as Cachar.

In the pre-colonial days Cachar was ruled by a number of state powers right from the 6th- 7th century AD till its annexation to the territory of British India in 1832. In between there emerged numerous state powers like *Samatata, Harikela, Srihatta Rajya*, followed by the Tripuri in 14th century to be replaced by the Koches in 1562 to be followed by the Dimasa rule since 1750. At the time of British annexation, it was an independent kingdom under the governance of the Dimasa or Kachari rulers, who were also known as Hedembas. Of course, the British colonists had already held the state under their suzerainty in 1826 following acute political crises in the state. After annexation Cachar was placed under Bengal Presidency to be ruled by a designated company official, Superintendent, under the Agent to the British Government stationed at Cherrapunji, the colonial headquarters in the north east. When Assam was reconstituted into a Chief Commissioners' state in 1874, Cachar was taken away from Bengal Presidency and tagged with Assam along with the adjoining district of Sylhet which had shared similar socio-economic-ethno-linguistic feature with Cachar with more or less same history of political transition too.

Barak valley is **geographically a natural extension of Gangetic Bengal** and as such the valley linguistically, culturally and ethnically is close to Bengal since the historical times.

In the colonial period Cachar and Sylhet were jointly termed as Surma valley division and at the time of partition of 1947 a greater portion of Surma valley was handed over to Pakistan, leaving a small portion of Karimganj subdivision of Sylhet district, and Hailakandi and Cachar within the territory of India. Thus the only natural opening with the mainland so as to the outer world had been closed to Cachar a place walled by the ranges of Barail in the other three sides.

The days following the fateful partition and independence Cachar continued to experience economic deterioration, political deprivation, social dispossession and cultural disintegration which have presently became more acute. The period following independence there were debates among people on the question of reconstitution of the territorial maps, representations made for creation of the province of Purbanchal, curving out a portion from the map of Assam, to the state reorganization commission, opinion generated for creation of separate state for Cachar, or for creation of a Union territory for Cachar. These all were to find out ways to see the hopes and aspirations of the people of the region fulfilled which were denied to them. The only administrative measure taken in this regard for proper administration of the area was to create the three districts in 1983 (Karimganj) and in 1989 (Hailakandi), notwithstanding the communication bottleneck, economic stagnation, and the political upper handedness of the forces at the mainland of the state.

Under the backdrop of prolonged discrimination in matters of allocation of funds, acute economic underdevelopment, severe unemployment, poor infra-structure facilities, non-utilization of natural and human resources, low GDP and Per Capita Income, lack of industrialization, low agricultural productivity, the high handedness of the political forces at the centre of the state, the disadvantaged, depressed people of the valley, irrespective of caste, creed, religion and language have resolved to move the government with a demand for creation of an **Economic Development Council** for their all-round development, to relieve the sufferings of the people meted out to them by the mindless political and bureaucratic forces without much dependence on the state capital at Dispur.

What the Economic Development Council is about?

The Economic Development Council, as demanded by the people of Barak Valley would be an autonomous council within the periphery of the state government. The council would monitor the planning and execution of the development projects by proper utilization of the funds received from the central and state government, from its various funding agencies.

Economic Development Council of Barak Valley

EDC and the provision in Constitution :

The Concept of an Economic Development Council is not altogether a new concept in this country, without its precedence. But whenever the question of a sort of separate council or autonomous body arises, particularly when demand for it raised by the people of the regions who experience economic backwardness, and who nourish a feeling of deprivation, the provision of 6th schedule [(Articles 244(2) and 275(1)] of the constitution of India comes up. In fact, the constitution in such situation provides for an autonomous council which may be constituted within the provincial government for administration of certain areas with a view to developing its economy having the power to formulate policy and see its implementation by a sort of council elected democratically without dependence on the state government. Of course, this provision is exclusively restricted to the tribal areas, particularly in the states of Assam, Meghalaya, Tripura and Mizoram.

Accordingly numerous autonomous councils were created in the Northeast in the past years. Notwithstanding the limitation of the provision of the constitution the Gorkha Hill Development Council created years ago in West Bengal which is outside the demarcated area (according to 6th schedule, art 470), and for that a constitutional amendment had to be made. Thereafter, in the heartland of Maharastra the Vidarbha Economic Development Council was constituted. The area covered by it is a non-tribal area and for the formation of the council in such a place necessary constitutional amendments had been made.

The Bodoland Territorial Council (BTC), the Karbi Anglong Autonomous Council, Dima Hasao Autonomous District Council in Assam; the Garo Hills Autonomous District Council, Jaintia Hills Autonomous District Council; Khasi Hills Autonomous District Council in Meghalaya; the Chakma Autonomous District Council, Lai Autonomous District Council, Mara Autonomous District Council in Mizoram; the Tripura Tribal Areas Autonomous District Council in the state of Tripura are example of such bodies. These were formed for the intensive administration and development of areas having peculiar geographical, demographical and economic features requiring administration by such autonomous bodies without dependence on the provincial governments which, it was felt, were not enough to cater to the needs of the areas.

From the above, it has become clear that, the provincial governments, particularly in the northeast India appear to be not enough to fulfil the needs of the people, may be because of its peculiar geographical features, ethnic, linguistic and demographic characters, and economic condition.

When it comes to the valley of Barak in South Assam, it is evident that in respect to its geographical position, communication hurdles, lack of development, and mainly in respect to its distance from the mainland, the valley has a similarity with the areas brought under the autonomous councils mentioned above, excepting the fact that, it is not a hilly area anyway notwithstanding the existence of tribal population in substantial figure in the peripheries.

Two points might be raised to rule out the possibility of the EDC on the ground of constitutional provision.

Firstly, The constitutional limitation to the tribal areas in the states of northeast (exclusiveness). It provides that such bodies should be restricted exclusively to the tribal areas, that too, in the northeast India. But the creation of Gorkha Development Council in West Bengal removes this hurdle by establishing a precedence. (for reference, The 107th Amendment Bill, 2007)

Moreover, in spite of the fact that, although the homeland of the Gorkhas in Darjeeling is located in the hills, the Gorkhas do not fall to the category of SC or ST. History has it that they had originated from the Hindu Rajputs and Brahmins in North India. It has been stated in the amendment that, "the original purpose of the Sixth Schedule was to provide autonomy to **the predominantly tribal areas of north-east India.** Thirteen per cent of the people living in Darjeeling district belong to Scheduled Tribes." The same source has it that, "Scheduled Castes constitute 16 per cent of the total population of Darjeeling". The substitution of the names of the state, like Assam, Meghalay etc collectively by '**north-east India**' to incorporate areas beyond the originally demarcated by the constitution may be noted for our present argument.

Also it must be kept in mind that although the Mishing, Rabha Hasang, Sonwal Kachari do not fall to the category of SC or ST, or their area located in the hills to come within the purview of the 6th schedule, yet conceding to the demand of the people the government of Assam had taken measures to form Mising Autonomous Council, Sonwal Kachari Autonomous Council, Rabha Autonomous Council and Tiwa Autonomous council. **Again, the creation of Vidarbha Development Council makes a precedence of such an autonomous body created beyond the territory assigned by the constitution.**

Secondly, the economic backwardness, the geographical isolation from the mainland, particularly from the provincial capital, suffered by the valley surrounded by hills on three sides and restricted by international border in another, absence of state government-initiative in improving the basic economic infra-structure, and general resentment about it, coupled with collective demand for a sort of autonomous body may be looked upon as a strong case for creation of such a body in Barak valley. If the constitution, however, does not support autonomous district council, the creation of Economic Development Council, however, receives constitutional sanction if the amendment for the creation of Vidarbha Economic Development Council be taken into consideration.

[Vidarbha is the eastern region of Maharashtra which despite its mineral, forest power resources is plagued by poverty, malnutrition leading to a situation of random suicide by the farmers. (the 70% among the 32,000 suicides recorded in in a decade has occurred in the 11 districts of Vidarbha region; this region is always underdeveloped because of the continuous dominance of the political leadership form the Western Maharashtra; similar situation also prevails in Barak Valley region of Assam.]

In the heartland of Maharastra the Vidarbha Economic Development Council is an example of a sort of autonomous body created in a non-tribal area and for the formation of the council necessary constitutional amendments had been made. **For the creation of the EDC for Barak valley this amendment should not therefore create any constitutional problem.**

Why this Economic Development Council:

In most of the cases, the need for creation of autonomous district councils or EDC has been felt only when the provincial government to which the areas belonged could not record proper and adequate development compared to the development in other areas. There has been public resentment and a feeling of deprivation, and people felt that their future was uncertain under the state government and demanded a sort of autonomy within the constitutional framework. In many cases, particularly in the northeast, people had taken recourse to agitation programmes, some of the agitations, however, had shown a tendency to violence even; of course, Barak valley has been an exception to it in this regard. But why the demand for an Economic Development Council came up from among the cross section of the people forming a platform under the aegis Barak Upatyaka Banga Sahitya O Sanskriti Sammelan joined by different linguistic, religious and ethnic factions in the valley? The reasons are many and the ways of its successful implementation are also wide open. We may recount the reasons and their justification as under:

1. **Slow Development:** Regarding the valley, it has become clear that during the last six decades after the Independence the development is extremely at a slow pace, and presently the prospect of development of its economy seems to be bleak. Following sixty-six years of independence without making any development, the basic infra-structure that was in existence as a legacy to colonial rule have been allowed to crumble, particularly since the sixties and seventies of the last century.

2. **Geographical feature**: Barak valley is located in an isolated area surrounded by Barail range in the northern and eastern areas, and in the south by the hills of Mizoram, and the only natural opening towards the outer world the valley has is the border of Bangladesh restricted by international rules and regulations. The century-old Hill Section of the railways has been partially withdrawn for BG conversion (in 1996), and the project has been left in the midst of uncertainty for 17 years, a very long time indeed in the 21st century; the century-old surface road, the National Highway No.44, passing through the hills of Meghalaya, prone to frequent disruption due to landslide is too old to sustain the pressure of traffic increased nearly by hundred times ; the completion of Silchar-Surat *Mahasarak* Project is a far away cry, while air travel is unaffordable to the majority.

3. **Communication problem responsible for underdevelopment :**

   (a) The constraints for development of Barak Valley is chiefly the communication bottleneck. More emphasis be given to the *Mahasarak Project* which could solve the major communication problem of the valley. But this project is also in the midst of uncertainties. In the excuse of Barail Wildlife sanctuary the work of Mahasarak in between Harangajhao to Balacherra (31 km) has been kept pending and as such the communication problem of the valley remained still unresolved even though the Mahasarak project has made a considerable progress in other areas. We would like to demand immediate solution of the problem and issuance of clearance by the Forest and Environment department at an early date.

(b) The Karimganj-Lakhipur route in the river of Barak via Badarpur has been declared as the Third National Waterways. But till date no positive step has been taken towards implementation of the project.

(c) In view of India's enhanced engagement with the ASEAN and as a follow up to the Look East Policy announced in 1992 India has sought transit facilities through as many as fifteen routes in Bangladesh. The rail and motor routes offered in the said Transit Treaty are (i) Akhaura-Agartala, Sabroom-Ramgarh, Bibir Bazar - Srimantapur, (ii) Belonia - Belonia, Betuli - Old Raghna Bazar, Chatlapur - Monu, (iii) Borosora - Borosora, Haluaghat - Ghasuapara, Sonamganj, (iv) Shellbazar, Tambali - Dawki, (v) Demagiri - Thegamukh, in addition to four in west Bengal. Surprisingly enough, Assam has been kept excluded from the proposed transit map. The **Sutarkandi - Sheola route in Karimganj district** of Assam is an obvious transit point for trade with Bangladesh. It is a natural opening for Barak Valley and Assam if we want to benefit from the proposed Transit Treaty. There is a growing mass demand in this Valley for inclusion of Sutarkandi in the Transit map. The Barak Valley, a proverbially backward region of the State, can be linked with the transnational goods movement for its economic emancipation through the transit route.

(d) The long waited BG conversion project has been kept pending to the utter inconvenience of the people of the Barak Valley. It is the demand of the mass people to see the speedy completion of the total project.

(e) The major inter district roads in the valley do not receive regular care and supervision and remain dented for years together, while the roads and streets under the local units of PWD hardly ever receive due attention, and hence do not serve the need of the people. It is due to the communication bottleneck no industry on private venture flourish and the routine venture on government initiative dwindle and decline. The pre-Independence Burma Oil Company and the ONGC project of the present time, the Cachar Sugar Mill, over three hundred numbers of tea industry, the food processing industry, the Seri-culture industry, the handloom, handcraft and cane industry are some such cases; even the Hindustan Paper Corporation at Panchgram is in a sinking state.

4. **A Food-deficit Valley**: The valley had once been buffer in respect to paddies, but now it is a food- deficit region and has to depend on importation. The agriculture is still at the mercy of nature, and with the uncertainties in rainfall the valley stands almost on single cropping. The government record has it that only 0.2% of irrigation facilities extended to 3.5 lac hectors of net cropped area. No modern techno-based cultivation introduced to cope with the need of the growing population, and the valley experiences seasonal unemployment, and in some cases permanent agricultural unemployment; the cultivation of jute plants, *kharif* crops, mustard seed, sugar cane, cotton, pulses etc receive no institutional patronage; the tea industry which had flourished in the second half of 19th century, had received international acclaim at one time, but the six decades following Independence the industry witnessed steady decrease in number, and continuous sickening. The power shortage, the absence of local auction market, high cost of transportation of produces to the distant market, and absence of administrative support in matters relating to security offer serious blow to this industry, which is highly labour intensive, but presently fails to provide sustenance to the economy of the valley.

5. **Increase of Population**: Sandwiched by the hills and international borders, this densely populated valley (according to 2001 Census the population of the valley was 31, 33,366, and the recent population has exceeded 35 lacs) is a 'distinct culture zone', which had its continuity with the adjoining Sylhet portion of present Bangladesh which, however, has been closed for good by having the entire Sylhet district of Assam including a portion of Karimganj transferred to the erstwhile Pakistan at the time of independence. This transfer, besides snapping the natural

route to the outer world, had reduced the number of representation of the valley in the State Legislature of Assam; moreover the fateful partition had increased the population of the valley by having to accommodate the citizens of the undivided Assam (India) expatriated from their homes, particularly who were not ready to accept their fate in a theocratic state of Pakistan, when there was a choice to a secular democratic country across the border, which was once their own too. This increase of population has gone beyond the sustainable limit, and the problem was never addressed with earnest sincerity by the government during the last sixty-six years. Due to population growth new settlements emerged, forest depleted, agricultural land shrank in size. The fate of the valley has been left undecided and the economy was left alone to dwindle and decline.

6. **Lack of Industrialization**: There has not been any integrated approach towards industrialization of the Barak valley initiated by the state Government. The almost exhausted tea industry still has been continuing to flush the capital out of the valley like it did during the colonial rule (to England) and no reinvestment of capital in any subsidiary industry that should have developed could ever be initiated. This industry, however, could make little contribution to the local economy as, excepting for the land all the other three factors of production—labour, capital and organization were from outside.

7. **Employment-oriented micro-development sector neglected :**

   To cite a few instances, we may point out the case of *Pan leaves* growers. It is known that these leaves have medicinal value and the growers will benefit if produced properly for preparation of enzymes etc. Again, a survey reveals that more than fifty medicinal plants are available in the valley, but for want of initiative the growers are not interested in it. But if due incentive is given to them at least twenty pharmaceutical industries could be established in the valley.

   Cotton is also available in plenty in the valley. But due to lack of patronage it remains economically unutilized. We believe at least two textile industries could be established in the valley with the available raw materials in the valley.

Besides, a carpet industry could also be established from the husks of paddy. Similarly, small industries could be developed by using the husks of betel nut and coconut trees, generating employment opportunities.

Manipuris and other tribal people are very much skilful in weaving handloom. But this industry is also in a dire state for want of patronage. Very little production is there. The same is the case with sericulture which also needs serious attention.

Other industries, such as bamboo, cane etc., also could be established with other available resources.

8. **Inter and intra district Communication**: The lack of development-planning and its implementation resulted in stagnation and deterioration of the economy of the valley in many fronts. The condition of the routes towards the outer world have already been referred to, the inter district routes –Silchar Karimganj, Silchar-Hailakandi, the VIP road towards the air-port at Kumbhirgram in Cachar, the road towards Medical College, NIT, and Assam University, the road to NC Hills, the Kalain-Silchar road via Barkhola (covering the Gas Bottling plant), the Silchar Binnakandi Road via Sonai, the Silchar-Dholai-Bhaga road via Sonabarighat, the Karimganj-Patharkandi road via Nilambazar leading towards Tripura, the Karimgani-Badarpur road, the karimganj-Dullabchera road, the Karimgani-Latu road, and many more roads within the towns and municipalities, and within the Gram Panchyats—all these are in a deplorable condition. It seems there is hardly any provision for regular maintenance and major re-construction of the roads; the people of the valley have to take recourse to strikes and bandhs intermittently just to see the roads temporarily mended when they are almost condemned. Record has it that the state government could never maintain and supervise the roads in the valley or arrange for timely allocations of fund in that head and proper utilization of the same.

9. **Power and Energy**: The local sources of energy-generation—the hydel or thermal or/ including solar energy have not been exploited, even the lone Gas-based power generation project at Banskandi in Cachar and Adamtilla in Karimganj could not be properly developed; hence, the power supply obtained from outside has always been short of the requirement even for domestic consumption, no question of satisfying the demands of the medium, small cottage industries, printing press, motor repairing garages, different food industries, saw mills, rice mills, jewelries, general grocery shops and stationeries. Because of this power problem, no corporate investors ventured any project in the valley despite abundant human and natural resources.

10. **Look East Policy:** The State government have failed to realize the importance of the valley in terms of its geographical location, particularly with reference to the proposed 'Look East' policy undertaken by the Government of India and the proposal of the Trans-Asian Railway, the implementation of which requires development and reorganization of the basic infrastructure in the valley where five of the seven states in the Northeast (namely Meghalaya, Mizoram, Tripura, Manipur, and of course, Assam) meet, in addition to its sharing the international border with Bangladesh in the west and with Mayanmar in the east providing access to the Southeast Asia.

It may also be noted that the Government of India has a proposal to wrap up transit transport agreement by 2015 for the movement of goods and passengers with the neighbouring South East Asian countries. For implementation of the same a trilateral highway connectivity project is proposed to be undertaken by 2016. Also, we gather, a maritime transit transport is on the proposed project, and a discussion on the issues in the forum, ASEAN Connectivity Coordination Committee in India has been started. We may humbly remind the Prime Minister of India his own proposal on the extension of highway to Cambodia, Laos PDR and Vietnam, and in this connection his suggestion on the corridors, and on the Special Economic Zone.

The proposed Development Council for Barak Valley fits well with the governments' proposal towards extension of South East Asian connectivity covering the southern part of Assam when the Barak Valley geographically stands at a very important juncture particularly in this connection.

11. **Railways**: The inter-district railways have been allowed to dwindle without proper maintenance and supervision or regular intervention by the state government Nobody ever cares why the railway stations in the valley are being closed one by one, the trains are ill-timed, ill maintained, no amenities offered to the passengers, no security given. The Martin and Haris Company had brought almost the entire valley of Barak within the railway network, but the period following Independence witnessed mis-management leading to continuous loss, slow abandonment of tracks, and no new extension within the valley to lessen the excess of dependence on the motor roads. It never occurred to the state government that the railways could be moved just with a proposal to introduce some meter-gauge to cover the eastern bank of Barak or link Silchar with Jaypur-Rajabazar in one, and with Sonai Bhaga Dholai or with Medical College-NIT, Assam University.

12. **Condition of existing industries**: The industry which was within the purview of the state government never received due attention, and in spite of extensive field for cultivation of sugar cane, the only Sugar Mill at Chorgola in Karimganj has been allowed to decay and become non-functional. Before the establishment of Hindustan Paper Mill at Panchgram, that was the lone industrial enterprise by the government of Assam. Of course, Paper Mill is neither funded by the state government nor managed by it, but the only support it could offer to it by way of arranging steady supply of raw materials, and by providing adequate security was not given, and hence the industry is sinking slowly. Depending on the waste materials subsidiary industries could be built by the state government, but no attention has ever been given to it. A valley comprising three districts without industrialization is surely a case of state governments' apathy. It is perhaps too late for the government

to make amends, and hence an EDC could be the only alternative to it.

13. **Five Year Plan:** The valley of Barak has never found place in the Five year Planning and its fate solely depended on the mercy of Shillong, and thereafter on Dispur. Besides the much-lauded Agricultural Package Program in the sixties no developmental program could be undertaken at the government initiative, and that too, without its follow up action failed to bring the desired result. Recently the much publicized '1000 Crore Development Allocation' remained beyond the reach of the people following two consecutive elections. The 60% of the people in the valley are living Below the Poverty Line. As per Central Government and State Government records Barak Valley pays more than 250 Crores per year as direct and indirect tax to the central and state government, but the fund allocation to the valley is not in proportion to the tax paid.

14. **Service Sector**: The service sector is in no way appreciable. The supply, health, education, management of municipality and panchyat suffer from mis- management and gross negligence. Supply of essential food items in an isolated valley frequently cut off from the rest of the country is uncertain, and the price is virtually never controlled by any government agency. The Co-operatives do not cater to the needs of the people. Kerosene, cooking gas, sugar could be purchased from black market, but very scarce in supply. Same is the case with Civil Hospital and Primary Health Centres under the state Government. Shortage of staff from high officials to the grade IV workers, shortage of medicine and other equipments, maintenance of the buildings including staff quarters is a great problem. The para-medical units in the PHCs are mismanaged, and as such there emerged numerous diagnostic centres and its sub-centres throughout the valley before the nose of the administration to the great health hazard of the people. The only Medical College in the valley is constantly under the threat of losing affiliation of the AIMC. How could the people of the valley rely on the existing system under the state government?

The only institution for Technical Education under the state government, the 'Silchar Poly-technique' is carrying on with almost dilapidated buildings, factories, laboratories, out-dated equipments, insufficient furniture, and acute shortage of staff. While most of such institutions in the state have been modernized, computerized and its infra-structure up-dated in international standard the Silchar Politechnique is crawling in the standard of sixties. The Veterinary Training institute at Silchar, Gungoor, the Krishi Vignan Kendra at Masimpur, in Cachar, the Regional Agricultural Research Centre at Akbarpur, in Karimganj, the *Vignan Mandir* at Hailakandi— these all are left uncared, with shortage of staff, utterly neglected with no benefit to the agriculture except flushing out money from the government exchequer pocketed by certain nominal employees and men in high places. The lone institute of Tea Technology and tea research is also in a dying stage if not already dead, of course, retaining ways for draining out the meagre fund still allocated for it. Under the state government, it appears, things would never improve.

15 **Education**: Coming over to the general education, the Law College, BT College, the DIETs, Normal School hardly receive any attention, and as such private institutions, institutions controlled by private universities, open universities etc are flowrishing. But these were never discussed in the state assembly or any action taken in this regard. It is due to administrative negligence the non-affiliated, illegal profiteering pseudo academic institutions, fake universities are having a field day in the valley.

To come to the management of primary, middle, high and higher secondary education in the valley, most of the officers deployed do not have an access to the major language in the valley, Bengali, no question of any passing idea of Manipuri, Dimasa, Bishnupriya Manipuri language spoken by a sizable number of learners and teachers in the valley. The fund from Sarba Shiksha Mission,/ RMSA and other agencies are subjected to random misuse with nobody to monitor it or inspect the ways of its utilization.

In respect to appointment of teaching staff, due to absence of any monitoring cell, very often teachers are appointed in the schools of the valley from other parts of the state with no knowledge of the Bengali language, which is the medium of instruction in the valley. For the state government it has never been possible to look into the minute details of the matter and the result is horrible.

In the past decades almost all the public libraries and public halls in the valley have been allowed to decay with no ways of updating the stocks, filling the vacant posts of librarian, asstt librarian, clerk, or peon, or repairing/ reconstructing the library house be it District library in Silchar, Hailakandi or Karimganj, or the state library under the town committee. The district auditoriums which are a source of revenue to the government have been left unattended, unrepaired to the utter inconvenience of the people in organizing socio-cultural-educational programs.

16. **Forest and Conservation** : The negligence towards forest and its conservation, wasteland, wet-land have paused a serious threat to the ecology of the valley. The bamboos, valuable trees, canes were destroyed violating the rules and regulations, making the wild forest in Bhuban hills, Barail hills or in Chatachura, Mohonpur, Saraspur almost bare which disturbs the ecological balance, the monsoon and slowly leading the valley towards the process of deforestation with nobody to look after it. Environmentalists have already expressed apprehension on the shortage of groundwater in the valley, along with acute shortage of timely rainfall, increased heat and cold.

The forest department suffers acute shortage of staff leading to the increased activities of poachers, hunters and illicit wild life traders operating in the inter-state and international borders, in addition to the illegal activities of timber merchants. The valley with two important reserve forests has to get on without any trained naturalist/herpetologist who could avoid unnecessary killing of valuable snakes and other animals. The proposed animal sanctuary in the Barail hill in Cachar is still in its initial stage, just to provide an excuse to lengthen the process of permission to the *Mahasarak project* to continue its work.

The earth filling in the wet-land near the urban and sub-urban areas, the merciless destruction of hills and hillocks for collection of soil for earth filling is having a far reaching impact in the environment of the valley. These are the examples of gross negligence of the government to the future of the valley.

The important water bodies, the *Ratabil*, *Shonbil*, the numerous *haors* of the valley do not receive the government attention. These could be centre of tourist attraction, and profitable centres of fish production and trading.

17. **Tourism**: There is nobody to look into the prospect of natural tourist resorts that could be built in spite of all the communication hurdles. The historical relics, the monuments, the ancient holy shrines could be converted into great tourist spots with some investment and care; there are safe spots for water-resort, adventure tourism, ample opportunity for folk-tourism which could be planned only by the persons who have experience and a feeling for the valley. Development council is the only answer to it.

The people of the valley had been silently suffering the negligence for the last six decades. Their patience and commitment were never rewarded. Due to government apathy a very potential region has been reduced to the state of stagnation. When the entire Northeast burnt with the fire of distrust, secessationist antagonism, when several groups expressing desire to break away with the provincial bond, even with the national bond, when numerous groups have taken recourse to violence, even sabotage activities to press their demand, the people of Barak valley remained committed to peace and to the ideal of nationalism.

18. **Human resource deprivation**: Barak valley is afflicted with the problem of unemployment both in agricultural as well as in non-agricultural sectors, in tea industry, in the private industrial sectors. The skilled artisans are under-employed in the private sectors. The great population force could easily be turned into labour force if the initiative is taken for development of small and medium industries.

19. **Flood:** The people of Barak valley have been experiencing regular devastation due to wrong management of water resources, unscientific works by the flood control department. The river bed is rising steadily, the low and wetlands are being brought under human use, the water bodies are disturbed in so many ways unnoticed by the government, and residential areas both in urban as well as rural areas get submerged easily in the rainy season.

It is time the government had come forward to concede to the just demand of the people of Barak Valley for an Economic Development Council for redressal of all the socio-economic deprivations meted out to them since Independence.

The Demand for EDC:

In a convention held at Karimganj on 18 December, 2005, the multi-lingual forum, Bahu Bhashik Samannya Samiti under the aegis of Barak Upatyak Banga Sahitya O Sanskritik Sammelan an unanimous resolution was adopted to move the government with the demand for an EDC for the overall economic development of the valley comprising three districts of Cachar, Karimganj and Hailakandi, and save the economy of the valley from further degradation under the administration of the provincial government of Assam. A memorandum has been forwarded to the Hon'ble Prime Minister, India, through the DCs of the three districts dated 14th August, 2006 signed by:

C.Nilkanta Singha, D.Mongimba Singha, N.Dhananjay Sinha, Debendra Sinha, Chandra Kanta Sinha, Uday Sinha, Suresh Chandra Dwibedi, Babul Naraya Kanu, Rabi Nunia, Mukul Ranjan Barman, Biswajyoti Barman, Edenlal Chorei, Stephen Chorei, Fonidhar Chorei, Rajdhan Gurung, Bijay Chetri, Bhakta Sing Thakuri, Dinendra Narayan Biswas, Janmajit Roy, Nitish Bhattacharjee, Shyamalendu Chakrabarty, Tarun Das, the Representatives of the Manipuri Sahitya Parishad, Nikhil Bishnupriya Manipuri Mahasabha, Barak Hindi Sahitya Samiti, Dimasa Sahitya Sabha, District Tribes Union, Gurkha Dukka Nibarak Samiti, and Barak Upatyak Banga Sahitya O Sanskriti Sammelan.

Thereafter, numerous districtwise conference held on the issue followed by a convention at Karimganj on 30 September, 2012, attended by general public representing linguistic and religious groups of the people of the valley, and representatives of major political parties viz, Congress, BJP, AIUDF, CPM, CPI, including a number of present and former MLAs, and the same demand has been moved.

Meanwhile, the Sammelan had sent representatives in the Seminar, entitled Development Strategies for Barak Valley (Assam) held jointly by the Deptt. of Economics, Assam University and Institute of Northeast India Studies at the Campus of Assam University on 29 April, 2008 to state the case of Barak valley justifying the demand for an EDC which received the support of the leading Economists and social scientists.

Memo to PM, HM, CM :

On 25 April, 2013 a delegate visited the CM, Assam, Sri Tarun Gogoi, and placed the demand for creation of the EDC for Barak valley. In the recent past the Government of Assam realizing the inadequacy of the machinery of the state government and conceding to the demands of the people had constituted the Bodo Territorial Council, reconstituted North Cachar Hill Council as Dima Hasao District Council, Karbi Anglong District Council and numerous other councils, without giving attention to the just demand of the peaceful valley of Barak.

Presently, when the northeast India is rife with the demand for separate statehood from numerous factions, the most deprived, neglected and disadvantaged valley of Barak, without subscribing to the separatist view demanded an EDC. The peaceful people of the valley, deprived since the Independence would be bound to react adversely if this demand is not given due attention before it is too late.

An Outline of the EDC:

Nomenclature : The proposed EDC would be named Economic Development Council for Barak Valley, Assam.

Composition : The EDC would comprise the following body/ members/designations:

1. General Council
2. Chairman
3. Vice-Chairman
4. Executive Committee
5. Speaker
6. Deputy Speaker

The Council shall be formed by:

i. The MLAs, MPs, Chairpersons of Zila Parishad, Chairpersons of Municipalities or Town committees. They will elect the Chairman.

ii. The tenure of the session, the periodicity of the session may be determined thereafter keeping conformity with the sessions in assembly or parliament.

Secretariat and Secretary : There shall be a secretariat consisting of different branches covering all the administrative, planning and developmental sides of the EDC.

The Central Government shall appoint a Secretary from among the IAS category with adequate knowledge about the peculiar geographical, demographic, ethnic, linguistic feature of the valley along with considerable access to the major language (s) of the valley.

Planning Cell : There shall be a Planning Cell attached to the EDC, constituted by the competent experts who shall be government officials.

The objectives of the EDC:

To search for the weak economic spots, to initiate need-based macro or micro- plans, examine their feasibility, approve and implement them. These plans, however, will be in addition to the other plans of the State and Central government for the valley. The NEC model shall be followed.

Funding:

The Funding of the plans prepared and approved by the EDC shall be done by the Central Government. The Central Government shall directly handover the plan-money etc., to the EDC. Also the Expenditure of the EDC shall be borne by the Central Government

Advisory Committee:

There shall be an advisory committee to the EDC with the following members:

a. The representatives of different linguistic communities who are the constituents of the Barak Upatyaka Bahubhashik Samannay Samiti.

b. The presidents of the Zila Parishads of the three districts of the Barak valley, and other constituents of Panchyat Raj institution.

c. The Chairpersons of the Municipalities/ Town committees in Barak valley.

d. A representative from Assam University, Silchar.

e. Three DCs of the three districts of the valley.

The President and Secretary of the Advisory Committee:

The president and Secretary of the Barak Upatyaka Bahubhashik Samanway Samiti shall be the president and secretary of the Advisory Committee of the EDC respectively.

The Central Government by order shall constitute the Advisory Committee. The Advisory Committee shall have statutory power to act.

The Secretary of the Advisory Committee shall convene the meeting of the committee as and when necessary. There shall be at least two sittings of the Advisory Committee a year.

The expenditure of the Advisory Committee shall be met by the Central government.

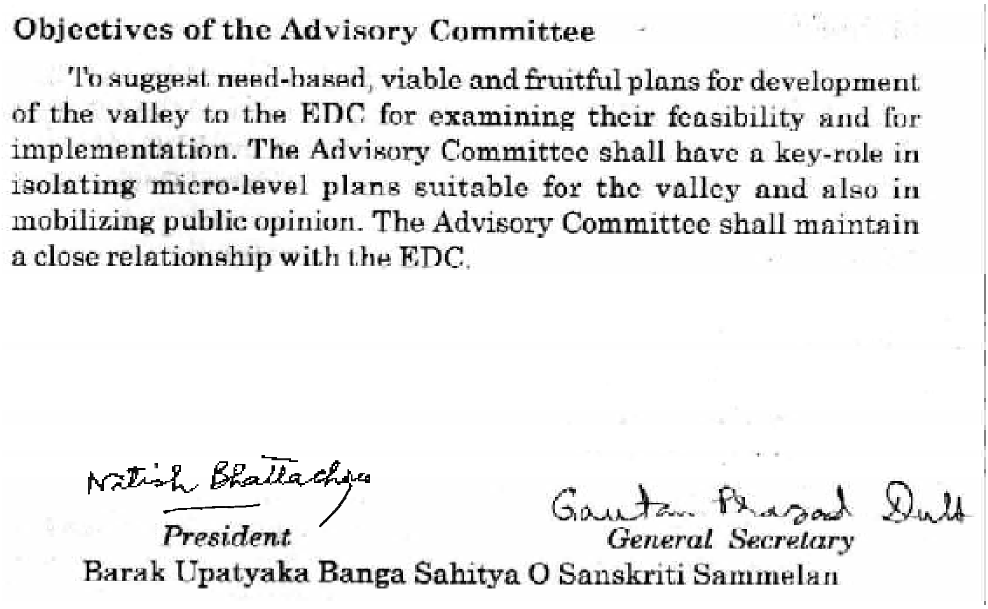

Objectives of the Advisory Committee

To suggest need-based, viable and fruitful plans for development of the valley to the EDC for examining their feasibility and for implementation. The Advisory Committee shall have a key-role in isolating micro-level plans suitable for the valley and also in mobilizing public opinion. The Advisory Committee shall maintain a close relationship with the EDC.

Nitish Bhattacharya
President

Gautam Prasad Dutt
General Secretary

Barak Upatyaka Banga Sahitya O Sanskriti Sammelan

ক্রোড়পত্র : ৩

Synopsis on Revival of Cachar Paper Mill & Struggle of JACRU

The Hindustan Paper Corporation Ltd. established by the Govt. of India followed by a decision passed by the Parliament on 29th May 1970 aiming to achieve various purposes includes self-reliance in own & indigenous paper production to reduce import of Paper, Economic Development & Employment Generation in the Industrially & economically diffident region of North East, accordingly two Heavy Paper Industries came into existence of which the Cachar Paper Mill started Commercial Production w.e.f. 1 April 1988 & Nagaon Paper Mill started commercial Production w.e.f. 1 April 1985. Undoubtedly, both the Paper Heavy Industries were playing fundamental and vital role for providing large scale employment in the remotest part of North East and for uplifting of socio-economic development in Industrially & Economically backward state Assam. The successful installation of the Heavy industries was also accelerated to ensure large scale employment of unemployed youths as all knew that in 1970 to 80 there were serious social turmoil including extremism in entire NE region particularly in the state of Assam and the unemployed youths were being attracted in separatist movement which caused serious threats to the National interest. Under such critical circumstances the GOI strategically decided to ensure large scale employment for the youths and installed two heavy paper industries in the state to ensure large scale employment and for socio-economic development in national interest, indisputably, there was no business motive or policy to earn profit. However, HPCL Paper industries achieved tremendous success not only in providing large scale employment & socio-economic development but also established as a dividend paying profit making organization and paid dividend to GOI till 2008- 09 and Ornamented with scheduled "A" and Mini Ratna Status by the Govt. of India.

Regretfully, the situation instigated with deterioration of Performance of the Industries for some external reasons like Gregarious Bamboo flowering causing raw material crisis in the North East particularly in Mizoram, a major source of main raw material "BAMBOO" discontinued and simultaneously imposition of Blanket embargo by National Green Tribunal (NGT) on transportation of coal from Meghalaya. The raw material crisis imposed serious obstacle on the way of Production of Cachar Paper Mill due to non- availability of BG railway connectivity in Barak Valley, enforced abnormal increase in transportation cost both on inbound & outgoing finished product, also coupled with overall unprofessional conduct by management wholly Administered and Controlled by the Government of India resulted diminishing production substantially. These issues were repeatedly raised in all related forums and also presented before NITI Aayog, Hon'ble Prime Minister, Hon'ble Union Minister of Heavy Industries, Hon'ble Union Minister of Finance, Hon'ble Chief Minister of Assam and Knowingly, though all authorities has repeatedly assured revival of the Industries nothing experienced on the ground and all commitment made for the people of Barak Valley turned to falsehood. On the contrary, the Govt. of India discontinued grant of Transport Subsidy earlier available for Cachar Paper Mill w.e.f. April 2016 resulted complete destabilization of the Financial Structure & Functioning of the Industries. We being the Representative of the Workers raised these issues before all

Leaders of the Ruling Party but all our efforts went on vain. and finally the production of both the industries i.e. Cachar & Nagaon Paper Mill suspended w.e.f. October 2015 & March 2017 respectively on a plea of dearth of WORKING CAPITAL. Allegedly, this was done under serious conspiracy to extend unethical benefits to private paper industries.

Who were attempting to increase the price of paper monopolistically in domestic market and the fact can be easily understood that while Per Ton of paper sold by HPC in competitive market was @ Rs. 49,000/- is now being sold by private owner @ Rs. 95,000/- to 12,00,000/- per MT after suspension of production of paper mills. The rate of paper abnormally increased as there is no competition for stabilizing the market price as HPCL paper has been successfully thrown out from market to impose monopolistic price on the People, moreso, India is importing paper from China, Indonesia, Bangladesh to meet Domestic requirements & factually India is now a BIDESH NIRVAR BHARAT in the guise of ATMANIVAR BHARAT. On repeated occasions we have demanded an independent inquiry to find out unholy nexus if nay behind the suspension of production at paper Mill, but nothing could be achieved as Govt. did not desire to digout the truths behind the screen.

The people of the region received immense pleasures while in reply to a question raised by Hon'ble MP (LS) Shri Gourav Gogoi in the Lok Sabha (Q.No. 262) on 21/3/2017, Supplemented by Kumari Sushmita Dev, Hon'ble MP (LS) & Hon'ble Minister of HI&PE Shri Anant G Geete declared that the revival proposal of HPCL has been already presented before the Cabinet for approval and the same would be approved very soon, knowing this truth the entire region taken a safe breath and again recollected the commitment made before huge rally by Hon'ble Prime Minister of India on 27/3/2016 at Kalinagar near Cachar Paper Mill and on 08/4/ 2016 at Roha near Nagaon Paper Mill and people realized that the commitment made by Hon'ble PM is going to be fulfilled very soon.

What is most unfortunate that reportedly the proposed initiatives and revival plan of HPCL was being delayed year after years might be due to designed conspiracy of the private parties & import lobby as a result the Financial as well as physical condition of the Industries deteriorated day by day as the production of both the mills suspended on the plea & pretext of dearth of Working Capital resulted debarring the source of employment of two lac people of the region.

By this time the Govt. of India enacted new law named Insolvency & Bankruptcy Code 2016 and taking shelter of the new law one vendor of HPC Nagaon Paper Mill went to National Company Law Tribunal, New Delhi Bench for realization of his Rs. 98 Lacs (Ninety Eight Lacs) Claims, and it is obnoxiously deplorable that the present regime of the Govt. of India failed, rather refused to settle the claim of only Rs. 98 Lacs & NCLT Ordered Liquidation of entire Organization on which livelihood of two lac people was depended, We challenged the Order of NCLT at Appellate Tribunal NCLAT & Hon'ble NCLAT ordered to ensure that the company to remain a going concern vides order dated 29-05-2019.

Surprisingly, on 09-07-2019 while replying a Question of Hon'ble MP, Sri Manish Tiwari, the Minister of Heavy Industries & Public Enterprises Sri Arabind Ganapat Sawant placed a written reply in Parliament that the Govt. of India already invested Rs. 4,141 Crs. in Hindustan Paper Corporation Ltd within the accounting year from 2014-15 to 2017-18, Paradoxically, it was a Bolt from the Blue for Citizens of Assam because during same period both the Industries remain inoperative, around 100 (hundred) workers died under various compelling circumstances due to nonpayment of salary though the Government unveiled investment such huge Rs 4141 Crs, a Hue & Cry exploded in the sentiment of the people who desired to know where the funds has gone? Repeated demands been raised from various corners but till date no answer received & the fund so claimed as invested remained in camera never seen light of the Day.

We under the banner of HPC Revival Committee & Joint Action Committee of Recognized Unions (JACRU) of Cachar & Nagaon Paper Mills, continuing relentless struggle in both Barak & Brahmaputra Valley since last 7-8 years with active participation & co-operation of the citizens irrespective of their political identities, series of agitations resorted includes Rail Rokho, National Highway Blockade, Barak Bandh, Religious Candle March, Hunger strikes to justify our legitimate Demands and ultimately in last few months the Govt. of Assam under the Leadership of Dr. Himanta Biswa Sarma realizing the sentiment of the people decided to intervene into the matter and came forward for discussion on the issues and after series of discussion an MoU signed on 28-09-2021, accordingly assurances has been given by the Hon'ble Chief Minister to Revive the Cachar Paper Mill along with release of relief package for rescue of the dying workers.

JACRU reveals & strives for resolution of the issues enumerated herein below:-

1. While the Government of India under the leadership of Hon'ble Prime Minister Shri Narendra Modi committed for generation of large scale employment aiming to extend employment opportunity to unemployed youth of the North East, revival of HPCL paper mills operating in NER (ASSAM) is inevitable as no industry other than Paper Industry of HPCL is capable to extend such large scale employment in Rural Area as such delaying or disturbing the immediate revival of the HPC's Paper Industry would tantamount to abolition of employment opportunity & destruction of source of income of the people of Rural Area & Rural Economy. Undoubtedly, generation of employment literally means "Protection of Existing and creation of new opportunity" thus Policy of "Save Existing and create New" will meet the commitment of the Government rather abolish the existing and create nothing, thus revival of Cachar Paper mill will bring back the socio-economy growth not only of Barak valley but will be a step forward towards "ATHMANIRVAR BHARAT".
2. It is the ugly and hideous truth that since independence of India there is no instance that any private party infused funds in NER for large scale industrial installation and employment generation. While NER is still passing through various social, economical turmoil and logistical disruption finding negative response to invest in HPCL, any attempt to hand over the Industries to any private entity would invite nothing but killing time and may be detrimental to the existing industries and may further erode the Net-worth of the corporation besides infusing serious social disorder and chaos arising out of sudden unemployment caused due to non-functioning of the industries. It may be mentioned here that Ashok Paper Mill of Assam was earlier privatized but the Industry is dead now. Hence, delay in decision by the concerned authorities of the government to revive the Industry is nothing but elimination of Industry from the State of Assam, naturally, we are striving for revival of Cachar Paper Mill keeping it with PSU (Public Sector Undertaking).
3. The per capita paper consumption in India is increasing rapidly and would be enhanced up to 57% (approx) within 2024 but production and supply to meet the requirement is

not increasing in the country as such there would be tremendous mismatch between demand and supply, accordingly the country would be compelled to import more paper from foreign Countries for meeting domestic requirement at the cost of draining foreign currency, whereas revival of these two heavy paper industry of NER will not only support supply segment to mitigate demand & supply mismatch and will control the monopolistic price hike impact but also will gain higher market share and profitability to a large extent, moreover, the objectives of the Government related to large scale employment generation and socio-economic development of industrially & economically backward region NER would be achieved to fulfill the commitment made by Hon'ble Prime Minister of our country.

4. That the Cachar and Nagaon Paper Mill is highly and absolutely viable industries as because the regeneration process of major raw material i.e. Bamboo is completed and there would be no raw material crisis in next 50 (Fifty) years because bamboo flowering eventually occurs in 50 (Fifty) years span, moreover, Board Gauge railway connectivity completed connecting Barak Valley, more so, Cachar Paper Mill is now directly connected with BG railway network of the country, therefore, Transportation of inbound raw material and outbound finished product would be more cheaper and competitive and since the product of the industry has huge market demands for its proven quality benchmark higher realization and profitability is assured. The need of the hour is total quality management under strict monitoring form the Government with policy driven governance.
5. The people who are closely attached & associated with the industry and its machineries are confident that if proper maintenance, refurbishment done and backup raw materials are provided uninterruptedly with quality management and planning these Industries may achieve 100% capacity utilization within 15 days from the date of start up of the Mill and positive contribution would be generated within six months to pay back the support so infused for revival.
6. The Citizen of the state on repeated occasions expressed serious disquiet that the Working Class people of the Corporation has been victimized by inhuman torture as the salary were not being paid since 2017 resulted premature death of 109 workers as on date under various compelling circumstances, the students who were in higher education were being compelled to leave their study as their parents are not in a position to meet education expenses owing to nonpayment of wages, the statutory dues related to Provident Fund, LIC etc. though deducted from the salary were not being remitted to the employees account which is a serious criminal offence as per Law of the Land, the Banks were issuing property attachment notice due to failure of EMI remittance on loan by the Employees, the employees family are not getting death benefit from LIC in cases of employees death while in service as their premium has not been deposited by the Management beside deducting the same from the salary, the employees who are retiring from the service are not being paid retirement benefits by the management. These are the horrible and atrocious conditions of the employees who were being compelled to choose suicide to death or premature death on inhuman psychological torture, during these long sufferings & struggles the elected representatives of Ruling party of the locality remain silent & establish their real inefficiencies to resolve the crisis which would be remembered for ever. However, It is indeed appreciable that Dr. Himanta Biswa Sarma,

being the Chief Minister of Assam could realized the critical situations & decided to come forward to extend humanitarian aids to save lives of the workers and finalized a "RELIEF PACKAGE" for rescue of the workers & an MoU signed on 28-09-2021.

7. We are confident, the MoU reached between the Government of Assam under the Leadership of Hon'ble Chief Minister of Assam, Dr. Himanta Biswa Sarma & Unions / Associations of HPCL would be honoured in its letter & Spirit and the Relief Package so agreed for rescue of the workers would be implemented including revival of Cachar Paper Mill so declared. The Citizens of the region is eagerly waiting for the days while the dream of revival of the only heavy industrial assets of the valley would revealed as reality.
8. UNRESOLVED MISTRY: The Government which could not pay only Rs. 98 Lacs in 2019 & allowed Liquidation of the entire organization, HPCL, has paid Rs. 375 Crs, to take over entire assets of Cachar & Nagaon Paper Mills in 2022.

We on behalf of JACRU therefore, sturdily urges upon the GOI to extend salary support and release all statutory dues for the workers & employees till revival of the Industries took place so that the workers & employees may survive who are in serious danger due to nonpayment of their wages and statutory dues and approve the pending

Revival package of Paper Mills of Assam to support the Govt. of Assam which has already taken over the Paper Mills & committed revival of the industries.

Our Prime issues are:-

1. The JACRU demands immediate revival of Cachar & Nagaon Paper Mill keeping CPSE/ PSU status intact and opposes any form of privatization.
2. Start recruitment of local unemployed youth to fill vacancies.
3. Initiate in-depth independent inquiry to find out intension behind suspension of production of Cachar & Nagaon Paper Mill which resulted direct benefits to private paper industries & import lobbies along with abnormal enhancement of the price of paper and imposed monopolistic control over Paper Market.
4. JACRU demands Release of WHITE PAPER on Investment of Rs. 4141 Crs. so declared in the Parliament to find out where the huge investment has gone?
5. JACRU reaffirms its continuous struggle till the industries are revived & all the legitimate dues are released for full settlement.

With Revolutionary Salutes,

Manabendra Chakraborty,
President, JACRU,
Cachar & Nagaon Paper Mill,
Assam. Date: 30-09-2022

ক্রোড়পত্র : ৪

Chief Minister's Statement on Barak (1)

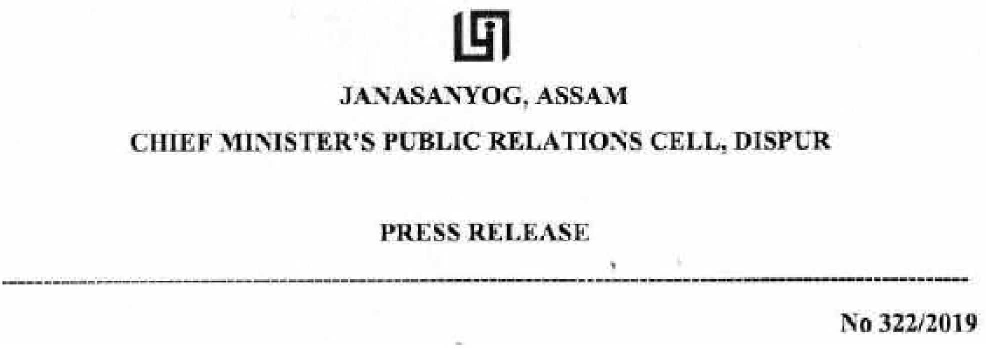

JANASANYOG, ASSAM

CHIEF MINISTER'S PUBLIC RELATIONS CELL, DISPUR

PRESS RELEASE

No 322/2019

CM takes part in Speaker's initiative at Assam Legislative Assembly

Govt. committed to equal development of Brahmaputra and Barak valley

Dispur, July 27: Chief Minister Sarbananda Sonowal today said that the State government is committed to equal development of Brahmaputra and Barak valley and several steps have been taken to boost brotherhood amongst the people living in the districts of both the valleys. Chief Minister Sonowal said this during the discussion on faster socio-economic development of Barak valley as part of Speaker's initiative at Assam Legislative Assembly today.

Stating that the State government is guided by Prime Minister Narendra Modi's vision of "sabka saath, sabka vikas and sabka viswas", Chief Minister Sonowal said that steps were taken to build up confidence of the Barak valley people and to explore its vast potential. He said that as a sequel to Namami Brahmaputra Festival, the State government organized Namami Barak festival covering all the three districts of the valley, which showcased its natural resources, heritage and culture. The initiative also helped the people to discover the rich potential of Barak valley, he added.

Saying that there was a sense of alienation amongst the people of Barak Valley earlier, Chief Minister Sonowal said that people of the entire state must internalise the feelings, aspirations, suffering and pains of the people of the valley to foster better camaraderie and bonhomie. Such an approach would not only strengthen the bond but also act as a catalyst in building a strong and vibrant Assam, he observed.

Underlining the state government initiatives to unleash a new era of development in Barak Valley, the Chief Minister said that already steps have been taken to set up a mini secretariat at Silchar which would facilitate easy access of government services by the people of the valley. Moreover, Sonowal informed that efforts are afoot to set up another airport at Barak Valley to boost economic growth of the state. The Chief Minister also urged the public representatives of the Barak Valley districts to join their hands together with the state government in its development initiatives in the valley.

Moreover, paying his tribute to the martyrs who sacrificed their lives for the cause of India's independence during the sepoy mutiny at Karimganj, Chief Minister Sonowal said that commemorating their contributions the state government would send a proposal to the central government to develop Indo-Bangladesh border at Karimganj in line with the Indo- Pakistan border at Wagah so as to attract tourism as well as promoting nationalistic sentiment.

Terming the rich natural resources, heritage, tradition and values of Assam as the core strength of the government, Chief Minister Sonowal said that there are many inherent potential amongst the vast number of small and large communities of the state. He called upon the people to engage their energies to discover the untapped potential of the state by working with cooperation, positivity and team spirit. In this regard Sonowal informed that State Innovation and Transformation Ayog (SITA) has already been entrusted with the responsibility to bring out a research book highlighting the resources and avenues for the state's growth.

MLAs from all the political parties also took part in the discussion and shared their views on the Speaker's initiative.

BG/July 27, 2019

ক্রোড়পত্র : ৫

Chief Minister's Statement on Barak (2)

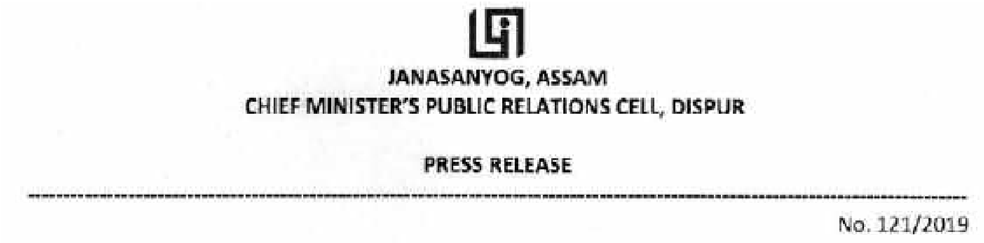

JANASANYOG, ASSAM
CHIEF MINISTER'S PUBLIC RELATIONS CELL, DISPUR

PRESS RELEASE

No. 121/2019

CM lays foundation stone of Mini Secretariat at Barak Valley

Connectivity boost to achieve transformation through transportation: CM

Dispur, March 2: Putting an end to all uncertainties and giving a logical conclusion to the long pending demand of the people of Barak Valley, Chief Minister Sarbananda Sonowal laid the foundation stone for setting up Mini Secretariat at Barak Valley, Silchar at a programme held at Police Parade Ground at Silchar today.

In the same programme, Chief Minister Sonowal also laid the foundation stone for a bouquet of projects namely new auditorium cum district library at Silchar, sports stadium at Silchar Police Parade Ground under Uttoron scheme, cultural research centre in Barak Valley in the name of Swami Vivekananda at Assam University, construction of RCC bridge over river Barak near Itkholaghat.

Chief Minister Sonowal also dedicated RCC bridge No. 1/1 over river Barak at Sadarghat on Silchar-Kumbhirgram Road under NLCPR for the people of Barak Valley region.

Speaking on the occasion, Chief Minister Sonowal termed Barak Valley as an asset of the state and said that ever since his govt. has come to power, facilitating infrastructure development of Barak Valley has been one of the core agenda of the government. To spearhead its infrastructure development, Sonowal said that in the last two and a half years, his government has started the work of constructing 2000 km road in Barak Valley and work for converting 120 wooden bridges into RCC bridge are also going on full swing.

Stating that projects to boost connectivity has been implemented with a view to achieving transformation through transportation, he said that in the coming days expansion of Silchar town will also be taken up in line with state capital region which has been taken for expansion of Guwahati. He also said that state government is in touch with the civil aviation ministry of Government of India for setting up an airport at Barak Valley region.

The Chief Minister further said that for facilitating equal development of all the 33 districts of the state, the state government is of the view that three districts of the Barak Valley region should also be developed in the field of education, culture and sports. Therefore his government has also decided to build medical college and engineering college at Karimganj. He also said that under Chief Minister Samagra Gramya Unnayan Yojana, more than 30 playgrounds will be built in the Barak Valley region.

Chief Minister Sonowal also hailed all sections of the people of Barak Valley region for strengthening the great demographic mosaic of the state. He also said that Silchar which is a 150 year old town alongwith Karimganj and Hailakandi have been working in tandem with other places of the state to bring about revolutionary changes for fuelling development in the state.

Terming education as one of the priorities of the state, Chief Minister Sonowal said that to make education driven development a reality in the state, his government has been distributing free textbooks, uniform to the students along with waiver of admission and tuition fees to the students of the state.

He also called upon the people of Barak Valley to contribute significantly for educational development of the state. Chief Minister Sonowal at the same time said that under his government, people of Barak Valley are absolutely secured and no untoward incident can vitiate the friendly co-existence of the people of Barak-Brahmaputra and Hills & Plains.

Environment & Forest Minister Parimal Suklabaidya while speaking on the occasion gave a snapshot of various development projects of the state government. He said that the present state government under the leadership of Chief Minister Sarbananda Sonowal has given never before impetus for the development of Barak valley. He said that after becoming Chief Minister Sarbananda Sonowal made 17 visits to the Barak Valley region, which bears testimony to government's intentions of inclusive development.

Former Deputy Speaker of Assam Legislative Assembly and Silchar MLA Dilip Kumar Paul, Borkhola MLA Kishor Nath and Udarband MLA Amar Chand Jain also spoke on the occasion.

MLAs Aminul Hoque Laskar, Mihir Kanti Som, Rituparna Baruah, CEM of Sonowal Kachari Autonomous Council Dipu Ranjan Makrari, former Union Minister Kabindra Purkayastha along with a host of dignitaries were present on the occasion.

SD/ March 2, 2019

ক্রোড়পত্র : ৬

Beginning of The Tea Industry in Cachar*

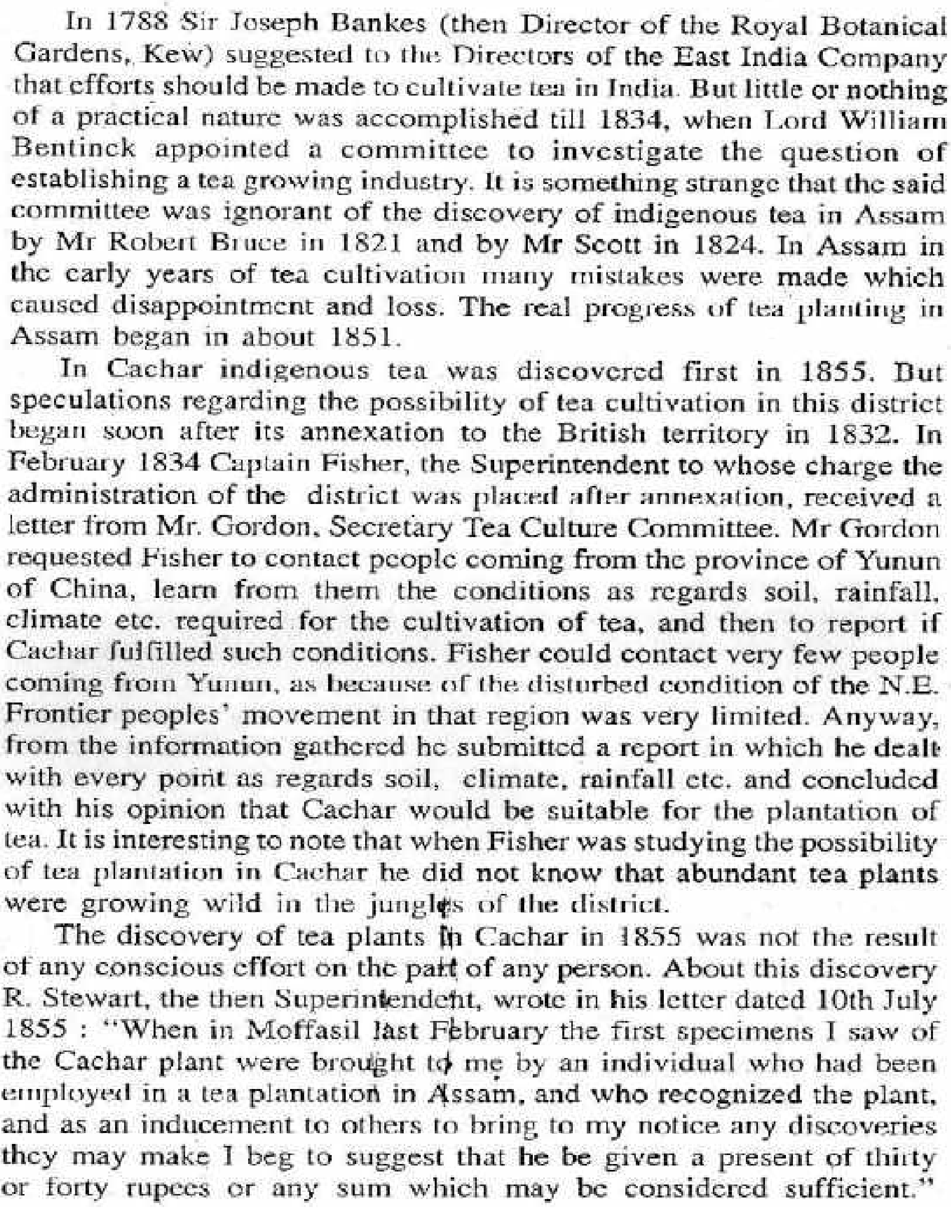

In 1788 Sir Joseph Bankes (then Director of the Royal Botanical Gardens, Kew) suggested to the Directors of the East India Company that efforts should be made to cultivate tea in India. But little or nothing of a practical nature was accomplished till 1834, when Lord William Bentinck appointed a committee to investigate the question of establishing a tea growing industry. It is something strange that the said committee was ignorant of the discovery of indigenous tea in Assam by Mr Robert Bruce in 1821 and by Mr Scott in 1824. In Assam in the early years of tea cultivation many mistakes were made which caused disappointment and loss. The real progress of tea planting in Assam began in about 1851.

In Cachar indigenous tea was discovered first in 1855. But speculations regarding the possibility of tea cultivation in this district began soon after its annexation to the British territory in 1832. In February 1834 Captain Fisher, the Superintendent to whose charge the administration of the district was placed after annexation, received a letter from Mr. Gordon, Secretary Tea Culture Committee. Mr Gordon requested Fisher to contact people coming from the province of Yunun of China, learn from them the conditions as regards soil, rainfall, climate etc. required for the cultivation of tea, and then to report if Cachar fulfilled such conditions. Fisher could contact very few people coming from Yunun, as because of the disturbed condition of the N.E. Frontier peoples' movement in that region was very limited. Anyway, from the information gathered he submitted a report in which he dealt with every point as regards soil, climate, rainfall etc. and concluded with his opinion that Cachar would be suitable for the plantation of tea. It is interesting to note that when Fisher was studying the possibility of tea plantation in Cachar he did not know that abundant tea plants were growing wild in the jungles of the district.

The discovery of tea plants in Cachar in 1855 was not the result of any conscious effort on the part of any person. About this discovery R. Stewart, the then Superintendent, wrote in his letter dated 10th July 1855 : "When in Moffasil last February the first specimens I saw of the Cachar plant were brought to me by an individual who had been employed in a tea plantation in Assam, and who recognized the plant, and as an inducement to others to bring to my notice any discoveries they may make I beg to suggest that he be given a present of thirty or forty rupees or any sum which may be considered sufficient."

**Presently Barak Valley*

McArthur of Secrespur, James Abernutty of Monacherra, W. McArthur of Luckinugger, H.C. Gibson of Mohunpur, Webster (garden not mentioned) and Sandeman of Rosecandy.

As numerous applications were pouring in asking for grants of land, the Govt. became apprehensive of over speculation. Some of the letters betray this apprehension. In a letter addressed to one J. B. Shadwell who applied for 1000 acres of land the Superintendent wrote : "At the same time I beg to bring to your notice that in order to bring a thousand acres of land under tea cultivation it is calculated that it would entail an outlay of at least one lac of rupees, at the rate of rupees one hundred per acre." To another applicant Mr. Hogg the Superintendent wrote that he must have the money required in hand, and not depend on the money he might have from others.

Thus began the tea plantation which within a short time brought magical change in every sphere of life—economic, social, educational etc. — of Cachar. It would not be wrong to say that the present district of Cachar is the gift of the Tea Industry. The impact of tea on Cachar is a different story, and it is left for some future issue of our College magazine. So is the story of Tea labour. The first Superintendent Captain Fisher and Lieutenant R. Stewart, the Superintendent, during whose tenure of office tea was first discovered, proved to be prophets as regards their prediction on the prospect of tea plantation in Cachar. But both cherished wrong ideas about tea labour. In his letter of 4th September 1855 R. Stewart wrote : "With regard to labour I do not anticipate there will be any great difficulty in obtaining the quantity which may be required, if not in Cachar, in the neighbouring district of Sylhet the inhabitants of which district and of Jynteah come very willingly to Cachar and settle down in it." But here Stewart was mistaken. By 1858 planters began to feel difficulties as local labour was found unsuitable for plantation purpose. Hence the question of importation of labour arose. The letter dated 13th May, 1858 addressed to Mr. Sanderman of Goongoor Hill is revealing on this issue. The Superintendent wrote to Mr. Sanderman :

Sir,

In answer to your letter of today's date with reference to the importation of labour into Cachar, I have the honour to state that I am of opinion it would be a measure attended with much benefit to the country, and to the tea planting interest.

The climate of Cachar is a healthy one and I think it very probable that if coolies were imported they would settle here for good, and form

Immediately after the discovery Stewart submitted the specimen of the plant to Dr. Thomas, Superintendent of the Govt. Botanic Garden, Calcutta and to others, and all agreed considering them identical with the tea plant of Assam. Dr. Thomas in a letter said, "The specimens forwarded by you are beyond any reasonable doubt the true tea plant (Assam variety)."

When Stewart was convinced that the plant discovered was the genuine tea plant he sent people to different directions into the jungles to look for it, and wherever he sent, the plant was found more or less abundant. It is evident from a letter dated 4th Sept. that as a result of the first search tea plant was discovered to the south and south-east of Silchar, the Sudder station. The principal places where tea plants were growing in abundance were the Bargoongoor hills in the Chatla Howher, Baokara and Nawowalla near the Gagra river, Barrahangun near Hyleakandy, and Infang in the east of Rajnuggur pargannah. From the same letter we know that Barrahangun was the first place where plantation work was commenced by a planter from Assam.

After the discovery wide publicity was given inviting people to come to Cachar and undertake the work of tea cultivation receiving grants of land from the government. Stewart received many applications, and all these from the Europeans. Their demand for grant of land varied from 500 acres to 1000 acres. One Bengalee gentleman named Purbutty Churn Bunnoorjee, Banker and Agent, Sylhet, had correspondence with Stewart but we do not know if he actually came to Cachar for plantation purpose. Fisher himself was very enthusiastic about the cultivation of tea in Cachar. To one R. Houston he wrote '.....any person who has made up his mind to embark in the enterprise and try tea planting in Cachar I recommend strongly his not losing one day but that he should set people to work at once to clear away the jungles.'

From a letter dated 5th May, 1856 we learn "some three or four parties have commenced work, and from all accounts they appear to be well satisfied with the prospects, and entertain the hopes of making large sum of money by the cultivation and manufacture of tea in Cachar."

In a letter dated 30th August, 1856 addressed to the Tea planters of Cachar we get the names of the pioneers in the field of tea industry. They were A. Tydd of Wise & Co., Dacca, Baokara gardens; I. Davidson of Cachar Tea Company, Adelaide gardens; and M. Herring of Chundeepoor.

By 1860 plantation had vastly increased and so we then meet W.H.

a permanent population. Every facility should therefore be given them for prosecuting a cultivation of their own as well as labouring for the tea gardens. Once settled on a piece of land which they had cleared themselves and which they could call their own, I do not think that it is at all probable that men who are so badly off as to be obliged to ship themselves off to Mauritius and the West Indies for subsistence would ever think of quitting and you would thus have a lasting supply of labour settled on your grants.

The coolies on first coming up to Cachar, that is before leaving Calcutta, should be bound down by an agreement to serve for a certain number of years, a breach of this agreement, if the documents were regularly and fairly drawn out, would subject the delinquent to one month's imprisonment and then if he still refused to fulfil his contract to another month in addition, but no more, and any advances that had been made to him would be recoverable through the civil courts.

I have etc.
R. Stewart,
Offg. Superintendent.

That the matter relating to the importation of labour had by 1859 advanced is evident from the letter addressed to the same Mr. Sanderman on the 25th May, 1859. Mr Stewart wrote : 'Wishing to move the Govt. of Bengal to facilitate the immigration of Coolies into Cachar to supply labour for the cultivation of tea I have the honour to request that you will be so good as to fill up the accompanying form with respect to the coolies now labouring on your grant." But the problem of tea labour, as has been said above, is a different story and let me keep it in reserve as I will have to oblige many more editors of the College magazine in future.*

লেখক : দেবব্রত দত্ত

---

* Purbashree, G. C. College Magazine, Silchar, 1965.

ক্রোড়পত্র : ৭

The Statistics: A Government of Assam Publication

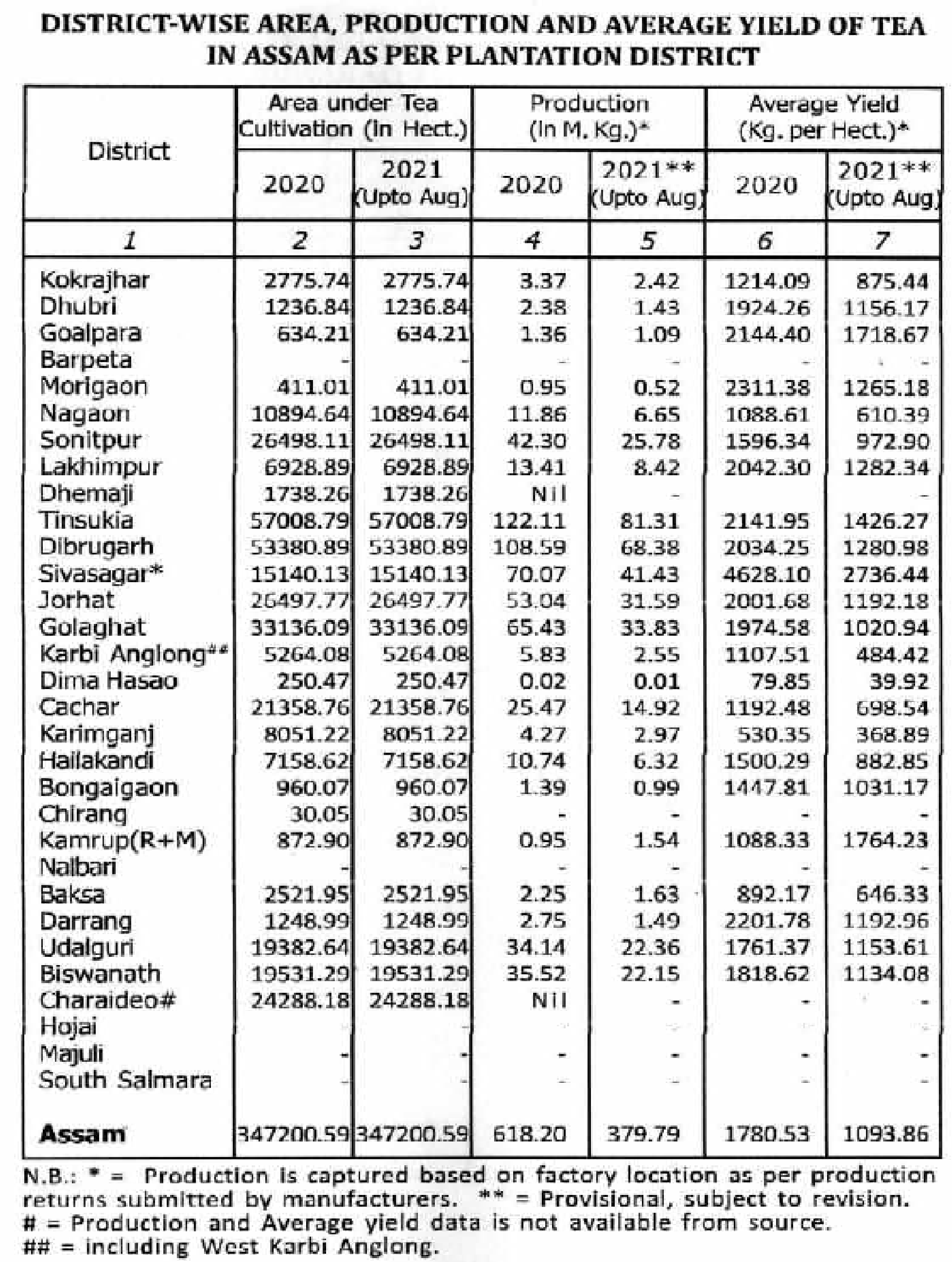

DISTRICT-WISE AREA, PRODUCTION AND AVERAGE YIELD OF TEA IN ASSAM AS PER PLANTATION DISTRICT

District	Area under Tea Cultivation (In Hect.)		Production (In M. Kg.)*		Average Yield (Kg. per Hect.)*	
	2020	2021 (Upto Aug)	2020	2021** (Upto Aug)	2020	2021** (Upto Aug)
1	2	3	4	5	6	7
Kokrajhar	2775.74	2775.74	3.37	2.42	1214.09	875.44
Dhubri	1236.84	1236.84	2.38	1.43	1924.26	1156.17
Goalpara	634.21	634.21	1.36	1.09	2144.40	1718.67
Barpeta	-	-	-	-	-	-
Morigaon	411.01	411.01	0.95	0.52	2311.38	1265.18
Nagaon	10894.64	10894.64	11.86	6.65	1088.61	610.39
Sonitpur	26498.11	26498.11	42.30	25.78	1596.34	972.90
Lakhimpur	6928.89	6928.89	13.41	8.42	2042.30	1282.34
Dhemaji	1738.26	1738.26	Nil	-		-
Tinsukia	57008.79	57008.79	122.11	81.31	2141.95	1426.27
Dibrugarh	53380.89	53380.89	108.59	68.38	2034.25	1280.98
Sivasagar*	15140.13	15140.13	70.07	41.43	4628.10	2736.44
Jorhat	26497.77	26497.77	53.04	31.59	2001.68	1192.18
Golaghat	33136.09	33136.09	65.43	33.83	1974.58	1020.94
Karbi Anglong##	5264.08	5264.08	5.83	2.55	1107.51	484.42
Dima Hasao	250.47	250.47	0.02	0.01	79.85	39.92
Cachar	21358.76	21358.76	25.47	14.92	1192.48	698.54
Karimganj	8051.22	8051.22	4.27	2.97	530.35	368.89
Hailakandi	7158.62	7158.62	10.74	6.32	1500.29	882.85
Bongaigaon	960.07	960.07	1.39	0.99	1447.81	1031.17
Chirang	30.05	30.05	-	-	-	-
Kamrup(R+M)	872.90	872.90	0.95	1.54	1088.33	1764.23
Nalbari	-	-	-	-	-	-
Baksa	2521.95	2521.95	2.25	1.63	892.17	646.33
Darrang	1248.99	1248.99	2.75	1.49	2201.78	1192.96
Udalguri	19382.64	19382.64	34.14	22.36	1761.37	1153.61
Biswanath	19531.29	19531.29	35.52	22.15	1818.62	1134.08
Charaideo#	24288.18	24288.18	Nil	-	-	-
Hojai	-	-	-	-	-	-
Majuli	-	-	-	-	-	-
South Salmara	-	-	-	-	-	-
Assam	347200.59	347200.59	618.20	379.79	1780.53	1093.86

N.B.: * = Production is captured based on factory location as per production returns submitted by manufacturers. ** = Provisional, subject to revision.
= Production and Average yield data is not available from source.
= including West Karbi Anglong.

The Statistics: A Government of Assam Publication

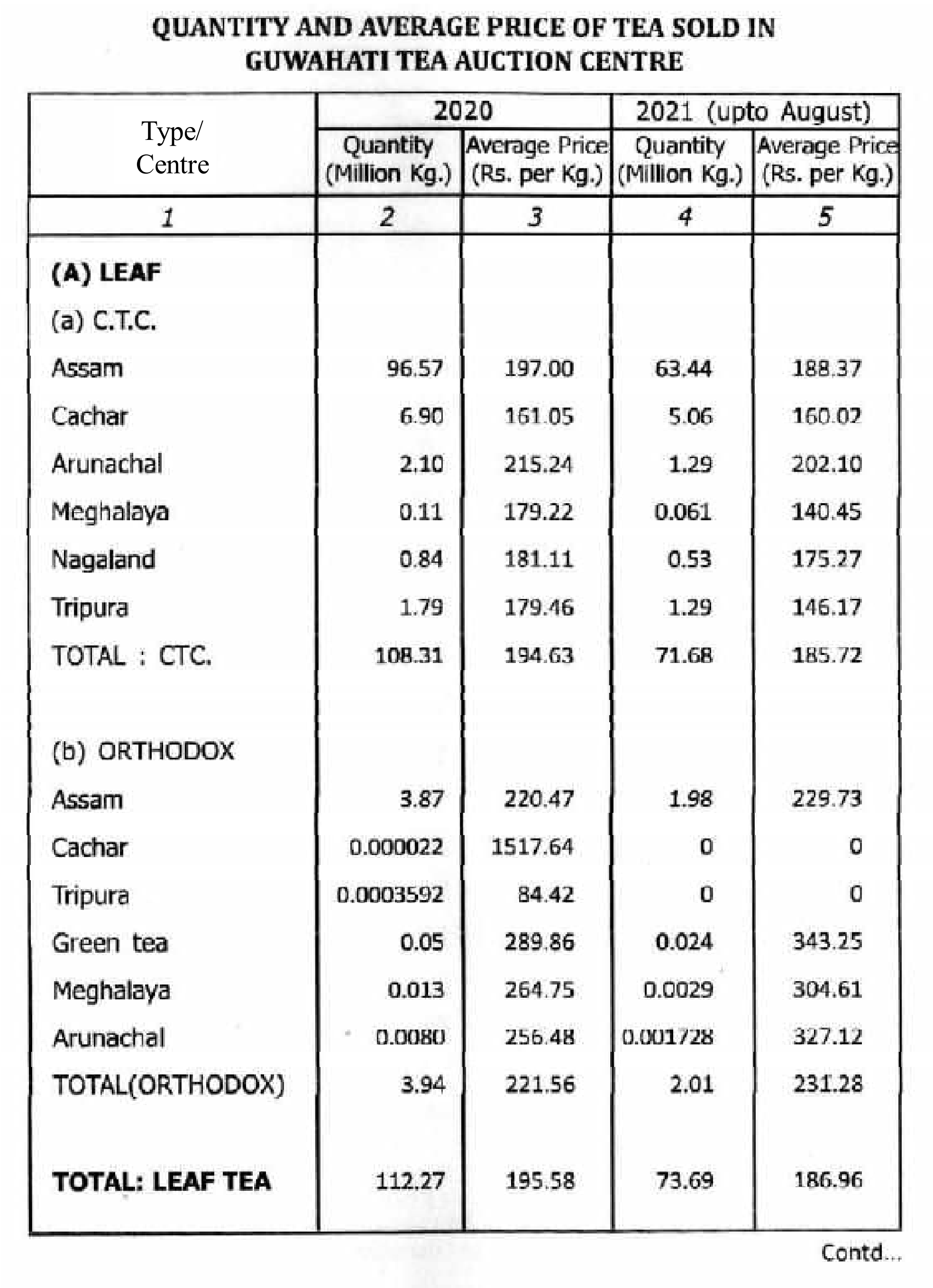

QUANTITY AND AVERAGE PRICE OF TEA SOLD IN GUWAHATI TEA AUCTION CENTRE

Type/ Centre	2020		2021 (upto August)	
	Quantity (Million Kg.)	Average Price (Rs. per Kg.)	Quantity (Million Kg.)	Average Price (Rs. per Kg.)
1	2	3	4	5
(A) LEAF				
(a) C.T.C.				
Assam	96.57	197.00	63.44	188.37
Cachar	6.90	161.05	5.06	160.02
Arunachal	2.10	215.24	1.29	202.10
Meghalaya	0.11	179.22	0.061	140.45
Nagaland	0.84	181.11	0.53	175.27
Tripura	1.79	179.46	1.29	146.17
TOTAL : CTC.	108.31	194.63	71.68	185.72
(b) ORTHODOX				
Assam	3.87	220.47	1.98	229.73
Cachar	0.000022	1517.64	0	0
Tripura	0.0003592	84.42	0	0
Green tea	0.05	289.86	0.024	343.25
Meghalaya	0.013	264.75	0.0029	304.61
Arunachal	0.0080	256.48	0.001728	327.12
TOTAL(ORTHODOX)	3.94	221.56	2.01	231.28
TOTAL: LEAF TEA	112.27	195.58	73.69	186.96

Contd...

The Statistics: A Government of Assam Publication

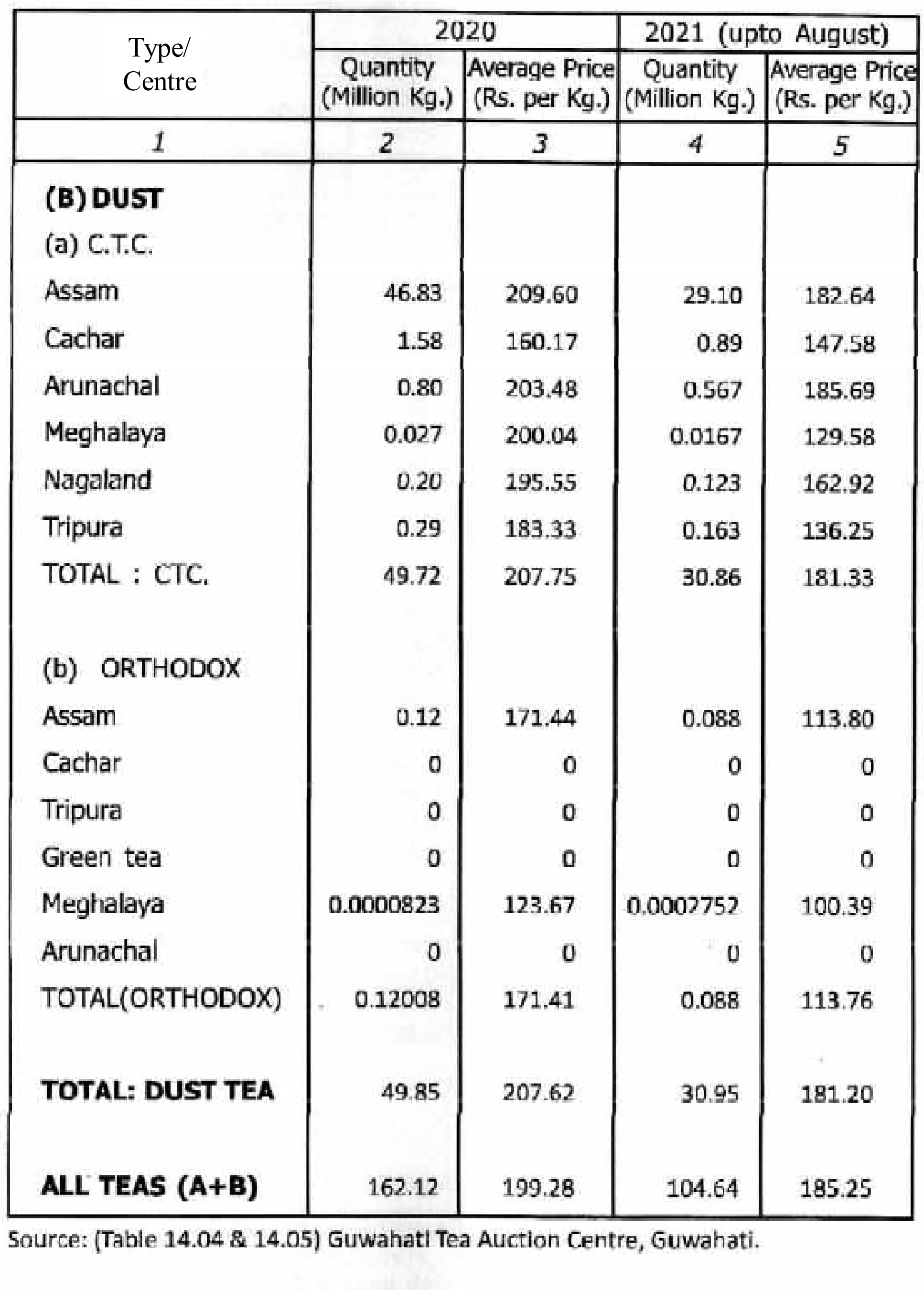

Type/ Centre	2020		2021 (upto August)	
	Quantity (Million Kg.)	Average Price (Rs. per Kg.)	Quantity (Million Kg.)	Average Price (Rs. per Kg.)
1	2	3	4	5
(B) DUST				
(a) C.T.C.				
Assam	46.83	209.60	29.10	182.64
Cachar	1.58	160.17	0.89	147.58
Arunachal	0.80	203.48	0.567	185.69
Meghalaya	0.027	200.04	0.0167	129.58
Nagaland	0.20	195.55	0.123	162.92
Tripura	0.29	183.33	0.163	136.25
TOTAL : CTC.	49.72	207.75	30.86	181.33
(b) ORTHODOX				
Assam	0.12	171.44	0.088	113.80
Cachar	0	0	0	0
Tripura	0	0	0	0
Green tea	0	0	0	0
Meghalaya	0.0000823	123.67	0.0002752	100.39
Arunachal	0	0	0	0
TOTAL(ORTHODOX)	0.12008	171.41	0.088	113.76
TOTAL: DUST TEA	49.85	207.62	30.95	181.20
ALL TEAS (A+B)	162.12	199.28	104.64	185.25

Source: (Table 14.04 & 14.05) Guwahati Tea Auction Centre, Guwahati.

ক্রোড়পত্র : ৮

Natural Wetlands in Barak Valley

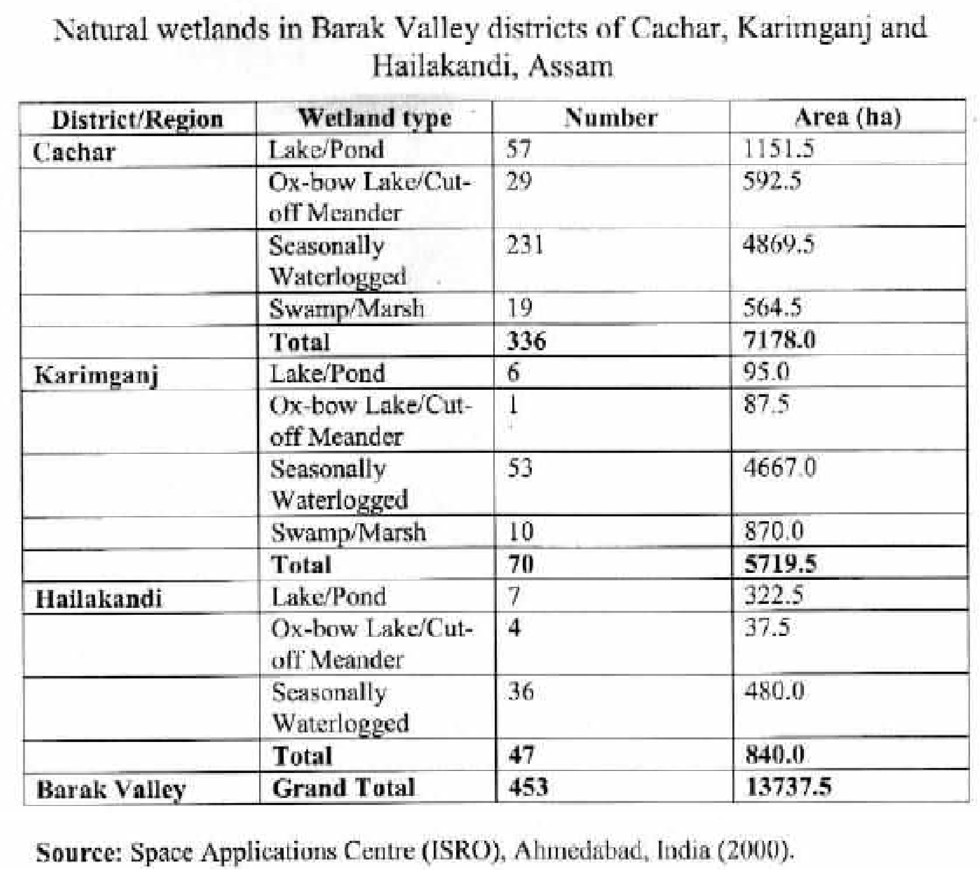

Natural wetlands in Barak Valley districts of Cachar, Karimganj and Hailakandi, Assam

District/Region	Wetland type	Number	Area (ha)
Cachar	Lake/Pond	57	1151.5
	Ox-bow Lake/Cut-off Meander	29	592.5
	Seasonally Waterlogged	231	4869.5
	Swamp/Marsh	19	564.5
	Total	**336**	**7178.0**
Karimganj	Lake/Pond	6	95.0
	Ox-bow Lake/Cut-off Meander	1	87.5
	Seasonally Waterlogged	53	4667.0
	Swamp/Marsh	10	870.0
	Total	**70**	**5719.5**
Hailakandi	Lake/Pond	7	322.5
	Ox-bow Lake/Cut-off Meander	4	37.5
	Seasonally Waterlogged	36	480.0
	Total	**47**	**840.0**
Barak Valley	**Grand Total**	**453**	**13737.5**

Source: Space Applications Centre (ISRO), Ahmedabad, India (2000).

ক্রোড়পত্র : ৯

বরাক উপত্যকার তিন জেলায় ব্যাঙ্কগুলোতে জমা এবং অগ্রিম প্রদানে খতিয়ান

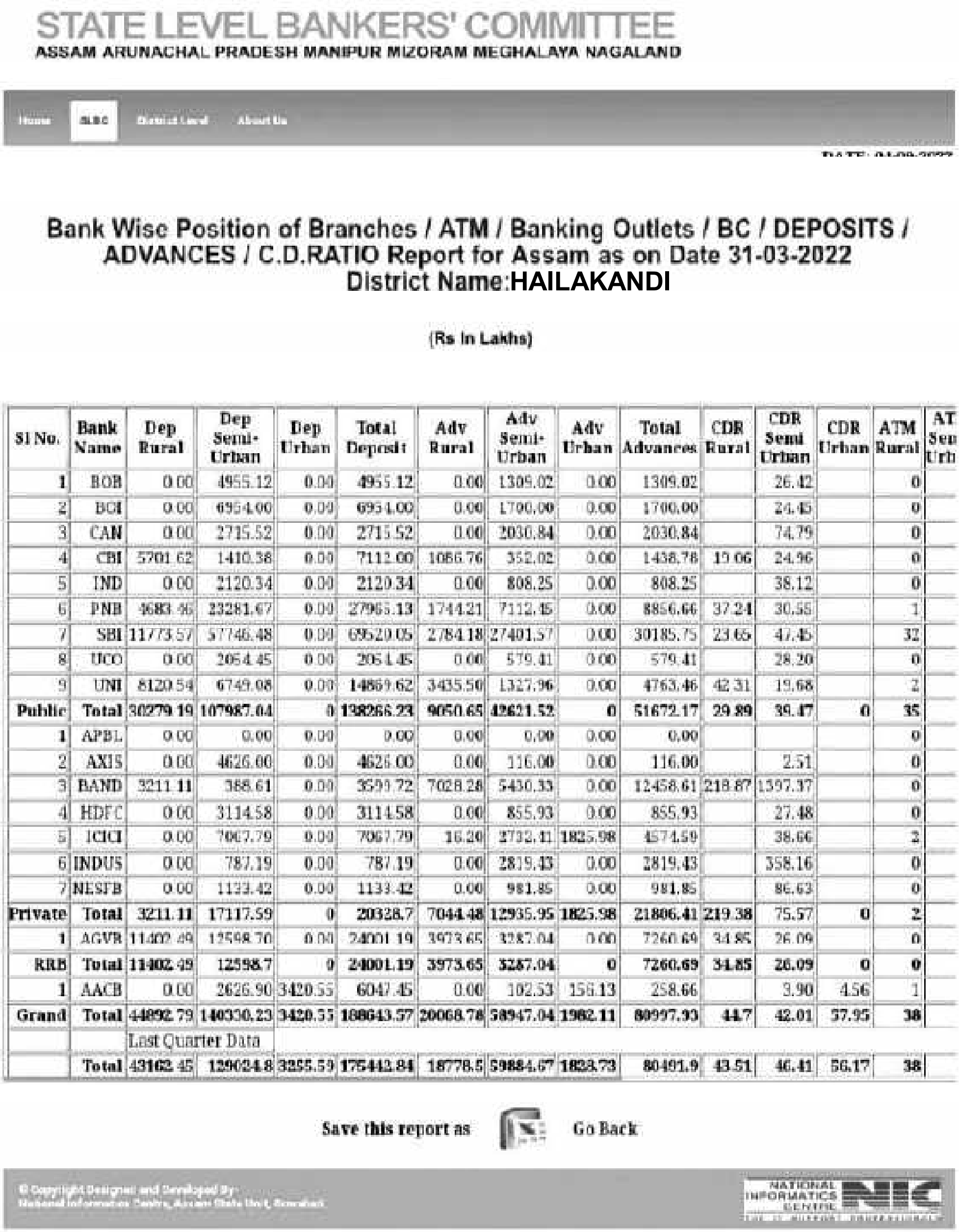

STATE LEVEL BANKERS' COMMITTEE
ASSAM ARUNACHAL PRADESH MANIPUR MIZORAM MEGHALAYA NAGALAND

Bank Wise Position of Branches / ATM / Banking Outlets / BC / DEPOSITS / ADVANCES / C.D.RATIO Report for Assam as on Date 31-03-2022
District Name:HAILAKANDI

(Rs In Lakhs)

Sl No.	Bank Name	Dep Rural	Dep Semi-Urban	Dep Urban	Total Deposit	Adv Rural	Adv Semi-Urban	Adv Urban	Total Advances	CDR Rural	CDR Semi Urban	CDR Urban	ATM Rural
1	BOB	0.00	4955.12	0.00	4955.12	0.00	1309.02	0.00	1309.02		26.42		0
2	BOI	0.00	6954.00	0.00	6954.00	0.00	1700.00	0.00	1700.00		24.45		0
3	CAN	0.00	2715.52	0.00	2715.52	0.00	2030.84	0.00	2030.84		74.79		0
4	CBI	5701.62	1410.38	0.00	7112.00	1086.76	352.02	0.00	1438.78	19.06	24.96		0
5	IND	0.00	2120.34	0.00	2120.34	0.00	808.25	0.00	808.25		38.12		0
6	PNB	4683.46	23281.67	0.00	27965.13	1744.21	7112.45	0.00	8856.66	37.24	30.55		1
7	SBI	11773.57	57746.48	0.00	69520.05	2784.18	27401.57	0.00	30185.75	23.65	47.45		32
8	UCO	0.00	2064.45	0.00	2064.45	0.00	579.41	0.00	579.41		28.20		0
9	UNI	8120.54	6749.08	0.00	14869.62	3435.50	1327.96	0.00	4763.46	42.31	19.68		2
Public	**Total**	**30279.19**	**107987.04**	**0**	**138266.23**	**9050.65**	**42621.52**	**0**	**51672.17**	**29.89**	**39.47**	**0**	**35**
1	APBL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0
2	AXIS	0.00	4626.00	0.00	4626.00	0.00	116.00	0.00	116.00		2.51		0
3	BAND	3211.11	388.61	0.00	3599.72	7028.28	5430.33	0.00	12458.61	218.87	1397.37		0
4	HDFC	0.00	3114.58	0.00	3114.58	0.00	855.93	0.00	855.93		27.48		0
5	ICICI	0.00	7067.79	0.00	7067.79	16.20	2732.41	1825.98	4574.59		38.66		2
6	INDUS	0.00	787.19	0.00	787.19	0.00	2819.43	0.00	2819.43		358.16		0
7	NESFB	0.00	1133.42	0.00	1133.42	0.00	981.85	0.00	981.85		86.63		0
Private	**Total**	**3211.11**	**17117.59**	**0**	**20328.7**	**7044.48**	**12935.95**	**1825.98**	**21806.41**	**219.38**	**75.57**	**0**	**2**
1	AGVB	11402.49	12598.70	0.00	24001.19	3973.65	3287.04	0.00	7260.69	34.85	26.09		0
RRB	**Total**	**11402.49**	**12598.7**	**0**	**24001.19**	**3973.65**	**3287.04**	**0**	**7260.69**	**34.85**	**26.09**	**0**	**0**
1	AACB	0.00	2626.90	3420.55	6047.45	0.00	102.53	156.13	258.66		3.90	4.56	1
Grand	**Total**	**44892.79**	**140330.23**	**3420.55**	**188643.57**	**20068.78**	**58947.04**	**1982.11**	**80997.93**	**44.7**	**42.01**	**57.95**	**38**
		Last Quarter Data											
	Total	**43162.45**	**129024.8**	**3255.59**	**175442.84**	**18778.5**	**59884.67**	**1823.73**	**80491.9**	**43.51**	**46.41**	**56.17**	**38**

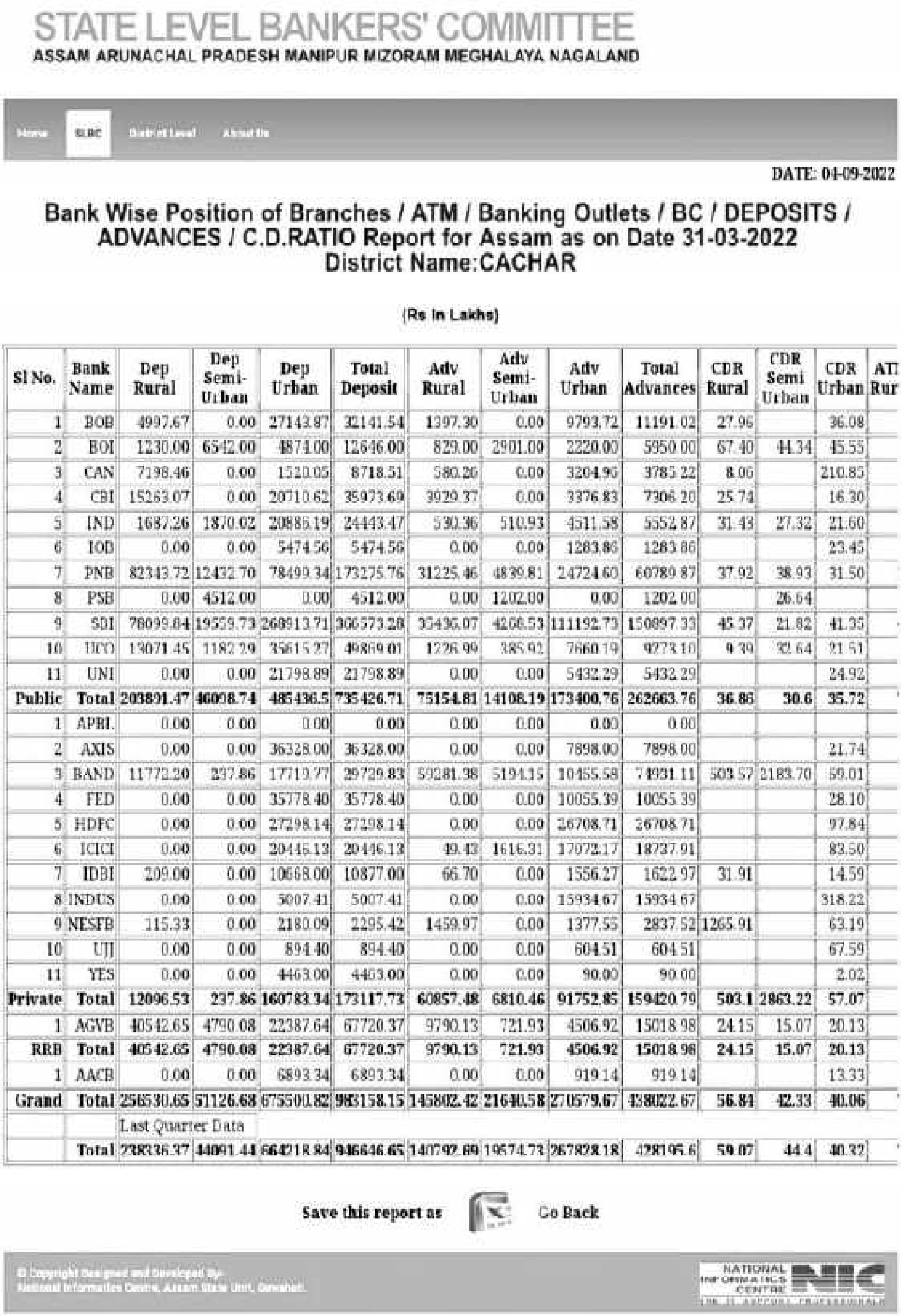

STATE LEVEL BANKERS' COMMITTEE
ASSAM ARUNACHAL PRADESH MANIPUR MIZORAM MEGHALAYA NAGALAND

DATE: 04-09-2022

Bank Wise Position of Branches / ATM / Banking Outlets / BC / DEPOSITS / ADVANCES / C.D.RATIO Report for Assam as on Date 31-03-2022
District Name:CACHAR

(Rs In Lakhs)

Sl No.	Bank Name	Dep Rural	Dep Semi-Urban	Dep Urban	Total Deposit	Adv Rural	Adv Semi-Urban	Adv Urban	Total Advances	CDR Rural	CDR Semi Urban	CDR Urban	ATI Rur
1	BOB	4997.67	0.00	27143.87	32141.54	1397.30	0.00	9793.72	11191.02	27.96		36.08	
2	BOI	1230.00	6542.00	4874.00	12646.00	829.00	2901.00	2220.00	5950.00	67.40	44.34	45.55	
3	CAN	7198.46	0.00	1520.05	8718.51	580.26	0.00	3204.96	3785.22	8.06		210.85	
4	CBI	15263.07	0.00	20710.62	35973.69	3929.37	0.00	3376.83	7306.20	25.74		16.30	
5	IND	1687.26	1870.02	20886.19	24443.47	530.36	510.93	4511.58	5552.87	31.43	27.32	21.60	
6	IOB	0.00	0.00	5474.56	5474.56	0.00	0.00	1283.86	1283.86			23.45	
7	PNB	82343.72	12432.70	78499.34	173275.76	31225.46	4830.81	24724.60	60780.87	37.92	38.93	31.50	
8	PSB	0.00	4512.00	0.00	4512.00	0.00	1202.00	0.00	1202.00		26.64		
9	SBI	78099.84	19559.73	268913.71	366573.28	35436.07	4268.53	111192.73	150897.33	45.37	21.82	41.35	
10	UCO	13071.45	1182.29	35615.27	49869.01	1226.99	385.92	7660.19	9273.10	9.39	32.64	21.51	
11	UNI	0.00	0.00	21798.89	21798.89	0.00	0.00	5432.29	5432.29			24.92	
Public	**Total**	**203891.47**	**46008.74**	**485436.5**	**735426.71**	**75154.81**	**14108.19**	**173400.76**	**262663.76**	**36.86**	**30.6**	**35.72**	
1	APBL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2	AXIS	0.00	0.00	36328.00	36328.00	0.00	0.00	7898.00	7898.00			21.74	
3	BAND	11772.20	237.86	17719.77	29729.83	59281.38	5194.15	10455.58	74931.11	503.57	2183.70	59.01	
4	FED	0.00	0.00	35778.40	35778.40	0.00	0.00	10055.39	10055.39			28.10	
5	HDFC	0.00	0.00	27298.14	27298.14	0.00	0.00	26708.71	26708.71			97.84	
6	ICICI	0.00	0.00	20446.13	20446.13	49.43	1616.31	17072.17	18737.91			83.50	
7	IDBI	209.00	0.00	10668.00	10877.00	66.70	0.00	1556.27	1622.97	31.91		14.59	
8	INDUS	0.00	0.00	5007.41	5007.41	0.00	0.00	15934.67	15934.67			318.22	
9	NESFB	115.33	0.00	2180.09	2295.42	1459.97	0.00	1377.55	2837.52	1265.91		63.19	
10	UJJ	0.00	0.00	894.40	894.40	0.00	0.00	604.51	604.51			67.59	
11	YES	0.00	0.00	4463.00	4463.00	0.00	0.00	90.00	90.00			2.02	
Private	**Total**	**12096.53**	**237.86**	**160783.34**	**173117.73**	**60857.48**	**6810.46**	**91752.85**	**159420.79**	**503.1**	**2863.22**	**57.07**	
1	AGVB	40542.65	4790.08	22387.64	67720.37	9790.13	721.93	4506.92	15018.98	24.15	15.07	20.13	
RRB	**Total**	**40542.65**	**4790.08**	**22387.64**	**67720.37**	**9790.13**	**721.93**	**4506.92**	**15018.98**	**24.15**	**15.07**	**20.13**	
1	AACB	0.00	0.00	6893.34	6893.34	0.00	0.00	919.14	919.14			13.33	
Grand	**Total**	**256530.65**	**51126.68**	**675500.82**	**983158.15**	**145802.42**	**21640.58**	**270579.67**	**438022.67**	**56.84**	**42.33**	**40.06**	
		Last Quarter Data											
	Total	**238336.37**	**44091.44**	**664218.84**	**946646.65**	**140792.69**	**19574.73**	**267828.18**	**428195.6**	**59.07**	**44.4**	**40.32**	

© Copyright Designed and Developed By:
National Informatics Centre, Assam State Unit, Guwahati.

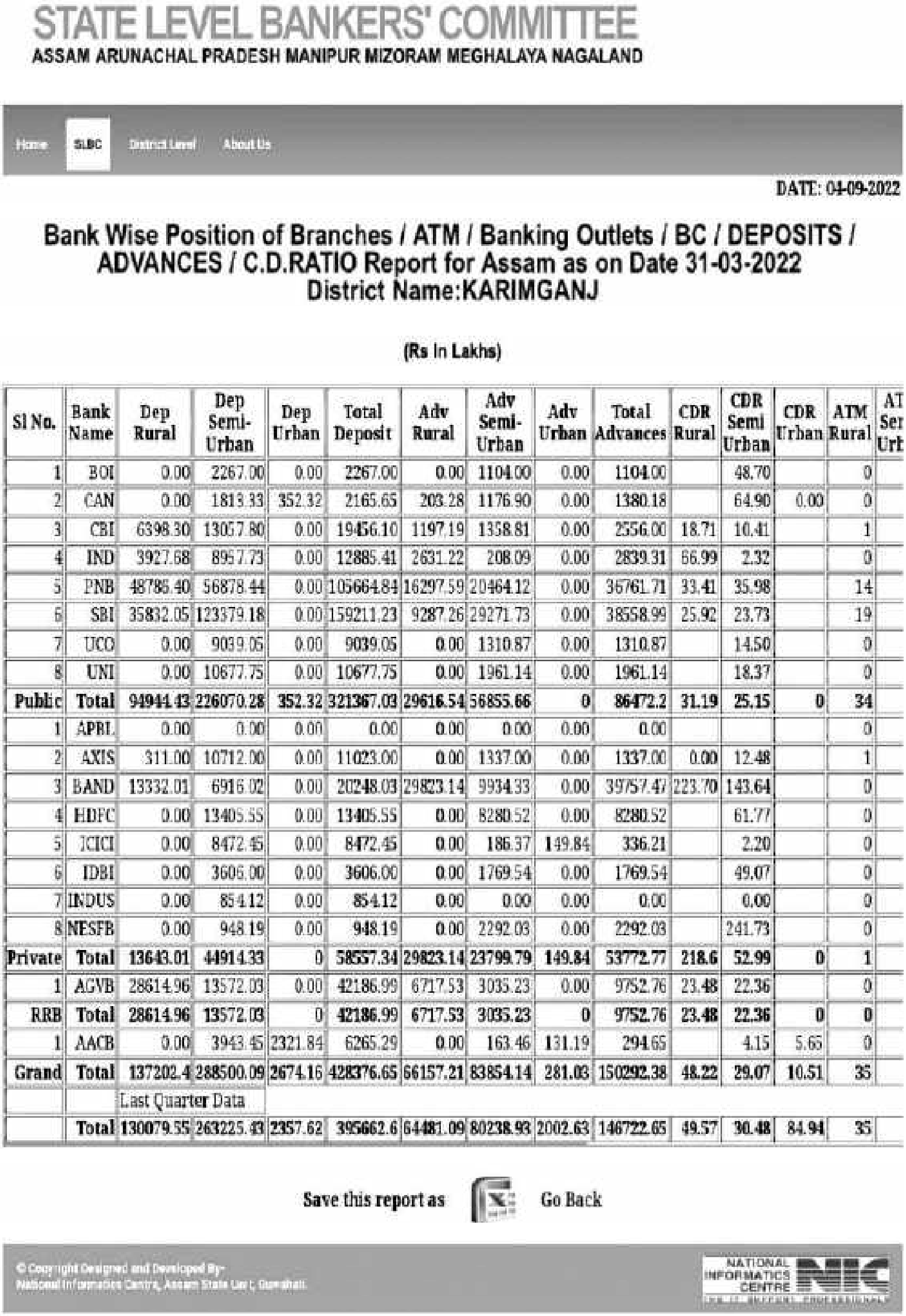

STATE LEVEL BANKERS' COMMITTEE
ASSAM ARUNACHAL PRADESH MANIPUR MIZORAM MEGHALAYA NAGALAND

DATE: 04-09-2022

Bank Wise Position of Branches / ATM / Banking Outlets / BC / DEPOSITS / ADVANCES / C.D.RATIO Report for Assam as on Date 31-03-2022
District Name:KARIMGANJ

(Rs In Lakhs)

Sl No.	Bank Name	Dep Rural	Dep Semi-Urban	Dep Urban	Total Deposit	Adv Rural	Adv Semi-Urban	Adv Urban	Total Advances	CDR Rural	CDR Semi Urban	CDR Urban	ATM Rural	AT Ser Ur
1	BOI	0.00	2267.00	0.00	2267.00	0.00	1104.00	0.00	1104.00		48.70		0	
2	CAN	0.00	1813.33	352.32	2165.65	203.28	1176.90	0.00	1380.18		64.90	0.00	0	
3	CBI	6398.30	13057.80	0.00	19456.10	1197.19	1358.81	0.00	2556.00	18.71	10.41		1	
4	IND	3927.68	8957.73	0.00	12885.41	2631.22	208.09	0.00	2839.31	66.99	2.32		0	
5	PNB	48786.40	56878.44	0.00	105664.84	16297.59	20464.12	0.00	36761.71	33.41	35.98		14	
6	SBI	35832.05	123379.18	0.00	159211.23	9287.26	29271.73	0.00	38558.99	25.92	23.73		19	
7	UCO	0.00	9039.05	0.00	9039.05	0.00	1310.87	0.00	1310.87		14.50		0	
8	UNI	0.00	10677.75	0.00	10677.75	0.00	1961.14	0.00	1961.14		18.37		0	
Public	**Total**	**94944.43**	**226070.28**	**352.32**	**321367.03**	**29616.54**	**56855.66**	**0**	**86472.2**	**31.19**	**25.15**	**0**	**34**	
1	APRL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0	
2	AXIS	311.00	10712.00	0.00	11023.00	0.00	1337.00	0.00	1337.00	0.00	12.48		1	
3	BAND	13332.01	6916.02	0.00	20248.03	29823.14	9934.33	0.00	39757.47	223.70	143.64		0	
4	HDFC	0.00	13405.55	0.00	13405.55	0.00	8280.52	0.00	8280.52		61.77		0	
5	ICICI	0.00	8472.45	0.00	8472.45	0.00	186.37	149.84	336.21		2.20		0	
6	IDBI	0.00	3606.00	0.00	3606.00	0.00	1769.54	0.00	1769.54		49.07		0	
7	INDUS	0.00	854.12	0.00	854.12	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0	
8	NESFB	0.00	948.19	0.00	948.19	0.00	2292.03	0.00	2292.03		241.73		0	
Private	**Total**	**13643.01**	**44914.33**	**0**	**58557.34**	**29823.14**	**23799.79**	**149.84**	**53772.77**	**218.6**	**52.99**	**0**	**1**	
1	AGVB	28614.96	13572.03	0.00	42186.99	6717.53	3035.23	0.00	9752.76	23.48	22.36		0	
RRB	**Total**	**28614.96**	**13572.03**	**0**	**42186.99**	**6717.53**	**3035.23**	**0**	**9752.76**	**23.48**	**22.36**	**0**	**0**	
1	AACB	0.00	3943.45	2321.84	6265.29	0.00	163.46	131.19	294.65		4.15	5.65	0	
Grand	**Total**	**137202.4**	**288500.09**	**2674.16**	**428376.65**	**66157.21**	**83854.14**	**281.03**	**150292.38**	**48.22**	**29.07**	**10.51**	**35**	
		Last Quarter Data												
	Total	**130079.55**	**263225.43**	**2357.62**	**395662.6**	**64481.09**	**80238.93**	**2002.63**	**146722.65**	**49.57**	**30.48**	**84.94**	**35**	

Save this report as Go Back

© Copyright Designed and Developed By-
National Informatics Centre, Assam State Unit, Guwahati.

আকাদেমি পত্রিকা

গত ছয়টি সংখ্যার সম্পূর্ণ সূচি

প্রথম সংখ্যা।। ১৪০২ বঙ্গাব্দ, ১৯৯৬ খ্রিস্টাব্দ।। সম্পাদক : অপূর্বানন্দ মজুমদার

১. শুভেচ্ছাবাণী : প্রভাস সেন মজুমদার।। ২. মুখবন্ধ : নৃপতিরঞ্জন চৌধুরী, বিজয়কুমার ধর।। ৩. সম্পাদকীয়।। ৪. গবেষণার কথা : অসীমকুমার দত্ত।। ৫. বরাক উপত্যকার প্রেক্ষাপটে আঞ্চলিক ইতিহাস-চর্চার প্রাসঙ্গিকতা : জয়ন্তভূষণ ভট্টাচার্য।। ৬. বরাক উপত্যকায় আর্যব্রাহ্মণ্য প্রভাবের সূচনা : কয়েকটি অনালোচিত ও লোকায়ত তথ্যসূচি : অমলেন্দু ভট্টাচার্য।। ৭. ভাটেরা তাম্রশাসন : সাহিত্য বিচার ও ঐতিহাসিক মূল্যায়ন : হরিপদ চক্রবর্তী।। ৮. সুলতানী আমলের একটি অনালোচিত লিপি : সুজিৎ চৌধুরী।। ৯. কাছাড়ে চা-শিল্পের আদিপর্ব : অপ্রকাশিত কয়েকটি সরকারি পত্র : দেবব্রত দত্ত।। ১০. বরাকের উপন্যাস ও অশ্রুমালিনী : উষারঞ্জন ভট্টাচার্য।। ১১. মননের প্রাকৃতায়ন : তপোধীর ভট্টাচার্য।। ১২. ইতিহাসের মৌন মুখর মুহূর্তগুলি কথা বলুক আজ : অনুরূপা বিশ্বাস।। ১৩. বরাক উপত্যকা ভিত্তিক গবেষণাধর্মী গ্রন্থ, নিবন্ধ ও থিসিসসমূহের একটি প্রাথমিক ও অসম্পূর্ণ তালিকা : প্রশান্তরঞ্জন আচার্য।। ১৪. ইতিহাস অনুসন্ধান বর্ষের সমাপ্তি উপলক্ষে গবেষণা পরিষদ আহ্বায়কের লিখিত প্রতিবেদন : অপূর্বানন্দ মজুমদার।।

দ্বিতীয় সংখ্যা।। ১৪১১ বঙ্গাব্দ, ২০০৫ খ্রিস্টাব্দ।। সম্পাদক : জন্মজিৎ রায়

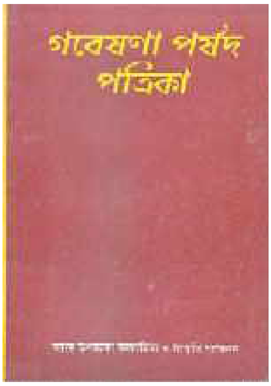

১. মুখবন্ধ : শক্তিপদ ব্রহ্মচারী, তরুণ দাস।। ২. সম্পাদকের নিবেদন।। ৩. কাছাড়ের কয়েকটি অপ্রধান ভাষা : সুধাংশুশেখর তুঙ্গ।। ৪. করিমগঞ্জে রবীন্দ্র-সংবর্ধনা : উষারঞ্জন ভট্টাচার্য।। ৫. সুরমা-বরাক উপত্যকার প্রাক্-চৈতন্য বৈষ্ণবধর্ম : তাম্রলিপির আলোকে : সুজিৎ চৌধুরী।। ৬. মনসামঙ্গল কাব্যের এক অনালোচিত কবি রাধামাধব দত্ত : অমলেন্দু ভট্টাচার্য।। ৭. সুরমা-বরাক উপত্যকার স্মৃতিশাস্ত্রে প্রাচীন ইতিহাসের ইঙ্গিত : আনন্দমোহন মোহন্ত।। ৮. অচ্যুতচরণ চৌধুরী তত্ত্বনিধি : শতবর্ষ পূর্বের চিঠিপত্রের আলোকে : জন্মজিৎ রায়।। ৯. শ্রীহট্ট-কাছাড়ে লোকায়ত জীবন ও সংস্কৃতিতে ঐক্যভাবনা : সঞ্জীব দেবলস্কর।। ১০. বরাক উপত্যকার কৃষি অর্থনীতি : নিরঞ্জন রায়।। ১১. আসামের বরাক উপত্যকার জনসংখ্যা ও অর্থনৈতিক চিত্র : একটি সংক্ষিপ্ত আলোচনা : পরিতোষচন্দ্র দত্ত।

তৃতীয় সংখ্যা।। ১৪১৫ বঙ্গাব্দ, ২০০৯ খ্রিস্টাব্দ।। সম্পাদক : জন্মজিৎ রায়

১. সম্পাদকীয়।। ২. Bipin Chandra Paul : The Fiery Orator and His struggle for Swaraj : হরিদাস মুখোপাধ্যায় ও উমা মুখোপাধ্যায়।। ৩. Bipin Chandra Paul : A Chronicle of Life and Events : ভূপেন্দ্রকুমার ভট্টাচার্য।। ৪. Bipin Chandra Paul : A Bibliography : বিজয় দেব।। ৫. কর্মে ও মননে বিপিনচন্দ্র ও গান্ধী : সন্দীপ দাস।। ৬. বঙ্গীয় জাতীয় শিক্ষা পরিষৎ ও বিপিনচন্দ্র পাল : মায়া ভট্টাচার্য।। ৭. বিপিনচন্দ্র পাল : রাজনীতির মঞ্চে এক আপোষহীন ব্যক্তিত্ব : মনোলীনা নন্দী রায়।। ৮. Speech on Congress Resolution for the Repeal of Assam Act (1887) : বিপিনচন্দ্র পাল।। ৯. প্রাণতুল্যেষু : বিপিনচন্দ্র পাল।। ১০. পিতাপুত্রে : বিপিনচন্দ্র পাল।। ১১. ত্যাজ্যপুত্র : বিপিনচন্দ্র পাল।।

চতুর্থ সংখ্যা।। ২০১০-২০১১।। সম্পাদক : সঞ্জীব দেবলস্কর

১. মুখবন্ধ : নীতীশ ভট্টাচার্য।। ২. প্রাক্-কথন : তরুণ দাস।। ৩. সম্পাদকীয়।। ৪. দু'টি রবীন্দ্র কবিতার জন্মকথা : উষারঞ্জন ভট্টাচার্য।। ৫. মরমিয়াবাদে রবীন্দ্রনাথ ও হাছন রাজা : আবুল হোসেন মজুমদার।। ৬. চৈতন্যদেব, বৈষ্ণবীয় প্রভাব ও রবীন্দ্রনাথ : জন্মজিৎ রায়।। ৭. বরাক উপত্যকায় রবীন্দ্র নির্মাণ : সংস্কৃত ভাষায় অনূদিত রবীন্দ্রকাব্য : আনন্দমোহন মোহন্ত।। ৮. আমাদের রবীন্দ্রনাথ : লোকসাহিত্যের চারণক্ষেত্রে কবিগুরু : তুষারকান্তি নাথ।। ৯. রবীন্দ্র-আলোকে সুজিৎ চৌধুরীর ইতিহাস-চেতনা : সঞ্জীব দেবলস্কর।। ১০. উত্তর-পূর্বাঞ্চলে ঠাকুর পরিবার : প্রাক্ রবীন্দ্র থেকে রবীন্দ্রোত্তর পর্ব : ইতিহাসের সূত্রসংকেত : বিবেকানন্দ মোহন্ত।। ১১. শিলচর শহরে রবীন্দ্রসংগীত চর্চা : দেবাশিস দাস।। ১২. ঢাকাদক্ষিণে সপ্ততিতম রবীন্দ্রজয়ন্তী, ১৯৩১ : বাণীপ্রসন্ন মিশ্র।। ১৩. শিলচরে রবীন্দ্র অনুষ্ঠান : সংক্ষিপ্ত সমীক্ষণ : মনুজেন্দ্র শ্যাম।। ১৪. করিমগঞ্জে রবীন্দ্রজন্মশতবার্ষিকীর প্রতিবেদন : অরিজিৎ চৌধুরী।। ১৫. গ্রামকাছাড়ে রবীন্দ্রজন্মশতবার্ষিকী : প্রতিবেদন-১ : দীপংকর চন্দ।। ১৬. গ্রামকাছাড়ে রবীন্দ্রজন্মশতবর্ষ : প্রতিবেদন-২ : সঞ্জীব দেবলস্কর।। ১৭. আকাদেমি পত্রিকা — গত তিনটি সংখ্যার সম্পূর্ণ সূচি।। ১৮. চিত্র।। ১৯. প্রসঙ্গ ভাষা আকাদেমি।

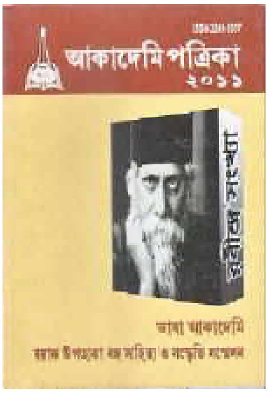

পঞ্চম সংখ্যা।। ২০১২-২০১৩।। সম্পাদক : তুষারকান্তি নাথ

১. মুখবন্ধ : নীতিশ ভট্টাচার্য।। ২. প্রাক্-কথন : তরুণ দাস।। ৩. সম্পাদকীয়।। ৪. লোকসংস্কৃতি ও নাগরিক সংস্কৃতি : সংঘাত, সমন্বয় ও উত্তরণ : জন্মজিৎ রায়।। ৫. বরাক উপত্যকার লোকসংগীতে অধ্যাত্মবাদ : সম্প্রীতি চেতনার প্রেক্ষাপট : আবুল হোসেন মজুমদার।। ৬. অথ বাঘ-মানব প্রসঙ্গ : উত্তরপূর্ব ভারতের লোককথা : সুবীর কর।। ৭. গাজিনৃত্য : বরাক উপত্যকার এক অনুপম লোকশিল্পকলা: কামালুদ্দীন আহমেদ।। ৮. বৌ নাচ বা বধূবরণ নৃত্য : মুকুন্দদাস ভট্টাচার্য।। ৯. বরাক উপত্যকার লোকসংস্কৃতি বলয়ে ওঝানাচ : শিবতপন বসু।। ১০. 'গুরমার গান' বা 'ওঝানাচ' : লিঙ্গাতিযায়ী লোককলা : দীপেন্দু দাস ।। ১১. ভূমি চারণা (Landlore) : বরাক উপত্যকার মাটির ইতিবৃত্ত : সঞ্জীব দেবলস্কর।। ১২. বরাক উপত্যকার তিনটি মেয়েলিব্রত : একটি সমাজতাত্ত্বিক আলোচনা : প্রিয়ব্রত নাথ।। ১৩. বরাক উপত্যকার লোকছড়ায় প্রতিফলিত সমাজচিত্র : প্রভাসচন্দ্র নাথ।। ১৪. বরাক উপত্যকার প্রবাদে সমাজমনস্কতা : সর্বজিৎ দাস।। ১৫. বরাক উপত্যকার লোকজীবনের লুপ্তপ্রায় কিছু লোক-উপাদান : আশিসরঞ্জন নাথ।। ১৬. বিবাহের লোকাচার ও লোকগান : শিল্পীর নকশিকাঁথায় নিপুণ গাথা : অনামিকা চক্রবর্তী।। ১৭. বরাক

উপত্যকার বাঙালি মুসলমান সমাজে প্রচলিত বিয়ের গান : মহবুবুল বারী।। ১৮. মণিপুরি লোকসংস্কৃতি : মণিধন সিংহ।। ১৯. ডিমাছাদের পূজা-পার্বণ : ঐতিহ্যের মূল্যায়ন : সুদীপ্তা খেরসা।। ২০. বরাক উপত্যকার দুর্গাপূজায় 'নৌকাটানা' অনুষ্ঠান : তুষারকান্তি নাথ।। ২১. লোকসংস্কৃতি চর্চার ধারায় রাজমোহন নাথ : অমলেন্দু ভট্টাচার্য।। ২২. লোকসংস্কৃতি এবং ইতিহাস : প্রসঙ্গ সুজিৎ চৌধুরী : সঞ্জীব দেবলস্কর।। ২৩. লোকসংস্কৃতিবিদ্যা ও পাণ্ডুলিপিবিদ্যা— বিনিময়! : অর্জুনদেব সেনশর্মা ।। ২৪. প্রতিবেদন ১. অরুণ চন্দ স্মৃতি সম্মান নিয়ে অভিভূত প্রবাদপ্রতিম রাজনীতিক।। ২৫. প্রতিবেদন ২. বরাকবঙ্গের ধামাইল উৎসব ও কর্মশালা ।। ২৬. আকাদেমি পত্রিকা— গত চারটি সংখ্যার সম্পূর্ণ সূচি।। ২৭. আলোকচিত্র সংগ্রহ : সূর্যতপ নাথ

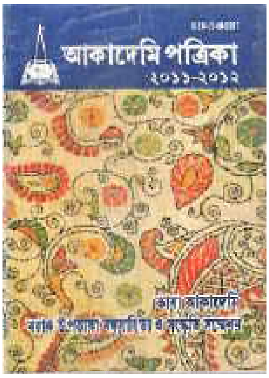

ষষ্ঠ সংখ্যা।। ১৪২২ বঙ্গাব্দ, ২০১৬ খ্রিস্টাব্দ।। সম্পাদক : সঞ্জীব দেবলস্কর

১. মুখবন্ধ : নীতিশ ভট্টাচার্য।। ২. প্রাক্-কথন : গৌতম প্রসাদ দত্ত।। ৩. সম্পাদকীয়।। ৪. বাংলা ভাষাবিদ্যা চর্চার আড়াই শতক : সুশান্ত কর।। ৫. পুথি সাহিত্যের ভাষাবিচার : কাছাড়ের পুথি 'পারিজাতহরণ' : তুষারকান্তি নাথ।। ৬. লোকভাষার সন্ধানে : প্রেক্ষিত বরাক উপত্যকা : সঞ্জীব দেবলস্কর।। ৭. বরাক উপত্যকার কথ্য বাংলার কিছু বৈশিষ্ট্য : আবিদ রাজা মজুমদার।। ৮. বাংলা তৎসম শব্দের বানান ঃ সংশয় ও মীমাংসা : জন্মজিৎ রায়।। ৯. প্রসঙ্গ বাংলা বানান সংস্কার : সুজিৎ চৌধুরী।। ১০. বহুভাষিক চরিত্রই আমাদের সম্পদ : জয়দীপ বিশ্বাস।। ১১. বহুবাচনিক বরাক উপত্যকার বিভিন্ন জনগোষ্ঠী : ডঃ মণিধন সিংহ।। ১২. প্রসঙ্গ ডিমাসা ভাষা : সুদীপ্তা খেরসা।। ১৩. বরাক উপত্যকার চা জনগোষ্ঠীর ভাষা : সন্তোষ রঞ্জন চক্রবর্তী।। ১৪. ভাষা ও প্রযুক্তি : আন্তর্জালে বাংলা ভাষা : সুশান্ত কর।। **১৫. ক্রোড়পত্র :** ক. ভাষার ভুল, ভুলের ভাষা : অমিতাভ দেব চৌধুরী।। খ. বরাক উপত্যকার চিত্রকলার ভাষা : গণেশ নন্দী।। গ. বরাক উপত্যকার নাটকের ভাষা : শান্তনু পাল।। ঘ. বরাক উপত্যকার গানের ভাষা : সম্পাদকীয় প্রস্তাবনা।। **১৬. বিশেষ প্রতিবেদন** : ১. আকাদেমি সম্মাননা, পঞ্চবিংশতিতম এবং ষড়বিংশতিতম।। ২. ভাষা আকাদেমি সম্মাননা প্রাপকদের উদ্দেশে সম্মেলন প্রদত্ত মানপত্রের বয়ান ।। ৩. আকাদেমি পত্রিকা — পঞ্চম সংখ্যা প্রসঙ্গে।। ৪. আকাদেমি পত্রিকা — গত পাঁচটি সংখ্যার সম্পূর্ণ সূচি।। **১৭. দলিল দস্তাবেজ** : ১. বরাক উপত্যকায় বাংলা ভাষা ব্যবহারের ঐতিহ্য।। ২. THE ASSAM OFFICIAL LANGUAGE ACT, 1960।। ৩. THE ASSAM OFFICIAL LANGUAGE RULES, 1970 ।। ৪ভাষার জন্য সংগ্রাম — সাধারণ সম্পাদকের প্রতিবেদন।। ৫. আসাম সরকার রাজনৈতিক (খ) বিভাগ, দিসপুর, গুয়াহাটি প্রেরিত একটি চিঠি, ৩০ নভেম্বর ২০১৩। বিষয় ঃ সরকারি ভাষা আইন, ১৯৬০ অনুযায়ী আসাম সরকারের নথিপত্রে সরকারি ভাষা প্রয়োগ সম্পর্কে।। ৬. ঐ, দ্বিতীয় চিঠি, ২০ জুন ২০১৩।। ৭. কাছাড়, করিমগঞ্জ ও হাইলাকান্দির জেলাশাসকের কাছে কেন্দ্রীয় সমিতির তরফে ২১ জুলাই ২০১৪তে দেওয়া স্মারকপত্র ৮. Office of the District Magistrate, Cachar এর চিঠি, ২৫ জুলাই ২০১৪।। ৯. ঐ, চিঠি, ২৮ জুলাই, ২০১৪।। ১০. আসাম সরকার জেলা উপায়ুক্ত কার্যালয়ের প্রেস বিজ্ঞপ্তি, ৮ সেপ্টেম্বর, ২০১৪।। ১১. প্রশাসনের স্পষ্টীকরণ — সংবাদপত্রের প্রতিবেদন।। ১২. সরকারি নির্দেশ প্রত্যাহারের বিজ্ঞপ্তি, SN/9.9.14।। ১৩. On Language Circular – The Telegraph Clipping।। ১৪. আসামে ভূমিপুত্রের সংজ্ঞা নির্ধারণ নিয়ে সম্মেলনের অভিমত।। ১৫. আসাম বিধানসভার অধ্যক্ষ শ্রী প্রণবকুমার গগৈকে প্রদত্ত স্মারকপত্র।।

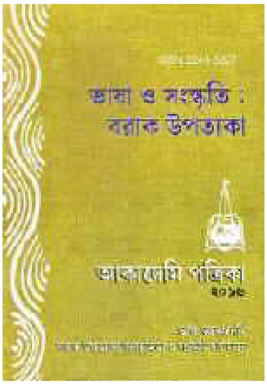

HINDUSTAN PAPER CORPORATION LTD.
Cachar Paper Mill
PLANT
TOWNSHIP
Paper For People
From Bamboo To Book